হৃষীকেশ সিরিজ—১৮

সুবর্ণবণিক্ কথা ও কীর্তি

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

কলিকাতা

১৯৪১

মূল্য—৬৲ টাকা

৯নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস লিঃ হইতে
শ্রীযোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভূমিকা

সুবর্ণবণিক্ কথা ও কীর্তির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। প্রথম খণ্ডের মত এই খণ্ডের বিষয়বস্তুও ধারাবাহিকভাবে সুবর্ণবণিক্ সমাচারে প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি, আগামী এক বৎসরের মধ্যে তৃতীয় খণ্ড মুদ্রিত করিয়া সহৃদয় পাঠকের হস্তে প্রদান করিতে সমর্থ হইব।

বর্তমান খণ্ডে কয়েকজন মনীষীর কীর্তি-কাহিনী স্থান পাইয়াছে। সুবর্ণবণিক্ জাতি এমন অনেক মহৎ কার্য করিয়া গিয়াছেন, যাহা জনসাধারণ পরিজ্ঞাত নহেন। এই গ্রন্থ পাঠে জনসাধারণ সেই সমস্ত জানিতে পারিবেন। সুবর্ণবণিক্গণও তাঁহাদের পূর্বপুরুষগণের কীর্তির কথা স্মরণ করিয়া জীবনের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করিবেন, ইহাই আমার আশা ও আকাঙ্ক্ষা।

৯৬নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
আশ্বিন, ১৩৪৮

শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা

সূচীপত্র

চিত্র-সূচী

দানবীর নিমাইচরণ মল্লিক

বংশ-পরিচয়

দানবীর নিমাইচরণ মল্লিক কলিকাতার বড়বাজারের (সিংহবাহিনী) মল্লিক বংশে আনুমানিক ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের আসল উপাধি দে, পরে ইঁহারা মল্লিক আখ্যা প্রাপ্ত হন। এই বংশের বনমালী মল্লিক তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া-আবাদ নামক স্থানের সন্নিকটে জনসাধারণের সুবিধার জন্য একটি খাল কাটান। এই খাল এখনও মল্লিকের খাল নামে প্রসিদ্ধ আছে। এই সম্বন্ধে রায় শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক বাহাদুর তৎপ্রণীত নদীয়া কাহিনীতে লিখিয়াছেন—"অধুনা বাঘের খাল নামে যে খালটি কাঞ্চনপল্লী (কাঁচড়াপাড়া) ও কুমারহট্টের মধ্যে বিদ্যমান আছে, সেটি মল্লিক সাহেব নামক কোনও এক ধনী কর্তৃক খাত হয়।" পৃঃ ৩৪৯

বনমালী মল্লিকের পুত্র বৈদ্যনাথ মল্লিক শ্রীশ্রীভগবতী সিংহবাহিনী দেবীকে প্রাপ্ত হন এবং এই মূর্তি প্রাপ্তির পর হইতে তাঁহাদের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। নিমাইচরণের পিতামহ দর্পনারায়ণ মল্লিক। "ইনি কাশী, নবদ্বীপ ও হুগলী জেলায় অনেক মন্দির ও অতিথিশালা স্থাপন করিয়াছিলেন।"*

নয়ানচাঁদ মল্লিক

নিমাইচরণের পিতার নাম নয়ানচাঁদ মল্লিক। তিনিও অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। "ইনি কাশী, মাহেশ ও অন্যান্য স্থানে অনেক মন্দির ও ধর্মশালা স্থাপন এবং বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে অনেকগুলি পুষ্করিণী খননও করিয়াছিলেন। কলিকাতা সহরেও বড়বাজারের মধ্যে একটি পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিয়া সর্বসাধারণের ব্যবহার জন্য তদানীন্তন মান্যবর ইষ্ট ইণ্ডিয়া

---

* শ্রীশ্রীভগবতী সিংহবাহিনী দেবীর সেবাধিকারিগণের সমূল বংশবল্লী, পৃঃ ২১

কোম্পানীকে দান করেন ; এক্ষণে ইহাই ক্রশ ষ্ট্রীট নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহার স্ত্রী (নিমাইচরণের মাতা) স্বর্ণমুদ্রায় তুলা দান করিয়াছিলেন।"[১]

হুগলী জেলার বল্লভপুরে নয়ানচাঁদ বল্লভজি ও রাধিকার যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই যুগলমূর্তি কাল কষ্টিপাথরে নির্মিত ; বল্লভজির মন্দির বল্লভপুরে একটি দর্শনীয় বস্তু। মন্দিরের উচ্চতা ৬৫ ফিট, দৈর্ঘ্য ৬০ ফিট ও প্রস্থ ৪০ ফিট। প্রবেশ-পথ দক্ষিণ মুখে। মন্দির নির্মাণের সময় ও দাতা এবং শিল্পীর নাম মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ আছে। উহা নিম্নরূপ—

"শ্রীকৃষ্ণ স্মরণার্থ
শুভমস্তু শকাব্দা—১৬৮৬ (খৃঃ ১৭৬৪)
দাতা—নয়ান মল্লিক
শিল্পকার—শ্রীকৃষ্ণদাস"

এই মন্দিরের ব্যয় নির্বাহার্থ দুই দফায়—৮৩৬৲ টাকা পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন নিমাইচরণ বিগ্রহের নিত্য সেবার জন্য মাসিক ৩৬৲ টাকা আয়ের স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

নয়ানচাঁদের তিন পুত্র, জ্যেষ্ঠ গৌরচরণ, মধ্যম নিমাইচরণ ও কনিষ্ঠ রাধাচরণ।

বিদ্যাশিক্ষা ও কর্মজীবন

নিমাইচরণের বিদ্যাশিক্ষা ও কর্মজীবন সম্বন্ধে পারিবারিক ইতিহাস গ্রন্থে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ—"তিনি ইংরেজী, বাংলা ও পারস্য ভাষায় বিজ্ঞ ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর নিমাইচরণ প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। তদুপরি কয়েক বৎসর মধ্যে স্বীয় প্রতিভাবলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও অপর সমস্ত সওদাগরমণ্ডলীর সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া যথেষ্ট ধনোপার্জন করেন এবং একজন প্রসিদ্ধ সওদাগর ও ব্যাঙ্কার বলিয়া পরিগণিত হন। ব্যাঙ্কার 'নিমাইচরণ মল্লিকের তোড়া' তৎকালে নোটের ন্যায় ক্রয়-বিক্রয়াদি কার্যে ব্যবহৃত হইত এবং কেহ উহা পরীক্ষার প্রয়োজন মনে করিত না।"[২]

১ শ্রীশ্রীভগবতী সিংহবাহিনী দেবীর সেবাধিকারিগণের সমূল বংশবল্লী, পৃঃ ২১

২ পারিবারিক ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২০৬

বল্লভপুরের মন্দির, হুগলী
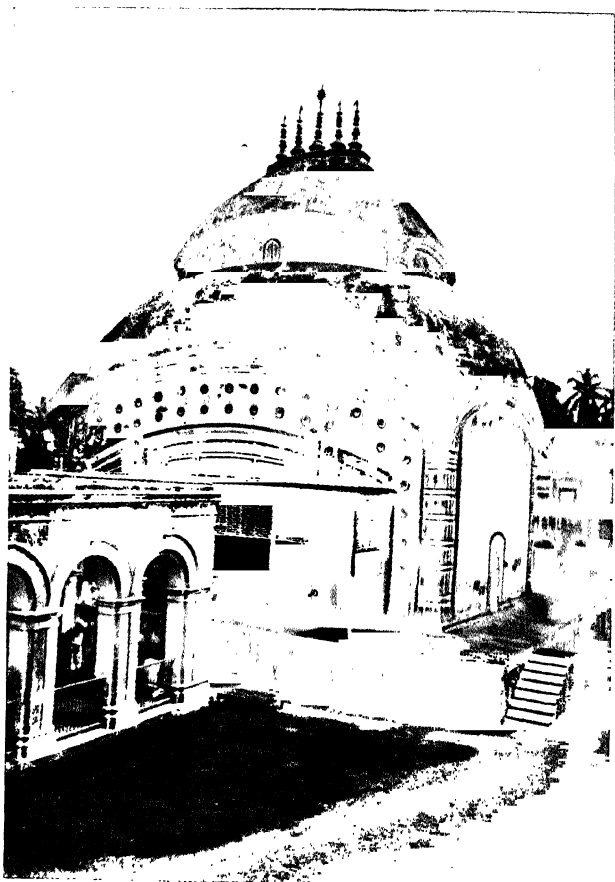
গৌরচরণ ও নিমাইচরণ এই দুই ভ্রাতা পিতার মৃত্যুর পর একান্নবর্তী ছিলেন। উভয়ে একত্রে বাণিজ্য ও তেজারতি ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। পরে উভয়ে পৃথক হন। "যখন তাঁহারা পৃথক হয়েন, তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৌরচরণ মল্লিক যৌথ ব্যবসায়ের উপস্বত্ব কনিষ্ঠকে ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র পৈত্রিক সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশই গ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিমাইচরণ মল্লিক তজ্জন্য সেই উপস্বত্বের ধন কেবলমাত্র পুণ্যকার্যের জন্যই নিয়োজিত করিয়াছিলেন।"*

কাঁচড়াপাড়ায় ঠাকুরবাড়ী নির্মাণ

কলিকাতা হইতে ২৮ মাইল দূরবর্তী কাঁচড়াপাড়া বহু প্রাচীন স্থান। পূর্বে ইহার নাম ছিল কাঞ্চনপল্লী। এই স্থানে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে গৌরচরণ ও নিমাইচরণ উভয় ভ্রাতা শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় বিগ্রহের এক বিরাট্ মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। এই সম্বন্ধে রায় শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক বাহাদুর লিখিয়াছেন —"কাঞ্চনপল্লী বর্তমান কাঁচড়াপাড়া নদীয়া জেলায় একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। বহু পূর্বে ইহার নাম ছিল নবহট্টগ্রাম। * * * বর্তমান কাঞ্চনপল্লী গ্রামটি গঙ্গাযমুনার সঙ্গম-স্থলের চরভূমির উপর স্থাপিত। পূর্বখ্যাত কাঞ্চনপল্লী কালের কুটিল গতিতে এখন গঙ্গাবক্ষে বিরাজ করিতেছে। বৈষ্ণবদিগের প্রসিদ্ধ পাঠমালা গ্রন্থে দেখা যায় যে, কাঞ্চনপল্লী সেন শিবানন্দের পাট বলিয়া উক্ত আছে। শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেব এই শিবানন্দের বাটিতে আগমন করিয়াছিলেন ও এখান হইতে শান্তিপুর অদ্বৈত মন্দিরে, পরে তাহা হইতে নবদ্বীপে জননী দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। সেন শিবানন্দ নিজগুরু শ্রীনাথ আচার্যের নামে যে 'কৃষ্ণরায়' বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন, ঐ বিগ্রহ প্রথমে শ্রীনাথ আচার্যের দৌহিত্র শ্রীমহেশের নিজ বাটিতে থাকিতেন। ঐ বিগ্রহের পদ্মাসনে একটি শ্লোক খোদিত আছে।

কথিত আছে বঙ্গের শেষ বীর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত-পুত্র যশোহরজিৎ কচুরায় প্রতাপের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে দিল্লী দরবারে যাইবার কালীন কাঞ্চনপল্লী দিয়া গমন করেন; * * * তিনি যাত্রাকালে

* শ্রীশ্রীভগবতী সিংহবাহিনী দেবীর সেবাধিকারিগণের সমূল বংশবল্লী, পৃঃ ২১

কৃষ্ণরায় বিগ্রহ দর্শন করিয়া এইরূপ মানসিক করেন—'যদি এ যাত্রায় আমি ফতে হই, তাহা হইলে ঠাকুরের একটি শ্রীমন্দির নির্মাণ করিয়া দিব।' সেবারে তিনি দরবারে সফলমনোরথ হওয়ায় প্রত্যাগমনকালে পুনরায় কৃষ্ণরায়কে দর্শন করিতে আসেন এবং বহু অর্থব্যয় করিয়া তাঁহার শ্রীমন্দির, ভোগমন্দির, দোলমঞ্চ প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া দেন; এবং ঠাকুরের নিত্য সেবা নির্বাহার্থ 'কৃষ্ণবাটি' নামে একখানি তালুক জায়গীর দেন। এখনও উক্ত তালুক তাঁহার সেবার্থ নিয়োজিত আছে। লর্ড কর্ণওয়ালিশ দশশালা বন্দোবস্তের সময়ে ইহার বার্ষিক ২৮৵০ করধার্য করিয়া গিয়াছেন। পুরাতন কাঞ্চনপল্লী যখন গঙ্গার ভাঙনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন যশোহরজিতের নির্মিত শ্রীমন্দিরও গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিত হয়। বর্তমান শ্রীমন্দির যাহা ভারতীয় শিল্প-চাতুর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে, তাহা ১৭০৭[১] শকে কলিকাতার প্রসিদ্ধ নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক মহাশয়দ্বয়ের ব্যয়ে নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপ সুন্দর গঠন, সুঠাম মন্দির সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।"[২]

মন্দির নির্মাণের বিষয়ে রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর "কাঁচড়াপাড়া, কবিকর্ণপুর" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"সেই মন্দির কালে গঙ্গাগর্ভে গত হইলে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার নিমাইচরণ মল্লিক ও গৌরচরণ মল্লিক এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে বর্তমান মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন।"[৩]

এই মন্দির নির্মাণ উপলক্ষে তাঁহারা যে বিপুল অর্থ ব্যয় করেন, সেই সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে—"পূর্বে কাঁচড়াপাড়ায় সেন শিবানন্দের পাট ও তথায় শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণরায়জিউ নামক বিগ্রহ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইঁহারা সেই দেবতার একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া বহু সমারোহে তাহার প্রতিষ্ঠা-কার্য সম্পন্ন করেন। কথিত আছে তদুপলক্ষে কাঙালী বিদায়ে দুই টাকা করিয়া প্রতিজনকে দান করা হয়। এই দেবালয়ের ব্যয় নির্বাহ জন্য ইঁহারা তত্রত্য এক খণ্ড জমি ও একটি বাগান দেবত্র দান করিয়াছিলেন। এদ্ব্যতীত দেব-সেবার মাসিক ব্যয়ের বন্ধনীও করিয়া যান।"[৪]

---

১ ইং ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ ২ নদীয়া কাহিনী, পৃঃ ৩৪৯-৩৫০ ৩ বঙ্গবাণী, চৈত্র, ১৩২৮, পৃঃ ১৭০

৪ শ্রীশ্রীভগবতী সিংহবাহিনী দেবীর সেবাধিকারিগণের সমূল বংশবল্লী, পৃঃ ২১
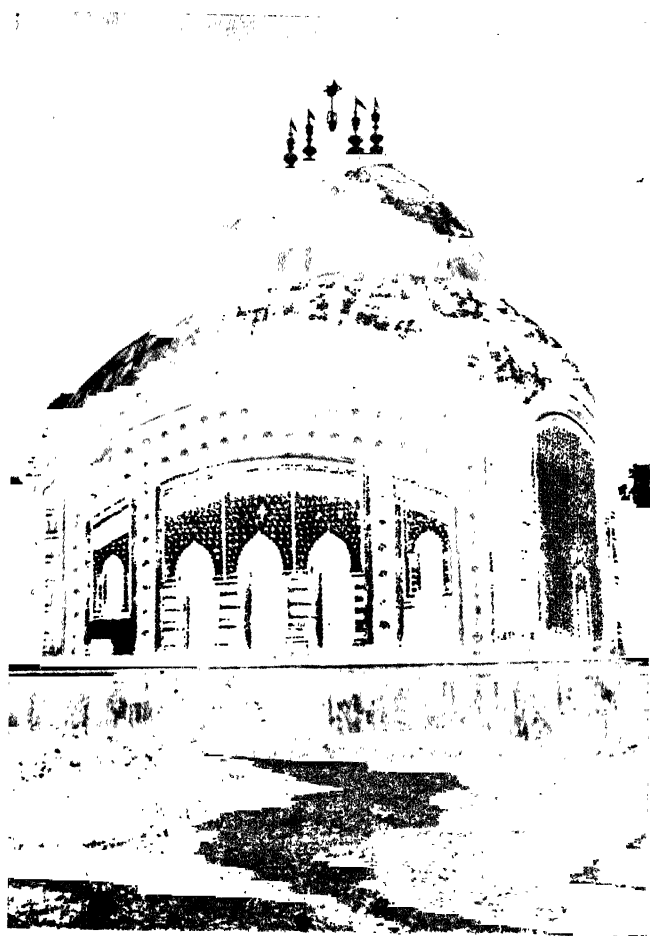
নিমাই মল্লিক নির্মিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়ের মন্দির, কাঁচড়াপাড়া, ২৪ পরগণা

ই বি রেল কোম্পানী কর্তৃক 'বাংলা ভ্রমণ' প্রথম খণ্ডে কাঁচড়াপাড়ার কৃষ্ণরায়ের মন্দির সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ স্থান পাইয়াছে—"কাঁচড়াপাড়ার প্রাচীন নাম কাঞ্চনপল্লী, বৈষ্ণব সাহিত্যে এই স্থান 'সেন শিবানন্দের পাট' নামে উল্লিখিত আছে। সেন শিবানন্দের প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ আজও কাঁচড়াপাড়ায় নিত্য পূজিত হইতেছেন।……

যশোহররাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত-পুত্র রাঘব বা কচু রায় দিল্লী হইতে 'যশোরজিৎ' উপাধি ও বাদসাহী সনন্দ লাভ করিবার পর কৃষ্ণরায়ের নূতন মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন ও নিত্য সেবা বিধানের জন্য 'কৃষ্ণবাটি' নামে একটি নিষ্কর তালুক জায়গীর দেন। এই মন্দির গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হইবার পর কৃষ্ণরায়ের বর্তমান মন্দির ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নিবাসী নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক মহাশয়দ্বয়ের ব্যয়ে নির্মিত হয়। এই মন্দিরের কারুকার্য অতি সুন্দর। রথের সময় কাঁচড়াপাড়ায় বিশেষ সমারোহ হয়।" পৃঃ ৭৯—৮০

শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়ের মন্দিরের বিবরণ

মন্দির-গাত্রে একখানি পাষাণ ফলকে গৌরচরণ, নিমাইচরণ ও রাধাচরণের নাম এবং মন্দির নির্মাণের কাল এইরূপ খোদিত আছে—'কুলাদ্রিবিন্দুসপ্তেন্দুসম্মিত' (১৭০৭) শক বৎসর অর্থাৎ ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে মন্দির নির্মিত হয়।

মন্দিরটি দক্ষিণমুখে অবস্থিত। তিন বিঘা জায়গার উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত; এতদ্ভিন্ন বাগান প্রভৃতিতে আরও ৪০ বিঘা হইবে। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৬০ ফিট ও প্রস্থে ৪০ ফিট। উচ্চতা ৭০ ফিট। রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর মন্দিরের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—"শুধু দরজা ছাড়া ইহাতে কাঠের কাজ কোথাও নাই। প্রকাণ্ড খিলানগুলি ও ছাদে কড়ি-বরগার সংস্রব নাই। অথচ তাহা বেশ সুদৃঢ় ও সুন্দর।"*

মন্দিরের সিংহদরজা ২টি ছাদওয়ালা। সামনে তিন ফুকুরে ঠাকুর-

* বঙ্গবাণী, চৈত্র ১৩২৮, পৃঃ ১৭১

দালান ও ৪ কোণে ৪টি পার্শ্বগৃহ। পশ্চাতে রান্নাবাড়ী; অনতিদূরে দোলমঞ্চ, ইহা ১০ ফিট উচ্চ বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত।

বর্তমানে মন্দির হইতে গঙ্গা এক মাইল দূরে এবং কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন দুই মাইল পথ।

সিংহদরজার ডান দিকে টিনের চালাঘর; এই স্থানে উৎসবের সময় যাত্রা ও থিয়েটার হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়ের বিগ্রহ আসন সমেত একখানি কষ্টি পাথরে নির্মিত। শ্রীরাধিকার মূর্তি অষ্ট ধাতু দ্বারা তৈয়ারী হইয়াছে।

ঠাকুরের নিত্যভোগে পাঁচ সের চাউলের অন্ন দেওয়া হয় এবং প্রসাদ সমাগত দরিদ্র অতিথি-অভ্যাগতদিগকে বিতরণ করা হইয়া থাকে।

ঠাকুর-সেবার ব্যয় নির্বাহার্থ নিমাই মল্লিকের ট্রাষ্টফণ্ড হইতে ২০০৲ ও রামমোহন মল্লিকের ট্রাষ্টফণ্ড হইতে ২০০৲ টাকা, মোট ৪০০৲ টাকা বাৎসরিক দেওয়া হয়।

রথের সময় ৯ দিন বিশেষ উৎসব হইয়া থাকে। ঠাকুরের রথ পূর্বে কাষ্ঠ-নির্মিত ছিল; উহা আগুনে পুড়িয়া যাওয়ায় বর্তমানে লৌহ-রথ নির্মিত হইয়াছে।

তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে নিমাইচরণ

তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে নিমাইচরণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বহু প্রকারে সাহায্য করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। এই অর্থের দ্বারা তিনি বহু ভূসম্পত্তি ও তালুক খরিদ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তৎকালীন স্বনাম-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে স্বীয় সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া তাঁহার পরামর্শে স্বজাতির হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

দল-সৃষ্টি

তৎকালে হুগলী ও ত্রিবেণীতে সুবর্ণবণিক্গণ বাস করিতেন। সুবর্ণবণিক্ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন ব্রাহ্মণ এই সমস্ত সুবর্ণবণিকের পিতৃদায়, মাতৃদায় বা অন্য কোন ব্যাপারে তাঁহাদিগের কোন কাজ করিতেন না। যে সমস্ত

শ্রীশ্রী৺কৃষ্ণরায় ও শ্রীরাধিকার যুগলমূর্তি, কাঁচড়াপাড়া

সুবর্ণবণিক্ ব্রাহ্মণ সেই সময় হুগলী বা ত্রিবেণীতে বাস করিতেন তাঁহারা কয়েকজন মোড়লের অধীন ছিলেন। কোন সুবর্ণবণিক্ দায়গ্রস্ত হইলে সেই মোড়ল ব্রাহ্মণকে খবর দিতে হইত। তিনি আসিয়া দায়-উদ্ধারের এমন ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থা দিতেন যে, তাহাতে অধিকাংশ সুবর্ণবণিক্‌কে ঋণগ্রস্ত হইতে হইত। কোন সুবর্ণবণিক্ ব্রাহ্মণ কৃতীর বাড়ীতে আহারাদি করিতেন না; একবার দর্শন দান করিয়া চলিয়া যাইতেন এবং প্রত্যেক ব্রাহ্মণের বাড়ীর পোষ্যগুলির উপযুক্ত আহার্য ও ফতোয়া মাফিক নগদ বিদায় ব্রাহ্মণদের বাড়ীতে পৌছাইয়া দিতে হইত। ইহা ব্যতীত কৃতীর অন্য কোন উপায় ছিল না।

নিমাইচরণ এই দায়গ্রস্ত স্বজাতিকে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার মানসে পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কয়েক ঘর দরিদ্র সুবর্ণবণিক্ ব্রাহ্মণের ভরণপোষণের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করেন। তবে তাঁহাদের সহিত সর্ত ছিল এই যে, যখনই কোন সুবর্ণবণিক্ দায়গ্রস্ত হইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিবেন, তখনই সেই কৃতীর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার দায় উদ্ধার করিয়া দিতে হইবে; কৃতীর বাড়ীতে ভোজন করিতে হইবে, এবং তিনি স্বেচ্ছায় যে দক্ষিণা দিবেন, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। অতঃপর তিনি তাঁহার সদুদ্দেশ্য স্বজাতিবর্গকে অবগত করাইলেন যে, দায় উপস্থিত হইলে তাঁহাকে সংবাদ দিলেই তিনি স্বজাতি ব্রাহ্মণগণের দ্বারা দায় উদ্ধার করিয়া দিবার সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। এই সংবাদে স্বজাতিবর্গ বিশেষ উৎসাহিত হইয়া তাঁহার দলভুক্ত ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন করাইয়া লইতে লাগিলেন। ইহাতে যে সমস্ত স্বজাতি ব্রাহ্মণ নিমাইচরণের দলভুক্ত ছিলেন না, তাঁহাদের আয় বিশেষভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, কারণ সুবর্ণবণিক্ ব্যতীত অন্য কেহ তাঁহাদিগকে কোন কাজে আহ্বান করিতেন না এবং সুবর্ণবণিক্‌গণও নিমাইচরণের সহায়তায় তাঁহাদের দায় হইতে মুক্তি পাওয়ায় আর উক্ত ব্রাহ্মণগণের নিকট যাইতেন না। ইহাতে অনেকে নিমাইচরণের দলভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করিলেন এবং নিমাইচরণও তাঁহাদিগকে এই সর্তে স্বীয় দলভুক্ত করিয়া লইলেন যে, নিমাইচরণ তাঁহার নিযুক্ত সম্ভাষণকারী ব্রাহ্মণের দ্বারা

নিমন্ত্রণ করিলেই তাঁহাদিগকে কৃতীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া ভোজন ও দক্ষিণা গ্রহণ করিতে হইবে ;—কৃতীর স্বতন্ত্র নিমন্ত্রণের কোন প্রয়োজন হইবে না। কারণ ব্রাহ্মণগণের দলপতি নিমাইচরণকে সংবাদ দিলেই দলস্থ সমগ্র ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা হইত।

নিমাইচরণের এই কার্যে ব্রাহ্মণ মোড়লেরা প্রথমে বিশেষভাবে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বজাতিহিতকামী নিমাইচরণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের পরামর্শে সেই সমস্ত প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া স্বীয় কার্যসাধনে অবিচল ছিলেন। ফলে এইরূপে নিমাইচরণ মল্লিকের দলের সৃষ্টি হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সন্তানেরা এই দলও ভাগ করিয়া লইয়াছেন। নিম্ন-লিখিত কয়টি দলের অস্তিত্ব এখনও বর্তমান—

৺রামগোপাল মল্লিকের দল
৺রামমোহন মল্লিকের দল
৺রামতনু মল্লিকের দল
৺স্বরূপ মল্লিকের দল
৺মতিলাল মল্লিকের দল

ইঁহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি এই স্বজাতীয় ব্রাহ্মণগণের দলপতি হিসাবে স্বজাতিদিগকে দায় মুক্ত করিয়া আসিতেছেন। কৃতী দলপতিকে দায়ের বিবরণ জানাইলেই দলপতি নিজ ব্রাহ্মণের দ্বারা দলস্থ ব্রাহ্মণগণকে খবর দিয়া নিমন্ত্রণ করেন এবং ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় দলপতি নিজে কৃতীর বাড়ীতে উপস্থিত থাকিয়া কার্য সুসম্পন্ন করাইয়া থাকেন।

মাহেশে মন্দির নির্মাণ

পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের অনুকরণে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে নিমাইচরণ হুগলী জেলার মাহেশে জগন্নাথের মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ৭০ ফিট। মন্দিরের বিগ্রহ জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। মন্দির ও সেবায়েতদিগের বাসগৃহ লইয়া জমির পরিমাণ প্রায় তিন বিঘা। বিগ্রহের বেদীতে নিম্নলিখিত লেখা উৎকীর্ণ আছে—

সুবর্ণবণিক্ কথা ও কীর্তি
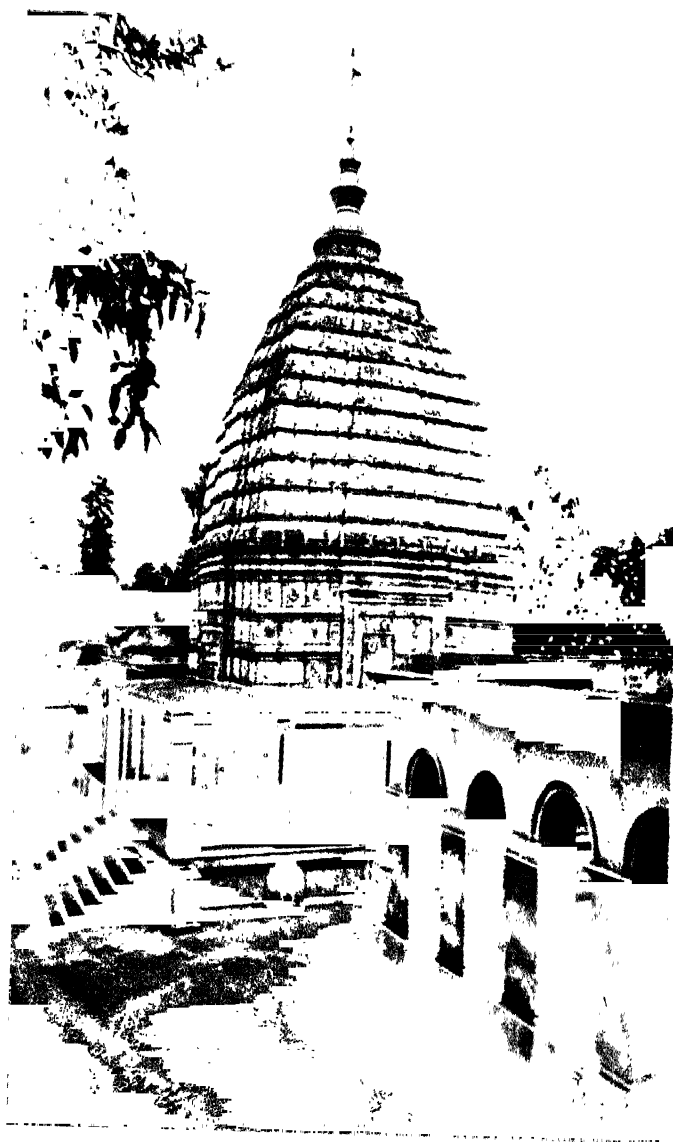
জগন্নাথদেবের মন্দির, মাহেশ, হুগলী

"৺রামতনু মল্লিক
ও
শ্রীমতী পার্বতী দাসী
১২৬৫"

ঠাকুরের নিত্য ভোগে সাড়ে বার সের চাউলের অন্ন দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন খিচুড়ী ভোগও হয়। নিত্য ভোগের জন্য নিমাই মল্লিকের দান বার্ষিক ১৯২৲ ও রামমোহন মল্লিকের ট্রাষ্টফণ্ডের দান ১৫০৲ টাকা। খিচুড়ি ভোগের জন্য নিমাই মল্লিকের স্বতন্ত্র দান বার্ষিক ৪৩৬৲ টাকা। নিমাইচরণের কনিষ্ঠ পুত্র মতিলাল মল্লিক গঙ্গার ধারে সুদৃশ্য রাসমঞ্চ তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন। মতিলালের পোষ্যপুত্র যদুলাল মল্লিক রাসের সময় নিজে গিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। রথ, স্নানযাত্রা, দোল, ঝুলন ও রাস মাহেশের বিশেষ উৎসব। তবে বর্তমানে রথযাত্রাই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

অন্যান্য জনহিতকর কার্য

তিনি তৎকালীন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন এবং হিন্দুর বিষয়-সম্পত্তি ইচ্ছানুসারে উইল করিবার অধিকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দরবার হইতে পাশ করাইয়া লন। তৎপূর্বে কোম্পানীর আমলে হিন্দুর উইল করিবার অধিকার ছিল না।

তিনি স্বীয় মাতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দানধ্যানাদিতে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। "শ্রীশ্রীভগবতী সিংহবাহিনী দেবীর শারদীয়া পূজার পালায় তিনি ঋণগ্রস্ত দেওয়ানী বন্দিগণের ঋণমোচনে প্রভূত ধন ব্যয় করিতেন। মৃত্যুকালেও পূর্বোক্ত পুণ্য কার্যের জন্য তিন লক্ষ টাকা রাখিয়া যান।"*

৩২ লক্ষ টাকা দান

তিনি তীর্থস্থানাদিতে ধর্মশালা নির্মাণ, কলিকাতায় গঙ্গার ঘাট নির্মাণ, ভাগবত মহাভারত প্রভৃতি পুরাণ পাঠের জন্য তাঁহার উইলে ৩২ লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। এই দানের বিবিরণ ১৮৫৮ খৃঃ ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

* শ্রীশ্রীভগবতী সিংহবাহিনী দেবীর সেবাধিকারিগণের সমূল বংশবল্লী, পৃঃ ২২

"প্রাতঃস্মরণীয় সমূহ সৎক্রিয়ান্বিত বিপুল-বিভবশালি ৺নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয় ইংরাজী ১৮০৬ সালে ধর্মকর্মের জন্য ৩২০০০০০৲ বত্রিশ লক্ষ টাকা ন্যস্ত করিয়া পুত্রগণের* প্রতি ভারার্পণ করত আপনার উইলে শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, বাল্মিকী (?) পুরাণ প্রদান এবং অম্বিকায় মহাপ্রভুর মন্দির, কলিকাতার গঙ্গাতীরে কটি ঘাট, বৃন্দাবনে দুইটি কুঞ্জ, জগন্নাথ ক্ষেত্রে মঠস্থাপন, আর মাহেশ বল্লভপুর কাঁচরাপাড়ার দেব-সেবা প্রভৃতি কর্ম নির্বাহ করণে অনুমতি করেন। তৎকালে উক্ত মৃত মহাত্মার প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র কেবল উপযুক্ত, অপর সকলে শিশু ছিলেন। ঐ দুই জন অগ্রজ সেই বত্রিশ লক্ষ টাকার প্রায় সমুদয়াংশ বিনষ্ট করেন।—সর্বশেষে কেবল ২০৮০০০৲ দুই লক্ষ আট হাজার মাত্র টাকা থাকে, সেই টাকার বৃদ্ধিতে এইক্ষণে প্রায় ৬০০০০০ ছয় লক্ষ টাকা হইয়াছে।—উক্ত টাকা ও ক্রিয়াদির কর্তৃত্ব করণের বিবাদ লইয়া বহুকাল পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে ও বিলাতে মোকদ্দমা চলে।—নিমাইচরণ মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺রামগোপাল মল্লিক, মধ্যম পুত্র ৺রাম (*) মল্লিক, তৃতীয় পুত্র ৺রাম (*) মল্লিক, চতুর্থ পুত্র ৺রাম (* * * * *) স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এইক্ষণে তাঁহার পুত্রের মধ্যে কেবল একামাত্র (?) বাবু রামমোহন মল্লিক মহাশয় জীবিত রহিয়াছেন। ইহাতে ১৮৫৫ সালে কোর্ট হইতে ইঁহার প্রতি ও ইঁহার ভ্রাতৃপুত্রেরদিগের উপর উইলপত্রের লিখন প্রমাণে কীর্তি স্থাপনে ও কর্তৃত্বকরণের অনুমতি হয়। তাহাতেও ঘরের মধ্যে পরস্পর বিবাদ নিষ্পন্ন না হওয়াতে বিচার-পতিরা এমত অনুমতি করিলেন '৫০ বৎসরকাল অতীত হইল, এ বিষয়ে আর অপেক্ষা করিয়া রাখা যাইতে পারে না। কোর্ট হইতেই কার্য সম্পন্ন করা উচিত ছিল, কিন্তু ধর্মসংক্রান্ত হওয়াতে কোর্ট ইহাতে হস্তার্পণ করিতে পারেন না। অতএব রামমোহন মল্লিকের উপরেই ভারার্পিত করা কর্তব্য।' পরে এই বিষয়টি মাষ্টরের অধীনে অর্পিত হইলে, ১৮৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে বাবু রামমোহন মল্লিক তাহার ভারগ্রহণ করত প্রতিভূ দিয়া প্রায় ৩০০০০০ তিন লক্ষ টাকা লইয়াছেন, তন্মধ্যে ঘাট নির্মাণে ৫০০০০ পঞ্চাশ

---

* ৺নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের আট পুত্রের নাম—রামগোপাল, রামরতন, রামতনু, রামকানাই, রামমোহন, হীরালাল, স্বরূপচন্দ্র ও মতিলাল।

সংবাদ প্রভাকর

রাঘবে সকলেই সমূহ সন্তোষ সম্পন্ন করিযাছেন। আর যিনি যে কার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাতেই বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন।

প্রাতঃস্মরণীয় সমূহ সৎক্রিয়ান্বিত বিপুল-বিভবশালি ৺নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয ইংরাজী ১৮০৬ সালে ধর্ম্ম-কর্ম্মের জন্য ৩২০০০০০ বত্রিশ লক্ষ টাকা ন্যস্ত করিয়া পুত্রগণের প্রতি ভারার্পণ করত আপনার উইলে শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, বল্মীকি পুরাণ প্রদান এবং অম্বিকায মহাপ্রভুর মন্দির, কলিকাতার গঙ্গাতীরে কটি ঘাট, বৃন্দাবনে দুইটি কুঞ্জ, জগন্নাথক্ষেত্রে মঠ স্থাপন, আর মাহেশ, বল্লভপুর, কাঁচারাপাডার দেবসেবা প্রভৃতি কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণে অনুমতি করেন।—তৎকালে উক্ত মৃত মহাত্মার প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র কেবল উপযুক্ত, অপর সকলে শিশু ছিলেন।—ঐ দুই জন অগ্রজ সেই বত্রিশ লক্ষ টাকার প্রায় সমুদয়াংশ বিনষ্ট করেন।—সর্ব্বশেষে কেবল ২০৮০০০ দুই লক্ষ আট হাজার মাত্র টাকা থাকে, সেই টাকার বৃদ্ধিতে এইক্ষণে প্রায় ৬০০০০০ ছয় লক্ষ টাকা হইযাছে।—উক্ত টাকা ও ক্রিয়াদির কর্ত্তৃত্ব করণের বিবাদ লইয়া বহুকালপর্য্যন্ত সুপ্রিমকোর্টে ও বিলাতে মোকদ্দমা চলে।—নিমাইচরণ মল্লিকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺রামগোপাল মল্লিক, মধ্যম পুত্র ৺রাম-

মল্লিক, তৃতীয় পুত্র ৺রাম-

চতুর্থ পুত্র ৺রাম-

রিয়াছেন, এইক্ষণে তাঁহার পুত্রের মধ্যে কেবল একামাত্র বাবু রামমোহন মল্লিক মহাশয জীবিত রহিয়াছেন, ইহাতে ১৮৫৫ সালে কোর্ট হইতে ইঁহার প্রতি ও ইঁহার ভ্রাতৃপুত্রেরদিগের উপর উইলপত্রের লিখন প্রমাণে কীর্ত্তি স্থাপনে ও কর্ত্তৃত্ব করণের অনুমতি হয়, তাহাতেও ঘরের মধ্যে পরস্পর বিবাদ নিষ্পন্ন না হওয়াতে বিচারপতিরা এমতঅনুমতি করিলেন ৫০বৎসরকাল অতীত হইল, এবিষয় আর অপেক্ষা করিয়া রাখা যাইতে পারেনা। কোর্ট হইতেই কার্য্য সম্পন্ন করা উচিত ছিল, কিন্তু ধর্ম্মসংক্রান্ত হওয়াতে কোর্ট ইহাতে হস্তার্পণ করিতে পারেননা। অতএব রামমোহন মল্লিকের উপরেই ভাবার্পিত করা কর্ত্তব্য,,। পরে এই বিষয়টি মাষ্টরের অধীনে অর্পিত হইলে ১৮৫৭ সালের জানুআরি মাসে বাবু রামমোহন মল্লিক তাহার ভার গ্রহণ করত প্রতিভূ দিয়া প্রায় ৩০০০০০ তিনলক্ষ টাকা লইয়াছেন, তন্মধ্যে ঘাট নির্ম্মাণে ৫০,০০০ পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা, গত বৎসর যে শ্রীভাগবত দেন তাহাতে ৪৩৫২০ টাকা, এবং বর্ত্তমান বৎসরের মহাভারতেও ৪৩৫২০ টাকা ব্যয় করিলেন, শেষোক্ত দুই কর্ম্মে তাঁহাকে নিজ হইতে প্রায় ২০০০০ টাকা দান করিতে হইয়াছে, কারণ ব্যাপার অতি বৃহৎ হওয়াতে কোর্টের নির্দ্দিষ্ট টাকায় নিষ্পন্ন হয় নাই, পরন্তু বল্লভপুরে সেবার নিমিত্ত ১০০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ নগদ১২০০, মাহেশের নিমিত্ত ৫০০০টাকার কোম্পানির কাগজ নগদ ১৫০, এবং কাঁচরাপাড়ার সেবার নিমিত্ত ৫০০০টাকার কোম্পানির কাগজ ও নগদ ২৫০ টাকাইতি মধ্যে দেওয়া হইয়াছে, এবং ক্রমে ক্রমে দেওয়া হইবে, পরন্তু বল্লভপুরের মাসিক সেবা ৩৪ এবং মাহেশ ও কাঁচরাপাড়ার মাসিক সেবা ১৭ টাকা করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রামমোহন বাবু এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ এমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন উইলের আজ্ঞা পালনে যদি তাঁহারদিগের নিজ সম্পত্তির অধিকাংশ ব্যয় করিতে হয়, তাহাও করিবেন। ব্রজনাথ বাবু মোকদ্দমায় ও আর আর সকল বিষয়েই বিস্তর পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তিনি মহত্ত্ব স্থাপনে অত্যন্ত যত্নশীল।—এইস্থলে ৺নিমাইচরণ মল্লিকের নামোল্লেখ পূর্ব্বক এই মাত্র কহিতেছি, তিনি যথার্থ মানবদেহ ধারণ করত মানবজন্মের ও ধনের সার্থকতা করিয়াছেন, এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণেরাও সাধু, কেননা পৃথ্বীব্যাপিনী কীর্ত্তি স্থাপনে অনুরত হইয়া কুলের, ধনের, মনের এবং জীবনের সার্থকতা করিতেছেন।

আমারদিগের আলাহাবাদস্থ কোনো আত্মীয় ব্যক্তির পত্র সাদরে প্রকটন করিলাম।

এস্থানে শ্রীযুক্ত গবরনর জেনরল বাহাদুর শুভাগমন করায় দিনদিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, শ্রীশ্রীযুত অদ্যাপি দুর্গ মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, আগ্রাস্থ আর্কিস সংক্রান্ত সমস্ত কাগজাদি এস্থানে আসিবার কথা স্থির হইয়াছে, এবং তথা হইতে অনেক

৺নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের বত্রিশ লক্ষ টাকা দানের উল্লেখ

সহস্র মুদ্রা, গত বৎসর যে শ্রীভাগবত দেন তাহাতে ৪৩৫২০ টাকা, এবং বর্তমান বৎসরের মহাভারতেও ৪৩৫২০ টাকা ব্যয় করিলেন, শেষোক্ত দুই কর্মে তাঁহাকে নিজ হইতে প্রায় ২০০০০ টাকা দান করিতে হইয়াছে, কারণ ব্যাপার অতি বৃহৎ হওয়াতে কোর্টের নির্দিষ্ট টাকায় নিষ্পন্ন হয় নাই। পরন্তু বল্লভপুরে সেবার নিমিত্ত ১০০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ নগদ ১২০০, মাহেশের নিমিত্ত ৫০০০ হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ নগদ ১৫০, এবং কাঁচরাপাড়ার সেবার নিমিত্ত ৫০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ ও নগদ ২৫০ টাকা ইতিমধ্যে দেওয়া হইয়াছে, এবং ক্রমে ক্রমে দেওয়া হইবে, পরন্তু বল্লভপুরের মাসিক সেবা ৩৪ এবং মাহেশ ও কাঁচরাপাড়ার মাসিক সেবা ১৭ টাকা করিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। রামমোহন বাবু এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ এমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন উইলের আজ্ঞা পালনে যদি তাঁহাদের নিজ সম্পত্তির অধিকাংশ ব্যয় করিতে হয়, তাহাও করিবেন। ব্রজনাথবাবু মোকদ্দমায় ও আর আর সকল বিষয়েই বিস্তর পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তিনি মহত্ত্ব স্থাপনে অত্যন্ত যত্নশীল।— এইস্থলে ৺নিমাইচরণ মল্লিকের নামোল্লেখপূর্বক এইমাত্র কহিতেছি, তিনি যথার্থ মানবদেহ ধারণ করত মানবজন্মের ও ধনের সার্থকতা করিয়াছেন, এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণেরাও সাধু, কেন না পৃথীব্যাপিনী কীর্তি-স্থাপনে অনুরত হইয়া কুলের, ধনের, মনের এবং জীবনের সার্থকতা করিতেছেন।”

মৃত্যু

তিনি রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের পিতামহ রামকৃষ্ণ মল্লিকের ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার আট পুত্র ও দুই কন্যা। আট পুত্রের নাম, রামগোপাল, রামরতন, রামতনু, রামকানাই, রামমোহন, হীরালাল, স্বরূপচন্দ্র ও মতিলাল। তিনি ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি নগদ তিন কোটি টাকা, বহু ভূসম্পত্তি ও কয়েকখানি তালুক রাখিয়া যান।

নিমাই মল্লিকের শ্রাদ্ধ

নিমাইচরণের পুত্রগণ তাঁহার দানসাগর শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। "পিতৃ শ্রাদ্ধ সময়ে যখন রাশি রাশি টাকা কাঙালীগণকে বিতরণ করা হইয়াছিল, তখন সংবাদ আসে যে কর্মকর্তৃগণের কেহ কেহ সেই টাকার কিয়দংশ নিজে নিজে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার তৃতীয় পুত্র রামতনু মল্লিক বলিয়াছিলেন—'কাঙালী বিদায়ের টাকা ছোট কাঙালী ও বড় কাঙালীতেই খরচ হইয়াছে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি'।"[১]

নিমাই মল্লিকের ঘাট

তাঁহার উইল লইয়া পুত্রগণের মধ্যে কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টে বিরাট্ মামলা হয় এবং অবশেষে বিচারকের আদেশে ৩২ লক্ষ টাকা দানের মর্মানুযায়ী কার্য করিবার ভার পঞ্চম পুত্র রামমোহনের উপর অর্পিত হয়।

রামমোহন কার্যভার গ্রহণ করিয়া প্রথমে "বর্তমান হাওড়া পুলের দক্ষিণে 'নিমাই মল্লিকের ঘাট' বাঁধাইয়া দেন। এই ঘাটের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে গঙ্গাযাত্রার রোগীর জন্য কতিপয় ঘরও নির্মিত হইয়াছিল। এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট সেই ঘাটে জলের কল বসাইয়া তৎপরিবর্তে কিঞ্চিৎ উত্তরে সেই নামে অপর একটি ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।"[২]

পুরাণাদি পাঠের ব্যবস্থা

"রামমোহন প্রথমে অনেকগুলি পণ্ডিত ও লেখক নিযুক্ত করিয়া সমগ্র অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ সকল উত্তম তুলট কাগজে লিপিবদ্ধ করান। পরে স্বজাতীয় যাজকশ্রেণী মধ্য হইতে সুবিজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে নির্বাচিত করিয়া * * * শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থের পাঠ করান। এই সময়ে সাধারণ ব্যক্তিগণের শীঘ্র মর্ম বুঝিবার জন্য অপরাহ্নে কথকতাও হইত। প্রত্যহ ভূরি ভূরি কাঙালীগণকে অন্নদান, এবং কুটুম্ব স্বজনগণের ও ব্রাহ্মণ ও গোস্বামিগণের যথোপযুক্ত সেবা

---

১ শ্রীশ্রীভগবতী সিংহবাহিনী দেবীর সেবাধিকারিগণের সমূল বংশবল্লী, পৃঃ ২৬

২ ঐ পুস্তক, পৃঃ ২৭

সুবর্ণবণিক্ কথা ও কীর্তি
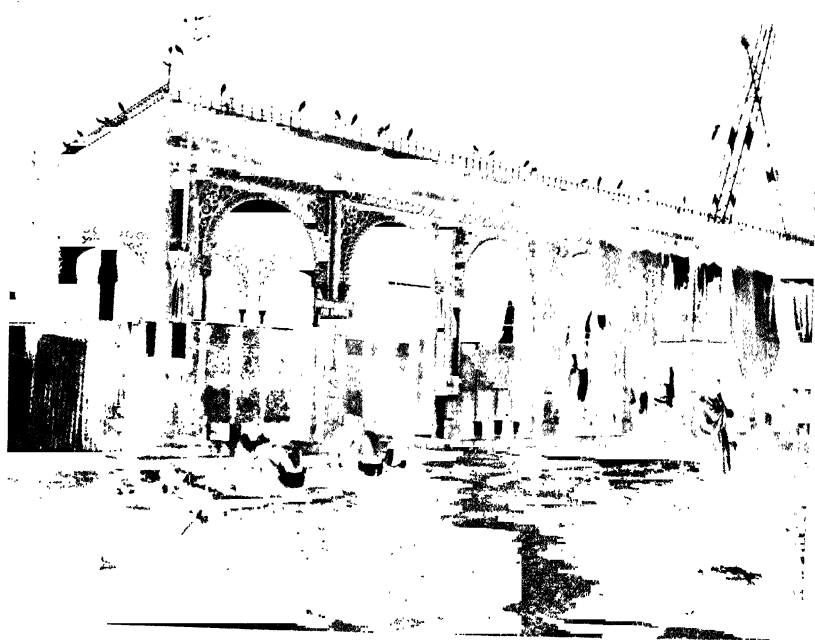
নিমাই মল্লিকের ঘাট, কলিকাতা

হইত। কথিত আছে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও অন্যান্য ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ পাঠের নিমন্ত্রণে একদা আগমন করত পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করত অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন এবং রাজা বাহাদুর মুক্তকণ্ঠে বলেন যে, 'রামমোহন বাবু আপনি বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন'।"*

সন ১২৬৩ সালের ২২শে ফাল্গুন রাত্রিতে এই পুরাণাদি পাঠের আরম্ভ হইয়াছিল।

এই সম্বন্ধে তৎকালীন সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে লিখিত হইয়াছে—

"স্বর্গবাসী পুণ্যরাশি নিমাইচরণ।
মল্লিক আখ্যাতে যে খ্যাত ত্রিভুবন॥
পুণ্যশীল দানশীল যার সম নাই।
পৃথিবী মধ্যেতে যার তুলনা না পাই॥
যার কীর্তিধ্বজা উড়ে গগন মণ্ডলে।
ধনে মানে দানে গুণে শ্রেষ্ঠ মহীতলে॥
অপ্রমিত দান করি যেই মহাজন।
তথাপি না হৈল তার চিত্ত বিনোদন॥
এ কারণে মহামতি যাইতে জীবন।
রাজহস্তে বহু ধন কৈলা সমর্পণ॥
পুণ্যকর্মে সেই ধন হইবেক ব্যয়।
এই অভিপ্রায় করি সেই মহাশয়॥
দানপত্রে পুত্রগণে দিয়া সমভার।
ব্যয় করিবেক সেই ধন স্বর্গার্থে তাঁহার॥
ন্যস্তধন সূত্রে কৈলা বিবাদ ঘটন।
স্বর্গ গমন পরে তার পুত্র-পৌত্রগণ॥
এইরূপ বিবাদ হতে বহুদিন গেল।
তথাপি সে ন্যস্তধন সদগতি না হৈল॥
পরে বিচারকগণ করিয়া বিচার।
শ্রীরামমোহন হস্তে দিল ব্যয়ভার॥

* শ্রীশ্রীভগবতী সিংহবাহিনী দেবীর সেবাধিকারিগণের সমূল বংশবল্লী, পৃঃ ২৭

বণিক্-কুলেতে যিনি সর্ব অগ্রগণ্য।
যাঁর সম পুণ্যশীল নাহি দেখি অন্য॥
রাজ আজ্ঞা অনুসারে সেই মহাজন।
ব্যয় হেতু পিতৃধন করিয়া গ্রহণ॥
ফাল্গুনের দ্বাবিংশতি শুভ দিবসেতে।
সঙ্কল্প করিলা কার্য মনের সাধেতে॥
ভাগবত অভিধেয় যে মহাপুরাণ।
তাহা পাঠ আরম্ভিলা যথোক্ত বিধান॥"

এই পুরাণ পাঠকালে তিনি ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, গোস্বামিগণ ও কাঙালী-গণকে যে দান করেন, সেই দান সম্বন্ধে সংবাদ-পূর্ণচন্দ্রোদয়ে লিখিত আছে—

"স্বর্ণ কলস স্বর্ণ বাজু সুবর্ণের হার।
সোণার অঙ্গুরী আদি বিবিধ প্রকার॥
রৌপ্য কোশাকুশি আদি রূপার বাসন।
অন্য আর কত শত রূপার বাসন॥
গরদ বনাত শাল বিবিধ বসন।
দান করিলেন বাবু হয়ে শুদ্ধ মন॥
পাঠারম্ভ দিনাবধি সমাপ্ত পর্যন্ত।
কত বিপ্র সেবা হয়, নাহি তার অন্ত।
পাঠের সমাপ্ত দিনে হইয়া সংযত।
বহু ধন বিতরণ কৈলা অবিরত॥
বহু টোলধারিগণে করি আবাহন।
বিদায় ছিলেন টাকা রৌপ্যাদি বাসন॥
দ্বাদশ সহস্রাধিক কাঙালী দিগকে।
অর্ধমুদ্রা চারি আনা দিলেন প্রত্যেকে॥"

১২৬৪ সালের ১৩ই ফাল্গুন (১৮৫৮, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার) তারিখের সংবাদ-প্রভাকরে মহাভারত-পাঠ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রথমে প্রকাশিত হয়—

সুবর্ণবণিক্ কথা ও কাত

এই প্রভাকর পত্র রবিবার ব্যতীত প্রতি দিবস কলিকাতা সিমুলার অন্তঃপাতি হোগোলক ড়িয়ার দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রিটে ৪২ নম্বর ভবনে সম্পাদক শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়।

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ॥
অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফাঃ রসং॥

এইপত্রের অগ্রিম মূল্য ১০টাকা। বৈশাখের প্রথম দিবসের পত্রের মূল্য ১ টাকা। তদ্ব্যতীত আর সকল মাসের প্রথম দিনের পত্রের মূল্য ।৷০ আন অগ্রিম ৬ টাকামাত্র

৬০৬০ সংখ্যা। শনিবার ১৭ ফাল্গুন ১২৬৪ সাল। ইং ২৭ ফিব্রুআরি ১৮৫৮ সাল। মাসিক মূল্য ১৲তঙ্কামাত্র

১৭ফাল্গুন শকাব্দাঃ ১৭৭৯। দানিশাব্দাঃ ১০৯

কলিকাতার বড়বাজার নিবাসি ধনরাশি সুবিখ্যাত ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত বাবু রামমোহন মল্লিক মহাশয় সাতিশয় সমারোহসূচক সদনুষ্ঠান সহকারে সংপ্রতি যে মহাভারত প্রদান করিয়াছিলেন, আমরা সর্ব্বসাধারণ পাঠকপুঞ্জের সুবিদিতার্থ তদ্বিশেষ প্রকাশ করিতেছি, সকলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ করুন।

এই মহামঙ্গলময় মহৎকার্য্যটি ৭—পৌষে আরম্ভ হইয়া ২১ ফাল্গুন দিবসে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ধারক ৬ জন, পাঠক ৬ জন, সদস্য ৬ জন, ঋষি ৭ জন, স্বস্ত্যয়নকারি ব্রাহ্মণ ১৬ জন, শ্রোতা ৪১ জন এবং কথক ১ একজন।—ক্রিয়া আরম্ভের দিবসে পাঠক, ধারক, সদস্য, কথক, গুরু এবং পুরোহিত, এই ২১ জনকে গরদের জোড়, স্বর্ণ-হার, স্বর্ণ-বলয়, স্বর্ণাঙ্গুরী, ও সাল, এবং গোস্বামিদিগ্যে বরণ-সামগ্রী সাল, টাকা ও অঙ্গুরী প্রভৃতি প্রদান করেন।

পরন্তু রামচন্দ্রের বিবাহ-বাসরে রূপার দানসামগ্রী, স্বর্ণালঙ্কার, বস্ত্র, ও তদুপযোগি বহুপ্রকার ভোজনীয় দ্রব্য।—ভীষ্ম পর্ব্বের সাঙ্গে পাল্কি ও আর আর দ্রব্য।—অশ্বমেধে অশ্বাদি, রুক্মিণী-হরণে রূপার দান-সামগ্রী, স্বর্ণালঙ্কার ও আর আর দ্রব্য।—রাজসূয় যজ্ঞে, পিত্তলের ঘড়া প্রভৃতি তৈজস বস্ত্রাদি।—দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণে বিবিধপ্রকার বস্ত্র।—সভা পর্ব্বের সাঙ্গে অন্ন জল বস্ত্রাদি।—বন পর্ব্বের সাঙ্গে জল কলসাদি।—বিরাট পর্ব্ব সাঙ্গে নানাপ্রকার বস্ত্র।—উদ্যোগ পর্ব্ব সাঙ্গে বহুবিধ খাদ্য দ্রব্য ও গন্ধ পুষ্প পত্রাদি।—দ্রোণ পর্ব্ব সমাধায় রৌপ্যনির্ম্মিত ধনু ও ধ্বজাদি।—বামন ভিক্ষায় রূপার দণ্ড কমণ্ডলু।—কর্ণ পর্ব্বে ভোজ্য ও স্বর্ণ কবচাদি।—স্ত্রী পর্ব্ব সাঙ্গে খাদ্য নবরত্ন বস্ত্রাদি।—মুষল পর্ব্বে দুগ্ধ ও পুষ্প পত্রাদি।—এবং হরিবংশের বস্ত্র হরণের দিন নানাপ্রকার বস্ত্র প্রদান করেন।

যে কয়েক দিবস কথা হয় স্বতন্ত্র এক বাটীতে ও নিজ বাটীতে সেই কয়েক দিবস প্রায় ৩০০ ব্রাহ্মণ ২০০ বৈষ্ণব, ১২০০ কাঙালি, ২০০ নাগা সন্ন্যাসি এবং বহু সংখ্যক কুটুম্বাদি ভোজন হয়, কাঙালির মধ্যে হিন্দুরা ভোজন এবং যবনেরা জলপান করে, এই আহারীয় ব্যাপারে বিস্তর টাকা ব্যয় হইয়াছে।—যে দিবস কথা সাঙ্গ হয় সেই দিবস রাত্রিতে অসংখ্য কাঙালি উপস্থিত হয়, তাহারা বিনা কষ্টে উপযুক্ত রূপ বিদায় পাওয়াতে যথেষ্ট পরিতুষ্ট হইয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা ও আশীর্ব্বাদ করিতেছে।

ক্রিয়াধ্যক্ষ পুণ্যাত্মা বাবুর ৪ পুত্র প্রথম বাবু দ্বারকানাথ, দ্বিতীয় বাবু তারকনাথ, তৃতীয় বাবু প্রেমনাথ এবং চতুর্থ বাবু ভোলানাথ মল্লিক মহাশয়, তিনি এই চারিজন পুত্র এবং প্রিয়তম পৌত্র বাবু ব্রজনাথ মল্লিক, বাবু যদুনাথ মল্লিক, তথা বাবু প্রসাদনাথ মল্লিক প্রভৃতি কয়েক মহাশয়ের প্রতি সমুদয় কর্ম্মের ভারার্পণ করেন। ইহাঁরদিগের তাবতের ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিনয় শীলতা, সৌজন্য

৺নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের অর্থে রামমোহন মল্লিক মহাশয় কর্তৃক মহাভারত পাঠের ব্যবস্থা

"কলিকাতার বড়বাজার নিবাসি সুবিখ্যাত ধনরাশি পরম ধার্মিক মান্যবর শ্রীযুক্ত রামমোহন মল্লিক মহাশয় বিশেষ সমারোহপূর্বক আপন ভবনে অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত প্রদান করিয়াছেন, সেই সুপবিত্র পুণ্য কার্য সাতিশয় সুখ্যাতি সহকারে সুনির্বাহ হইয়াছে। অদ্য স্থানাভাব বশতঃ তাহার তাবদ্‌বৃত্তান্ত বাহুল্যরূপে বর্ণনা করিতে পারিলাম না, অবিলম্বেই সবিশেষ লিখিয়া সকলের সুগোচর করিব।"

ইহার পর ১৭ই ফাল্গুনের কাগজে (১৮৫৮, ২৭এ ফেব্রুয়ারী, শনিবার) সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই "মহাভারতপাঠে"র একটি বিস্তৃত বর্ণনা প্রকাশিত হয়। সমগ্র বর্ণনাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল —

"কলিকাতার বড়বাজার নিবাসি ধনরাশি সুবিখ্যাত ধার্মিকবর শ্রীযুত বাবু রামমোহন মল্লিক মহাশয় সাতিশয় সমারোহসূচক সদনুষ্ঠান সহকারে সংপ্রতি যে মহাভারত প্রদান করিয়াছিলেন আমরা সর্বসাধারণ পাঠকপুঞ্জের সুবিদিতার্থ তদ্বিশেষে প্রকাশ করিতেছি, সকলে অনুগ্রহ পূর্বক পাঠ করুন।

এই মহামঙ্গলময় মহৎ কার্যটি ৭ই পৌষে আরম্ভ হইয়া ২১শে ফাল্গুন দিবসে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ধারক ৬ জন, পাঠক ৬ জন, সদস্য ৬ জন, ঋষি ৭ জন, স্বস্ত্যয়নকারি ব্রাহ্মণ ১৬ জন, শ্রোতা ৪১ জন এবং কথক ১ একজন।—ক্রিয়া আরম্ভের দিবসে পাঠক, ধারক, সদস্য, কথক গুরু এবং পুরোহিত এই ২১ জনকে গরদের জোড়, স্বর্ণ-হার, স্বর্ণ-বলয়, স্বর্ণাঙ্গুরী ও সাল এবং গোস্বামীদিগের বরণ-সামগ্রী, সাল, টাকা ও অঙ্গুরী প্রভৃতি প্রদান করেন।

পরন্তু রামচন্দ্রের বিবাহ-বাসরে রূপার দানসামগ্রী, স্বর্ণালঙ্কার, বস্ত্র ও তদুপযোগি বহু প্রকার ভোজনীয় দ্রব্য।—ভীষ্ম পর্বের সাঙ্গে পাল্কী ও আর আর দ্রব্য।—অশ্বমেধে অশ্বাদি, রুক্মিনী-হরণে রূপার দান-সামগ্রী, স্বর্ণালঙ্কার ও আর আর দ্রব্য!—রাজসূয় যজ্ঞে, পিতলের ঘড়া প্রভৃতি তৈজস বস্ত্রাদি।—দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণে বিবিধপ্রকার বস্ত্র।—সভা পর্বের সাঙ্গে অন্ন জল বস্ত্রাদি। বন পর্বের সাঙ্গে জল কলসাদি।—বিরাট্ পর্ব সাঙ্গে নানা প্রকার বস্ত্র।—উদ্যোগ পর্ব সাঙ্গে বহুবিধ খাদ্য দ্রব্য ও গন্ধপুষ্প পত্রাদি।—দ্রোণ পর্ব সমাধায় রৌপ্যনির্মিত ধনু ও খড়্গাদি।—বামন ভিক্ষায়

রূপার দণ্ডকমণ্ডলু।—কর্ণ পর্বে ভোজ্য ও স্বর্ণকবচাদি।—স্ত্রী পর্ব সাঙ্গে খাদ্য নবরত্ন বস্ত্রাদি।—মুষল পর্বে দুগ্ধ ও পুষ্প পত্রাদি।—এবং হরিবংশের বস্ত্রহরণের দিন নানাপ্রকার বস্ত্র প্রদান করেন।

যে কয়েক দিবস কথা হয়, স্বতন্ত্র এক বাটিতে ও নিজ বাটিতে সেই কয়েক দিবস প্রায় ৩০০ ব্রাহ্মণ, ২০০ বৈষ্ণব, ১২০০ কাঙালী, ২০০ নাগা সন্ন্যাসী এবং বহু সংখ্যক কুটুম্বাদি ভোজন হয়। কাঙালীর মধ্যে হিন্দুরা ভোজন ও যবনেরা জলপান করে, এই আহারীয় ব্যাপারে বিস্তর টাকা ব্যয় হইয়াছে।—যে দিবস কথা সাঙ্গ হয় সেই দিবস রাত্রিতে অসংখ্য কাঙালী উপস্থিত হয়। তাহারা বিনা কষ্টে উপযুক্তরূপ বিদায় পাওয়াতে যথেষ্ট পরিতুষ্ট হইয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা ও আশীর্বাদ করিতেছে।

ক্রিয়াধ্যক্ষ পুণ্যাত্মাবাবুর ৪ পুত্র প্রথম বাবু দ্বারকানাথ, দ্বিতীয় বাবু তারকনাথ, তৃতীয় বাবু প্রেমনাথ এবং চতুর্থ বাবু ভোলানাথ মল্লিক মহাশয়, তিনি এই চারিজন পুত্র এবং প্রিয়তম পৌত্র বাবু ব্রজনাথ মল্লিক, বাবু যদুনাথ মল্লিক, তথা বাবু প্রসাদনাথ মল্লিক প্রভৃতি কয়েক মহাশয়ের প্রতি সমুদয় কর্মের ভারার্পণ করেন। ইঁহারদিগের তাবতের ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিনয়, * শীলতা, সৌজন্য, * * * সম্ভাষণে সকলেই সমূহ সন্তোষ সঞ্চয় করিয়াছেন। আর যিনি যে কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাতেই বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন।"*

এতদ্ভিন্ন রামমোহন পুরীধামে মঠ ও জগন্নাথদেবের রন্ধনশালা, অম্বিকায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মন্দির ও শ্রীবৃন্দাবনধামে যাত্রিনিবাস নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

সরকারী দপ্তরে নিমাইচরণের পুত্র-পৌত্রগণের বিবরণ

ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন "শতবর্ষ পূর্বের কলিকাতার বাঙালী সম্ভ্রান্ত পরিবারের পরিচয়" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"১৮৩৯ সালে কলিকাতা,

* তারকা চিহ্নিত স্থান কীটদষ্ট।

মুর্শিদাবাদ, বেনারস প্রভৃতি বড় বড় সহরের সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণের তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছিল, এই সকল তালিকা ও বংশপঞ্জী ভারত সরকারের মহাফেজখানায় রক্ষিত আছে। * * * * পররাষ্ট্র বিভাগের কাগজপত্র হইতে যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক শতাব্দী পূর্বে কলিকাতার বাঙালী সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম ও বংশ-পরিচয় নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

বড়বাজার—

২। রামগোপাল মল্লিকের পুত্র উদয়চরণ (বংশবল্লী মতে অদ্বৈতচরণ) মল্লিক

৩। রামরতন মল্লিক

৪। রামতনু মল্লিক

৫। রামমোহন মল্লিক

৬। মতিলাল মল্লিক

৭। রামকানাই মল্লিকের পুত্র নবকিশোর মল্লিক

৮। জগমোহন মল্লিকের পুত্র প্রেমসুখ মল্লিক

৯। গৌরমোহন মল্লিকের পৌত্র কাশীনাথ মল্লিক”

রামগোপাল মল্লিকের মাতৃশ্রাদ্ধ

রামগোপাল মল্লিক মহাশয় স্বর্গীয় দানবীর নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের পুত্র। “ইনি ‘সমাচার চন্দ্রিকা’র তাৎকালিক সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দশ সহস্রাধিক টাকা দিয়া ‘শ্রীমদ্ভাগবত’ পুরাতন ও নূতন ‘স্মৃতিশাস্ত্র’ প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রীয় গ্রন্থ পুথির আকারে মুদ্রিত করাইয়াছিলেন।”[১] ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মাতা পরলোক গমন করেন। তাঁহার শ্রাদ্ধে রামগোপাল বাবু বিপুল অর্থব্যয় করেন। এ সম্বন্ধে ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৩৭ (১৫ই মে, ১৮৩০) তারিখে—“সমাচার দর্পণে”[২] লিখিত হইয়াছে—

১ শ্রীশ্রীভগবতী সিংহবাহিনী দেবীর সেবাধিকারিগণের সমূল বংশবল্লী, পৃঃ ২৫

২ এই সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মে শ্রীরামপুরস্থ মিশনারীগণ কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। রেভারেণ্ড ডক্টর জে মার্সম্যান এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

"গত ১৬ বৈশাখ মঙ্গলবার শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিকের মাতৃশ্রাদ্ধে অপরিমিত কাঙ্গালি আসিয়াছিল ঐ বংশের কাঙ্গালি বিদায়ের সুখ্যাতি কাহার না স্মরণ আছে বিশেষতঃ তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় করেন তাহার দুই লক্ষ টাকা সাধারণ ধন হইতে প্রাপ্ত হন অবশিষ্ট যত ব্যয় হইয়াছে তাহা নিজ হইতে দিয়াছেন ব্যয় বিষয় প্রায় এতন্নগরস্থ সকলেই জ্ঞাত আছেন যেহেতু চারি রূপার দানসাগর ইহার মধ্যে ৮ সোনার ষোড়কা ১৬ বৃষ গোস্বামী ও ব্রাহ্মণদিগকে শাল পট্টবস্ত্র স্বর্ণাঙ্গুরীয় ইত্যাদি দ্রব্যের দ্বারা সভাবরণ করিয়াছিলেন ইহাতে সভার শোভার সীমা দেখিয়া কে না ধন্যবাদ করিয়াছিলেন।" (সমাচার চন্দ্রিকা)

রামগোপাল মল্লিকের ভবনে 'বিধবা-বিবাহ' নাটকের অভিনয়

রামগোপাল মল্লিক মহাশয়ের ভবনে, উমেশচন্দ্র মিত্র প্রণীত "বিধবা বিবাহ" নাটকের দ্বিতীয়বার অভিনয়ের নিম্নলিখিত সংবাদ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই মে (মঙ্গলবার) তারিখের "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে" পাওয়া যায়—

"গত শনিবার রজনীযোগে ৺রামগোপাল মল্লিক মহাশয়ের বাটিতে পুনর্বার বিধবা বিবাহ নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। অভিনয়-ক্রিয়া এবারও সাতিশয় প্রশংসনীয় হইয়াছে।"

রামকানাই মল্লিকের লোকান্তর গমন

"সমাচার দর্পণ"-সম্পাদক "সমাচার চন্দ্রিকা" হইতে, ২৭শে শ্রাবণ, ১২৩৪ (১১ই আগষ্ট, ১৮২৭ খৃঃ) তারিখে তাঁহার পত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"আমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে ১৮ শ্রাবণ শুক্রবার বেলা আড়াই প্রহরের মধ্যে বাবু নিমাইচরণ মল্লিকের চতুর্থ পুত্র বাবু রামকানাই মল্লিক লোকান্তর গমন করিয়াছেন তদ্বিবরণ এই শুনা গিয়াছে কোন পীড়া হয় নাই ঐ দিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করণান্তর যে নিয়মিত মত প্রতি দিবস স্বকার্য সাধন করিয়া থাকেন তাহা করিয়া

পুত্রের বিবাহ নির্বাহের নানা পরামর্শ ও অন্য বাবুদিগের সহিত তদ্বিষয়ের বহুবিধ কথোপকথন করিলেন এ পর্যন্ত কোন ব্যামোহ বোধ হয় নাই তৎপরে প্রায় বেলা এগার ঘণ্টার সময়ে বহির্দেশ গমন করিয়া সেখান হইতে আসিয়া কহিলেন আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এই প্রকার দুই চারি বাক্যব্যয়ের পরেই শ্বাসাদি মৃত্যু লক্ষণ হইবাতে ঐ বাটির মধ্যে সহোদরাদি পরিবার যাঁহারা ছিলেন তাঁহারদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও কথা হইয়াছিল মাত্র ইঁহার এই মৃত্যু সংবাদে বহুজনের খেদ হইয়াছে এবং হইবেক যেহেতুক ইনি অতি শিষ্ট সাম্প্রদায়িক মর্যাদক পরোপকারক সহ্যশীল মনুষ্য ছিলেন তাঁহার সহিত যাঁহার আলাপ হইয়াছে তিনি বিশেষ জানেন।”

রামতনু মল্লিকের স্বর্গারোহণ

দানবীর নিমাইচরণ মল্লিকের তৃতীয় পুত্র রামতনু মল্লিক মহাশয়ের স্বর্গারোহণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়” হইতে উদ্ধৃত হইল :—

“৺বাবু রামতনু মল্লিকের স্বর্গারোহণ। এতন্নগরস্থ বড়বাজার নিবাসী অতি ভাগ্যধর স্বর্গবাসী ৺বাবু নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র ধনাঢ্যবর ৺বাবু রামতনু মল্লিক গত কল্য প্রাতে বেলা ৮ ঘণ্টার সময়ে মায়াময় অনিত্য দেহ পরিত্যাগ পূর্বক নিত্যধাম গমন করিয়াছেন। উক্ত মহাশয়ের বয়ঃক্রম প্রায় ৭৮ বৎসর হইয়াছিল, বহু দিবসাবধি বাতরোগে পীড়িত থাকিয়া মধ্যে কিঞ্চিৎ আরোগ্য হন। এক্ষণে হাঁপানি রোগে একালে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তিনি অনেক ব্যয়জনক ধর্মকর্ম করেন, তাঁহার পরলোক গমনে অনেকেই খেদান্বিত হইবেন। তাঁহার দুই উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুত বাবু রমানাথ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু লোকনাথ মল্লিক মহাশয়েরা আছেন বোধ হয় তাঁহারা স্বর্গীয় মহাত্মার নাম চিরস্মরণীয় নানা কর্ম করিবেন।”*

* সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ১৯শে আষাঢ় মঙ্গলবার, ১২৫৭ সাল ; ২রা জুলাই, ১৮৫০ খ্রঃ, পৃঃ ৩-৪

রামতনু মল্লিকের আদ্যশ্রাদ্ধ

"বড়বাজার নিবাসি উক্ত ভাগ্যধর মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ তৎপুত্রদ্বয় শ্রীযুত রমানাথ মল্লিক ও শ্রীযুত লোকনাথ মল্লিক বাবুরা গত পরশ্ব অতি সমারোহ পূর্বক নির্বাহ করিয়াছেন। স্বর্ণময় দানসাগর ও তদুপলক্ষিত অন্যান্য কার্যও তদুপযুক্ত করেন। অপর কলিকাতায় উপস্থিত কাঙ্গালিদিগের প্রত্যেককে একটাকা অর্থাৎ যে হারে তাঁহাদিগের পিতামহ ৺নিমাইচরণ মল্লিকের শ্রাদ্ধে দান হয় সেইরূপ দান করিয়াছেন। এক্ষণে সমারোহের রৌপ্য দানসাগরের মধ্যে ২।৪ স্বর্ণ ষোড়শ ধনি লোকেরা করিয়া থাকেন, কাঙ্গালিদিগকে প্রায়ই কিছু দেন না, কিন্তু পূর্বোক্ত বাবুরা তৎপরিবর্তে সমুদয় সুবর্ণের দানসাগর করিয়াছেন, তাহা স্বজাতীয় ও দলস্থ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবেন, এবং কাঙ্গালিদিগকেও বিদায় করিয়াছেন, ইহা অন্যান্য ধনিগণের অপেক্ষা অনেক সাহস ও ব্যয়জনক কর্ম হইয়াছে, এ জন্য তাঁহাদিগের প্রচুর সুখ্যাতি হইয়াছে।"*

রামরত্ন মল্লিকের পুত্রের বিবাহ

১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৮২০ খৃঃ, ১লা ফাল্গুন, ১২২৬ সালের সমাচার দর্পণে লিখিত হইয়াছে—

"গত শুক্রবার ৩০ মাঘ ১১ ফেব্রুআরি তারিখে শ্রীযুত বাবু রামরত্ন মল্লিক আপন পুত্রের বিবাহ যেরূপ দিয়াছেন এমন বিবাহ শহর কলিকাতায় কেহ কখনও দেন নাই। এই বিবাহে যে যে রূপ সমারোহ হইয়াছে ইহাতে অনুমান হয় যে সাত আট লক্ষ টাকার ব্যয় ব্যতিরেকে এমত মহাঘটা হইতে পারে না। ইহার বিশেষ বিবরণ পরে ছাপান যাইবেক।

সন ১৮১২ সালে মোং দিল্লীতে এই প্রকার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মহ্লাররাও হোলকারের বক্সী ভবানীশঙ্কর রাও নামে একজন মহারাষ্ট্রের বিবাহ হইয়াছিল তাহাতে এগার লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল সে বিবাহের অধ্যক্ষ প্রধান প্রধান ইংল্যণ্ডীয় সাহেবেরা ছিলেন। এই বিবাহও তাহা

* সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ১৯শে শ্রাবণ শুক্রবার, ১২৫৭ সাল; ২রা আগষ্ট, ১৮৫০ খৃঃ, পৃঃ ২

হইতে ন্যূন বড় নহে যেহেতুক সকল লোকেই এ বিবাহের প্রশংসা করিতেছে ও কহিতেছে যে এমন বিবাহ আমরা দেখি নাই।”

স্বর্গীয় রামতনু মল্লিকের পত্নী কর্তৃক বড়বাজার জগন্নাথ ঘাটের মন্দির ও অট্টালিকার সংস্কার সাধন ও দান

২রা মাঘ, ১২৫৭ সাল মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি, ১৮৫১ খৃঃ) তারিখের সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় (পৃঃ ৩) পাঠে জানা যায় ঃ—

“আমরা আহ্লাদ পূর্বক পাঠকবর্গের গোচরার্থ প্রকাশ করিতেছি যে এতন্নগরস্থ বড়বাজার নিবাসি অদ্বিতীয় ভাগ্যধর স্বর্গবাসি ধনরাসি ৺বাবু রামতনু মল্লিক মহাশয়ের অতি পুণ্যশীলা এবং দাননিরতা বনিতা গত উত্তরায়ণ সংক্রমণ দিবসে জগন্নাথের ঘাটের মন্দির ও অট্টালিকা যাহা ভগ্নাবস্থা হইয়াছিল তাহা পুনর্নির্মাণ করাইয়া উৎসর্গ করিয়াছেন তত্তুপলক্ষে স্বীয়দলস্থ ব্রাহ্মণ সজ্জন ও কতিপয় গোস্বামীদিগকে আহ্বান করাইয়া নানা প্রকার মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া অতি উত্তম রক্তবর্ণের মূল্যবান এক ২ বনাৎ দান করিয়াছেন তদ্ব্যতীত আত্মীয় কুটম্ব ও অনুগত ব্যক্তিদিগকে কৃষ্ণবর্ণ এক ২ বনাৎ উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন। ঐ পুণ্যবতীর অনেকার্থ এইরূপ সৎকর্মে ব্যয় দৃষ্টে অনেকে ধন্যধ্বনি করিয়াছেন।”

রামমোহন মল্লিকের প্রপৌত্রের ষষ্ঠীপূজোপলক্ষে দান

২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৫৮ সাল শনিবার (৭ জুন, ১৮৫১ খৃঃ) তারিখের সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে (পৃঃ ৩-৪) নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে ঃ—

“আমরা আহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে এতন্নগরস্থ বড়বাজার নিবাসী ধনাঢ্যবর শ্রীযুক্ত বাবু রামমোহন মল্লিক মহাশয় তাঁহার প্রপৌত্রের শুভ জন্ম এবং ষষ্ঠী পূজোপলক্ষে গত পরশ্ব শ্রীশ্রীইষ্টদেবতা ও পুরোহিত এবং কতিপয় প্রাত্যহিক স্বস্ত্যয়নের ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণাঙ্গুরী ও বস্ত্র এবং নগদ মুদ্রা বিদায় দিয়াছেন। ভৃত্যবর্গকে চার হিসাবে বিতরণ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত কাঙ্গালি বালকবালিকা প্রভৃতি ৭।৮ সহস্র ব্যক্তিকে /০ হিসাবে

এবং কতকগুলিকে ৵০ হারে বিদায় করিয়াছেন ইহাতে শ্রীযুক্ত মল্লিক মহাশয় মহা যশস্বী হইয়াছেন।"

হীরালাল মল্লিকের স্ত্রীর মৃত্যু

২০শে বৈশাখ, বুধবার ১২৫৭ সালের (১মে, ১৮৫০ খৃঃ) সংবাদ পূর্ণ-চন্দ্রোদয়ে লিখিত হইয়াছে—

"বড়বাজার নিবাসি স্বর্গবাসি ৺নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের ষষ্ঠপুত্র বৈকুণ্ঠবাসি ৺হিরালাল মল্লিক মহাশয়ের স্ত্রী অল্লক্ষণের ওলাউঠা রোগে গত কল্য প্রাতে পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৬০ বৎসর হইয়াছিল তিনি তৎস্বামির স্বর্গারোহণের পর অবধি অনিত্য দেহ পরিত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত অনেক ধর্ম কর্ম করিয়া পুণ্যবতীরূপে খ্যাতা হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই হিরালাল বাবুর পুত্র সন্তান জীবিত নাই, চারি কন্যা মধ্যে তিন বর্তমানে আছেন, তন্মধ্যে দ্বিতীয়া কন্যার পুত্র ৺বাবুর উপযুক্ত দৌহিত্র শ্রীযুত বাবু হরিদাস দত্ত আছেন, তিনি যে প্রকার সচ্চরিত্র ও সুশীল, বোধ হয় তদ্দ্বারা আপন মাতামহ ও মাতামহির নাম রক্ষণীয় কর্ম করিয়া সর্ব-সাধারণের সন্তোষ জন্মাইবেন।"

চতুর্থী উপলক্ষে দান

২৬শে বৈশাখ মঙ্গলবার, সন ১২৫৭ সালের (৭ই মে, ১৮৫০ খৃঃ) সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে প্রকাশিত হইয়াছে—

"চতুর্থ ক্রিয়া। ৺বাবু হিরালাল মল্লিক মহাশয়ের তিন কন্যা তাঁহা-দিগের স্বর্গীয়া মাতা ঠাকুরানীর চতুর্থি ক্রিয়া গত শুক্রবারে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তদুপলক্ষে রৌপ্যময় দ্বাদশ ষোড়শ ও তদুপযুক্ত অন্যান্য দ্রব্য ও নগদ মুদ্রা উৎসর্গানন্তর দলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে বিতরণ করিয়াছেন।"

স্বরূপচন্দ্র মল্লিকের জনোপকার

স্বরূপচন্দ্র মল্লিক মহাশয় প্রাতঃস্মরণীয় নিমাইচরণ মল্লিক মহাশয়ের সপ্তম পুত্র। শ্রীশ্রী৺সিংহবাহিনী দেবীর সেবাসম্পর্কে ইঁহার সম্বন্ধে ১৮ই

বৈশাখ, ১২৩৩ সালের (২৯ এপ্রিল, ১৮২৬ খৃঃ) "সমাচার দর্পণে" নিম্ন-লিখিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে—

"সংপ্রতি আমরা পরমাহ্লাদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে বাবু স্বরূপচন্দ্র মল্লিক মহাশয় আপন পালা মত ৺সিংহবাহিনী ঠাকুরাণীর সেবা প্রাপ্ত হইয়া বিধি বিধিত মহাশোভা এবং সমারোহ পূর্বক পূজা করত তদুপলক্ষে এক মহাকার্য করিয়াছেন অর্থাৎ দুস্থ ঋণগ্রস্ত কারাগারস্থ অনেক লোককে অনেক অর্থ প্রদান পূর্বক মুক্ত করিয়াছেন ইহা যথার্থ জনোপকার বটে আমরা ভরসা করি যে উত্তরোত্তর এইরূপ চিরস্মরণীয় উপকারে অনেকে ইচ্ছুক হইবেন।

যে সকল লোক পূর্বে উত্তমাবস্থায় থাকিয়া কালবশে দুস্থ অথচ বহু পরিবার বিশিষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের অন্তঃকরণে কি আনন্দ উপস্থিত হয় এবং কাহার যথার্থ বিষয় তাহার শক্তিহীনতা প্রযুক্ত অন্য গ্রহণ করে তাহাতে কেহবা খরচার টাকার অভাবে কেহবা সহায়াভাবে কিছু করিতে পারে না। এ প্রকার ব্যক্তি সকলের প্রতি মনোযোগী হইয়া তাহারদিগের পুনঃ সংস্থান করিলে তাহারদিগের মনে কি সুখ জন্মে তাহা অনির্বচনীয় এ আনন্দ এবং সুখ ঐ সকল লোকের অধিক নহে কিন্তু উপকারকের অধিক হয়।"*

মতিলাল মল্লিকের বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

২৪ জুন, ১৮২৬ খৃঃ, ১১ আষাঢ়, ১২৩৩ সালের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হইয়াছে—

"গত বৃহস্পতিবার দশহরার দিবস শ্রীযুত বাবু মতিলাল মল্লিক পাথুরিয়াঘাটার আপন নূতন বাটিতে বিগ্রহ স্থাপনোপলক্ষে স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ সকলকেই এক এক জোড়া শাল ও স্বর্ণের বাজু এবং নিত্যানন্দ বংশ্য ৪৫ ঘর গোস্বামিরদিগকে এক এক জোড়া গঙ্গাজলী শাল হীরক অঙ্গুরীয়ক দুই নর মুক্তার মালা রূপার চন্দনের বাটি খিরদের যোড় ও আসন দিয়া বরণ করিয়াছেন তদ্ভিন্ন গঙ্গাবংশ্য প্রভৃতি অনেকে ছিলেন তাঁহারাও প্রায় তাদৃক সমাদৃত হইয়াছেন এবং আপনার গুরু ঠাকুরকে আড়াই হাজার টাকার

* "সমাচার দর্পণ" সম্পাদক এই সংবাদটি "সংবাদ কৌমুদী" পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বাটি এবং ঐ পরিমাণে হীরকের অঙ্গুরীয়ক ও শাল এবং চারি নর মুক্তার মালা এবং নগদ আড়াই হাজার টাকা দিয়াছেন এবং শুনা যাইতেছে যে পূর্ণিমার দিবস সকলকে জলযোগ করাইয়া যথোচিতরূপ নগদ দিয়া বিদায় করিয়াছেন অপর গত দিবস ব্রাহ্মণকে দুই টাকা ও অন্য জাতীয়কে এক টাকা দিয়া কাঙ্গালি বিদায় করিয়াছেন প্রায় পঞ্চাশ সহস্র লোক হইয়াছিল।" *

যদুলাল মল্লিকের বিবাহ

২২শে ফাল্গুন বুধবার, ১২৬৫ সালের (২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৯ খৃঃ) "সংবাদ প্রভাকরে" (চতুর্থ পৃষ্ঠা, তৃতীয় কলম) প্রকাশিত হইয়াছে—

"৺মতিলাল মল্লিক মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান্ যদুনাথ মল্লিক মহাশয়ের শুভোদ্বাহ গত সোমবার রজনীযোগে অতি সমারোহপূর্বক নির্বাহ হইয়াছে। বহুকাল হইল এই রাজধানী মধ্যে এ প্রকার বিবাহ ব্যাপার অনেকের নয়নগোচর হয় নাই, বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ উভয়েই বিপুলার্থ ব্যয় করিয়াছেন। ব্যয় সংখ্যা লক্ষ মুদ্রা বলিলেও বলা যায়, কয়েক দিবস ব্যাপিয়া বর ভবনে নাচ হয় সেই নাচের সভায় অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ যবন ইহুদি প্রভৃতি নানা জাতি এবং এই রাজধানীর বহু সম্ভ্রান্ত বাঙালি উপস্থিত হইয়াছিলেন, দানাদিও উচ্চ নিয়মে হইয়াছে। অধুনা জগদীশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি দম্পতী আরোগী ও দীর্ঘায়ু হউন।"

যদুলাল মল্লিকের সদনুষ্ঠান

যদুলাল মল্লিক মহাশয়ের সদনুষ্ঠান সম্বন্ধে "শ্রীমধুসূদন শর্ম্মা" নামক জনৈক ব্রাহ্মণ প্রেরিত নিম্নলিখিত পত্রখানি ১০ই শ্রাবণ, ১২৭২ সালের (২৪শে জুলাই, ১৮৬৫ খৃঃ) "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে" প্রকাশিত হইয়াছে—

"মান্যবর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

গুণিগুণাগ্রগণ্য বিবিধ গুণ বিশারদ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রোদয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু॥ আপনার জগদ্বিখ্যাত পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রৈকপার্শ্বে মল্লিখিত কয়েক পংক্তি স্থান দানে মানদান করিবেন।

* রাজা রামমোহন রায়-সম্পাদিত 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্র হইতে এই অংশ 'সমাচার দর্পণে' উদ্ধৃত হয়।

"সম্পাদক মহাশয়! আমরা বিপ্রকুল সম্ভূত হইয়াও এক্ষণে সুবর্ণ-বণিক্ ব্রাহ্মণ বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইতেছি, কিন্তু সুবর্ণবণিক্ সম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণদিগের সামাজিক, পত্র প্রদানের নিয়ম কস্মিনকালেও ছিল না, কেবল ভোজন দক্ষিণা বলিয়া সাধ্যানুসারে কথঞ্চিৎ বিদায় দেওয়া হইত, নচেৎ এতাবৎ কালাবধি কেহ কখন উচ্চতর বিদায় প্রদান করেন নাই, এবং তৎসম্বন্ধীয় ব্রাহ্মণেরাও প্রাপ্ত হন নাই, ইদানীং পাতুরীয়াঘাটা নিবাসী ধনরাশি, মিষ্টভাষী বদান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু যদুলাল মল্লিক মহাশয় তাঁহাদিগের কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺সিংহবাহিনীর শারদীয় মহাপূজোপলক্ষে এই একটি নূতন বিধি সংস্থাপন করিয়াছেন, অর্থাৎ স্বদল ও বিদলস্থ সমুদয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নীতিমত এক একখানি চলিত পত্র প্রদান করিয়াছিলেন, এবং যোগ্যতানুরূপ উচ্চহারে বিদায় দিয়া সকলের নিকট বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন, যেহেতু তিনি একটি নূতন সদ্ব্যবহারের সৃষ্টি করিলেন সুতরাং তাঁহার যে, ইহাতে বিশেষ সুখ্যাতি হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? যাহা হউক, এই নবীন বয়সে তাঁহার যে, হিন্দুধর্মের প্রতি এত শ্রদ্ধাভক্তি, ইহাই পরমাহ্লাদের বিষয়। কারণ স্বর্গীয় কর্তা মহাশয়রা যাঁহারা এই বিপুল ধন সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এমত শুভানুষ্ঠানে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহাদিগের কুলতিলক বংশধরগণ সেই সমুদয় ধনের সার্থকতা করিতেছেন, সে ধন যে, ধর্মোপার্জিত ধন, তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই, নচেৎ এরূপ সৎকার্যে ব্যয় কেন হইবে?

"আমরা পুনশ্চ শ্রবণ করিতেছি যে, উক্ত বিদ্যানুরাগী বদান্যবর বাবু মহাশয় আর একটি পরম হিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন, অর্থাৎ একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তাহাতে অক্ষম ব্রাহ্মণ বালকগণ অধ্যয়ন করিবেন, তাঁহাদিগের শিক্ষার্থ পুস্তক সকল এবং ভরণ পোষণার্থ কথঞ্চিৎ ব্যয় সাহায্য করিবেন, এমত সংকল্প করিয়াছেন, না হইবে কেন? যেমন কুবের তুল্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তদনুযায়িক কার্য করাও তাঁহার পক্ষে বিধেয়, যাহা হউক, শ্রীযুক্ত যদুলাল বাবু যে, এত অল্প বয়সে এমত পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, এবং বিদ্যানুরাগিতা জন্মিয়াছে, ইহাপেক্ষা আমাদিগের আহ্লাদের

বিষয় আর কি আছে, তিনি যে, সর্বদা পরোপকার ব্রতে এবং পুণ্য কর্মে নিযুক্ত থাকেন, ইহা সকলের অভিলাষ, যাহা হউক আমরা এক্ষণে পরমেশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি যে যদুলাল বাবু দীর্ঘজীবী হইয়া সর্বসাধারণের হিতসাধন করুন, আর সকলেরই আহ্লাদ-ভাজন হউন, অতএব হে ধনীসন্তানগণ আপনারা এই বদান্যবর বাবুর পথ অনুসরণ করুন, এবং ইঁহার কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, এক্ষণে আমি একটি আশীর্বাদী শ্লোক বাবুকে উপহার প্রদান করিতেছি, অনুকম্পা-পুরঃসর একবার কটাক্ষপাত করিবেন, কিমধিকমিতি বিস্তরেণ।

আশীর্বাদমিমং করোমি সততং লক্ষ্মীর্গৃহে নিশ্চলা
ভক্তিঃ কৃষ্ণপদাম্বুজেষু সুদৃঢ়া তে সাধুষু যেষ্বপি।
শ্রীল শ্রীযদুলালমল্লিক ভবান্ নিত্যং চিরং জীবতু
প্রহ্লাদ ইব দানবেষু বণিকে থং ভাতি শ্রেষ্ঠে তথা॥

অহং হিতাকাঙ্ক্ষী আশীর্বাদকব্রাহ্মণঃ

শ্রীমধুসূদন শর্মা”

শ্রীশ্রী৺ভগবতী সিংহবাহিনীর পূজা উপলক্ষে ভোলানাথ মল্লিকের দান

১১ই আশ্বিন মঙ্গলবার, ১২৭২ সালের (২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৫ খৃঃ) “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে”র সম্পাদকীয় স্তম্ভে লিখিত হইয়াছে—

“স্থানীয় পাঠকগণের অবিদিত নাই এ বৎসর বড়বাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মল্লিক মহাশয়ের আলয়ে শ্রীশ্রী৺ভগবতী সিংহবাহিনীর শুভাগমন হইয়াছে। এক পক্ষ যাবৎ তদুপলক্ষে নৃত্যগীত ভোজাদি হইতেছে গোস্বামীদিগকে উত্তম উত্তম এক এক জোড়া বস্ত্র একখানি শালের জামেয়ার এবং নগদ চারিটি করিয়া টাকা দেওয়া হইতেছে। দলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও এক জোড়া করিয়া উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও এক একখানি বনাত প্রাপ্ত হইয়াছেন। পূজার পরে তাঁহাদিগকে নগদ টাকা দেওয়া হইবে। অদ্য এতন্নগরস্থ দীন দরিদ্র লোকদিগকে এক একখানি করিয়া বস্ত্র দেওয়া হইবে। আমরা মল্লিক মহাশয়ের সদাশয়তায় যার পর নাই প্রীত হইয়াছি।

হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি শ্রীযুক্ত নর্মাণ সাহেব এক দিবস উক্ত বাবুর বাড়ীতে আহূত হন। সে দিবস আরও অন্যান্য অনেক ইয়োরোপীয় ভদ্রলোকের আগমন হইয়াছিল।"

২০শে মাঘ গুরুবার, সন ১২৭২ সালের (১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৬ খৃঃ) "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে"র সম্পাদকীয় স্তম্ভে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে—

"এতন্নগরস্থ বড়বাজার নিবাসী স্বর্গবাসী ৺রামমোহন মল্লিকের পুত্র শ্রীযুত বাবু প্রেমনাথ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু ভোলানাথ মল্লিক মহাশয়েরা তন্মহাত্মাদিগের কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺সিংহবাহিনী ঠাকুরাণীর পূজা ও বার উপলক্ষে গত শনিবার তাঁহারদিগের দলস্থ বহু সংখ্যক অধ্যাপক ব্রাহ্মণ-দিগকে উত্তমরূপে মিষ্টান্নাদি ভোজন করাইয়া প্রত্যেককে ৩৷৹ টাকার হিসাবে বিদায় দিয়াছেন। উক্ত রজনীতে উক্ত মল্লিক মহাশয়েরা অনেক কুটুম্ব ও বন্ধুবান্ধবদিগকে আহারাদি করাইয়া ছিলেন, তদ্ব্যতীত নৃত্য গীতাদিও যথা রীত্যনুসারে নির্বাহ হইয়াছিল। স্বাত্তিক ব্যয়ের বিষয়ে বাবুদিগের বিশেষ মনোযোগ থাকাতে এই কর্মে পরম যশস্বী হইয়াছেন। আমরা ভরসা করি যে, ধনি মহাশয়েরা যখন কোন ক্রিয়া কর্ম করিতে বাসনা করেন তৎকালীন স্বাত্তিক ব্যয়ের বিষয়ে কিঞ্চিৎ যত্ন প্রকাশ করিবেন তাহা হইলে সেই সকল কর্মে পরম যশস্বী হইতে পারিবেন তাহার সন্দেহ নাই।"

ভোলানাথ মল্লিকের পুত্রের বিবাহ

১৫ই বৈশাখ বুধবার, সন ১২৭২ (২৬ এপ্রিল, ১৮৬৫ খৃঃ) সালের "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়" পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে—

"গত ৯ই বৈশাখ বড়বাজার নিবাসী বদান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ মল্লীক মহাশয়ের পুত্রের তস্করোছান নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র মল্লীক মহাশয়ের পৌত্রীর সহিত শুভোদ্বাহ হইয়া গিয়াছে। ভোলানাথ বাবু এই বিবাহোপলক্ষে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, সেই সমুদয় ব্যয় কেবল

তামসিক ব্যাপারে পর্যাপ্ত হয় নাই, তিনি শুভকর্মে যেরূপ নিয়মে ব্যয় করিতে হয়, তাহা সর্বাঙ্গসুন্দর রূপেই করিয়াছেন এক্ষণে অনেক ধনাঢ্য মহাশয়রা নাম কিনিবার নিমিত্ত তামসিক কার্যেই প্রচুর ধনক্ষয় করিয়া সর্ব সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে উৎসাহী হইয়া থাকেন। কিন্তু মল্লীক বাবুদিগের সেই বিষয়টি কেহ বলিতে পারিবেন না, ইঁহারা চতুর্দিক্ সমান নিরীক্ষণ করিয়া কার্য করেন, বরং সাত্ত্বিকী বিষয়ে অধিক ব্যয় করিতে অনুরাগ করিয়া থাকেন, এই শুভকর্ম উপলক্ষ করিয়া যে প্রকার দানধ্যান করিয়াছেন, আমাদিগের অনুমান হয়, সমুদয় ব্যয় সমষ্টি করিলে তৃতীয়াংশ কিম্বা অর্ধেক প্রকৃত সাত্ত্বিকী বিষয়ে ব্যয়িত এবং অবশিষ্ট তামসিক এবং অন্যান্য কার্যে খরচ হইয়াছে। যাহা হউক, ভোলানাথ বাবুর এই বিবাহে ৺রামমোহন মল্লীক মহাশয়ের দলস্থ সমুদয় ব্রাহ্মণ ও স্বর্গীয় মহাত্মা রূপচরণ রায়ের এবং অন্যান্য কতিপয় দল সংক্রান্ত ব্রাহ্মণকে নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্যাদি ভোজন করাইয়া নগদ পাঁচ পাঁচ টাকা আর দুই ভরি রূপা প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে দিয়া বিদায় করিয়াছেন, সকলেই ঊর্ধ্ব বাহু হইয়া সহর্ষ চিত্তে চীৎকার ধ্বনি পূর্বক বরকন্যাকে আশীর্বাদ করিয়া গমন করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত দীনহীনদিগকেও বিবিধ মিষ্টান্ন দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। আত্মীয়, কুটুম্ব এবং জ্ঞাতিবর্গের সম্মান রক্ষার কথা অধিক কি বর্ণন করিব? মল্লীক পরিবারদিগের ক্রিয়া কলাপের বিষয় দেশবিখ্যাতই আছে।

"ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং অধ্যাপকগণের বিদায়ও হইয়াছে, তাহাতে যিনি যেরূপ উপযুক্ত তদনুরূপ অর্থাৎ কেহ ৪ কেহ বা ৫ টাকার হিসাবে বিদায় প্রাপ্ত হইয়া পুলকিত চিত্তে বর কন্যা এবং কর্তা বাবুদিগকে আশীর্বাদ করিয়া স্বস্থানে গমন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শ্রুত হওয়া গেল যে উক্ত বাবু ভোলানাথ মল্লিক মহাশয় ইতিমধ্যে এক দিবস গোস্বামীদিগের সেবা করিয়া যথাযোগ্য বিদায় দিবেন, সুতরাং এই বিবাহে কেহই বঞ্চিত হইবেন না।

"তামসিক ব্যাপারেও সামান্য ব্যয় হয় নাই, মহারাণীর ৫৪ গণিত সেনাদলের বাদ্যকরেরা পূর্ণ সজ্জায় আগমন করিয়া সুমধুর বাদ্যোদ্যমে শ্রোতৃবর্গের আনন্দ বর্ধন করিয়াছে, তদতিরিক্ত এতদ্দেশীয় নহবত প্রভৃতি যে সকল হর্ষসূচক কোলাহল হইয়া থাকে, তাহার কোন অঙ্গেরই ত্রুটি

হয় নাই, তদ্ভিন্ন কন্যাকর্তার ভবন এবং বড়বাজার পর্যন্ত বাঁধা রোসনাই হইয়াছিল পরিবার সংক্রান্ত কর্মচারিগণ এবং অনুগত আশীর্বাদক যে সকল মল্লীক বংশের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে, তাহাদিগের পাত্র বিশেষে সাল, বস্ত্র, অলঙ্কার, মুদ্রা এবং বহুবিধ মিষ্টান্ন দ্বারা পরিতোষ করিয়াছেন। বড়বাজার নিবাসী মল্লীক বাবুদিগের কার্যই এরূপ যে যখন যাহা করেন, তাহাই সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠে, ঘুণাক্ষরে ছিদ্র পাওয়া যায় না, না হইবে কেন, বনিয়াদী ঘরের নিয়মই এইরূপ হয়।”

ডাক্তার রসিকলাল দত্ত

বঙ্গগৌরব স্বর্গীয় ডাক্তার রসিকলাল দত্ত সাধারণের নিকট লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল আর এল দত্ত নামেই সুপরিচিত। তাঁহার পিতার নাম গুরুচরণ দত্ত, মাতার নাম দিগম্বরী দেবী ; তিনি তাঁহাদের চতুর্থ পুত্র। গুরুচরণ দত্ত মহাশয়ের আদি নিবাস হুগলী জেলার আটপুর গ্রাম। এইখানে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখে রসিকলালের জন্ম হয়। তাঁহার বয়স যখন এক বৎসর, তখন গুরুচরণ দত্ত মহাশয় হাওড়ায় বাসস্থান পরিবর্তন করেন।

বিদ্যাশিক্ষায় রসিকলাল

ছয় বৎসর বয়সে তাঁহাকে পাঠশালায় ভর্তি করিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু লেখাপড়ায় তাঁহার আদৌ মন ছিল না। পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের প্রহারও তাঁহাকে পাঠে মনোনিবেশ করাইতে পারিল না, বরং উহাতে তাঁহার চাপল্য আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিল ; শুনিতে পাওয়া যায় যে, পাঠশালায় ভর্তি হইবার এক বৎসর পরে তিনি একদিন অতিশয় চাপল্য প্রকাশ করায় গুরুমহাশয় অসন্তুষ্ট হন। তারপর তাঁহাকে রেভারেণ্ড গোপাল মিত্রের অ্যাংলো-ভার্ণ্যাকুলার স্কুলে ভর্তি করা হয়। এখানে তিনি ১১ বৎসর বয়স পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন।

১১ বৎসর বয়সে তিনি হাওড়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলে ভর্তি হন। এই বিদ্যালয়ে তাঁহার প্রতিভার প্রথম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি ছয় মাস অন্তর তিনি এক একটি ক্লাস অতিক্রম করিয়া ১৪ বৎসর বয়সে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিলেন। তখন সেই বৎসরের প্রবেশিকা পরীক্ষার মাত্র তিন মাস বাকী। প্রবেশিকা-ক্লাসে পরীক্ষা পাশ করার উপযুক্ত কোন ছাত্র ছিল না। সেই জন্য হেড মাষ্টার রসিকলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি এই তিন মাসে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার মত পড়া

লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল ৺আর এল্ দত্ত এম্ ডি

(১৮৪৫—১৯২৪)

তৈয়ারী করিতে পারিবেন কি না। উত্তরে তিনি বলিলেন যে, যদি কেহ তাঁহাকে ভাল করিয়া পড়াইয়া দেয়, তবে তিনি প্রস্তুত হইতে পারিবেন। ইহাতে হেড মাষ্টার স্বয়ং ইংরেজী শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার নাম প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থীরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন।

তিনি নিজে অন্যান্য বিষয় কঠোর পরিশ্রম করিয়া আয়ত্ত করিতে যত্নবান্ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে হেড মাষ্টার মহাশয় ইংরেজী শিক্ষার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রের এই সহযোগিতা বিফল হইল না। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ১৪ বৎসর বয়সে রসিকলাল দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাঁহার চরিত্রে কতকগুলি বিশিষ্ট পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি সেই সময়কার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য খাদ্যাদিতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মে। এই সময়ে তিনি শারীরিক শক্তিতে, সাঁতার কাটায় ও লাঠিখেলায় পারদর্শী হন। কার্যসিদ্ধির জন্য দৃঢ়সংকল্প, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অসম-সাহসিকতা, সরলতা, নির্ভীক তেজস্বিতা ও স্বীয় আচরণের অকপট স্বীকৃতি বিশেষভাবে তাঁহার চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করে।

প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশের পর তাঁহার নিকট দুইটি পথ উন্মুক্ত হইল; একটি সাধারণ উচ্চ শিক্ষা, অন্যটি চিকিৎসাবিদ্যা। তিনি উভয় দিকেই স্বীয় মনোবৃত্তি সমভাবে আকৃষ্ট দেখিয়া এক সঙ্গে দুইটি বিষয়ই অধিগত করিতে অভিলাষী হইলেন। সেই জন্য তিনি প্রেসিডেন্সী ও মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইলেন।

তখনও গঙ্গার উপর বর্তমান ভাসমান সেতু নির্মিত হয় নাই। সেই জন্য তাঁহাকে প্রত্যহ নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া কলেজে যাতায়াত করিতে হইত।

রসিকলাল কিছুদিন উভয় কলেজের পড়া সমভাবে চালাইয়াছিলেন; কিন্তু পরে দুই দিক্ রক্ষা করা সম্ভব হইল না। চিকিৎসাবিদ্যায় সমধিক প্রবণতা লক্ষ্য করিয়া তিনি সেই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়েন ও প্রেসিডেন্সী কলেজ ত্যাগ করেন।

মেডিকেল কলেজের প্রথম বৎসরের পরীক্ষায় তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইল। ১৮৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি মেডিকেল কলেজের জুনিয়ার ডিপ্লোমার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই বৎসর গোলাপমোহিনী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পরই তিনি মেডিকেল কলেজে পড়িবার সময়ে চিকিৎসা-ব্যবসা করিতে আরম্ভ করেন। ধীরে ধীরে চিকিৎসকরূপে তাঁহার খ্যাতি প্রচারিত হইতে লাগিল এবং অর্থোপার্জনও বাড়িয়া চলিল। মেডিকেল কলেজে পড়ার পঞ্চম বৎসরে তিনি প্রায় মাসিক ৬০০৲ শত টাকা উপার্জন করিতেন এবং রোগী দেখার জন্য তিনি ১৬ জন পাল্কী-বেহারা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফলে ব্যবসায় তিনি এত বেশী লিপ্ত হইয়া পড়িলেন যে, মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষায় তিনি উপস্থিত হইতে পারিলেন না এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই।

কর্মজীবনের প্রারম্ভ

তাঁহার শ্বশুর বাড়ী ছিল খিদিরপুরে। এই সময় কোন কারণে তাঁহার শ্বশুরবাড়ীতে একটি মস্ত দাঙ্গা উপস্থিত হয়। গুণ্ডা ও লাঠিয়াল বাড়ী ঘিরিয়া ফেলে। সেই সময়ে উপস্থিত হইয়া তিনি বিশেষ সাহসের পরিচয় দেন এবং বাড়ীর মহিলাদিগকে একটি গাড়ীতে চাপাইয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যান।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার একমাত্র পুত্র জহরলাল জন্মগ্রহণ করে এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জীবনের গতি কোন এক ঘটনায় ভিন্ন দিকে পরিচালিত হয়।

হাওড়া শালকিয়ার একটি স্ত্রীলোক প্রসব-বেদনায় কষ্ট পাইতেছিল। দুই তিন দিন অতিক্রান্ত হইবার পরও যখন প্রসূতি প্রসব করিতে পারিল না, তখন বাড়ীর কর্তা হাওড়ার হাসপাতালের এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জনকে আহ্বান করেন। তিনি আসিয়াও স্ত্রীলোকটিকে প্রসব করাইতে অক্ষম হওয়ায় সিবিল সার্জনকেও আহ্বান করা হইল। তিনিও বিফল হইয়া প্রস্থান করেন। তখন উক্ত গৃহস্বামীর কোন আত্মীয়া তাঁহাকে

রসিকলালকে ডাকিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই আত্মীয়ার অনুরোধে রসিকলালকে আহ্বান করা হইল। যখন তিনি সেই গৃহে উপস্থিত হন তখনও এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রসিকলালকে দেখিয়া মাতাল ও হাতুড়ে ডাক্তার বলিয়া বিদ্রূপ করেন। কিন্তু বিদ্রূপে কর্ণপাত না করিয়া রসিকলাল প্রসূতির নিকট উপস্থিত হন এবং অল্প সময়ের মধ্যে প্রসূতিকে নিরাপদে প্রসব করাইয়া বাড়ী ফিরিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। কারণ অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জনের বিদ্রূপ তাঁহার মর্মে বড় লাগিয়াছিল, এবং তিনি সেই মূহূর্তে বিলাত হইতে ডাক্তারী পাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাঁহার জননী আসিয়া রসিকলালকে স্নানাহার করিতে বলিলে তিনি উত্তর দিলেন যে, যদি তাঁহার দাদা বৈকুণ্ঠনাথ তাঁহাকে বিলাত যাওয়ার অনুমতি দেন তবেই তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া স্নানাহার করিবেন; অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণে অক্ষম হইয়া তিনি জীবন-ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন না। তিন দিন তিন রাত্রি দাদার অনুমতি না পাওয়ায় রসিকলাল শয়ন করিয়াই কাটাইয়াছিলেন। চতুর্থ দিবসে মাতার অনুরোধে বৈকুণ্ঠনাথ বলিলেন যে, রসিকলাল যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, তবে তিনি তাঁহার বিলাত যাওয়ার বা বিলাতে থাকিয়া পড়াশুনা করার জন্য কোনরূপ খরচপত্র বহন করিতে পারিবেন না। এই কথা শুনিয়াই রসিকলাল শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং স্নানাহার করিয়া চাকুরীর সন্ধানে বহির্গত হন। চাকুরী পাইতে বিলম্ব হইল না। তিনি "ফ্লাইং ফোম" নামক পালবাহী জাহাজে ডাক্তারের পদ গ্রহণ করিয়া ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া ত্রিনিদাদ যাত্রা করেন।

সমুদ্রে বিপদ্

ডাক্তার রসিকলাল যে জাহাজে ত্রিনিদাদ যাত্রা করেন, সেই জাহাজে ভারতবর্ষ হইতে ৫০০ শত কুলী যাইতেছিল। ঐ কুলীদের অভিভাবক ছিলেন জনৈক ইয়োরোপীয় ভদ্রলোক। ইহাদের আহারের নিমিত্ত কয়েক শত মণ চাউল ও ডাল জাহাজে সঞ্চিত ছিল।

জাহাজ বঙ্গোপসাগরের ভিতর দিয়া মাদ্রাজ অতিক্রম করিয়া যখন

ভারত মহাসাগরে সিংহল দ্বীপের সন্নিকটে উপস্থিত হইল, তখন হঠাৎ ঝড় দেখা দিল। জাহাজের কাপ্তেন কৌশলক্রমে সেই ঝড়ের মধ্যে জাহাজের গতি স্থির রাখিতে সমর্থ হন। কিন্তু তাহাতেও কুলীদের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহাদের অভিভাবক তাহাদিগকে স্থির রাখিতে অসমর্থ হওয়ায় কাপ্তেনের অনুরোধ ক্রমে রসিকলাল তাহাদিগকে বুঝাইয়া স্থির রাখেন। কিছুকাল পরে ঝড় থামিয়া গেল এবং আবার সুবাতাস দেখা দিল। ইহাতে নঙ্গর তুলিয়া ভারত মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়া জাহাজ বিষুবরেখা অতিক্রম করিল এবং মাদাগাস্কার দ্বীপের ধার দিয়া উত্তমাশা অন্তরীপে উপনীত হইল। এইস্থান ত্যাগ করিয়া জাহাজ যখন আট্‌লান্টিক মহাসমুদ্রের দিকে চলিল, তখন আবার ভীষণ ঝড় দেখা দিল। এইবার ঝড়ের প্রচণ্ড বেগে কাপ্তেনের কৌশল ব্যর্থ হইয়া গেল। ঝড় জাহাজকে ঠেলিয়া ৪০০ মাইল দক্ষিণে লইয়া চলিল এবং ভীষণ বেগে একটা ভাসমান বরফ-স্তূপের উপর নিক্ষেপ করিল। সেই সংঘর্ষে জাহাজ বরফ-স্তূপে আটকাইয়া গেল; অন্য কোন জাহাজের সহায়তা ব্যতীত বরফ-স্তূপ হইতে জাহাজকে মুক্ত করার কোন উপায় তৎকালে দেখা গেল না। এই সময় জাহাজের মাস্তুলে বজ্রাঘাত হওয়ায় মাস্তুলের কতকাংশ কাটিয়া ফেলা হইল।

মেরু প্রদেশের প্রচণ্ড শীতে এবং ভীষণ সমুদ্রতরঙ্গের প্রতিঘাতে জাহাজে রন্ধন-কার্য নির্বাহ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। কুলীরা কেবল চিড়ে আর গুড় এবং অন্যান্য অফিসারগণ মাত্র বিস্কুট খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে লাগিলেন। ঝড়ে সমুদ্র-তরঙ্গ জাহাজকে এমনভাবে আঘাত করিতে লাগিল যে, জাহাজ ক্ষুদ্র মোচার খোলার মত টলমল করিতে থাকে; তাহাতে জাহাজে বেড়ান ত দূরের কথা, শয়ন করিয়া থাকাও কষ্টসাধ্য হইল।

হঠাৎ জহাজ এক দিকে কাৎ হইয়া পড়িল। জাহাজ রক্ষার জন্য কাপ্তেন জাহাজ হইতে ২০০ মণ চাউল ও ডাল সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার হুকুম দিলেন। ইহাতে কুলীরা প্রাণের আশঙ্কায় বিষম গোলযোগ আরম্ভ করিল। তাহাদের অভিভাবককে তাহারা গ্রাহ্যই করিল না; কাপ্তেনকেও

অগ্রাহ্য করিল, তখন তাহারা প্রাণের ভয়ে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। কাপ্তেনের অনুরোধে রসিকলাল তাহাদিগকে অতি কষ্টে বুঝাইয়া নীচের ডেকে prison cellএ লইয়া যান এবং তথায় আবদ্ধ করেন।

এইভাবে দশ দিন অতিক্রান্ত হইয়া গেল কিন্তু কোন সাহায্যকারী জাহাজের দেখা মিলিল না। প্রতিমূহূর্তে জাহাজের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। কাপ্তেন যখন বুঝিলেন যে, জাহাজ রক্ষার আর কোন উপায় নাই, তখন তিনি একাদশ দিবস সকাল বেলা প্রতি দশ মিনিট অন্তর বন্দুকের আওয়াজ করিবার হুকুম দিলেন, যদি আকৃষ্ট হইয়া কোন জাহাজ উদ্ধারার্থ সমাগত হয়। কাপ্তেনের আশা ফলবতী হইল। সেই দিবস দূরে একখানি বাষ্পীয় পোত দেখা গেল। উহা দেখিয়া ফ্লাইং ফোম জাহাজ হইতে প্রতি দুই মিনিট অন্তর বন্দুকের আওয়াজ করা হইতে লাগিল। ঐ ষ্টীমার নিকটে আসিয়া জাহাজকে বরফ-স্তূপ হইতে মুক্ত করিল এবং পিছনে বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া চলিল। এইরূপে রসিকলাল নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন।

ষ্টীমারখানি ভগ্ন জাহাজখানিকে টানিতে টানিতে কয়েক দিন পরে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে পৌঁছাইয়া দিল। এইখানে দশ দিন অপেক্ষা করিয়া জাহাজ খানিকে মেরামত করা হইল। তৎপরে আটলান্টিক মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়া জাহাজ ত্রিনিদাদের দিকে চলিল এবং সুদীর্ঘ চারি মাস পরে ত্রিনিদাদে উপনীত হইল। সমস্ত ভারতীয় কুলীকে এইখানে নামাইয়া দেওয়া হইল।

ইংল্যণ্ডে আগমন

রসিকলাল জাহাজে চাকুরী করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যণ্ডে গিয়া ডাক্তারি পড়া। তিনি দেখিলেন যে, জাহাজের চাকুরী লইয়া ব্যাপৃত থাকিলে মূল উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে না। সুতরাং তিনি "ফ্লাইং ফোম" জাহাজের ডাক্তারের পদে ইস্তফা দিলেন এবং স্বীয় বেতনাদি চুকাইয়া লইলেন। তাঁহাকে ডাক ষ্টীমারের জন্য এক সপ্তাহ ত্রিনিদাদে অপেক্ষা করিতে হইল। এক সপ্তাহ পরে তিনি পাল ও দাঁড়বাহী ডাক জাহাজে ত্রিনিদাদ ত্যাগ করেন।

পথে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ ও কিউবা দ্বীপ দর্শন করত তিনি আবার আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করেন। এইবার পথে কোনরূপ বিপদের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। তিনি নিরাপদে ১৮ দিন পরে ডোভার বন্দরে উপনীত হন।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় তিনি লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন। তিনি একটি কফি হাউসে বাসা লইলেন। ইহা মাতাল ও গুণ্ডার আড্ডা ছিল। তিনি দেখিলেন, যতই রাত্রি গভীর হইতে লাগিল, উহাদের গোলমাল ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহাতে তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া শয়নাধার টানিয়া দরজায় আটকাইয়া দেন এবং ভিতর হইতে উহা ছিট্‌কানি দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখেন। তৎকালে তাঁহার মনে এত ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল যে, তিনি সারা রাত্রি জাগিয়া কাটাইতে বাধ্য হন।

ডাক্তার ক্ষেত্রমোহন দত্ত নামক একজন বাঙালী সেই সময় লণ্ডনে থাকিতেন। রসিকলাল তাঁহার সন্ধান পাইয়াছিলেন; পরদিন ডিরেক্টারী দেখিয়া তিনি ক্ষেত্রমোহন দত্তকে তার করেন। ইহাতে ক্ষেত্রমোহন দত্ত সেই দিনই উক্ত কফি হাউসে আসিয়া তাঁহাকে নিজের বাসায় লইয়া যান।

অল্পদিন পরে তিনি তারকনাথ পালিত, কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়, বম্বের বাবাজী ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গিরিশচন্দ্র মিত্র— সকলে মিলিয়া একটা বাসা ভাড়া করেন ও সেইখানে সকলে একসঙ্গে বাস করিতে থাকেন।

অতঃপর তিনি ডব্লিউ সি চেম্বার্সের তত্ত্বাবধানে লণ্ডনের সিনিয়ার মেডিকেল কোর্স পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং বিভিন্ন হাসপাতালের কার্যাবলী পরিদর্শন করিতে থাকেন।

পরীক্ষায় কৃতকার্যতা

লণ্ডনের সিনিয়ার মেডিকেল কোর্স শেষ করিয়া রসিকলাল যথাক্রমে এম বি, এম্ আর সি এস্, ও এম্ ডি পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হন। এই সময় তিনি সার উইলিয়্যাম গাওয়ারের মেডিকেল ওয়ার্ড এবং চিকিৎসক ভাষ্টন জোন্সের প্যাথলজিক্যাল ওয়ার্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

অতঃপর তিনি আই এম্ এস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সময় বিদেশীয়দিগের জন্য উক্ত পরীক্ষা বন্ধ ছিল। সুতরাং তিনি, গোপাল রায় ও কে ডি ঘোষ প্রভৃতি সকলে ইণ্ডিয়া অফিসে আবেদন করিলেন যে, বিদেশীয়দিগকে আই এম্ এস্ পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তাঁহাদিগকে নেট্‌লে মিলিটারি ট্রেণিং স্কুলে ভর্তি করিয়া রাখা হউক। এই দরখাস্ত মঞ্জুর হইল না, তবে ইণ্ডিয়া অফিস তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, তাঁহারা ভারতবর্ষে ফিরিয়া গেলে uncovenanted service পাইবেন।

ইহাতে ১৮৭১ সালের শেষভাগে তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। দেশে ফিরিতেই ডেপুটি সার্জন জেনারেল তাঁহাকে ডিব্রুগড়ে মেডিকেল অফিসার নিযুক্ত করিলেন। তিনি সেইখানে যাইয়া কার্যভার গ্রহণের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় লণ্ডন হইতে তাঁহার এক বন্ধু রাখালদাস রায় তাঁহাকে টেলিগ্রামে জানাইলেন যে, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ৪০ জন বিদেশীয়কে আই এম্ এস্ পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার অনুমতি দেওয়া হইবে।

এই সংবাদ পাইয়া রসিকলাল ও গোপাল রায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ডাক-জাহাজে দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন। তৎকালে ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধ চলিতেছিল। সেই জন্য তাঁহারা ব্রেনার পাশের মধ্য দিয়া ষ্ট্রাসবুর্গ ও কলোন হইয়া ব্রুসেল্‌স্‌এ আগমন করেন এবং তথা হইতে ইংলিশ প্রণালী পার হইয়া লণ্ডনে উপনীত হন, তখন পরীক্ষার বাকী মাত্র আট দিন।

গোপাল রায় ও তিনি সুখ্যাতির সহিত আই এম্ এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। এই পরীক্ষায় ভারতীয় "বেল"-এর উপকারিতা সম্বন্ধে একটি মৌখিক প্রশ্ন ছিল; সময় ছিল তিন মিনিট। তিনি বেলের উপকারিতা সম্বন্ধে এমন ব্যাখ্যা পরীক্ষকের নিকট করেন যে, পরীক্ষক তাঁহাকে আরও আধ ঘণ্টা বেশী সময় দিয়াছিলেন; এবং উত্তর শুনিয়া এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বেল সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করেন। পরীক্ষকের উৎসাহে তৎকালে পুস্তক প্রণয়নে

প্রতিশ্রুতি দান করিলেও তিনি তাহা কার্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

. আই এম্ এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি নেট্‌লে মিলিটারি ট্রেণিং স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া লেফটেন্যান্ট উপাধি লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি আয়ার্ল্যণ্ডের কুইন্‌স্ টাউনের ৫১নং আইরিশ রেজিমেণ্ট সৈন্যদলের ভারপ্রাপ্ত হইয়া ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বম্বে বন্দরে উপনীত হন।

কর্মজীবনে রসিকলাল

বম্বে পৌঁছিয়া তিনি সার্জন জেনারেলের নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাইলেন যে, তাঁহাকে বর্ধমানের সিভিল সার্জনের পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং অবিলম্বে কার্যে যোগদান করিতে হইবে।

তিনি অবিলম্বে কর্মস্থলে যোগদান করিলেন। বর্ধমানে তৎকালে ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রকোপ ছিল। তিনি জেলার ভারপ্রাপ্ত হইয়াই সুদূর পল্লী-অঞ্চলে অশ্বারোহণে গমন করত দরিদ্র অধিবাসীদিগের চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে থাকেন। এই কার্যে তিনি দৈনিক ৩০।৪০ মাইল পথ অশ্বারোহণে অতিক্রম করিতেন।

বর্ধমানের সিভিল সার্জনের পদে তিনি পাঁচ বৎসর কাজ করেন।

অতঃপর তিনি আলিপুর মিলিটারি হাসপাতালে কিছুকাল কাজ করিয়া সাঁওতাল পরগণার সিভিল সার্জন নিযুক্ত হইলেন। তথা হইতে তিনি বাঁকুড়া, নয়া তুমকা, রংপুর, পুরী ও মেদিনীপুরে বদলী হন; এই সব স্থানে খুব অল্প দিন করিয়া ছিলেন।

রংপুরে সিভিল সার্জন থাকা কালে তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে টমটমে করিয়া ভ্রমণ করিতেন। একদিন তিনি ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন; হঠাৎ দূরে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা দেখিয়া তিনি সেই দিকে জোরে টমটম চালনা করেন এবং অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, একখানি খড়ের ঘর জ্বলিতেছে। পার্শ্ববর্তী যে কয়খানি ঘরে তখনো আগুন লাগে নাই, চেষ্টা করিলে সেই ঘরগুলিকে অগ্নির গ্রাস হইতে রক্ষা

করা সম্ভব। তিনি আরও দেখিলেন যে, অনেকগুলি স্কুলের ছাত্র নিকটে দাঁড়াইয়া হৈচৈ করিতেছে, কিন্তু কেহই পার্শ্ববর্তী গৃহগুলি রক্ষার চেষ্টা করিতেছে না। ইহাতে তিনি ছাত্রগুলিকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, নিকটে মই না থাকায়, কেহই তাহারা চালে উঠিতে পারিতেছে না। একজন দূরবর্তী বাড়ী হইতে মই আনিতে গিয়াছে, মই আনিলে তাহারা ভিজা কাঁথা প্রভৃতি দিয়া ঘরের চালগুলি ঢাকিয়া দিবে। ইহা শুনিয়া তিনি তাহাদিগকে তাঁহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন এবং জ্বলন্ত গৃহের পার্শ্ববর্তী গৃহের নিকট উপস্থিত হইয়া এক একটি করিয়া বালককে নিজের কাঁদের উপর উঠাইয়া চালে তুলিয়া দিলেন, এবং ভিজা কাঁথা, চট প্রভৃতি বহন করিয়া আনিয়া কর্মিগণকে যোগান দিতে লাগিলেন। এইরূপে অগ্নি নির্বাপিত হইল।

মেদিনীপুর হইতে তিনি পুনরায় আলিপুরে বদলী হন। এইবার তাঁহাকে জেনারেল হাসপাতালের কাজ ও প্রেসিডেন্সি জেলের কাজ—এই উভয় কাজ করিতে হইত।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজের মেটিরিয়া মেডিকার অফিসিয়েটিং প্রফেসার নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি উক্ত কলেজের সেকেণ্ড ফিজিসিয়ান ছিলেন।

অধ্যাপকের কার্য হইতে তিনি পুনরায় বর্ধমান বদলী হন। এই স্থানে কোন উচ্চ রাজকর্মচারীর সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় তাঁহাকে হুগলীর সিভিল সার্জন পদে নিযুক্ত করা হয়।

এই সময় মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষের পদ খালি হয় এবং উক্ত পদে তাঁহার দাবী সমধিক ছিল। কিন্তু তিনি বাঙালী বলিয়া তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইল না; একজন জুনিয়ার ইংরেজ কর্মচারীকে প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত করায় তেজস্বী রসিকলাল দুই বৎসরের ফার্লো লইয়া চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ২নং সদর ষ্ট্রীটে চেম্বার খুলিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার প্রকৃত উপার্জন এবং প্রতিভার বিকাশ আরম্ভ হইল, বলা যায়।

তিনি প্রত্যহ চা পানের পর ৮টা—৮½টায় রোগী দেখিতে বাহির হইতেন এবং ১২টা—১টার সময় ফিরিয়া স্নানাহার করিতেন। ২টা হইতে ৪টা পর্যন্ত সংবাদপত্র ও মেডিকেল জার্ণ্যাল প্রভৃতি পাঠ তাঁহার নিত্য কার্য ছিল; তৎপরে জলযোগ শেষ করিয়া রোগী দেখিতে বাহির হইতেন এবং রাত্রি ৯টার মধ্যে ফিরিয়া আহারান্তে নিদ্রা যাইতেন। ইহাই তাঁহার দৈনিক কার্যসূচী। তখন তাঁহার দৈনিক উপার্জন ছিল প্রায় ২০০৲ শত টাকা।

বৎসরের মধ্যে তিনি জুন, জুলাই ও অক্টোবর—এই তিন মাস কার্শিয়াঙের বাড়ীতে অতিবাহিত করিতেন।

পারিবারিক জীবন

রসিকলালের পারিবারিক জীবন সুখশান্তিপূর্ণ ছিল। তাঁহার পত্নী গোলাপমোহিনী কর্মক্ষেত্রে প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম জহরলাল। তিনি স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জন করিতে উৎসুক হওয়ায়, রসিকলাল তাঁহাকে রাণীগঞ্জের নিকটবর্তী ভসকাজুলী নামক কয়লার খনি ক্রয় করিয়া দেন। কয়লার খনির কার্য-পর্যবেক্ষণার্থ গমন করিয়া অনভ্যস্ত জহরলাল কথঞ্চিৎ কঠোর আচার-ব্যবহার অবলম্বন করেন। ফলে কিছুদিন পর তিনি হাওড়ার বাটিতে ফিরিয়া নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। তৎকালে রসিকলাল বর্ধমানের সিভিল সার্জন ছিলেন। পুত্রের অসুখে যথেষ্ট ধৈর্য ও পরিশ্রম সহকারে প্রথমে তিনি নিজে চিকিৎসা করেন ও পরে অন্যান্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান হয়। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দেখা গেল না। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী জহরলাল দুইটি কন্যা ও অন্তঃসত্বা স্ত্রীকে রাখিয়া এবং পিতামাতাকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করেন। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল তাঁহার পৌত্র রঙ্গুলাল দত্তের জন্ম হয়।

অন্য কোন সন্তান না থাকায় রসিকলালের সমস্ত স্নেহ পৌত্র-পৌত্রীর উপর বর্ষিত হইতে থাকে। তিনি পৌত্রী দুইজনকে সুপাত্রে বিবাহ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রথমা পৌত্রী শ্রীমতী আশালতা চাটার্জি, কর্ণেল কে

কে চাটার্জির পত্নী। দ্বিতীয়া পৌত্রী অনারেবল্ মিসেস্ শান্তিলতা সিংহ, লর্ড সিংহের পুত্র অনারেবেল শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার সিংহের পত্নী।

তাঁহার পত্নী গোলাপমোহিনী কার্শিয়াঙে অ্যাপোপ্লাক্সী রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৯০৮ সালের চৈত্র সংক্রান্তির দিন দেহত্যাগ করেন।

পত্নীর মৃত্যুর দুই মাস পরে তিনি ৪নং ময়রা ষ্ট্রীটে বাড়ী ক্রয় করেন। বর্তমানে এই বাড়ীতে তাঁহার পৌত্র শ্রীযুক্ত রঙ্গুলাল দত্ত বাস করিতেছেন।

চিকিৎসা-নৈপুণ্যের খ্যাতি

ময়রা ষ্ট্রীটে উঠিয়া আসিবার পর হইতে রসিকলালের চিকিৎসা-নৈপুণ্যের খ্যাতি অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করে। এই সময় বঙ্গদেশের সর্বত্র, এমন কি বঙ্গদেশের বহির্ভূত বহু স্থান হইতেও চিকিৎসার্থ বহু রোগী তাঁহার নিকট সমাগত হইত। তাঁহার অপেক্ষায় তাহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকিতেও বিরক্তিবোধ করিত না। তিনিও প্রতেক রোগীকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার চিকিৎসায় অধিকাংশ রোগী নিরাময় হইত। অনেক রোগীর বিশ্বাস ছিল ডাক্তার দত্ত হস্তের দ্বারা স্পর্শ করিলেই তাহাদের রোগ আরোগ্য হইবে।

চিকিৎসার বিশেষত্ব

প্রাচ্য এবং পাশ্চত্য চিকিৎসা-কৌশলের সমন্বয়ই তাঁহাকে চিকিৎসক-শিরোমণিরূপে পরিণত করিয়াছিল এবং উহাই ছিল তাঁহার চিকিৎসার বিশেষত্ব। তিনি ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রথমবার বিলাত যাওয়ার পূর্ব হইতে কিছু কিছু অধ্যয়ন করিতেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিদ্যা অধিগত করিয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার পর তিনি চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট প্রভৃতি ভারতীয় চিকিৎসাগ্রন্থ পুনরায় অধ্যয়ন করিয়া উভয় বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। বিশেষত ভারতীয় দ্রব্যগুণ তিনি বিশেষভাবে আয়ত্ত করেন। ইহাতে তিনি ক্রমে আয়ুর্বেদীয় পথ্যের অনুরাগী হইলেন, এবং রোগ-নির্ণয়েও ভারতীয় প্রথা অনেকাংশে অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং রোগীর ঔষধের ব্যবস্থায় তিনি আয়ুর্বেদীয় ঔষধের ব্যবস্থা না

করিলেও পথ্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে আয়ুর্বেদের অনুসরণ করিতেন। অনেক সময় রোগীকে তিনি কোন ঔষধ প্রদান না করিয়া পথ্যের বিশেষ ব্যবস্থা দিতেন এবং তাহাতেই রোগী রোগমুক্ত হইত।

বার্ধক্যে দৃষ্টিহীনতা

বার্ধক্যের প্রথম অবস্থায় তাঁহার কর্ম-ক্ষমতা অটুট ছিল; তিনি ৬৫ বৎসর বয়সেও তরুণ যুবকের মত পরিশ্রম করিতে সমর্থ ছিলেন। পূর্বের মত নিয়মিতভাবে আহার-বিহার, রোগী দেখা প্রভৃতি নির্বাহ করিতেন—কোন দিন কোন কার্যে আলস্য প্রদর্শন করেন নাই।

জীবনের শেষের দিকে তিনি একটি চক্ষুর দৃষ্টি হারাইলেন। ক্রমে উক্ত রোগে দ্বিতীয় চক্ষুও আক্রান্ত হইল এবং তিনি প্রায় অন্ধ হইয়া গেলেন। প্রথমে একটি চক্ষুতে অস্ত্রোপচার করা হইল; কিন্তু কোন সুফল দেখা গেল না। এই সময় দূরদেশ হইতে সমাগত রোগিদিগকে সহকারীর দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া রোগ-নির্ণয় করত নিজে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপ-ব্যবস্থায় ৭।৮ মাস অতিবাহিত হইবার পর তিনি চিকিৎসা-ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেন।

দৃষ্টিহীন অবস্থায় জীবন-ধারণ করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়াছিল। সেই কারণে তিনি প্রায়ই বলিতেন—"ভগবান্ আমাকে শীঘ্র নাও, আমার কাজ শেষ হয়েছে, চক্ষুহীন হয়ে পৃথিবীতে থাকায় কি লাভ।" এই সময় তিনি প্রাতঃকালে বাড়ীতেই উদ্যানে বেড়াইতেন। দুপুর বেলা তাঁহাকে বিবিধ সংবাদ-পত্র পড়িয়া শোনান হইত। সন্ধ্যায় মোটরে গঙ্গাতীরে ভ্রমণার্থ যাইতেন। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসের প্রথম ভাগ পর্যন্ত এইভাবে চলিয়াছিল।

ধর্মানুষ্ঠান

রসিকলাল বিলাত গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন দিন অন্য কোন ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। বস্তুত তিনি কোন ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান মানিতেন না। কোন দিন তিনি মন্দিরে বা অন্য কোন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে

গমন করিয়া ঈশ্বরোপাসনা করেন নাই ; কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি নাস্তিক ছিলেন না। রাত্রিতে শয্যা-গ্রহণের পূর্বে তিনি নিভৃতে ভগবানের উপাসনা করিতেন এবং পরলোকগত পুত্র, স্ত্রী ও স্বীয় আত্মার সদ্গতির জন্য ব্যাকুল-ভাবে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতেন। প্রভাতে শয্যাত্যাগের সময়ও অনুরূপ উপাসনা চলিত।

কাজ করাকেই তিনি ভগবানের উপাসনা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

নৈতিক চরিত্র

তিনি যেমন শারীরিক বলে বলবান্ ছিলেন, তাঁহার নৈতিক চরিত্র-বলও ছিল ঠিক তেমনই অসাধারণ। মিথ্যা, শঠতা, প্রতারণা প্রভৃতিকে তিনি আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। সময়ের সদ্ব্যবহার, মিতাচার, সন্তোষ, দরিদ্রের প্রতি দয়া, সত্যনিষ্ঠা, শ্রমশীলতা প্রভৃতি সদ্গুণে তাঁহার নৈতিক জীবন অলঙ্কৃত ছিল। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন। ভীতি বা কাপুরুষতা তাঁহার চরিত্রে স্থান পায় নাই।

উপাধির তালিকা

বিলাতে পাঠ্যাবস্থা হইতে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত তিনি যে সমস্ত উপাধি দ্বারা ভূষিত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

এল্ এস এ (এবার্ডিন)—১৮৭০ খৃষ্টাব্দ
এম্ আর সি এস—১৮৭০খৃষ্টাব্দ
এম ডি (এবার্ডিন)—১৮৭১ খৃষ্টাব্দ
এ এস্—৩০শে মার্চ, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ
সার্জন—১লা জুলাই, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ
সার্জন-মেজর—৩রা মার্চ, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ
সার্জন লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল—৩০শে মার্চ, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ
বি এস্ লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল—১লা এপ্রিল, ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ

এই বৎসরই তাঁহার সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণের কাল।

মহাপ্রয়াণ

১৯২৪ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে তাঁহার শরীর ক্রমশ দুর্বল হইতে থাকে। বহু ডাক্তার সমাগত হইয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করত ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিল। কিন্তু তিনি স্মিতহাস্যে বলিলেন—"আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। এবার ভগবানের চরণে আশ্রয় পাবার জন্য প্রস্তুত হ'ব।"

চিকিৎসায় কোনরূপ ফল দেখা গেল না। তিনি ধীরে ধীরে আরও দুর্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ১৯২৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল ভোর রাত্রিতে তাঁহার নাড়ী ক্রমশ ক্ষীণ হইতে থাকে; কিন্তু অন্য কোনরূপ রোগ দেখা দেয় নাই। অবশেষে রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই পৌত্র রঙ্গুলাল দত্তের হাতে হাত রাখিয়া ৮০ বৎসর বয়সে কর্মবীর রসিকলাল ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

স্বর্গীয় অমৃতলাল দে

অমৃতলাল দে

বংশ-পরিচয়

ইণ্ডিয়ান রয়্যাল ক্রনিক্‌ল্‌ পত্রিকার সম্পাদক অমৃতলাল দে মহাশয়ের পূর্বপুরুষগণের নিবাস চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত শুকচর গ্রামে। বহুকাল হইতে শুকচর চিনির ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ। অমৃতলালের পূর্বপুরুষগণ শুকচরে চিনি ও গুড়ের কারবার করিতেন। এই কারবারে তাঁহারা বহু অর্থসঞ্চয় করেন।

অমৃতলালের উর্ধ্বতন অষ্টম পুরুষ পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া যায়। নিম্নে পর্যায়ক্রমে তাঁহাদের নাম প্রদত্ত হইল ঃ—

তিলকচাঁদ অমৃতলালের প্রপিতামহ। ইনিই শেষ শুকচরবাসী। তিলকচাঁদের সময়ে শুকচরে প্রায়ই ডাকাতি হইত। একবার কালীপূজার রাত্রিতে ইঁহাদের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। এই ডাকাতিতে তাঁহাদের বহু অর্থ অপহৃত হওয়ায় ব্যবসা অচল হইয়া পড়ে।

তিলকচাঁদের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ গোরাচাঁদ ও কনিষ্ঠ রাজকিশোর। গোরাচাঁদ অমৃতলালের পিতামহ। স্থানীয় ব্যবসা অচল হইয়া পড়ায় পিতার মৃত্যুর পর গোরাচাঁদ ভাগ্যোন্নতি ও ব্যবসার জন্য আনুমানিক ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আগমন করেন।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অন্তর্গত রাধাবাজারে গোরাচাঁদ "দে এণ্ড কোম্পানী" নামক একটি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করেন। পুস্তক-প্রকাশ, পুস্তক-বিক্রয় ও সাধারণ সওদাগরী কারবার লইয়া ইঁহারা ব্যাপৃত

থাকিতেন। ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় রাধাবাজার হইতে লালদিঘীর ধারে ড্যালহাউসি স্কোয়ারে গোরাচাঁদ এই কারবার উঠাইয়া লইয়া যান। এখন যেখানে স্মিথ ষ্ট্যানষ্ট্রীট কোম্পানির ঔষধের দোকান অবস্থিত, ঠিক তারই পাশে ১০ নং ড্যালহাউসি স্কোয়ার ইষ্টে "দে এণ্ড কোম্পানির" দোকান পরিবর্তিত হয়। তখন এই বাড়ীটি একতলা ছিল। এখন ইহা একটি চারিতলা বড় বাড়ীতে পরিণত হইয়াছে এবং এই বাড়ীতেই ওয়েষ্ট এণ্ড ওয়াচ কোম্পানির আপিস প্রতিষ্ঠিত ছিল। গোরাচাঁদ এই কারবারের যাবতীয় কার্য পরিদর্শন করিতেন।

গোরাচাঁদের কনিষ্ঠ সহোদর রাজকিশোর কলিকাতা কাষ্টমস্ হাউসের একজন উর্দ্ধতন কর্মচারী ছিলেন। ইহারা তুই সহোদরে তখন আহিরী-টোলায় বাস করিতেন। ৬৯নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীটে তাঁহাদের বাড়ী ছিল। এই বাড়ী গোরাচাঁদ দে মহাশয় ক্রয় করেন। আহিরীটোলায় রাজকিশোর দে মহাশয়ের নামে এখনও একটি রাস্তা—রাজকিশোর দে লেন— বর্তমান আছে।

গোরাচাঁদের তুই পুত্র ও নয় কন্যা। জোড়াবাগানের গৌর লাহা ষ্ট্রীট নিবাসী প্রসিদ্ধ উকীল রমানাথ লাহা মহাশয় গোরাচাঁদের জ্যেষ্ঠ জামাতা। রাধাবাজারের সুপ্রসিদ্ধ "চন্দ্র ব্রাদার্সের" প্রতিষ্ঠাতা ও মালিক নীলমাধব চন্দ্র মহাশয় গোরাচাঁদের দ্বিতীয় কন্যাকে বিবাহ করেন।

গোরাচাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধানাথ ও কনিষ্ঠ নৃত্যলাল। রাধানাথই অমৃতলালের পিতা। কনিষ্ঠ নৃত্যলালের বয়স যখন ৬।৭ বৎসর, তখন গোরাচাঁদের মৃত্যু হয়। রাধানাথ কনিষ্ঠ নৃত্যলালকে প্রতিপালন করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নৃত্যলাল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত "দে এণ্ড কোম্পানির" কার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে কোন কারণবশত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধানাথের সহিত নৃত্যলালের মনান্তর ঘটে, সে সময়ে "দে এণ্ড কোম্পানির" অবস্থা খুব ভাল। যৌথ কারবার হইতে পৃথক্ হইয়া নৃত্যলাল স্বতন্ত্রভাবে স্বীয় নামে স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের নাম হইল "নৃত্যলাল দে এণ্ড কোম্পানি" এবং এই প্রতিষ্ঠান হইতে তিনি অর্ডার সাপ্লায়ের কাজ করিতে লাগিলেন।

রাধানাথ গৌরলাহা ষ্ট্রীট নিবাসী স্বরূপচন্দ্র সেনের কন্যাকে বিবাহ করেন। অমৃতলাল, হরলাল, শ্যামলাল ও কানাইলাল নামে তাঁহার চারি পুত্র হয়।

জন্ম ও বাল্যজীবন

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী (২৮শে মাঘ, ১২৫২ সাল) সোমবার, শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন অমৃতলাল জন্মগ্রহণ করেন।

অমৃতলালের পিতা একজন শিক্ষিত, ধনবান্ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। ব্যবসায়ী হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি লাভও করেন। পুত্র অমৃতলাল যাহাতে উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া সুচারুভাবে ও সুশৃঙ্খলে তাঁহার চালিত ব্যবসা চালাইতে সক্ষম হয়, তাহার জন্য তিনি তাঁহার উচ্চ শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন।

অমৃতলাল হিন্দু স্কুলে ভর্তি হন। তিনি একজন মেধাবী ও পাঠানুরাগী ছাত্র ছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর তাঁহার ছাত্রজীবন সম্বন্ধে Indian Royal Chronicle পত্রিকায় যাহা বাহির হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"In his school-life he was very keen, always assiduous in his study and diligent to a remarkable degree. His memory was wonderfully retentive. By committing the whole of Lennie's English grammar to memory, he earned the *sobriquet* of Grammar, which was his sole appellation among his classmates in his College, and frequently he was called to upper classes to rectify the mistakes of students belonging to them, and the teachers using his knowledge and diligence to shame his seniors. His earnestness and winning manners also made him a favourite pupil with the teachers."*

প্রতিদিন স্কুলের ছুটীর পর অমৃতলাল দোকানে যাইতেন এবং অপরাহ্ণ হইতে রাত্রি আট ঘটিকা পর্যন্ত নানা বিষয়ের ইংরেজী পুস্তক ও

* Vol. XXIV, Nos. 3 & 4, February 1911, p. 21

পত্রিকা পাঠ করিতেন। স্কুলের ছাত্রজীবন হইতেই, ভাল করিয়া ইংরেজী শিখিবার, ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিবার ও বক্তৃতা করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হয়। পিতার পুস্তকের কারবার তাঁহার এই ইচ্ছা পূরণের বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল।

পিতার সুশিক্ষা ও সদুপদেশ, সদ্‌গ্রন্থ পাঠের ফল ও নিজের উচ্চ মনোবৃত্তির দ্বারা অমৃতলাল ছাত্রাবস্থা হইতেই স্বীয় চরিত্রগঠনে সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে Indian Royal Chronicle বলিতেছেন :—

"From this stage of his life he tried hard to form his character. For this purpose he used an ingenious method; he made out a list of hourly routine, and at the expiration of each hour checked it.........minutely regulating the ordinary course of his life. In this way he endeavoured to perfect his character and show others an example to follow."*

এনট্র্যান্স পাসের পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। কলেজে পাঠকালে দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণি গণেশচন্দ্র চন্দ্র ও নিমাইচন্দ্র বসু, উপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রথিতনামা ব্যবহারজীবী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাইকপাড়া রাজ-পরিবারের কুমার শিরিশচন্দ্র সিংহ বাহাদুর তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন।

পাঠ্যাবস্থায় সমিতি স্থাপন

কলেজে পাঠকালীন, আঠার বৎসর বয়সের সময় তিনি তাঁহার সহপাঠী ও অন্যতম সুহৃদ্‌ উপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সাহায্যে কলেজের ছাত্রদের লইয়া Young Men's Literary Association স্থাপন করিলেন। এই সভায় তিনি ইংরেজীতে বহু প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রকৃতপক্ষে এই সময় হইতেই তাঁহার ইংরেজী-রচনাশক্তি ও বক্তৃতা দিবার ক্ষমতা স্ফূর্তিলাভ করে।

কলেজের বাহিরেও অধ্যবসায়, চেষ্টা ও প্রতিভার সাহায্যে অমৃতলাল বহু কাজে আত্মনিয়োগ করিতে লাগিলেন। কলিকাতার উত্তর অঞ্চলে সে

Vol. XXIV, Nos. 3 & 4, pp. 21 & 22.

সময়ে সাহিত্যালোচনার জন্য কোন বিশিষ্ট সভা ছিল না। প্রাণে প্রাণে এই অভাব উপলব্ধি করিয়া অমৃতলাল Calcutta Conversazione নামক একটি সভা স্থাপন করেন। এখানে নীতি, সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা ও প্রবন্ধাদি পঠিত হইত। এই সভাকে কেন্দ্র করিয়া বহু সামাজিক সম্মিলনের অনুষ্ঠান চলিত এবং সেই উপলক্ষে সহরের বহু শিক্ষিত নবীন ও প্রবীণ ব্যক্তিবর্গের সমাগম হইত। বহু লোক এই সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইলেন। অমৃতলাল নিজে এই সভার স্থাপনকর্তা ও অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। সভার বড় বড় অনুষ্ঠানসমূহ কলিকাতার টাউন হলে, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ও সাধারণ স্থানে হইত। ইহাতে তাঁহার নাম চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং সংবাদপত্রের সম্পাদক, বহু দেশীয় ও বিদেশীয় ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। এই সময়ে তিনি কলিকাতার ড্যালহাউসি ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্য মনোনীত হন।

Calcutta Conversazione-এর কার্যালয় তাঁহার গৃহে অবস্থিত ছিল। ছোটখাট সভাগুলি এবং সাধারণ আলোচনাদি সেইখানেই হইত। এখানে অনেক ইংরেজী ও বাংলা সংবাদপত্র-সম্পাদক আলোচনায় যোগদান করিবার জন্য শুভাগমন করিতেন। সুবিখ্যাত পাদরী ও সাহিত্যসেবক রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একদিন এখানে আসিয়া অমৃতলালের বক্তৃতা শ্রবণ করেন এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। এই উপলক্ষে তাঁহার সহিত অমৃতলালের বিশেষ সৌহার্দ হয়।

বাগ্মী অমৃতলাল

অমৃতলাল সুবক্তা ছিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বরের মিষ্টতায় ও বলিবার সঙ্গীতে লোক আকৃষ্ট হইত। তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া সাধারণে কিরূপে তৃপ্তি-লাভ করিত, তাহা নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠে উপলব্ধি হইবে,—

"The unfailing urbanity and courtesy he displayed, and the keen intelligence of his conversation made such a

marked impression on all those who came into contact with him that *to meet him once was to remember him always.*"[১]

ইহার উদাহরণস্বরূপ Indian Royal Chronicle পত্রিকায় যে বিশিষ্ট ঘটনাটির উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা এই—একবার Indian Daily News পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়া একটি *Conversazione* এ আগমন করেন; সন্ধ্যার সময় সভা আরম্ভ হইয়াছে, সভাগৃহ লোকে লোকারণ্য, তিলধারণের স্থান নাই, সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ অমৃতলালের বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন। বক্তৃতা সমাপ্তির পর সভাভঙ্গ হইয়া গেল, সকলেই সভা ত্যাগ করিলেন, কিন্তু Indian Daily News পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় অমৃতলালকে লইয়া সেইখানেই তাঁহার ইতিপূর্বে-প্রদত্ত বক্তৃতার আলোচনায় ব্যাপৃত হইলেন। আলোচনায় উভয়ে এরূপ তন্ময় ও নিমগ্ন যে, রাত্রি অধিক হইতে থাকিলেও, সেদিকে তাঁহাদের উভয়ের কাহারও কোন প্রকার লক্ষ্য নাই। পরদিন প্রভাতে যখন আপিষে যাওয়ার ডাক পড়িল, তখন সম্পাদক মহাশয়ের স্মরণ হইল যে, রাত্রি শেষ হইয়া গিয়াছে।[২]

অমৃতলাল যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েন, তখন তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁহার সেই বক্তৃতার সমালোচনা পাঠ করিয়া অমৃতলালের এক শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপক ক্লাসে অন্যান্য কথার পর ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন—

"Here in this class we have some orators like Cicero and Demosthenes, whose praise is sounded by the public press, and who are learned enough to teach me."[৩]

ষ্টেট্স্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী পরলোকগত Robert Knightএর সহিত কার্য-ব্যপদেশে অমৃতলালের পরিচয় হয়; তিনি অমৃতলালের সহিত আলাপে এবং তাঁহার গুণরাশি-দর্শনে মুগ্ধ হন। অমৃতলাল প্রায়ই নাইট সাহেবের সহিত দেখা করিতে যাইতেন এবং

১ Indian Royal Chronicle, vol. XXIV, February 1911, p. 22.

২ Ibid., p. 22.

৩ Ibid., vol. XXIII, February 1911, p. 22.

নাইট সাহেবও নানা সাময়িক বিষয় লইয়া অমৃতলালের সহিত সময়ে সময়ে আলোচনা করিতেন।

ভারতের সমস্ত অভিজাত-সম্প্রদায়ের সামাজিক ও অন্যান্য অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য অমৃতলাল ইং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে The Royal Society of India নামক একটি সমিতি স্থাপন করেন। দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যাহাতে তাঁহাদের সুখদুঃখ অভাব-অসুবিধা প্রভৃতি লইয়া পরস্পরের সহিত আলোচনা এবং ভাবের আদান-প্রদান করিবার সুযোগ পান, এই সমিতি স্থাপন দ্বারা অমৃতলাল তাহারই ব্যবস্থা করেন। কিছুকাল পরে তিনি তাঁহার পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত Calcutta Conversazioneটিকেও এই সমিতির সহিত সংযুক্ত করিয়া দেন।

ব্যবসা-ক্ষেত্রে অমৃতলাল

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, যখন অমৃতলালের বয়স মাত্র ২২ বৎসর, তখন তিনি পিতার ব্যবসায় যোগদান করেন। তাঁহারই চেষ্টা ও যত্নের ফলে দেশীয় সামন্তরাজগণের মধ্যে অনেকে এই ব্যবসায়ের পৃষ্ঠপোষক হন। এই সময় হইতে ব্যবসায়ের উন্নতিমূলক নানা প্রকার নূতন নূতন চিন্তা তাঁহার মনে উদিত হইতে থাকে। কিসে ব্যবসা বিস্তৃত হইবে, ব্যবসায় উন্নতির মূল কোথায়, কোন্ কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে অর্থ লাভের সহিত ব্যবসায় সুনাম অর্জন করা যাইতে পারে, এই সমস্ত বিষয় লইয়া তিনি মাথা ঘামাইতে লাগিলেন। অধ্যবসায় ও উপযুক্ত পরিশ্রমের ফলে তিনি এ বিষয়ে ক্রমশ নিপুণতা লাভ করেন। তাঁহার উর্বর মস্তিষ্কের নবোদ্ভাবিনী শক্তি ব্যবসা-ক্ষেত্রে তাঁহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল। সততার ও সতর্কতার সহিত ব্যবসা পরিচালনা করিয়া তিনি বহু অর্থ উপার্জন করেন।

ব্যবসায়ে যোগদান করিয়া অমৃতলাল কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনায় ব্যাপৃত হন। পুস্তক কয়খানির বিক্রয়াধিক্য তাঁহার ভবিষ্য উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দেয়। পুস্তক-প্রচার কার্যের সুবিধার জন্য তিনি London Printing Works নামে একটি ছাপাখানা স্থাপন

করেন। কয়েক বৎসর পরে এই ছাপাখানার নাম Calcutta Printing Company রাখা হয় এবং ৭১নং বেন্টিক ষ্ট্রীটে ইহার কার্যালয় স্থাপিত হয়।

সংবাদপত্র সম্পাদন

অমৃতলাল কয়েকখানি ইংরেজী সংবাদপত্র সম্পাদন ও প্রকাশ করেন। তাঁহার সম্পাদকতায় সর্বপ্রথম ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে Calcutta Price Current প্রকাশিত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে তিনি News of the World প্রকাশ করেন। ইহা সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হইত এবং তিনিই ইহার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রে সংক্ষেপে পৃথিবীর বহু সংবাদ বাহির হইত। সে সময়ে পত্রিকাখানি সাধারণের নিকট আদৃত হইয়াছিল। ১৮৮৩-১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন কলিকাতায় International Exhibition হয়, তখন তিনি Exhibition Gazette নামক পত্রিকা বাহির করেন। ইহাতে তিনি প্রদর্শনী সম্বন্ধীয় বহু বিষয়ের আলোচনা করিতেন এবং প্রদর্শনীর সকল জিনিষের বিস্তৃত বিবরণ ইহাতে প্রকাশিত হইত। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতলাল The Indian Royal Chronicle পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্র ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ইহার সম্পাদক ও প্রকাশক—উভয়ই তিনি। ভারতের অভিজাত সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগ, তাঁহাদের ইতিহাস ও বিবরণ প্রভৃতি বহুল পরিমাণে এই পত্রিকায় চিত্র সহ প্রকাশিত হইত। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এ দেশীয় সৈন্যদিগের সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য Military Standard পত্রিকা বাহির করেন। ইহাও সাপ্তাহিক আকারে বাহির হইত। ভারতের তাৎকালীন সমর-সেনাপতি (Commander-in-Chief) ইহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

পুস্তক-রচনা

তাঁহার সাহিত্য-জীবন কেবল পত্রিকা-সম্পাদনেই পর্যবসিত হয় নাই। তিনি নানা বিষয়ে ইংরেজীতে পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কেবল সুবক্তা বলিয়া নয়, সুলেখকরূপেও তিনি সাধারণের নিকট আদৃত হন। তাঁহার

সাহিত্য-জীবন সম্বন্ধে Indian Royal Chronicle বলেন—"His social, moral and religious convictions and speculations found utterance in works on a variety of subjects, which at all events showed the author's intrepidity and profound learning." তাঁহার স্থাপিত পুস্তকালয় Lewis & Co. হইতে সর্বসমেত প্রায় ৭০।৭৫ খানি পুস্তক প্রকাশের সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে কতক তাঁহার নিজের রচিত এবং কতক তাঁহার সম্পাদিত।

তিনি ইংরেজী পদ্যে একখানি গ্রন্থ ও একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি Royal Jubilee in India; মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব উপলক্ষে ইহা রচিত হয়। দেশীয় রাজগণ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ জুবিলী উপলক্ষে যে সব উৎসবাদির আয়োজন করেন, এই গ্রন্থে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁহার পদ্যে রচিত পুস্তিকার নাম—The Calcutta Police Court. ইহা ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানির বিবরণের কতকটা আভাস ইহার নিম্নোদ্ধৃত প্রচ্ছদ-পত্র হইতে পাওয়া যায়—

"A Serio-Comic Poem,
Containing
Sketches of Magisterial decisions
humourously illustrated,
Reporter's life in Court,
Attorneys' and Pleaders' whims of Law
et hoc genus omne"

সে যুগের পুলিশ কোর্টের বেশ রসাত্মক বর্ণনা এই ছোট কবিতা-পুস্তিকার ভিতর লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

অমৃতলালের জনহিতকর অনুষ্ঠান

অমৃতলাল শিক্ষা বিস্তারের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি অসমর্থ ও দরিদ্র শিক্ষার্থিগণের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

পরের দুঃখে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইত। অভাবগ্রস্ত প্রার্থীকে তিনি সাধ্যমত সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেন। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বে তিনি

অন্ধ, অনাথ, বিধবা ও অন্যান্য অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সাহায্যের জন্য Amrita Charitable Fund স্থাপন করেন।

শেষ জীবন

অমৃতলালের আধ্যাত্মিক জীবনও উন্নত ছিল। তিনি মাঝে মাঝে পরলোকতত্ত্ব ও যোগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। শাস্ত্রানুশীলন ও শাস্ত্রাধ্যয়নে তাঁহার আগ্রহ পরিলক্ষিত হইত। সাধু বা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকে নিকটে পাইলে তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে উপদেশাদি গ্রহণ করিতেন। জীবনের শেষভাগে তিনি যেন কিসের অনুসন্ধানে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বদিনের একটি উক্তিতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। হঠাৎ একটিবার মাত্র চীৎকার করিয়া তিনি বলিয়া উঠেন—"I have got it. I shall now die contented." এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া Indian Royal Chronicle বলেন—"Up to the very end he retained his consciousness, always meditating on the Omnipotent, and the smiling feature of his countenance showed that, as a result of his practice in Yoga, he was in communion with the Infinity and inwardly got something that preserved his coolness, cheerfulness and smiling attitude."

তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল, মনের বল এবং উৎসাহও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। ৪।৫ দিন অসুখে ভুগিয়া, তিনি ৬৬ বৎসর বয়সে, ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বেলা ২ ঘটিকার সময় দেহত্যাগ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর প্রায় ১৮ বৎসর পরে, ১৩৩৪ সালের ১লা মাঘ ভোর ৪ ঘটিকার সময়, ৭৪ বৎসর বয়সে তাঁহার সহধর্মিণী পরলোকগমন করেন।

অমৃতলালের মৃত্যুতে সংবাদপত্রে শোকপ্রকাশ

তাঁহার পরলোকগমনের পর Indian Royal Chronicle পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হয় তাহাতে দেখা যায়—"His

charity was a perennial stream that was evidenced every day. The money value is small compared with the kindliness with which the gifts were bestowed and the warm sympathy that promoted the gifts."

* * * *

"We know we are but voicing his own sentiment when we finish this brief notice with the hope that all that was lofty, pure and elevated in his ideals and actions may find many to emulate and follow amongst his beloved countrymen."

অমৃতলালের ইয়োরোপীয় বন্ধুগণ ও সংবাদপত্রসমূহও তাঁহার বিয়োগে শোক ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

অমৃতলালের পরলোকগমনের পর বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁহার সম্বন্ধে যে সমস্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য বাহির হয়, তাহাদের মধ্য হইতে নিম্নে কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল—

"*Death of a Bengali Author.*—The death is announced from pneumonia of Amrita Lal Dey, editor of the Indian Royal Chronicle, and a Bengali scholar. The deceased was the author of some Bengali books on Yoga, Astronomy and Physiology."

Statesman, 14th February, 1911.
(Calcutta and Suburbs, p. 5)

"The late Babu Omirtto Lal Dey, founder and editor of the 'Indian Royal Chronicle', of the weekly 'News of the World', and 'Military Standard' died on Tuesday last of pneumonia, aged 65. He was a clever and well-read man, a prolific writer, and one of old school of Bengali gentlemen whom it was a pleasure to know. He was the author of many books on Hindu Philosophy, Medicine and Astronomy. A friend and schoolmate of Babu Surendra Nath Banerjee, he lacked that popular leader's success as well as his way with the

young. He founded years back the Royal Society of India, an aristocratic association, which earned the approval of Lord Lytton and had subscribers in all parts of the land. A profoundly religious man, he was the pink of courtesy, and will be much missed by his friends..........."

—অর্থাৎ "ইণ্ডিয়ান রয়্যাল ক্রনিক্‌ল্', 'নিউজ অফ দি ওয়ার্লড' নামক সাপ্তাহিক পত্র ও 'মিলিটারী ষ্টাণ্ডার্ড' পত্রিকানিচয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক অমৃতলাল দে মহাশয় ৬৫ বৎসর বয়সে গত মঙ্গলবার নিউমোনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি সুধী, বিদ্বান্ ও বহু গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তাঁহার চালচলন পুরাতন ধরণের ছিল এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিলে আনন্দ পাওয়া যাইত। তিনি হিন্দু জ্যোতিষ, চিকিৎসা-শাস্ত্র ও দর্শনমূলক বহু গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন। তিনি বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বন্ধু ও সহপাঠী ছিলেন কিন্তু তাঁহার ন্যায় জনপ্রিয় নেতা হইতে পারেন নাই কিম্বা যুবকদিগের সহিত মেলামেশা করিতে সমর্থ হন নাই। বহু বৎসর আগে তিনি 'রয়্যাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া' নামক অভিজাত-সম্প্রদায়ের একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি লর্ড লিটনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এবং ভারতের সকল প্রদেশের লোকই ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়। তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রবণ এবং সৌজন্যের প্রতিরূপ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার বন্ধুবর্গ বিশেষভাবে অভাব উপলব্ধি করিবেন।"

ইণ্ডিয়ান্ রয়্যাল ক্রনিক্‌ল্

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে অমৃতলাল দে মহাশয় ইংরেজী Indian Royal Chronicle নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকাখানি তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইত। পত্রিকাখানির প্রত্যেক সংখ্যার মলাটে ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় স্থানে লিখিত আছে—"The only Representative paper specially devoted to the Interest and Welfare of the Ruling Chiefs, Princes, Maharajas, Rajas, Nawabs, Zemindars and

সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক ইণ্ডিয়ান রয়্যাল ক্রনিকলএর নমুনা

the Gentry of India and which contains Records of their Doings etc."

প্রতি সংখ্যায় সাধারণত ১৬ হইতে ২০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লিখিত বিষয় স্থান পাইত। পত্রিকাখানির ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর ছিল। মূল্যবান আর্ট পেপারে ইহা ছাপা হইত এবং ইহাতে বহু ছোট বড় ছবি থাকিত। ১৮৮৮ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত, ২৫ বৎসর কাল ইহা পরিচালিত হইয়াছিল। ইহার বার্ষিক মূল্য ছিল পঁচিশ টাকা।

এই পত্রিকায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ স্থান পাইত—

1. The Summary and Substance of Papers ;
2. All the latest and up-to-date news and information regarding the Indian Nobility, Gentry and High Government Officials ;
3. Illustrated Accounts of Installations, Darbars, Wedding Ceremonies, State Functions, Banquets, Parties, Shikars, and Sports ;
4. Indian Antiquities and Entertaining Tales ;
5. Details of Important Law Suits; and
6. Important News of the World.

এই সকল বিষয় থাকিত বলিয়াই দেশের রাজন্যবর্গ ও অভিজাত সম্প্রদায় পত্রিকাখানির গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকবর্গের বিরাট্ তালিকার মধ্য হইতে কতকগুলি নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাণী
ইন্দোরের মহারাজা (হোলকার)
ধাতিয়ার মহারাজা
ঝিন্দের মহারাজা
কুচবিহারের মহারাজা
সাপুরার রাজাধিরাজ

জব্বলের রাণা
খয়রাগড় ষ্টেটের করদ রাজা
ঢেঙ্কানল ,, ,,
বামড়ার ,, ,,
রায়গড়ের ,, ,,
সোনপুরের ,, ,,
নদীয়ার মহারাজা
দ্বারভাঙ্গার মহারাজা

নিজের পাণ্ডিত্য, অধ্যবসায়, চেষ্টা ও যত্নে অমৃত বাবু পত্রিকাখানি সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর চালাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অমৃত বাবু নিজে একজন সুবক্তা ও সুলেখক ছিলেন। তাঁহার লেখার গুণে বক্তব্য বিষয়-সমূহ সহজে সাধারণের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিত। তারপর তিনি জানিতেন, কি ভাবে পরিচালনা করিলে পত্রিকাখানি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হইবে।

পঁচিশ বৎসরের পত্রিকার মধ্যে কত রাজপরিবারের, কত জমিদার ও নবাব-বাদসার, কত সর্দার ও উচ্চ রাজকর্মচারীর চিত্র, জীবনী ও কীর্তিকলাপ বাহির হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

প্রতি সংখ্যার পত্রিকায় প্রথমে সাময়িক কোন বিশিষ্ট ঘটনা বা দুই একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত স্থান পাইত। পরে পর্যায় ক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের সংবাদ ও আলোচনা প্রদত্ত হইত :—

1. Doings of the Aristocracy and Gentry of India ;
2. The Notables of the Indian Empire ;
3. General Notes of Importance ;
4. Latest Movements ;
5. Domestic Occurrences ;
6. H. E. The Viceroy and the high officials.

কখনও কখনও ক্রীড়া ও আমোদ-প্রমোদ সম্বন্ধেও ইহাতে লেখা হইত।

সুবর্ণবণিক্-কুলগৌরব রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের পরিবারবর্গ ও তাঁহাদের প্রাসাদে সংগৃহীত বহুমূল্য চিত্র, প্রস্তর ও ধাতুমূর্তি সম্বন্ধে এই পত্রিকায় ২৪শ বর্ষের পঞ্চদশ ও ষোড়শ সংখ্যায় (আগষ্ট, ১৯১১ খৃঃ) বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বাহির হইয়াছিল। তাহার মধ্য হইতে নিম্নে কতকাংশ উদ্ধৃত করা হইল—

"There are many in Calcutta and elsewhere, who have paid a visit to the palatial residence of the Mullicks at Chorebagan; but there are an infinitely greater number who have not, and in this connection we may say, with both safety and certainty, that with regard to the architectural beauty of the exterior, including the grounds and the unique and *recherché* works of Art to be found within the mansion, the 'Mullick House' has no equal in India. Extending over twelve acres of land, it is really an edifice of beauty and pleasing to the sight. Its magnificent marble halls, the material of which includes over 90 varieties of beautiful marbles brought from every part of the globe, are remarkable specimens of Oriental architecture. The grounds of this mansion are embellished with statues and aviaries of rare birds. The interior is decorated in a gorgeous and lavish style with ceilings richly and picturesquely gilded and decorated. The rich and multi-coloured chandeliers of prismatic glass add much to the beauty of the apartments. The floors are of mosaic marble and the walls of many of the chambers are of beautiful Italian marbles. A gallery of bronze and marble statues in the best style, classical, mythical and heraldic, adorn the corridors and recesses. In short, the whole collection of the works of Art is the result of the indefatigable care and research of the Mullicks. They have recently been carefully arranged, perfected and catalogued by Kumar Nogendra Mullick, who deserves the well-merited praise usually bestowed on him by ladies and gentlemen who visit his palatial

residence. Just to inform the reader, what he or she may expect from a visit to the æsthetic Palace of Art, situated in the midst of Calcutta's great traffic, the following succinct description will suffice:—

"On entering by the main gateway, the visitor sees on the compound of the north lawn a number of excellently executed marble statues and a beautiful marble Fountain over which four figures represent the four seasons, *viz.* Spring, Summer, Autumn and Winter. The next object that is encountered on the west lawn is a life-sized marble statue of Michael Angelo, then a magnificient statue of Venus at the Bath, and a large and full sized bronze figure of an English cow, presented to the Mullicks by Sir Elijah Impey, Chief Justice of the old Supreme Court. Then on the grand landing are statues of Discobolus, Minerva, Bacchus, Demosthenes, of Una on a lion and a Tiger in Arena, and many others, all in marble and bronze. A beautiful bust of Christ wearing the Crown of Thorns is to be seen in the north marble hall, on the ground floor, and also busts of Napoleon and Wellington. On the eastern side of this hall are statues of Mercury, Psyche and Venus with Cupid rising from the sea. Then a lovely marble bust of the Virgin Mary is to be seen among other groups of well-known and world-famed figures. Passing to the north-west chamber, the walls of which are of red marble with pillars of green Grecian marble, is an excellently executed colossal statue of Her late Majesty Victoria the Good—with whom the late Rajah was a favourite. This statue represents the queen in her Coronation robes. There is also here a lovely marble bust of Her late Majesty by Zunuri which received the gold medal at the Calcutta International Exhibition in 1884. The visitor will then come across in the courtyard four beautiful statues,

representing the four continents of the globe:— Asia with a Lion, Africa with a Camel, Europe with a Horse and America with a Crocodile. Another statue that is worth mentioning is of Apollo Belvedere, copied from the one in the Vatican Palace in Rome. Among the other best works of eminent sculptors are to be found the marble figures of Diana, Versailles, Venus of Canova, Galileo, Columbus, etc., etc. The bronze Equestrian figures of Charles Francois I, Jeanne-d' Arc, Napoleon, Queen Elizabeth, Charlemagne, Duke of Wellington etc., are remarkable specimens of works of Art.

"In the collection also is to be seen a very valuable ancient Dresden China Centre Piece, which was presented by Viscount Harding (the grand-father of the present Viceroy) when he was Governor-General to Raja Baidya Nath Roy of Cossipur, who was a relative of the late Raja Rajendra Mullick Bahadur. Raja Baidya Nath Roy, thinking the Mullick Palace the most fitting home for such a splendid and rare gift, had it placed there among its present beautiful surroundings.

"The art Gallery on the first floor contains a selection of the works of the most eminent masters of the past and present days. They embrace a wide range of subjects secured without regard to cost and are things of beauty and joy for as long as they shall last.

"Amongst them are representative works of the French, Italian and Flemish schools of Pre-Raphael and Renaissance days, as also examples by famous Chinese and Indian artists, and by an innumerable number of dead and forgotten artists of countries all over the world.

"Among the Biblical paintings that command great admiration are those of 'Christ flying to Egypt' by Giacomo

da Ponte called Ill Bassano Burgamese (Venetian 1510-1592); 'Descent from the Cross,' copied from the one by Rubens in the Antwerp Cathedral; Raphael's 'Madonna, Infant Christ and St. John;' Guido's 'The Martyrdom of St. Sebastian;' 'Marriage of St. Catherine' by Lorenzo de San Severeno, a painter of the Umbrian School, 15th century; 'Christ dead' by Titian of the 16th century; 'Lord's Supper' by Battista, from the original painting at Milan etc.

"The following historical subjects are worthy of note:—

Stuart's 'Battle of Trafalgar' and 'Spanish Armada;' 'Geslin's' 'King of Prussia causing the papers of Voltaire to be seized;' 'Her Majesty the Queen and Her Family' and 'The Royal Family in 1848,' showing King Edward VII, standing with Queen Victoria, copied from the paintings at Westminster Abbey; Lebrun Charles' 'Family of Darius at the feet of Alexander the Great;' 'Cleopatra and Asp' by Guido Reni, and many others.

"In the Mythical painting, the following attract attention:—'Apollo flaying Marsyas alive' by Rubens; Sir Joshua Reynold's 'Infant Hercules strangling the Serpent;' 'Orpheus and the origin of love' by Sir Charleus D'Oyly; Sebastiano Ricci's 'Venus and Cupid Asleep;' 'Marriage of St. Catherine' by Rubens, which was presented by Lord Northbrook to the Government School of Art, and afterwards came into the possession of the present owner; 'Cupid and Psyche;' 'Paul and Virginia;' Le Suir's 'Diana and Endymion;' Booth's 'Judgment of Paris;' 'Three Graces and Cupid;' 'Romeo and Juliet;' etc."

দানশীলতা ও দরিদ্র সেবার জন্য চোরবাগানের মল্লিক পরিবার প্রসিদ্ধ। প্রতিদিন জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে কত শত দরিদ্র ও অনাথ-আতুর ইঁহাদের গৃহে অন্ন পায়, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বজাতিগৌরব রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয় ও তাঁহার বংশধরগণের এই কীর্তি জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়া

রাখিবে। তাঁহাদের এই কীর্তির কথা উল্লেখ করিতে গিয়া Indian Royal Chronicle সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছেন ঃ—

"Kumar Nagendra Mullick has done a world of good,—nay, not only has done, but is still doing, and will continue to do to the poor of Calcutta, the poor of all castes and creeds who depend entirely on the daily ration doled out to them within the spacious grounds of the Palace in Chorebagan, and any morning hundreds of homeless beggars may be seen wending their way from all parts of this vast city to receive their daily allowance from the Mullicks;—Nearly one thousand being the average number of poor fed with cooked rice at the Chorebagan mansion every morning, without distinction of caste or creed, and besides this which is done in public, almost every charitable object is recognized and supported in some way, of which the general public know absolutely nothing,—such deeds being generally of a private nature and seldom chronicled."*

নিউজ অফ্ দি ওয়ার্লড্

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী বুধবার 'নিউজ অফ্ দি ওয়ার্লড' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অমৃতলালই এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। ইহা ইংরেজী ভাষায় সপ্তাহে একবার করিয়া বাহির হইত। পত্রিকাখানির আকার সুপার রয়েল কোয়ার্টার (১৪´×১০২´) এবং ইহার প্রতি সংখ্যা ২৪ পৃষ্ঠাব্যাপী ছিল। প্রত্যেক পৃষ্ঠা তিনটি কলমে বিভক্ত। পত্রিকাখানি ১২ নং বেন্টিক ষ্ট্রীট হইতে সিটি প্রেসে টমাস এস্ স্মিথ্ (Thomas S. Smith) কর্তৃক মুদ্রিত হইত। ৪নং ড্যালহাউসী স্কোয়ারে (পূর্ব দিক্) অমৃতবাবুদের Lewis & Co. নামে যে আফিস ছিল, সেই কোম্পানীই পত্রিকার প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর পক্ষে ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ছিল। পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ পত্রের কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

* The Indian Royal Chronicle, vol. XXIV, Nos. 15 & 16, p. 141.

"The Weekly News of the World
or
The Epitome of Journalism

Published on the morning of the despatch for Europe of the Overland Mail *via* Bombay and Brindisi."

ইহার নীচেই Southey লিখিত নিম্নের অংশ পত্রিকার মটো (আদর্শ) স্বরূপ উদ্ধৃত করা হইয়াছে—

"Be brief; for, it is with words as the sunbeams; the more they are condensed, the deeper they burn."

পত্রিকাখানির প্রত্যেক সংখ্যার নগদ মূল্য সহরে ।/০ পাঁচ আনা এবং মফস্বলে ।৵০ ছয় আনা এবং ইহার বার্ষিক মূল্য সহরে ১২৲ বার টাকা ও মফস্বলে ১৪৲ চৌদ্দ টাকা নির্দিষ্ট ছিল।

প্রথম সংখ্যা পত্রিকায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থান পাইয়াছে—

১। Ourselves
২। Calcutta
৩। Local
৪। Sporting
৫। The Old (1880) and the New (1881) years.
(১৮৮০ খৃষ্টাব্দের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহের বিবরণ ও আলোচনা)
৬। Résumé of Indian Public Opinion.

ইহাতে Englishman, Indian Daily News, Statesman, Bangalore Spectator, Brahmo Public Opinion, Ceylon Times, Deccan Times প্রভৃতি পত্রে লিখিত নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের আলোচনা করা হইয়াছে—

(ক) Unsettled State of Ireland.
(খ) The Liability of the Husbands.
(গ) The Indian Medical Service.
(ঘ) The Famine Commission.
(ঙ) The Santhals.
(চ) The Takke-Turcomans and the Boers.

(ছ) Christmas.
(জ) Juvenile Offenders.
(ঝ) Ceylon Railway Extension.
(ঞ) The Harbour Plans.
(ট) Coffee Leaf-Disease.
(ঠ) Local Regiments in India.
(ড) The Land Agitation in Ireland.

৭। সংবাদনিচয়—

নিম্নলিখিত স্থানসমূহের (স্বদেশ ও বিদেশ) সংবাদ প্রথম সংখ্যায় বাহির হইয়াছে—মান্দ্রাজ, বাঙ্গালোর, বোম্বাই, পূর্ববঙ্গ, পাঞ্জাব, সিংহল, দার্জিলিং, পুণা, মহীশূর, পণ্ডিচারী, সাঁওতাল পরগণা, এলাহাবাদ, পেশওয়ার, আজমীর, সিমলা, কাবুল এবং রুমেনিয়া, চীন, মন্টিনিগ্রো, গ্রীস, তুরস্ক, প্রুসিয়া, ইটালী, অষ্ট্রেলিয়া, মিসর, ইংল্যণ্ড, আয়ারল্যণ্ড, আমেরিকা ও রুশিয়া।

৮। রাজপুতানা রেল-পথের উদ্বোধন

৯। তারের খবর (Telegrams)

১০। ব্যবসা-সম্বন্ধীয় সংবাদ (Commercial)

১১। সমুদ্রপথে গমনাগমন (Shipping)

১২। পারিবারিক (Domestic)

ইহার পরেই প্রায় পৌনে দুই পৃষ্ঠাব্যাপী নানা ব্যবসা-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিজ্ঞাপন।

প্রথম সংখ্যা পত্রিকার সম্পাদকীয় বিজ্ঞাপনীতে ইহার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত উক্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"It contains a mine of useful Information and News, compiled and selected from scores of Newspapers, from all parts of the World.

* * * *

"Subscribers and Readers of this paper will have the advantage of perusing the substance of scores of Newspapers

in a short space of time, in the same way as if they had actually subscribed to a number of journals."

কি উদ্দেশ্যে অমৃতবাবু News of the World প্রকাশ করিলেন, তাহা তাঁহার লিখিত "Ourselves" পাঠে বেশ বোঝা যায়। তাঁহার সেই "Ourselves" নিম্নে প্রকাশ করা গেল—

"Ourselves

"In the present age of journalistic enterprise, when the various cities, and towns, constituting the respective Presidencies of India, are so ably represented by newspapers, daily, bi-weekly, and weekly, it is a matter of no small difficulty to obtain for any new venture of this class, patronage sufficient to ensure for it any definite period of existence. Of late too, Calcutta has been the birthplace of many new organs, of various shades of opinion, some of which have already discovered how little room there really is for journals beyond those whose extensive circulation has for some time past been assured.

"Introducing to the public *The News of the World,* however, we do so, fully recognising the able manner in which the requirements of the general body of the community are met by our respected and worthy daily contemporaries. Yet, there are a class of newspaper readers to whom such journals are not only a luxury, but the claims upon whose time render it almost impossible for them to give them even a passing glance. It is to meet the wants of such as these, therefore, that we have determined to publish *The News of the World,* a journal which shall give them, once a week, the principal events, political, social and otherwise, which have taken place during the seven days previous to each publication. True, that in India, the various journals publish their weekly numbers, but these, as a rule, give intelligence chiefly concerning the Presidency in which they exist.

"*The News of the World,* will, on the contrary, contain intelligence from every part of the *World*. The subscription, therefore, these facts considered, cannot be regarded otherwise than as extremely trifling, and we venture to hope that the long-felt want of a cheap journal of this character will now have been fully met. In England, the journals most patronized by the middle and working classes, are those published weekly and hence the great demand which exists for them. *The News of the World* will contain a *résumé* of Indian public opinion, in other words, a summary of the opinions put forward by the various journals both in and out of India, upon events of principal importance, original editorials, in addition to a weekly summary of Indian news, the week's telegrams received from all parts of the world, etc.

"It would be presumptuous on our part to say more than we have here done, in introducing ourselves; we shall, therefore, remain content by leaving our readers to judge how far *The News of the World* is likely to supply the want of a cheap and interesting journal."

উপরি-উদ্ধৃত সম্পাদকীয় উক্তির সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য রক্ষার জন্য বর্ত্তমান সময়ে বহু সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা দেখা দিয়াছে। এমন সহর কমই আছে, যেখানে কোন না কোন পত্রিকা চলিতেছে না। ইহার মধ্যে কোনখানি মাসিক, কোনখানি সাপ্তাহিক, কোনখানি বা দৈনিক। এ সময়ে বর্ত্তমান পত্রিকার পক্ষে সাধারণের নিকট যথেষ্ট আদৃত ও প্রচারিত হওয়া কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

এই নবজাত পত্রিকা—নিউজ অফ্ দি ওয়ার্লড (দুনিয়ার বার্ত্তা)—জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলাম। আমাদের দেশের দৈনিক পত্রিকাগুলি যে যোগ্যতার সহিত পাঠকদের অভাব মিটাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি এই নূতন পত্রিকা প্রবর্ত্তনের হেতু এই

যে, এক শ্রেণীর পাঠকসম্প্রদায় রহিয়াছেন, যাঁহারা কর্মবাহুল্যবশত প্রাত্যহিক কাগজ পড়িয়া জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার অবসর পান না। আমরা ইঁহাদের জন্য জগতের প্রায় অধিকাংশ স্থানের প্রত্যেক সপ্তাহের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য প্রকার ঘটনাবলী প্রকাশ করিব। সত্য বটে, ভারতের প্রধান প্রধান সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি তাহাদের সাপ্তাহিক সংস্করণে বিভিন্ন প্রদেশ সম্পর্কে সকল খবর দিয়া থাকে, কিন্তু আমরা জগতের সকল স্থান হইতে সংবাদ আহরণ করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিব। ইংল্যণ্ডে এই ধরণের সাহিত্যের আদর মজুর ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব বেশী।

'নিউজ অফ দি ওয়ার্লড' বা 'তুনিয়ার বার্তায়,' ভারতের ও ভারতের বাহিরের পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত প্রধান প্রধান ঘটনার সংক্ষিপ্ত চুম্বক, মৌলিক সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও ভারতীয় সংবাদের সাপ্তাহিক হিসাব ইত্যাদি থাকিবে।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে অমৃতবাবুর মস্তিষ্কে এরূপ একখানি পত্রিকা প্রকাশের কল্পনা উদিত হইয়াছিল, ইহা তাঁহার চিন্তাশীলতা ও কৃতিত্বের পরিচায়ক। লোকের সময়ের অল্পতা ও আর্থিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি এই পত্রিকার দ্বারা স্বল্প মূল্যে জনসাধারণকে তুনিয়ার বার্তা জানাইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

প্রথম বর্ষের শেষ বা ৪৮ সংখ্যক পত্রিকা ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর সোমবার প্রকাশিত হয়। প্রথম বর্ষের ৪৮ সংখ্যা পত্রিকা সর্বসমেত ৯৮০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

"নিউজ অফ দি ওয়ালর্ড" পত্রের প্রথম বর্ষের প্রায় এক হাজার পৃষ্ঠার মধ্যে বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ, আলোচনা ও দেশবিদেশের অনেক জ্ঞাতব্য সংবাদ বাহির হইয়াছিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও আলোচনাসমূহের একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা গেল :—

1881		Page
5th January—	Famine Commission.	9
	Local Regiments in India.	10

ধর্মসভার বিবরণ

এই ধর্মসভার বিবরণের একটি বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

কলিকাতায় সম্প্রতি আমরা এক নূতন দৃশ্য দেখিলাম। সে দৃশ্য আর কিছুই নহে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটভবনে পণ্ডিতগণের এক বিরাট্ সভা। সভার উদ্দেশ্য কয়েকটি শাস্ত্রীয় সমস্যার মীমাংসা। সভায় ন্যূনাধিক পাঁচ শত লোক উপস্থিত ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে প্রায় তিন শত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। পণ্ডিতগণ মেঝেতে না বসিয়া সকলেই চেয়ারে উপবেশন করিয়াছিলেন। ... ... কলিকাতার হিন্দু-সমাজের শীর্ষস্থানীয় কতিপয় ব্যক্তি এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের হিন্দুগণের প্রধান প্রধান প্রতিনিধি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য—মান্যবর মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি আই ই, মহারাজ কমলকৃষ্ণ দেব, রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর, রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, সঙ্গীতাচার্য রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সি আই ই, রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক, চারুচন্দ্র মল্লিক, কাণপুরবাসী মুন্সী বঙ্কবিহারী বাজপেয়ী, কাণপুরবাসী মুন্সী জামনারায়ণ তেওয়ারী, রায়

বদ্রিদাস মুকিম বাহাদুর, শেঠ নহরমল, শেঠ হংসরাজ, লালা চূড়ামল প্রভৃতি। পণ্ডিতগণের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল— পণ্ডিত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন (নবদ্বীপ), পণ্ডিত সুব্রহ্ম শাস্ত্রী (বারাণসী), পণ্ডিত রামধন তর্কপঞ্চানন (যশোহর), পণ্ডিত শ্রীরাম শিরোমণি (বহরমপুর), পণ্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্ন (ভট্টপল্লী), পণ্ডিত তারকনাথ তর্করত্ন (বর্ধমান), পণ্ডিত গঙ্গাধর বিদ্যারত্ন (গুপ্তিপাড়া), পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি (কলিকাতা) এবং পণ্ডিত উমাকান্ত ন্যায়রত্ন (জনাই)।

দুঃখের বিষয়, দুইজন সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অসুস্থতার জন্য এই সভায় যোগ দিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহারা এই সভার উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মথুরানিবাসী শেঠ নারায়ণ দাসের উদ্যোগে এই সভা আহূত হইয়াছিল এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় সভার উদ্বোধন করিয়াছিলেন। সভা উদ্বোধন করিবার সময়ে, তিনি মুখবন্ধ-স্বরূপ এক বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, বেদের কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণের অভিমত অবগত হইবার জন্য এই সভা আহ্বান করা হইয়াছে। মান্দ্রাজের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাম সুব্রহ্মণ্য ওরফে রামসুম্বা শাস্ত্রী জানাইলেন যে, পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী বেদের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন তাহাতে দাক্ষিণাত্যের ও অন্যান্য স্থানের পণ্ডিতমণ্ডলী বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। সেইজন্য তিনি বঙ্গদেশের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের অভিমত গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন।

ধর্মসভায় প্রশ্নোত্তর

সভায় যে সকল প্রশ্নোত্তর হইয়াছিল, নিম্নে উহা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হইল—

প্রথম প্রশ্ন। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ বা বেদের মন্ত্রভাগ সংহিতাভাগের মত গ্রহণীয়, প্রামাণিক ও অখণ্ডনীয় কি না?

উত্তর। হাঁ, গ্রহণীয়, প্রামাণিক ও অখণ্ডনীয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন। বিষ্ণুপূজা, শিবপূজা, দুর্গাপূজা, শ্রাদ্ধক্রিয়া, জাতক্রিয়া, তীর্থদর্শন, শাস্ত্রানুমোদিত কি না?

উত্তর। হাঁ, শাস্ত্রানুমোদিত।

তৃতীয় প্রশ্ন। ঋগ্বেদ-সংহিতায় 'অগ্নিমীলে পুরোহিতম্' এর প্রতিপাদ্য দেবতা কে? অগ্নি, না ঈশ্বর?

উত্তর। অগ্নি।

চতুর্থ প্রশ্ন। যজ্ঞ করা হয় কেন? বায়ু ও জল বিশুদ্ধ করিবার জন্য অথবা স্বর্গলাভের জন্য?

উত্তর। স্বর্গলাভের জন্য।

সভায় সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষাতেই আলোচনা হইয়াছিল। প্রশ্নকর্তা পণ্ডিত রামসুব্বা শাস্ত্রী তাঁহার প্রশ্নসমূহ উপস্থিত করিয়া সংক্ষেপে সংস্কৃত ভাষায় উহাদের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন বাংলা ভাষায় বুঝাইয়া দেন। বঙ্গদেশের পণ্ডিতগণের প্রতিনিধি বা মুখপাত্রস্বরূপ পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রশ্নগুলির উত্তর দেন। উত্তর দিবার সময়ে তিনি নজীরও দেখাইয়া ছিলেন। তিনি বাংলা ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই তাঁহার বক্তব্য বিষয় বুঝাইয়া নেন।

পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের অক্লান্ত পরিশ্রমে সভার কার্য খুবই সফল হইয়াছিল। মথুরাবাসী শেঠ নারায়ণ দাস দেশের বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিতবর্গকে একত্র সমবেত করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।"

এই প্রসঙ্গে সম্পাদক মহাশয় হাটখোলার (কলিকাতা) মহাজনদিগের গদী হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৬ বৎসরের বিভিন্ন প্রকার চাউলের দরের তালিকা দিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য বিধায় উদ্ধৃত হইল—

চাউলের দর

	উৎকৃষ্ট বালাম প্রতিমণ	মোটা বালাম প্রতিমণ	খাড়ি প্রতিমণ	দেশী প্রতিমণ
১৮৬৫	২৷০	২৲	১৸০	×
১৮৬৬	৪॥০	৩৸৴০	×	×
১৮৬৭	৩৸০	৩৲	২৸৶০	×
১৮৬৮	২॥০	২৲	২৷০	×
১৮৬৯	২॥০	২৲	২৷০	×
১৮৭০	২৷০	১৸০	২৲	×
১৮৭১	২৲	১॥০	১৸০	×
১৮৭২	২৲	১॥০	১৸০	×
১৮৭৩	২৲	১॥০	১৸০	×
১৮৭৪	৩৸০	২॥০	২৸০	২॥৵০
১৮৭৫	৩৲	২৲	২৷০	২॥০
১৮৭৬	৩৷০	২৷০	২॥০	২৸০
১৮৭৭	৪॥০	৩৲	৩॥০	৩৸০
১৮৭৮	৪৷৴০	২৸০	×	৩৵১০
১৮৭৯	৩৴০	২॥৵১০	২॥৶১৫	২৸০
১৮৮০	২৷০	১৸৶০	১৸৶০	২৲

উপরিলিখিত তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে শিক্ষিত বাঙালী পরিচালিত ইংরেজী সংবাদপত্রে কিরূপ জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা হইত। এই সকল প্রবন্ধে যে চিন্তাশীলতা ও বিচারবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা তৎকালের পক্ষে খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার। এখনকার দিনে সংবাদপত্র পরিচালনার পদ্ধতি সুসংস্কৃত, সমুন্নত ও সুমার্জিত বটে, কিন্তু তখনকার দিনেও ইংরেজী সংবাদপত্র-পরিচালনে শিক্ষিত বাঙালী সম্পাদকের যোগ্যতা বড় সামান্য ছিল না। "নিউজ অফ্ দি ওয়ার্লডে" তখনকার যুগের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি এবং জগতের বহু অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় পরিপাটী-রূপেই আলোচিত হইত এবং সে আলোচনার পদ্ধতিও সুন্দর ছিল। 'ভারতের ভবিষ্যৎ,' 'তূলা ও তূলাজাত সামগ্রীর উপর শুল্ক', 'পার্লামেণ্টে ভারতীয় সমস্যা,' 'ভারতের পুরাতত্ত্ব', 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ভবনে ধর্মসভা,' 'দুর্ভিক্ষ কমিশন,' 'বঙ্গে শিক্ষা,' 'ট্রামওয়ে,' 'রেলওয়েতে ভারতবাসী,' 'ভারতের শাসনকার্যে ভারতবাসীর নিয়োগ,' মিউনি-সিপ্যালিটী,' 'মধ্য এসিয়ায় রুশ,' 'দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র আইন,' 'রাজ্যের অর্থ-সমস্যা,' 'রবার-শিল্প,' 'আবকারী-নীতি, 'সংবাদপত্রের ডাকমাশুল,' 'অহিফেন-ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন,' 'ইয়োরোপে দীর্ঘজীবন' প্রভৃতি প্রবন্ধ ও আলোচনা যে কিরূপ শিক্ষাপ্রদ ও জ্ঞাতব্য তথ্যপরিপূর্ণ, তাহা বোধ হয় বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া না বলিলেও চলে। সুতরাং ইংরেজী সংবাদপত্র পরিচালনে শিক্ষিত বাঙালীর কৃতিত্ব ও যোগ্যতা যে বহুকাল পূর্বেই সুপ্রকট হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৺হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৺কৃষ্ণদাস পাল, ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ৺শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায়, ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষী বাঙালী সম্পাদকগণের

ইংরেজী সংবাদপত্র সম্পাদনে ও প্রবন্ধ-রচনায় অসামান্য সাফল্যের বিষয় আজ দেশপ্রসিদ্ধ। কিন্তু "নিউজ অফ্ দি ওয়ার্লড"-সম্পাদক স্বর্গীয় অমৃতলাল দে মহাশয় ইংরেজী সংবাদপত্র-সম্পাদন ও ইংরেজী প্রবন্ধ-রচনায় যে শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাও আমরা গৌরবের সহিত স্মরণ করিতে পারি।

তালিকাভুক্ত প্রবন্ধসমূহের মধ্য হইতে নিম্নে কতকগুলির মর্মাভাস প্রদত্ত হইল।

ভারতে ও মার্কিণে কৃষি

প্রকাশ—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে চাষ করিবার উপযোগী জমির পরিমাণ ১০০ কোটি একর; তন্মধ্যে শতকরা ১১॥০ একর (এক একর প্রায় তিন বিঘা) জমি চাষ করা হইয়া থাকে। গত বৎসর ১০,৫৯,৮৩,৬০৫ একর জমি চাষ করা হইয়াছিল এবং সেই জমি হইতে ২৫৮,৬৪,৬১,৩২০ বুসেল (এক বুসেল ৯॥০ সেরের সমান) গম, ভুট্টা, জৈ, যব, শ্বেত সরিষা, বাক্‌হুইট্ (Buckwheat) ও আলু জন্মিয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ করিলে নয় গুণ ফসল লাভ করা যাইতে পারিত।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষের চাষের অবস্থা একবার দেখা যাউক। বৃটিশ ভারতে (অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যসমূহ বাদে) ৬০ কোটি একর চাষের উপযোগী জমি আছে। উহার অর্ধেকও যে চাষ হয়, ইহা আমরা মনে করি না। আবার কর্ষিত জমিও ভাল করিয়া চাষ হয় না। জমিতে ভাল করিয়া লাঙ্গল দেওয়া হয় না, জল সেচ হয় না ও ভাল সার দেওয়া হয় না বলিয়া জমিতে যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হওয়া উচিত, তাহার অর্ধেকও পাওয়া যায় না। সম্প্রতি সরকার নূতন কৃষি বিভাগ খুলিয়াছেন; আশা হইতেছে, অতঃপর চাষের অবস্থা ক্রমে ভাল হইবে।

ফ্রান্সের সহিত ইংল্যণ্ডের বাণিজ্য-সংক্রান্ত গোলযোগ

ফরাসী ও ইংরেজের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কে যে সন্ধি হইয়াছিল তাহার মিয়াদ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বরে শেষ হইবার কথা। কিন্তু ইংরেজের

সনির্বন্ধ অনুরোধেও ফরাসী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসেও এই সন্ধি পুনরায় নূতন করিয়া বলবৎ করিতে চেষ্টা করে নাই। এই সন্ধির একটা সর্ত ছিল এই যে, বিশেষ প্রয়োজন মনে করিলে এই সন্ধির মিয়াদ তিন মাস বাড়াইতে পারা যাইবে। মনে করুন, ১লা নভেম্বর পর্যন্ত দুই গবর্ণমেণ্টের মতের মিল হইল না। অথচ তখন আর মোটে ৭ দিন মাত্র বাকী। এই ৭ দিনে নূতন সন্ধি সম্বন্ধে সকল সর্ত স্থির হইয়া যাইতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে সন্ধির মিয়াদ তিন মাস না বাড়াইয়া উপায় নাই। কিন্তু দুই গবর্ণমেণ্টের যে মতের মিল হইবে এরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। সুতরাং ফরাসী সরকার সন্ধির মিয়াদ না বাড়াইলে আর নূতন করিয়া সন্ধি স্থাপন করা অসম্ভব হইবে।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন,—আমরা ত সন্ধি বজায় রাখিতে চাই; কিন্তু ইংল্যণ্ড এই সন্ধি অসঙ্গত কারণে স্থগিত রাখিয়াছেন। এই সম্বন্ধে আলোচনা দেখিয়া আশঙ্কা হয় যে, ৮ই নভেম্বর হইতে ফ্রান্সের অতিরিক্ত শুল্কের জন্য ফ্রান্সের হাটে ইংরেজের পণ্য অত্যন্ত দুর্মূল্য হইয়া উঠিবে এবং তাহার ফলে ইংরেজের মাল আর ফ্রান্সের হাটে বিকাইবে না। ইহাতে ইংল্যণ্ডের পণ্যশিল্প খুব ধাক্কা খাইবে বটে, কিন্তু সে জন্য ইংল্যণ্ডের উৎকণ্ঠিত হইবার কারণ নাই। কারণ, ইংল্যণ্ডে পণ্য-শিল্পের রপ্তানি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। পৃথিবীর বহু স্থানে ইংল্যণ্ডের শিল্পজাত সামগ্রী চালান হইতেছে। সুতরাং এখন ফ্রান্সের হাটে ইংরেজের পণ্য না বিকাইলে ইংরেজের ক্ষতির সম্ভাবনা বড় নাই। তবে ইয়োরোপের বাজারে ইংল্যণ্ডের পণ্যশিল্প যে বিশেষরূপে ঘা খাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ফ্রান্সের বাজার ত বন্ধ হইতেছে; জার্মাণী, স্পেন, রুশিয়া প্রভৃতি দেশেও ইংল্যণ্ডের শিল্পসামগ্রী বিকাইতেছে না। অবশ্য ইহাতে এই সকল দেশের ব্যবসায়ীদের আর্থিক ক্ষতি যথেষ্টই হইতেছে; কিন্তু সেদিকে তাহারা ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না। তাহারা এরূপ নিপুণতার সহিত শিল্পদ্রব্য তৈয়ারী করিতেছে যে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইংল্যণ্ডের এবং তাহার অধিকারভুক্ত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বাজারে ইংল্যণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিবে।

মার্কিণের শুল্কের হার অত্যধিক; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মার্কিণের

বাজারে ইংরেজের শিল্প-সামগ্রীর চাহিদা খুব এবং মার্কিণ ইংরেজের পণ্য কিনিয়াও থাকে অনেক বেশী। ইহার কারণ আর কিছু নয়, প্রয়োজন বুঝিলে মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট শুল্কের হার কিছুদিনের জন্য কমাইয়া দেয় এবং ইংল্যাণ্ডের মাল তখন সে দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হয়।

তারপর সেই প্রকার চাহিদা কমিয়া যায়, দরও কমে, তখন শুল্ক বাড়াইয়া ইংল্যাণ্ডের মাল আমদানি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। মার্কিণের এই শুল্কের উঠানামাতে উত্তর ইংল্যাণ্ড ও পশ্চিম স্কটল্যাণ্ডের শিল্পীদের অবস্থার ভালমন্দ সূচিত হইয়া থাকে। বাকি রহিল আফ্রিকা, তুরস্ক সাম্রাজ্য, চীন ও ভারতবর্ষ—এই গুলিই ইংরেজের প্রধান বাজার। কিন্তু এগুলির একটিও নিরাপদ্ বাজার বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না। কারণ, আফ্রিকা অজ্ঞাত দেশ; তুরস্ক সাম্রাজ্য একরূপ অরাজক বলিলেই চলে; চীনদেশ সকল দেশ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে চাহিতেছে; ভারতবর্ষের সংরক্ষণ-শুল্ক আংশিকভাবে উঠাইয়া দিলেও বিশেষ সুবিধা হইবে কি না সন্দেহ। বোম্বাই ও কলিকাতায় ম্যাঞ্চেষ্টারের যে সকল ব্যবসা-ঘাঁটি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের মালের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া জয়লাভ করাও সহজ নহে।

ফরাসীর সহিত তুলনায় ইংরেজের অসুবিধা সব দিকেই আছে। ফরাসীরা মনে করে—ইংরেজ বাণিজ্য-সংক্রান্ত সন্ধির জন্য লালায়িত। সন্ধিটা বজায় রাখিবার দায় যেন তাহাদের নয়, ইংরেজের। ইংরেজের কর এত অল্প যে, তাহা আর নামাইবার উপায় নাই। ইংরেজ বহুকাল যাবৎ এরূপ দৃঢ়তার সহিত অবাধ বাণিজ্য-নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে যে, ফরাসী নিশ্চিন্তভাবে ভাবিতে পারে—ইংরেজ প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যেও কখন শুল্ক বাড়াইবে না।

এখন প্রশ্ন এই যে, যদি আবার নূতন করিয়া সন্ধি না হয়, তবে কি করা যাইতে পারে? বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ত এইভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ক্ষতি সহ্য করিতে পারে না। আধুনিক অর্থনীতিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, অবাধ বাণিজ্যবিদের বন্ধু সর্বদেশেই বর্তমান আছে। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে এই বন্ধুরা ইংরেজের কোন উপকার করিতে সমর্থ হইতেছে

না। সুতরাং বর্তমান বাণিজ্য-প্রণালী পরিবর্তন করিবার সময় আসিয়াছে। ফ্রান্স প্রচুর পরিমাণে বিলাস-দ্রব্য উৎপাদন করিয়া থাকে। ফ্রান্সের রেশম-শিল্পে, মদ্য তৈয়ারীর কাজে, প্যারিসের বহু পণ্য নির্মাণের ব্যাপারে বিস্তর লোক খাটিয়া থাকে। ইহারা ও অন্যান্য ফরাসী-শিল্পীরা একরূপ অবাধ বাণিজ্য-নীতিরই পরিপোষক। ইহারা যদি একবার বুঝিতে পারে, ইংরেজের বাজার বন্ধ হইয়া যাইতেছে এবং তদ্দ্বারা ইহাদের আর্থিক ক্ষতি হইবে,—কারণ ফ্রান্সের এই সমস্ত পণ্যের চাহিদা ইংল্যাণ্ডেও খুব অধিক,—তাহা হইলে ফ্রান্সের টাকার বাজার ওলোট পালোট হইবে এবং শিল্পীদিগেব অর্থকষ্ট হইবে। শিল্পীরা ইহা ভালরূপই জানে।

ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যণ্ডের দায়িত্ব

ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের গচ্ছিত ধনের রক্ষকরূপে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ডের গুরুদায়িত্ব আছে। ব্যাঙ্ক যদি সেই দায়িত্ব রাখিতে না চায়, তাহা হইলে বহু পূর্বেই,—এক্ষণে যে ঘোর স্বর্ণাভাব ঘটিয়াছে তাহা ঘটিবার আগে,—জানাইলে ভাল হইত। ইংল্যাণ্ডের মত একটি দেশ—যে দেশে বিস্তর ব্যাঙ্ক রহিয়াছে সে দেশে—নগদ এক কোটি পাউণ্ড গচ্ছিত রাখা অর্থাৎ ক্যাশ রিজার্ভ ত কিছুই নয়। কারণ, দেনা মিটাইতে হইলেই যে উহার ৫০ গুণ লাগে। তবুও ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ড ছাড়া আর কোনও ব্যাঙ্ক প্রতিদিনকার চাহিদা মিটাইবার মত টাকা রাখিবার পরও এত বেশী টাকা রিজার্ভ রাখিতে পারে না। প্রত্যেক মাসে এবং প্রত্যেক তিন মাস অন্তর দেশের দেনা শোধের সময়ে ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ড হইতে লইয়াই সেই টাকা শোধ করা হয়। অবশ্য ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ডকে সাধারণের টাকা মিটাইয়া দেশের এই দেনার টাকা অতিরিক্ত দিতে হয়। ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ড এই টাকা দিতে পারে, তাহার একমাত্র কারণ, সেখানে বিস্তর না-খাটানো টাকা মজুত রাখা হয়। সকলের চেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, বিদেশীদেরও চাহিদা মিটাইতে হয় এই ব্যাঙ্ককে এবং যখন বিদেশীরা টাকা লয় তখন তাহারা স্বর্ণ মুদ্রাই লইয়া থাকে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত দেশের বা বিদেশের টাকা মিটাইবার পক্ষে খুব অল্প টাকাই ব্যাঙ্কে মজুত রাখিতে পারা যায়। এরূপ অবস্থা

ভাল নয়। ইহাতে ব্যাঙ্কের পতন হইতে পারে। ব্যাঙ্ক অফ্ ইংল্যাণ্ড যদি রিজার্ভ রক্ষা করিতে চায়, তাহা হইলে টাকার বাজারের উপরও যাহাতে উহা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত এবং কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় করিলে বা বন্ধক রাখিলে তাহা সম্ভব হইতে পারে।

সেভিংস ব্যাঙ্ক ও পোষ্ট অফিস আমানত

১৮৪০-১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দশ বৎসরের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে আমানত ২ কোটি আশী লক্ষ পাউণ্ড হইতে ৪ কোটি ৪ লক্ষ পাউণ্ডে উঠিয়াছে এবং পোষ্টাফিস ব্যাঙ্কসমূহে আমানত ১,৫০,০৯,০০০ পাউণ্ড হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গভর্ণমেণ্ট মোট ৫½ কোটি পাউণ্ডের উপর ধার পাইয়াছেন। এই টাকা দেশের ধনকুবেরগণ বা বড় বড় অর্থশালী মহাজনেরা দেন নাই, দিয়াছে দেশের বহুসংখ্যক দরিদ্র ব্যক্তি। ইংল্যাণ্ডের অনুকরণেই ভারতে এই প্রথার প্রবর্তন হইয়াছে। ইহার সুবিধা অনেক—যথা, জন সাধারণের টাকা লগ্নী করা থাকে বলিয়া দেশের শাসন-কার্যের দিকে সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি; কৃষক, শ্রমিক, শিল্পী প্রভৃতির ভিতর সঞ্চয়ের অভ্যাস জন্মে; খুব অল্প সুদে টাকা ধার পাইয়া সরকার বেশী সুদে সেই টাকা খাটাইতে পারেন। এই ব্যবস্থার ফলে বহু দরিদ্র ব্যক্তির টাকা সরকারে জমা থাকিতেছে বলিয়া শাসন-কার্যের প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা বাড়িয়া যাইবে। গভর্ণমেণ্টের হস্তে এইরূপে যে টাকা আসিয়া সঞ্চিত হইবে, তাহাতে দেশের নানা হিতকর কার্য হইতে পারিবে; যেমন—রাস্তাঘাট তৈয়ারী, খাল ইত্যাদি খনন, দরিদ্র কৃষকদিগকে সুদখোর মহাজনদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করা, শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সাধন ইত্যাদি। গভর্ণমেণ্টের সাফল্য নির্ভর করিতেছে, (১) জনসাধারণের হাতে নিজ নিজ খরচ মিটাইয়া যদি টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, (২) যদি সেই টাকা যোগাড় করিবার জন্য খরচ খুব কম হয়। দেশের লোকের হাতে যদি টাকা অকেজো হইয়া বসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে উন্নতির লক্ষণ বলা যায় না। দেশের টাকা নিষ্ক্রিয় হইয়া

পড়িয়া থাকা জাতীয় উন্নতির পরিচায়ক নহে। দেশের উন্নতিমূলক কাজে দেশের টাকা যতই প্রযুক্ত হইবে, দেশের লোকের পক্ষে ততই মঙ্গল। ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কের আমানতী টাকায় দেশের বহু কল্যাণকর কার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই আমানতী টাকা নষ্ট হইবার উপায় নাই, কারণ ইহা গভর্ণমেণ্টের হাতে ন্যস্ত থাকে। সুতরাং ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে টাকা আমানত রাখিবার ব্যবস্থায় ভারতবাসীর বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে।

ভারতে পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে পোষ্ট অফিসে সেভিংস ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। গভর্ণমেণ্ট এই সেভিংস ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিয়া জনসাধারণের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চয়ের অভ্যাস বৃদ্ধি পাইবে। যে সমস্ত দিন-মজুর উপার্জিত অর্থ সঞ্চয় করিয়া জমাইয়া রাখিবার স্থানের অভাবে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ আমোদ-প্রমোদে ব্যয় করে, তাহারা সে সমস্ত অর্থ সঞ্চয়ের সুবিধা পাইবে। দরিদ্র অভাবগ্রস্ত নরনারীর পক্ষে সেভিংস ব্যাঙ্ক অশেষ উপকার সাধন করিবে সন্দেহ নাই। ডাঃ ব্লেয়ার বলিয়াছেন—"যেখানে একটি তৃণ জন্মায়, সেখানে যিনি দুইটি তৃণ জন্মাইতে পারেন, তিনি মনুষ্য জাতির অশেষ উপকারক।" ডাঃ ব্লেয়ারের সঙ্গে একমত হইয়া বলা যাইতে পারে যে, যে গভর্ণমেণ্ট প্রজাসাধারণের মধ্যে সঞ্চয়শীলতা, মিতব্যয়িতা, স্বাবলম্বন প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশের চেষ্টা করেন, সে গভর্ণমেণ্ট আদর্শ-বাদীদের অপেক্ষা বহুগুণে ধন্যবাদার্হ। নিম্নে সেভিংস ব্যাঙ্কের নিয়মাবলী প্রদত্ত হইল ঃ—

প্রত্যেক পোষ্ট অফিসে সেভিংস ব্যাঙ্ক খোলা হইল। পুরুষ, নারী যে কোন লোক এখানে টাকা জমা রাখিতে ও উঠাইয়া লইতে পারিবে। এক সপ্তাহে একবারের বেশী টাকা উঠান চলিবে না।

প্রথম আমানতের সময়ে নাম, বাসস্থান ও সহি বা টিপসহি দরকার হইবে। তৎপরে টাকা উঠাইবার ফরমে সহি করিয়া পাঠাইতে হইবে অথবা নিজে আসিতে হইবে। প্রতিবারে ।০ আনা হইতে উর্দ্ধ সংখ্যা

৫০০৲ পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জমা রাখা চলিবে। বৎসরে ৫০০৲ টাকার বেশী জমা লওয়া হইবে না।

প্রত্যেক আমানতকারীকে একটি পাস বুক দেওয়া হইবে। প্রত্যেক-বারের টাকা জমা ও উঠান ঐ পাস বুকে লিপিবদ্ধ থাকিবে। পাস বুক না আনিলে টাকা জমা লওয়া বা উঠান চলিবে না।

আমানতী টাকার উপর শতকরা ৩ঃ টাকা সুদ দেওয়া হইবে। কিন্তু ৫৲ টাকার কম জমা থাকিলে সুদ দেওয়া হইবে না। প্রতি বৎসর ৩১শে মার্চের পরে ঐ সুদ জমা করা হইবে।

পাস বুক ইংরেজী বা দেশীয় যে ভাষায় আমানতকারীর ইচ্ছা সে ভাষায় লিখিত হইবে।

যদি পাস বুক হারাইয়া যায় তবে উহার জন্য ১৲ টাকা জরিমানা দিতে হইবে। কিন্তু উহা ফুরাইয়া গেলে বিনা খরচে নূতন পাস বুক দেওয়া হইবে।

নাবালকের অভিভাবক নাবালকের পক্ষে টাকা জমা রাখিতে পারেন এবং স্ত্রীর নামে স্বামী টাকা জমা রাখিতে পারেন; কিন্তু স্ত্রী যদি স্বোপার্জিত অর্থ জমা রাখেন, তবে নিজের নামে ভিন্ন হিসাব খুলিতে পারেন।

২।৩ জনের নামে টাকা রাখা চলিবে না কিংবা একজন ২।৩টি হিসাব খুলিতে পারিবে না।

যদি সাব অফিসে টাকা জমা দেওয়া যায়, তবে হেড্ অফিস হইতেও ভিন্ন স্বীকৃতি-পত্র দেওয়া হইবে।

যে পোষ্ট অফিসে সেভিংস ব্যাঙ্ক নাই, সেখানে টাকা জমা লওয়া বা উঠান চলিবে না।

"নিউজ অফ্ দি ওয়াল্ড´" পত্রিকার প্রথম বর্ষের পর অর্থাৎ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের পর আর কোনও সংখ্যা বহু অনুসন্ধানেও পাওয়া যায় নাই।

দি রয়্যাল ক্রনিক্‌ল এর আলোচনা

"নিউজ অফ দি ওয়াল্ড´" সম্পাদনেই অমৃতলালের শক্তি শেষ হয় নাই। তিনি অদম্য উৎসাহী ছিলেন। কারণ দেখিতে পাওয়া যায়—১৮৮৮

খৃষ্টাব্দে আর একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র তিনি বাহির করেন। এই পত্রের নাম—দি রয়্যাল ক্রণিক্ল্ (The Royal Chronicle)।

"দি রয়্যাল ক্রণিক্ল্" সাপ্তাহিক পত্র ছিল। সপ্তমবর্ষে ইহার আকার ছিল—ডবল সুপার রয়্যাল। ভিতরের পৃষ্ঠায় ১৪ কলম পাঠ্য বিষয় থাকিত; বাহিরের পৃষ্ঠায় ১৪ কলম বিজ্ঞাপন থাকিত। ইহা প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হইত। সম্মুখের পৃষ্ঠার শীর্ষদেশে কাগজের নাম—

The Royal Chronicle

এবং উহার তলদেশে—

A weekly Journal for the Indian Aristocracy.

এইরূপ মুদ্রিত হইত।

কাগজখানিতে অনেকগুলি বিজ্ঞাপন ছিল। কোন কোনটি সচিত্র। তখনকার দিনেও বিজ্ঞাপনের প্রাচুর্য ছিল।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী শনিবারের "রয়্যাল ক্রণিক্ল্" পত্রে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। প্রবন্ধটির নাম—"The New Year's Honors" অর্থাৎ নববর্ষের উপাধি-তালিকা। এই বৎসর সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রকে ইংরেজ-রাজ সি আই ই উপাধি দান করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপাধি লাভ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধের একস্থানে অমৃতলাল নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"Under the head of Companions of the Indian Empire, we rejoice to see the names of Mr. Pherozeshah Merwanje Mehta and Rai Bunkim Chunder Chatterjee included in the list. But why should there be in it the names of only two Indian Gentlemen while room has been found for no less than eleven English ones? This disproportion strikes us as invidious, to say the least of it. However, it is a wise proverb that advises not to look a gift-horse in the mouth; and so we will discourse no more to-day on the New Year's distribution of Honors."

"রয়্যাল ক্রণিক্‌লে" এইরূপ সংবাদ বাহির হইত :—

দেশীয়ের বদান্যতা

Native liberality.—The Lieutenant Governor acknowledges in the local Gazette the liberality of Baboo Krishna mohon Lal and Brij Mohan Lal, Zeminders of Ulas, in the district of Monghyr, for contributing a sum of Rs. 1,300 each towards the erection of a new building for the existing dispensary at Beguserai."

রামনদের রাজার সৎকার্য

"The Raja of Ramnad has dismissed all dancing girls from the Palace Temple, and substituted a male songster, a fiddler and a drummer to perform during the ceremonies at which these women had been performing dances from time immemorial, after consulting the Tantras."

যদু মল্লিকের দানশীলতা

"We are glad to learn that Baboo Jadu Lal Mullick, our public-spirited townsman of Pathuriagharta, with his usual liberality, has kindly made his annual present of one hundred and fifty pieces of Bombay *chudders* to the Sova Bazar Benevolent Society for distribution to the poor through the agency of the society. The society has thankfully accepted this liberal gift."

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চ তারিখের "রয়্যাল ক্রণিক্‌লে" নিম্নলিখিত কয়েকটি সংবাদ বাহির হইয়াছিল :—

'হেষ্টিংস্‌-বাড়ী' বিক্রয়

"The historic property, known as the Hastings House, at Alipore, has been sold, with the ground on which it stands, for the sum of Rs. 65,000."

আফগানিস্থানের আমিরের অন্তঃপুরে গীতবাদ্য শিক্ষা ও আমিরের বিলাস-দ্রব্য ক্রয়

"The Amir has requested Mr. J. A. Martin, his Calcutta agent, to procure a lady to teach music and piano to the ladies of his household. The latest Afgan surprise takes the form of a consignment of the most fashionable European toilettes, purchased by the Amir for the ladies of the household. The order must have been an important one, * * * for the bill, we hear, amounted to some £20,000."

রয়্যাল ক্রণিক্‌ল্-এর আকার ও নাম পরিবর্তন

"দি রয়্যাল ক্রণিক্‌ল্" পত্রের আকার ডবল সুপার রয়্যাল ছিল। তৎপরে উহার আকার ও নাম পরিবর্তিত হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে দেখা যায়—"দি রয়্যাল ক্রণিক্‌লে"র নাম পরিবর্তিত হইয়া "দি ইণ্ডিয়ান রয়্যাল ক্রণিক্‌ল্" হইয়াছে এবং উহা সাপ্তাহিক হইতে পাক্ষিকে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইহার প্রকাশের বিষয়ে লিখিত হইয়াছে—

"Published twice a month."

এই সময়ে কাগজখানির আকার ছিল ডবল ক্রাউন ৪ পেজী। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের ১ম ও ২য় সংখ্যায় এই আকারের ৩০ পৃষ্ঠা পাঠ্য বিষয় ছিল; ইহা ছাড়া মলাট ৪ পৃষ্ঠা ছিল। এই জুলাই মাসের দুই সংখ্যায় ভারত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের দীর্ঘায়ু ও কল্যাণ-কামনাসূচক সম্পাদকীয় নিবন্ধ, ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের পরলোকগমনে ভারতব্যাপী শোকোচ্ছ্বাস সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ, দ্বারবঙ্গের মহারাজা রামেশ্বর সিং বাহাদুরের জীবন-চরিত ও হাফটোন চিত্র, সাপুরার রাজাধিরাজ সার নাহার সিংজী বাহাদুরের সচিত্র জীবনী, কুচামনের অধিপতি রাওবাহাদুর শের সিংহের সচিত্র জীবনী, গিধোরের মহারাজা সার রাবণেশ্বর প্রসাদ সিং বাহাদুরের জীবনী, নশীপুরের মহারাজা রণজিৎ সিংহের জীবনী, সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে প্রদত্ত উপাধির তালিকা, অভিজাতগণ-সংক্রান্ত

সংবাদ ইত্যাদি আছে। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের সংখ্যায় আছে— "Persian Court and Persian Etiquettes," "Proposed Commemoration Scheme for H. E. Lord Minto's Viceroyalty" এবং অভিজাতবর্গ-সংক্রান্ত সংবাদ। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় কলিকাতার বাবু বিহারীলাল মিত্রের জীবনী, ভারতের অভিজাত ব্যক্তিগণের অনুষ্ঠিত কার্যকলাপের বিবরণমূলক সংবাদ, ভারত-সাম্রাজ্যের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের সংবাদ, বড়লাট ও উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ-সংক্রান্ত সংবাদ এবং সম্রাট্, সম্রাজ্ঞী ও সম্রাট্-পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের সমাচার আছে।

অবশিষ্ট সংখ্যাগুলিতে বারাণসীর মহারাজা সার প্রভুনারায়ণ সিং, রামপুরের নবাব বাহাদুর, সির্সার শেঠ সুখলাল কর্ণানী, দিল্লীর প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী লালা রামচাঁদ লোহিয়া, ত্রিবাঙ্কুরের অধীশ্বর কেরল বর্মা, অযোধ্যার নবাব পরিবারভুক্ত প্রিন্স কামার কাদের মির্জা মহম্মদ আবিদ আলি বাহাদুর, চোরবাগানের প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের বংশধর কুমার নগেন্দ্রকুমার মল্লিক, দ্বারবঙ্গের জমিদার বাবু বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ, রাজা মন্মথনাথ রায়চৌধুরী, ঝালোয়ারের রাণা সাহেব প্রভৃতির জীবনচরিত ও অন্যান্য অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সংক্রান্ত সংবাদ মুদ্রিত হইয়াছে।

করোনেশন সংখ্যা

১৯১১ খৃষ্টাব্দের জুন ও জুলাই মাসের দুই সংখ্যা "দি ইণ্ডিয়ান রয়্যাল ক্রণিক্‌ল্" পত্রের মলাটের উপর যথাক্রমে "First Coronation Number" এবং "Second Coronation Number" মুদ্রিত আছে। এই দুই মাসের কাগজে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের সিংহাসনারোহণ ব্যাপারের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই দুইটি সংখ্যা অতি পরিপাটীরূপে দ্বিবর্ণ কালিতে মুদ্রিত এবং এই দুই সংখ্যায় মোট ১৩ খানি হাফটোন চিত্র আছে।

"দি ইণ্ডিয়ান রয়্যাল ক্রণিক্‌ল্" আর্ট পেপারে পরিপাটীরূপে মুদ্রিত হইত এবং প্রতি সংখ্যাতেই কয়েকখানি করিয়া হাফটোন ছবি থাকিত।

দি মিলিটারী ষ্ট্যাণ্ডার্ডের আলোচনা

অমৃতলাল-সম্পাদিত আর একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রের নাম—"The Military Standard"। ইহা ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বাহির হইয়াছিল। ভারতের সমর-বিভাগ-সংক্রান্ত সমাচার ও সাময়িক বিষয়ের আলোচনা এই কাগজে প্রকাশিত হইত।

কেবল ভারতের নহে—ভারতের বাহিরেরও সংবাদ এই কাগজে মুদ্রিত হইত। যেমন—'Afgan Affairs', 'The Russians in Pamirs,' 'The Indian Volunteers at Bisley', 'Lord Roberts on Army Reform' ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত সংবাদ হিসাবে এই কাগজে সমর-বিভাগের কর্মচারিগণের সংবাদ বাহির হইত।

'মিলিটারী ষ্ট্যাণ্ডার্ডের প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধেও সামরিক বিষয়েরই আলোচনা হইত। কতকগুলি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শিরোনামা এইরূপ ছিল—"An Inducement to Recruiting," "The Calcutta Naval Volunteers,' "A possible Recruiting Ground in India," "A Local Army for India" ইত্যাদি।

"A Local Army for India" নামক সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"We recur to-day to a subject that has previously been considered in these columns, but the supreme importance of which warrants more insistence on it. We allude to reorganisation, or perhaps it would be better to say, reformation of the Native Army. It was years ago a valuable and most efficient Army. It is very efficient still. Recent operation in Burma, Lushailand, and on the North-West frontier, has proved that beyond cavil of the most Irish opposers to English rule in India, our English officers and our Hindostanee sepoys can hold their own against the world. They have done so in Kabul, in Burma, on

the plains of India, wherever and whenever they have been asked to. They did so at Assaye a century ago. Since then, they have fought and bled in Central India, in Afganisthan, in Burma, in the course of frontier raids, indeed 'all over the shogs.' And such good results have been obtained because men and officers have been, alike in cantonment and field, well in touch, and have had camaraderie to hold them together. This was good: any one with two eyes can see that. It was not good that the Staff Corps should have been established and should have been allowed to supersede the regimental system. The old regimental system made the regiment a family, as it were; officers knew their men, knew their wants, could appreciate and understand their requirements, and there was therefore attachment between officers and men. As things stand now, regimental officers are not content to stay with their men; nothing will suit them but civil employment. * * * Some of them have become Directors of Public Instruction, some of them Magistrates; one of them we happened to know was for certainly more than ten years Manager of a Court of Wards estate."

তখনকার কালে ইংরেজ সেনানীরা দেশী সৈনিকদের সহিত বাস করিতেন। তাঁহারা নিজ নিজ সৈনিকদিগকে চিনিতেন; তাহাদের সুখ-দুঃখের সংবাদ লইতেন। তাঁহারা সেনানীর কার্য ছাড়িয়া অর্থাৎ সমর-বিভাগের কার্য ত্যাগ করিয়া বে-সামরিক কোনও কার্য করিতেন না। কিন্তু এখনকার সেনানীরা সৈনিকদের নিকট হইতে তফাৎ হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের এখন ঝোঁক হইয়াছে বে-সামরিক কার্য গ্রহণ করিতে। দেখা যাইতেছে—সেনানীরা শিক্ষা-বিভাগের কর্তা হইতেছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট হইতেছেন, কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের ম্যানেজার হইতেছেন।

স্বতন্ত্রভাবে সেনানী-সঙ্ঘ (Staff Corps) গঠন করায় সেনানীদের

সৈনিকগণের প্রতি অনুরাগের হ্রাস হইতেছে। "মিলিটারী ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্র ইহাই উক্ত প্রবন্ধে বুঝাইয়া বলিয়াছেন।

"মিলিটারী ষ্ট্যাণ্ডার্ড" কাগজখানির আকার ছিল ডবল সুপার রয়্যাল; বাহিরের পৃষ্ঠায় ১৪ কলমে বিজ্ঞাপন ও ভিতরের পৃষ্ঠায় ১৪ কলমে পাঠ্য বিষয় থাকিত। ইহা প্রতি সোমবার বাহির হইত। ইহার মলাটে আত্মপরিচয় স্বরূপ লিখিত থাকিত—

A weekly Chronicle News.

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৬টি সংখ্যা এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ৪টি সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং কাগজখানি কোন্ তারিখে উঠিয়া গিয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না।

অমৃতলাল দে মহাশয় তাঁহার জীবন-কাল ৬৫ বৎসরের মধ্যে ৫ খানি পত্রিকা সম্পাদন করেন। সেই পাঁচখানি পত্রিকার মধ্যে তিনখানি পত্রিকার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বাকী দুইখানি কাগজ অর্থাৎ Calcutta Price Current ও Exhibition Gazette হস্তগত হয় নাই; সুতরাং উহাদের বিষয় আলোচিত হইল না। Calcutta Price Current নামক কাগজখানি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এবং Exhibition Gazette নামক কাগজখানি ১৮৮৩-৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর সময়ে বাহির হইয়াছিল।

পুস্তক রচনা

অমৃতলাল তাঁহার জীবিতকালে শুধু পত্রিকা সম্পাদন করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই। তিনি অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন, সম্পাদন ও প্রকাশ করেন। তাঁহার স্থাপিত Lewis & Co.র একখানি পুরাতন মূল্যতালিকা হইতে পুস্তকগুলির নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। অমৃতলাল স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠান হইতে সর্বসমেত বিভিন্ন-বিষয়ক ৭৮ খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। সমস্ত পুস্তকগুলিই ইংরেজীতে লেখা। বাংলায় তিনি নিজে কোন পুস্তক লিখিয়াছিলেন কি না কিংবা

বাংলায় লিখিত কোন পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই ৭৮ খানি পুস্তকের মধ্যে ৩২ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। বাকীগুলি দুষ্প্রাপ্য।

ইণ্ডিয়ান রয়্যাল ক্রণিক্ল্ পাঠে জানা যায়, অমৃতলাল তাঁহার ব্যবসা-জীবন আরম্ভ করিয়া কতকগুলি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন এবং সে পুস্তকগুলির বহুল প্রচার হয় ও তিনি উহাদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে লাভবান্ হন।[১]

প্রকাশিত ৭৮ খানি পুস্তকের মধ্যে অমৃতলালের নিজের লেখা ১০খানি পুস্তক, বিভিন্ন গ্রন্থকার ও গ্রন্থকর্ত্রী লিখিত ৬ খানি এবং বাকী ৬২ খানি পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম নাই।

প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা

নিম্নে মোটামুটি বিষয়বিভাগ করিয়া পুস্তকগুলির একটি তালিকা, তাহাদের প্রকাশ-সাল এবং মূল্যাদি প্রদান করা গেল।[২]

(ক) অমৃতলালের নিজের লেখা বই

১।	ধর্মতত্ত্ব	...	১
২।	জ্যোতিষ	...	১
৩।	স্বাস্থ্যতত্ত্ব	...	১
৪।	অর্থনীতি	...	১
৫।	অনুবাদ	...	২
৬।	উপন্যাস	...	১
৭।	কবিতা	...	১
৮।	বিবিধ	...	২
		মোট	১০ খানি

১ "At the beginning of his business career he wrote and published many school-books, which secured a wide and profitable circulation." *The Indian Royal Chronicle*, February, 1911, p. 22.

২ তারকা চিহ্নিত পুস্তকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

অমৃতলালের নিজের লিখিত পুস্তকগুলির তালিকা ও তাহাদের মূল্যাদি নিম্নরূপ—

১। ধর্মতত্ত্ব

Phallic Worship* ৫।০

২। জ্যোতিষ

Man Know Thyself
or
A Manual of Astrology* 1889 ২॥০

৩। স্বাস্থ্যতত্ত্ব

How to be Healthy* 1884 ১।০

৪। অর্থনীতি

How to be Wealthy* 1879 ॥০

৫। অনুবাদ

(১) A Throne of Thirty-two Images
or
The Buttris Shinghasun* 1888 ১॥০

(২) Kalila and Dimna
or
The Fables of Bidpai* ২॥০

৬। উপন্যাস

Kamarupa and Kamalata ১৲

৭। কবিতা

The Royal Jubilee in India* ২৲

৮। বিবিধ

(১) Pleasures of Single Life* ১॥০

(২) Pleasures of Married Life ১॥০

(খ) অপর গ্রন্থকার ও গ্রন্থকর্ত্রীর লেখা বই

১। ভূগোল-বিষয়ক ... ১

২। কবিতা ... ২
৩। উপন্যাস ... ২
৪। বিবিধ ... ১

মোট ৬ খানি

পুস্তকগুলি ও তাহাদের গ্রন্থকারের নাম এবং মূল্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১। ভূগোল-বিষয়ক

The Polar and Tropical World
By Dr. G. Hartwig ৮৲

২। কবিতা

(১) Poetry of Freemasonry
by Rob. Morris L. L. D. ১০৲

(২) The Calcutta Police Court
by A. F. Heberlet* 1882 ৸৹

৩। উপন্যাস

(১) Lilian
by Miss J. Williams ২৲

(২) Adam Khan and Durkhana-i
by T. C. Plowden ১৲

৪। বিবিধ

Woman—Physiologically considered
by Alexander Walker* 1885 ২৸৴

(গ) যে পুস্তকগুলির গ্রন্থকারের নাম জানা যায় নাই

১। দর্শন ... ১
২। ধর্মতত্ত্ব ... ২
৩। স্বাস্থ্যতত্ত্ব ... ৫
৪। ইতিহাস ... ১

৫।	অর্থনীতি	...	...	২
৬।	দেশের বিবরণ	...	...	৬
৭।	জীবন-চরিত	...	...	২
৮।	সমাজ-তত্ত্ব	...	...	৩
৯।	অনুবাদ	...	...	৩
১০।	কবিতা ও বক্তৃতা-সংগ্রহ	...	...	১
১১।	উপন্যাস ও গল্প	...	...	১৬
১২।	স্কুল-পাঠ্য	...	...	৩
১৩।	বিবিধ	...	...	১৭

মোট ৬২ খানি

উপরিলিখিত পুস্তকগুলির নাম ও মূল্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১। দর্শন

(১) Philosophy of Human Nature* ২॥০

২। ধর্মতত্ত্ব

(১) The Paradoxes of the Highest Science ১৲

(২) Hindoo Idolatry and English Enlightenment ১৲

৩। স্বাস্থ্যতত্ত্ব

(১) Diseases of the Urinary Organs and Generative System and their Private Treatment ২॥০

(২) Diseases of Women and their Private Treatment ১॥০

(৩) Essence of Philosophy (Medical Treatise) ১॥০

(৪) The Law of Population ১॥০

(৫) Amativeness* ১॥০

৪। ইতিহাস

(১) Russian Nihilism ৫৲

৫। অর্থনীতি

(১) Three Ways of Living* 1883 ॥০

(২) The Path to Wealth ৪৲

৬। দেশের বিবরণ

(১) In Various Climes ১৲
(২) Climes of the World ৩৩৲
(৩) Beautiful Britain ২০৲
(৪) Old Times in Assam ১৲
(৫) Crown Jewels of Arts ১৮৲
(৬) The Artistic Photographic Views of India*

৭। জীবন-চরিত

(১) Heroes of the Plain ৫৲
(২) Life of Lord Frederick Roberts ৫৲

৮। সমাজ-তত্ত্ব

(১) The Pathway of Life ১০৲
(২) The History and Philosophy of Marriage* ২৲
(৩) The History of the Female Sex* 1884 ১॥০

৯। অনুবাদ

(১) Ratnavali ১॥০
(২) Sakuntala ২৲
(৩) Shermista ১৲

১০। কবিতা ও বক্তৃতা-সংগ্রহ

(১) The Imperial Boquet of Pretty Flowers ২॥০

১১। উপন্যাস ও গল্প

(১) Man Metamorphosed* 1886 ২॥০
(২) A Fascinating Woman ১॥০
(৩) The Lady Nana* 1884 ২॥০
(৪) Nana's Daughter ২॥০
(৫) A Vagabond Heroine* ২॥০
(৬) Marrying off a Daughter* ২৲

(৭)	The Boudoir Intrigue		॥০
(৮)	Lovers' Stratagem*	1889	১॥০
(৯)	Thirty Years in the Harem*	1888	২৲
(১০)	The Two American Lovers*		২॥০
(১১)	Bars from a Barrack Room		১৲
(১২)	Helen		২॥০
(১৩)	Pilgrim of Love*	1883	॥০
(১৪)	A Husband Reformed by his Wife		।০
(১৫)	Life of a Beauty		২॥০
(১৬)	How a Rupee became a Hundred-Thousand*	1884	১॥০

১২। স্কুল-পাঠ্য

(১)	Questions on the History of India with Answers*	1870	
(২)	Students' History of India		
(৩)	Questions on the Landmark of Ancient History		

১৩। বিবিধ

(১)	History of the Province of Benares	১॥০
(২)	Love Charms and Marriage Spells	॥৫
(৩)	The Lover's Companion	॥০
(৪)	Mysteries of Making Love	॥৫
(৫)	How to woo and how to win the favour of Ladies	॥৫
(৬)	The Dancers' Guide and Ballroom Companion*	॥৫
(৭)	All about Kissing	১॥০

(৮)	The Pleasures of Love		১॥০
(৯)	The Philosophy of Beauty*		॥০
(১০)	The Husband that will suit you and how to treat him*		১৲
(১১)	The Wife that will suit you and how to treat her		১॥০
(১২)	The Young Wife's Book*	1887	১॥০
(১৩)	The Young Husband's Guide		১॥০
(১৪)	How to acquire Beauty and the Best Methods of Preserving it till Death*	1886	১৲
(১৫)	Wholesome Cookery for the Mofussilites		১৲
(১৬)	Manual of Useful Information		৬৲
(১৭)	Whisper to a Married Pair*	1886	১॥০

অমৃতলাল ইংরেজীতে সুবক্তা ও সুলেখক ছিলেন। তিনি যে সে যুগে ইংরেজী-শিক্ষা ও সাহিত্য-প্রচারের একজন উদ্যোক্তা ছিলেন, তাহা তাঁহার জীবন ও কার্যাবলী হইতে জানিতে পারা যায়।

পুস্তক পরিচয়

(১) How to be Healthy

স্বাস্থ্যতত্ত্ব বিষয়ক এই পুস্তকখানি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ৩০৭ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থিত কোন্‌স্ এণ্ড কোম্পানীর মুদ্রাযন্ত্রে (Cones & Co.'s Press) মুদ্রিত এবং ৭১নং বেন্টিক ষ্ট্রীট হইতে লুইস্ এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত। পুস্তকখানির আকার ক্ষুদ্র—রয়্যাল ৩২ পেজী আকারের তিন ফর্মা অর্থাৎ ৯৬ পৃষ্ঠা। পুস্তকখানির প্রচ্ছদপট বা মলাটের উপর যাহা মুদ্রিত আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"How to be Healthy
A manual containing many Hints and Suggestions
collected from the highest Medical Authorities
for Strengthening and Preserving the Men-
tal and Bodily Powers and Invigorating
the Vital Functions when these are
deteriorated or depressed together
with Notes on Personal and
Domestic Hygiene, and
matters of kindred
interest.
This book is intended to be perused by both
sexes, and will be found invaluable in districts
removed from the reach of Medical Aid.
Mens Sana In Corpore Sano.
Calcutta :
Lewis & Co.
71, Bentinck Street
Price 8 Annas."

পুস্তকখানির প্রচ্ছদপট পাঠ করিয়া বুঝা যায় যে, গ্রন্থকার অমৃতলাল দে মহাশয় আলোচ্য গ্রন্থে লোকের দৈহিক ও মানসিক শক্তির বৃদ্ধিসাধন ও উহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বড় বড় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশ সঙ্কলিত করিয়াছেন। এমন কি যাঁহাদের জীবনশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের জীবনীশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পাইতে পারে, এমন সকল উপদেশ তিনি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এই সকল ব্যতীত চিকিৎসকের সাহায্য না লইয়া নিজের ও পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশও গ্রন্থকার পুস্তকখানিতে প্রদান করিয়াছেন। মোট কথা স্বাস্থ্যনীতি-সংক্রান্ত কোনও প্রয়োজনীয় বিষয়ই তিনি পুস্তক হইতে বাদ দেন নাই। যেখানে চিকিৎসকের সাহায্য পাওয়া যায় না সেই স্থানের অধিবাসীদের সাহায্যের জন্যই যে এই পুস্তকখানি রচনা করা হইয়াছে, গ্রন্থকার এমন কথাও ব্যক্ত করিতে ভুলেন নাই।

পুস্তকখানির সূচনায় স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে। তারপর প্রথম অধ্যায়ে মানব-দেহের গঠন প্রণালী; দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্নায়ু ও পেশী সংস্থান; তৃতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও উহাদের ক্রিয়া, রক্ত সঞ্চালন ও নিশ্বাস-প্রশ্বাস; চতুর্থ অধ্যায়ে স্বাস্থ্যরক্ষা; পঞ্চম অধ্যায়ে পানের জল এবং রন্ধন, স্নান, বস্ত্রাদিধাবন প্রভৃতি কার্যে ব্যবহৃত জল; ষষ্ঠ অধ্যায়ে দুগ্ধ প্রভৃতি অন্যান্য পানীয়; সপ্তম অধ্যায়ে খাদ্য; অষ্টম অধ্যায়ে ভূমি ও জলবায়ু; নবম অধ্যায়ে আবাস-বাটি; দশম অধ্যায়ে পোষাক-পরিচ্ছদ এবং একাদশ অধ্যায়ে ব্যায়াম সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকখানির আকার ক্ষুদ্র এবং উহা সংক্ষিপ্তভাবে রচিত হইলেও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় গ্রন্থকার এই পুস্তকে প্রদান করিয়াছেন।

(২) A Throne
of
Thirty-two Images

ইহা প্রসিদ্ধ 'বত্রিশ সিংহাসন' পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ। যে সময়ে অমৃতলাল দে মহাশয় 'বত্রিশ সিংহাসনে'র ইংরেজী অনুবাদ করেন সেই সময়ে বত্রিশ সিংহাসনের নাম ইংরেজ সিবিলিয়ান-মহলে সুপরিচিত ছিল। যে সকল সিবিলিয়ানকে বাংলা শিখিতে হইত বত্রিশ সিংহাসন প্রায়ই তাঁহাদের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত থাকিত। সম্ভবত এই জন্যই অমৃতবাবু বত্রিশ সিংহাসনের ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছিলেন।

এই পুস্তকখানির প্রচ্ছদ-পত্রে পরিচয় স্বরূপ যাহা লিখিত আছে তাহা এই :—

"A Throne of
Thirty-two Images
or
The Buttris Shinghashun.
The Famous Collection of Indian Tales.
Calcutta:

Lewis & Co.
71, Bentinck Street.
1888
[All Rights Reserved]"

যে মুদ্রাযন্ত্রে পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়াছিল এবং যে ব্যক্তি ইহার প্রকাশক ছিলেন, সেই মুদ্রাযন্ত্র ও প্রকাশের পরিচয় এই পুস্তকে এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

"Calcutta:
Printed and Published for Lewis & Co., by
Edward Chambers at the Calcutta Printing Co.
71, Bentinck Street."

পুস্তকখানি রয়্যাল ১৬ পেজী আকারের ১১৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার দ্বাত্রিংশৎ গল্পের ইংরেজী অনুবাদ ভিন্ন এই পুস্তকে ভূমিকা ইত্যাদি কিছুই নাই।

(৩) How to be Wealthy

স্বর্গীয় অমৃতলাল দে প্রণীত এই পুস্তক ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ইহা অ্যালফা প্রেসে এল জে ডিক্রুজ কর্তৃক মুদ্রিত। এই প্রেসের ঠিকানা পুস্তকখানির কোথাও ছাপা নাই; কেবল ইহা যে কলিকাতায় অবস্থিত মাত্র এইটুকুই লেখা আছে। পুস্তকখানির প্রকাশক কে এবং কোথা হইতেই বা প্রকাশিত হইয়াছে সে বিষয়েরও কোন উল্লেখ নাই। পুস্তকখানির প্রচ্ছদ-পটে বা মলাটের উপর যাহা মুদ্রিত আছে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল ঃ—

"How to be Wealthy,
Being

A guide to fortune for everybody, containing the most essential rules and practical hints and suggestions for success in life,

And
Directing the ways

And means---How to earn, save, invest
And increase money,
And
Be wealthy, and thereby live comfortably
upon a substantial Income.
A book for persons of all ages and circumstances.

'Each day new wealth without their care provides,
They lie asleep with prizes in their nets'.

Dryden.

Calcutta:
Lewis & Co.
11/1/2, Dalhousie Square, North-East and
2, Old Court House Corner.
1879
[All Rights Reserved]"

প্রচ্ছদ-পটে যাহা মুদ্রিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, গ্রন্থকার এই পুস্তকে অর্থ-উপার্জন, অর্থ-সংগ্রহ, অর্থ-বিনিয়োগ এবং অর্থ-বৃদ্ধি দ্বারা ধনবান হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কেবল অর্থ উপার্জন করিলেই ধনী হওয়া যায় না; অর্থ সঞ্চয় করিবার কৌশল শিক্ষা করা চাই। তারপর সঞ্চিত অর্থ লাভজনক ভাবে বিনিয়োগ করিয়া বর্ধিত করিতে হয়। আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া, মিতব্যয়ী হইয়া কিরূপে অর্থ সঞ্চয় করিতে হয়, পুস্তকখানিতে তাহার উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। পুস্তকখানির আকার রয়্যাল ৩২ পেজী, ১০৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহাতে সংক্ষেপে সম্পত্তির সংজ্ঞা, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, অর্থের শক্তি, অর্থ অনর্থের মূল, অর্থ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সমাজ ও ব্যক্তির উপর অর্থের প্রভাব, অর্থ ও লোক-সেবা, অর্থ উপার্জনের আকাঙ্ক্ষা, বাণিজ্যে অর্থনিয়োগ, উপার্জনের পন্থা, পরিশ্রম ব্যতীত উপার্জন অসম্ভব, আলস্য অবনতি ও দুঃখের মূল, কর্মে উৎসাহ, অধ্যবসায়, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ব্যবসায়ীদের কথা ঠিক রাখা উচিত। ইহাতে ব্যবসায়ী ও ক্রেতা উভয়েরই সুবিধা হয়। কথা ঠিক না রাখিলে উভয়কেই অসুবিধায় পড়িতে হয়।

(8) Kalila and Dimna
or
The Fables of Bidpai

এই পুস্তকখানির পরিচয় স্বরূপ ইহার মলাটের পরবর্তী পৃষ্ঠায় যাহা লিখিত আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"Kalila and Dimna
or
The Fables of Bidpai
Being a collection of
The Most Interesting and Instructive Oriental Subjects
Tending to elevate the morals of readers
Both young and old.
Calcutta:
Lewis & Co.
Publishers and Book Sellers
5, Lindsay Street, Chowringhee
[All Rights Reserved]"

টাইটেল-পেজের অপর পৃষ্ঠায় পুস্তকখানি যে প্রেসে যৎকর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছে তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে :—

"Printed at
The Calcutta Printing Works,
5, Lindsay Street
By O. Day"

হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতির মত ইহা সন্নীতিমূলক উপাখ্যান বা উপকথার পুস্তক। বিদপাই দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বহুদর্শী জ্ঞানী ব্রাহ্মণ। লোকে বিপদে পড়িলে তাঁহার নিকট উপদেশ লইতে

আসিত। বিদপাই যে দেশে থাকিতেন সেই দেশের রাজা অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠেন। প্রজাগণ তাঁহার অন্যায় অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। ইহা দেখিয়া বিদপাই সঙ্কল্প করেন যে, তিনি রাজাকে ন্যায়পরায়ণ হইতে পরামর্শ দিবেন এবং যাহাতে তিনি প্রজাদের উপর অত্যাচার না করেন সেইরূপ ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করিবেন। রাজাকে এইরূপ মন্দ অবস্থায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত নহে। তাঁহাদের উচিত —রাজাকে সংশোধিত করিবার ও তথা রাজ্যের উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা করা। অতঃপর তিনি তাঁহার শিষ্যবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের সম্মতিক্রমে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তিনি বহুক্ষণ নীরব থাকেন। তখন রাজা মনে করেন, বিদপাই ভয়ে কোন কথা বলিতেছেন না। অতঃপর রাজা তাঁহাকে অভয় দেন এবং তাঁহার যাহা বলিবার আছে অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতে বলেন। বিদপাই রাজাকে বলেন—আপনি আপনার স্বভাবের সংশোধন করুন। ইহাতে রাজা অত্যন্ত রাগিয়া যান এবং তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে করেন, দণ্ড অত্যন্ত কঠোর হইয়াছে; সেইজন্য বিদপাইকে কারারুদ্ধ করিতে বলেন। বিদপাই কারাগারে অবস্থান করিতে থাকেন। এদিকে একদিন রাত্রিতে জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনার সময়ে গ্রহাদির সংস্থান সম্বন্ধে রাজার সন্দেহ উপস্থিত হয়। তখন বিদপাইয়ের কথা রাজার মনে পড়ে এবং তিনি এই ভাবিয়া দুঃখিত হন, বিদপাই রাজা ও রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আমাকে সদুপদেশ দিতে আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছি; ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। ইহা মনে হইতেই রাজা অবিলম্বে বিদপাইকে তাঁহার নিকটে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। তারপর তিনি বিদপাইয়ের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন—আপনি আমাকে যে উপদেশ দিবার জন্য আসিয়াছিলেন সেই উপদেশ দিন। অতঃপর বিদপাই রাজাকে গল্পচ্ছলে নানা প্রকার সদুপদেশ প্রদান করেন। ইহাই বিদপাইয়ের উপাখ্যান।

এই পুস্তকখানির আকার রয়্যাল ১৬ পেজী ২৬২ পৃষ্ঠা। পুস্তকখানিতে বিস্তর উপাখ্যান বা গল্প আছে।

(৫) *The Royal Jubilee in India*

of

Her Most Gracious Majesty

Queen Victoria,

Empress of India.

এই পুস্তকখানি কতকগুলি ইংরাজী কবিতার সমষ্টি। ভারত-রাজরাজেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষে ইহা রচিত। এই পুস্তকখানির রচয়িতা অমৃতলাল দে মহাশয় ইহা রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার নামে উৎসর্গ করেন। বড়লাট লর্ড ডাফরিনের উদ্দেশ্যেও একটি কবিতা লিখিত হইয়াছে। অতঃপর আর একটা কবিতায় ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়াকে গ্রন্থকার পুস্তকখানি উৎসর্গ করেন। জুবিলী উপলক্ষে ভারতের বরোদা, ভূপাল, আমেদাবাদ, ভবনগর প্রভৃতি দেশীয় রাজন্যবৃন্দের রাজ্যে যে সকল উৎসব হইয়াছিল ও তদুপলক্ষে সাধারণ হিতকর কার্যের জন্য বিপুল দান হইয়াছিল, কবিতায় তাহার উল্লেখ আছে। এমন কি নড়াইল, মুক্তাগাছা, বামনডাঙ্গা, রানাঘাট, মুশিদাবাদ প্রভৃতি স্থানের উৎসবাদির বিষয়ও এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই পুস্তকখানির আকার রয়্যাল ১৬ পেজী ১৯০ পৃষ্ঠা। পুস্তকখানি ৭১ নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীটস্থিত The Calcutta Printing Companyর প্রেসে এডওয়ার্ড চেম্বার্স (Edward Chambers) কর্তৃক মুদ্রিত। এই পুস্তক-খানির প্রচ্ছদ-পত্রের তলদেশে যে নাম ও ঠিকানা মুদ্রিত আছে তাহা এই—

The Calcutta Printing Company

71, Bentinck Street.

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে উৎসর্গ পত্রের কবিতা ও বড়লাট লর্ড ডাফরিণের নামে রচিত কবিতার প্রতি ছত্রের আদ্যক্ষর মিলাইলে অমৃতলাল দে মহাশয়ের নাম পাওয়া যায়। নিম্নে কবিতা দুইটি উদ্ধৃত হইল—

(১)

মহারাণীর নামে উৎসর্গপত্রের কবিতা—

"On this auspicious day of days,
May I dedicate hymn of praise,
Regeneration, and loyalty,
In honour of her Majesty
The Empress-Queen of India
The brightest, most particular star
Of loyalty's thorough devotion
Long over Indian land and ocean
And British isles as well, may she
Under god's providence still be
Loved ruler, guide, and panoply
Day after day 'gainst the enemy,
Anarchy, plots, and all disorders,
Yonder, and here in Indian borders."

(২)

বড়লাটের প্রতি কবিতা—

"Omnipotence, indubitably
Must be right well disposed to the
Right Honourable Lord Dufferin
In letting him be established in
The responsible place of Viceroy,
That he might all the Jubilee joy
Ordain, and add new lustre to
Lordly lineage given to few
Amongst his Peers. In this proem
Unto the following loyal poem
Lord Dufferin's patronage I amerce.
Due it is to poetic verse:
Asked for it is in India's name,
Yearning to aid Lord Dufferin's fame."

(৬) Man know Thyself
or
A Manual of Astrology

অমৃতলাল লিখিত এই জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় গ্রন্থখানি ইংরেজী ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। Lewis & Co. এই গ্রন্থখানির প্রকাশক। গ্রন্থখানির মুদ্রণ ও প্রকাশের স্থান, ৭১ নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই স্থানে অবস্থিত Calcutta Printing Company হইতে Edward Chambers কর্তৃক ইহা মুদ্রিত হয়। আলোচ্য গ্রন্থমধ্যে কোন ভূমিকা বা সূচীপত্র সন্নিবিষ্ট হয় নাই। রয়্যাল ১৬ পেজী আকারে ২৮৮ পৃষ্ঠায় গ্রন্থখানি সমাপ্ত।

গ্রন্থখানি ৩২টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং গ্রন্থে আলোচিত বিষয়টিকে সুপরিস্ফুট করিবার জন্য গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে ১৮টি টেবল ও ২১টি চিত্র সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

মূল্যবান্ বিবেচনায় সেইগুলির তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

Tables

১। A Celestial Table of the Magnitudes, Periods, and Revolution of the Planets, calculated and arranged from the latest and best authorities.

২। Twelve signs of the Zodiac.

৩-৮। Perpetual Tables of the Celestial Houses for casting Nativities and erecting Themes of Heaven.

৯-১০। A perpetual Table of the Sun's Right Ascension in Time, at noon, for each day in the year.

১১-১২। Copy of an Ephemeris.

১৩-১৪। A Table of the most Eminent Fixed Stars, with their various effects, according to authors.

১৫। A Table of the Essential Dignities, according to the Systems of Ancient Authors.

১৬। A Table of the Essential Fortitudes and Debilities of the Planets ; according to the Author's System.

১৭। A Table of the Celestial Periods of each Planet, as solely applicable to Nativities.

১৮। A Table of the Measure of Time, for all Celestial Arcs of Direction.

Diagrams

১। A Diagram of the Twelve Houses of Heaven.

২। Particular Significations of the Twelve Celestial Houses, according to various Astrological Authors.

৩। A Celestial Diagram, representing at one view the various symbolical significations of the Twelve Heavenly Houses ; according to ancient manuscript writers of the twelfth century ; and not to be found in Authors.

৪। A Theme of Heaven or Scheme of Nativity.

৫। A Celestial Diagram, exhibiting at one view the whole of the Mundane Aspects.

৬। The Nativity of His Late Majesty (George III).

৭। The Nativity of the late Queen Caroline.

৮। The Nativity of H. R. H. Princess Charlotte.

৯। A Remarkable Horoscope (John Hargrave).

১০। The Nativity of a Modern Satirical Poet.

১১। The Nativity of a great Traveller and clever Linguist.

১২। The Nativity of a Naval Gentleman.

১৩। The Nativity of a Person who died insane.

১৪। The Nativity of the Illustrious Warrior, the Duke of Wellington.

১৫। The Nativity of the Young "King of Rome" (Charles Francis Napoleon).

১৬। A Diagram to measure the Arcs of the Significator, in Horary Themes of Heaven.

১৭। A General Diagram, or Theme of Heaven, to illustrate the Principles of Horary Astrology.

১৮। The Horoscope of the New London Bridge.

১৯। The Book of the Stars.

২০। A Diagram of the Effects of the Twelve Houses of Heaven in State Astrology.

২১। The Moon Eclipsed, visible November 3rd, 1827.

গ্রন্থ মধ্যে এতগুলি টেবিল ও এতগুলি চিত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনার যে অত্যন্ত সুবিধা হইয়াছে তাহা জ্যোতিষের অনুশীলনকারী মাত্রই স্বীকার করিবেন।

পুস্তকখানির বিষয়-সন্নিবেশ নিম্নরূপ—

জ্যোতিষ শাস্ত্রের সংজ্ঞা, উহার ইতিহাস এবং অতি প্রাচীনকাল হইতে মানব কি প্রকারে গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি দ্বারা জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ঘটনাবলী নির্ণয় করিত তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পুস্তকখানির ১ হইতে ২৮ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে।

সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রপুঞ্জ, ধূমকেতু প্রভৃতির আকার, গতি, তেজ প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক বিবরণ, পাশ্চাত্ত্য মনীষিগণ যে সমস্ত নূতন নক্ষত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই সমস্ত নক্ষত্রের বিবরণ, জ্যোতিষ-গণনার সুবিধা-বিষয়ক দ্বাদশ রাশিচক্রের আলোচনা, গ্রহগণের স্থিতি ও গতিবিধি, রাশিচক্রের ইংরেজী ও ল্যাটিন নাম-সম্বলিত তালিকা এই গ্রন্থের ২৯ হইতে ৫৩ পৃষ্ঠায় দেখা যাইবে।

রাশিচক্রের দ্বাদশ স্থানের অধিপতি, গ্রহগণের উচ্চ ও নীচ স্থান এবং কোন্ স্থান হইতে কোন্ বিষয় বিচার্য, তাহা এই গ্রন্থের ৫৪ হইতে ৬৪ পৃষ্ঠায় বিবৃত হইয়াছে।

গ্রহগণের কারকতা, এবং কোন্ গ্রহ কোন্ ভাবের দ্যোতক তাহার আলোচনা ৬৬ হইতে ৯৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়।

দ্বাদশ স্থান হইতে কোন্ কোন্ বিষয় কি ভাবে বিচার করিতে হয় তাহার পদ্ধতি, কোষ্ঠী গণনার প্রাথমিক সঙ্কেতাদি, লগ্ন গণনার ও গ্রহ-সংস্থানের বিবরণ এই গ্রন্থের ৯৬ হইতে ১৩৮ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান। গ্রহগণের মিলন, সম্বন্ধ, উহাদের মিত্র ও বৈরীভাব এবং দৃষ্টি-বিচার ১৩৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৪০ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, মৃত্যু, আয়ু, যশ, সৌভাগ্য প্রভৃতি গণনার পদ্ধতি, প্রশ্ন গণনার প্রাথমিক সঙ্কেত এবং রোম-সম্রাট্ ও ভারত-সম্রাট্-সম্রাজ্ঞীর জন্ম-পত্রিকার চিত্র এই পুস্তকের ১৪৯ হইতে ২২৪ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

প্রাচ্য নিয়মানুসারে দ্বাদশ ভাবাধিপতির অবস্থিতি-ফল গ্রন্থের ২২৫ পৃষ্ঠা হইতে ২৪৬ পৃষ্ঠায় আছে।

পুস্তকখানির শেষভাগ অর্থাৎ ২৪৭ হইতে ২৮৮ পৃষ্ঠা রাষ্ট্রীয় জ্যোতিষ ও গ্রহণ ইত্যাদির আলোচনায় পূর্ণ।

(৭) The Pleasures of Single Life.

এই পুস্তকখানি ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারের ১৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহার প্রচ্ছদ-পদে বা মলাটের উপর যাহা লিখিত আছে তাহা নিম্নরূপ :—

"The Pleasures of Single Life
A Most Useful Book
To Bachelors.
Calcutta:
Lewis & Co. Publishers & Book-Sellers.
[All Rights Reserved]"

পুস্তকখানি The Calcutta Printing Works, 12-3, Lindsay Street এ মুদ্রিত। প্রকাশকের নাম বা ঠিকানা নাই।

পুস্তকখানিতে অবিবাহিত ব্যক্তিগণ কিরূপে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারেন, সেই বিষয়ে বিশদরূপে আলোচনা আছে। অবিবাহিতগণের বৈষয়িক ও ধর্মজীবনের উন্নতিকর বহু উপদেশও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(৮) Phallic Worship

লিঙ্গ-পূজা সম্বন্ধে অমৃতলাল প্রণীত এই গ্রন্থখানি কোন্ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কোন উল্লেখ গ্রন্থ হইতে জানা যায় না। পুস্তকের প্রচ্ছদ-পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"Phallic Worship
A Religio-Scientific Work
of
Great Value and Interest
Discovered from
Ancient Relics and Records of Old.
Calcutta :
Lewis & Co., Publishers and Book-Sellers.
(All Rights Reserved)"

পুস্তকখানি ১২।৫ নং লিণ্ড্‌সে ষ্ট্রীট (কলিকাতা) স্থিত Calcutta Printing Works হইতে অমৃতলাল দে কর্তৃক মুদ্রিত।

দুই পৃষ্ঠাব্যাপী সূচীপত্র ও দুই পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকা ব্যতীত গ্রন্থখানি রয়েল ১৬ পেজী আকারে ২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এই দুইশত পৃষ্ঠার মধ্যে গ্রন্থকার লিখিত ১৮ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি সুচিন্তিত Preface বা অনুক্রমণিকা আছে। গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য গ্রন্থকার গ্রন্থ মধ্যে ২২৩ খানি চিত্র প্রদান করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সংগৃহীত পুস্তকে একখানি চিত্রও নাই।

ছয়টি পরিচ্ছেদে গ্রন্থখানি সমাপ্ত। অনুক্রমণিকা ও প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক লিঙ্গপূজার উৎপত্তির কারণ নির্ণয়ের জন্য কতকগুলি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং তিনি অনেক প্রাচীন ও আধুনিক যুগের চিন্তাশীল ব্যক্তির পদাঙ্ক অনুসরণ দ্বারা এই সিদ্ধান্তসমূহে উপনীত হইয়াছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রাচীন ভারত, মিশর, ফিনিশিয়া, জুডিয়া এমন কি ফ্রান্স, স্পেন, বৃটেন, আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি ভূখণ্ডেও অন্তত কয়েক শতাব্দী পূর্বে এই পদ্ধতি কিরূপ বিভিন্ন আকারে অনুসৃত হইত তাহা একে একে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগ হইতে

এই ধারা বহিয়া আসিয়া কিরূপে বর্তমান যুগের বহু ধর্মমতের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ফল্গুর মত আত্মগোপন করিয়াছে, তাহা গ্রন্থকার তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিবৃত করিয়াছেন। পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিভিন্ন দেশে প্রচ্ছন্নভাবে আচরিত নারীচিহ্নের প্রতীক-পূজাপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ষষ্ঠ বা শেষ পরিচ্ছেদে নরনারীর যৌন-সংযোজনার প্রতীককে মানব কেমন করিয়া উপাসনার অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহা গ্রন্থকার প্রদর্শন করিয়াছেন।

অমৃতলাল এই পুস্তক রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, এমন অনেক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, যাহা আধুনিক যুগে অনেকের নিকট রুচিসঙ্গত বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু তাঁহার ভাষা, ভাব ও লিখিবার ভঙ্গীতে এমন একটা সংযমের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে উহা কুত্রাপিও অসহনীয় হইয়া উঠে নাই। আরও তিনি দেখাইয়াছেন যে, আদিমযুগে মানবীয় সভ্যতার শৈশবাবস্থায় যখন মানব কর্তৃক এই প্রকার উপাসনাপদ্ধতি উদ্ভাবিত হইয়াছিল, সরল শিশুপ্রকৃতি অকৃত্রিম মানব এই সকল পদ্ধতির মধ্যে কোন প্রকার কুরুচি বা অশ্লীলতার অস্তিত্ব অনুভব করিত না। তিনি বলিয়াছেন—"Indeed, it probably never occurred to the minds of the simple people that any work of nature—much less its highest and holiest activity—producing its crowning work of creation—man—could be indelicate—much less offensive or obscene."* গ্রন্থকার যথেষ্ট আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সরলতা লইয়া এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছেন এবং এই সহজ সাধন-পদ্ধতির পশ্চাতে যে গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে, সেটুকুর সংবাদও তিনি সুন্দরভাবে দিয়াছেন।

অমৃতলালের স্বরচিত ১০ খানি পুস্তকের মধ্যে ৮ খানির পরিচয় প্রদত্ত হইল। অবশিষ্ট দুইখানির পরিচয় উহাদের বিজ্ঞাপন হইতে প্রদান করা গেল। এই পুস্তক দুইখানির নাম—

(১) Kamarupa and Kamalata.

* Introduction, p. 11

(২) Pleasures of Married Life.

প্রথম পুস্তক 'Kamarupa and Kamalata' উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত। প্রাচীন ভারতের কোনও রাজকুমার ও রাজকুমারীর প্রণয়-কাহিনী অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন যুগে ভারতে রাজকুমারী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইবার পূর্বে কিরূপভাবে পূর্বরাগে প্রবৃত্ত হইতেন, এই পুস্তকপাঠে তাহার কতকটা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতীত ভারতের রাজ-পরিবারের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, বিবাহ-পদ্ধতি প্রভৃতির বিবরণ এই আখ্যায়িকা-পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের সভ্যতারও কিছু কিছু পরিচয় এই পুস্তকখানিতে আছে। এই পুস্তকের মূল্য ১৲ এক টাকা।

দ্বিতীয় পুস্তকখানির নাম 'Pleasures of Married Life'। বিজ্ঞাপনে ইহার মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এই পুস্তকখানিতে বিবাহিত ব্যক্তিগণ কিরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারেন সেই বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা আছে। দম্পতীর বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতিকর বহু উপদেশ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রকাশিত গ্রন্থমালা

অমৃতলালের স্বরচিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৬৮ খানি। তন্মধ্যে বিভিন্ন গ্রন্থকার ও গ্রন্থকর্ত্রী লিখিত পুস্তকের সংখ্যা ৬ খানি। এই ৬ খানি বাদ দিলে যে ৬২ খানি পুস্তক অবশিষ্ট থাকে সেগুলির গ্রন্থকারের নাম জানা যায় না। এই ৬২ খানি পুস্তকের মধ্যে মাত্র ২২খানি পাওয়া গিয়াছে। এইগুলির পরিচয় একে একে প্রদত্ত হইল।

১। Philosophy of Human Nature

এই পুস্তকখানি আকার রয়্যাল ১৬ পেজী আকারের ১৯২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পুস্তকখানির প্রারম্ভে—প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষদেশে ইহার পরিচয় স্বরূপ যাহা লেখা আছে তাহা এই—

"Philosophy of Human Nature
containing
A Complete Theory
of
Human Interests ;
To which is added
An Essay on the Origin of Evil."

এই গ্রন্থে মানব-প্রকৃতির তত্ত্বালোচনা করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বহু তথ্যের সমাবেশ এই পুস্তকে আছে। এইগুলি ব্যতীত পাপের মূল সম্বন্ধে একটি সন্দর্ভও ইহাতে বর্তমান। পুস্তকখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে আছে সূচনা—সূচনায় মানব-প্রকৃতির বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। মানুষ কতকগুলি নীতি বা মতবাদ ধরিয়া থাকে এবং তদনুসারে কার্য করে। ক্রমে তাহা অভ্যাসে এবং অভ্যাস হইতে স্বভাবে পরিণত হয়। তারপর মূলত এক হইলেও বিভিন্ন মতের সংঘর্ষ, বৈচিত্র্যের ভিতর একত্ব, বৈষম্যের মধ্যে সাম্য ইত্যাদির আলোচনাও প্রথম অধ্যায়ে করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মানব-মনের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, মনোবৃত্তি, বয়োধর্মে শরীর-ক্ষয়ের সহিত মানসিক শক্তির অপচয়, মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ, বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ, বিচার-বুদ্ধি, মানসিক উত্তেজনা ইত্যাদি এই আলোচনার মূলীভূত। তৃতীয় অধ্যায়ে স্বার্থবুদ্ধি ও আত্মপ্রেমের আলোচনা দেখা যায় ; মানুষ সকলের আগে চায় আপনার ভাল, সে সকলের আগে দেখে আপনার স্বার্থ, আত্মসুখ। চতুর্থ অধ্যায়ে ভোগ-বিলাসের আনন্দ, ইন্দ্রিয়-সুখের ইচ্ছায় শরীর ও মনের সহযোগিতা, অনুভূতি, ভোগ-সুখের আস্বাদ ও সৌন্দর্যজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে রিপু, প্রেম, ঘৃণা, সুখ, দুঃখ, ক্রোধ, ভয়, অভিমান, বিনয়, প্রশংসা, আশা, নৈরাশ্য, হাস্য প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা আছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে মানুষের নিত্য নূতন আনন্দ লাভের ইচ্ছা সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

২। Woman

এই পুস্তকখানি রয়্যাল ষোল পেজী আকারের ৩০৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইংরেজী বর্জাইস্ অর্থাৎ ক্ষুদ্র অক্ষরে মুদ্রিত। পুস্তকখানির প্রচ্ছদপত্রে যাহা লেখা আছে তাহা এই—

"WOMAN
Physiologically considered as to
MIND, MORALS, MARRIAGE,
Matrimonial slavery,
Infidelity and Divorce.
By Alexander Walker.
'Poor thing of usages! coerced, compell'd ;
Victim when wrong, and martyr oft when right.'
Byron.
Calcutta:
Lewis & Co., 71, Bentinck Street.
1883"

এই পুস্তকখানি অমৃতলাল দে মহাশয়ের প্রকাশিত গ্রন্থমালাভুক্ত। গ্রন্থখানি সাত খণ্ডে বিভক্ত ; ইহাতে নারী সম্বন্ধে বহু বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

৩। Amativeness

এই পুস্তকখানির আকার রয়্যাল ১৬ পেজী ; পৃষ্ঠার সংখ্যা ১০৩। ইহাতে গ্রন্থকারের বা মুদ্রাকরের নাম নাই এবং কোন্ সালে ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল তাহারও কোন উল্লেখ নাই। প্রচ্ছদপত্র নিম্নরূপ—

"Amativeness
...
Including warning and valuable advice
To the Married and the Single.
Calcutta:
Lewis & Co., Publishers & Booksellers.
(All Rights Reserved.)"

পুস্তকখানি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে মানুষ যে ইন্দ্রিয়ের দাস, ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার প্রবৃত্তি যে মানুষের স্বভাবগত তাহারই উল্লেখ দেখা যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্বাস্থ্যনাশ, দেহক্ষয়, মানসিক শক্তির অপচয়, স্নায়ুসমূহের দুর্বলতা, মস্তিষ্কের শক্তিহ্রাস প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বিবাহিত জীবনে সংযমের ফলে পুত্রকন্যার স্বাস্থ্য বৃদ্ধি, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের শারীরিক ও মানসিক শক্তির উন্নতি ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা আছে। চতুর্থ অধ্যায়ে কিভাবে বিভিন্ন আকারে প্রচ্ছন্ন আবরণের অন্তরালে অসংযমভাব ফুটিয়া উঠে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে অত্যধিক ইন্দ্রিয়াসক্তি ও তাহার প্রতিকারের উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে শীতল জলে স্নান ও অঙ্গ ধৌত করণ, সকল প্রকার উত্তেজক আহার্য ও পানীয় বর্জন, আলস্য ত্যাগ, অধিকাংশ সময় কার্যে প্রবৃত্ত থাকা—এগুলি প্রতিকারের উপায়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে মানুষের মনে কিরূপে অকালে অসংযত প্রবৃত্তির বিকাশ হয়, তাহার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে এবং উহা নিরোধ করিবার উপায়স্বরূপ অহিতকর উপন্যাস বর্জন, উত্তেজক মসলাযুক্ত মাংস এবং কফি, চা প্রভৃতি আহার্য দ্রব্য ত্যাগের উপদেশ আছে। সপ্তম অধ্যায়ে বংশরক্ষা বিষয়ক উপদেশ এবং সেই উপদেশ কিরূপে প্রতিপালন করিতে হইবে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

পুস্তকখানিতে মানুষকে সংযত হইয়া জীবনকে সুখময় করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

৪। Diseases of the Urinary Organs and Generative System

এই পুস্তকখানির আকার রয়্যাল ১৬ পেজী আকারের ৩০০ পৃষ্ঠার উপর। সম্পূর্ণ পুস্তক পাওয়া যায় নাই। ইংরেজী বর্জাইস অক্ষরে ইহা মুদ্রিত। পুস্তকখানির টাইটেল-পেজে নিম্নরূপ লেখা আছে—

"Diseases
of the
Urinary Organs

and
Generative System
with
The Most Efficacious Means for their
Relief and Cure.
By
FOTHERGILL & CO.,
Pharmaceutical and Manufacturing
Chemists.
Calcutta:
Lewis & Co., 71, Bentinck Street.
1885"

এই পুস্তকখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে চারিটি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে পাঁচটি অধ্যায়; উভয় খণ্ডে স্ত্রী ও পুরুষের বহুবিধ পীড়ার কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায় লিপিবদ্ধ আছে।

৫। The Three Ways of Living

ইহা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা; রয়্যাল ১৬ পেজী আকারের মাত্র ২৮টি পৃষ্ঠা ইহাতে আছে। মূল্য আট আনা। ইহার টাইটেল-পেজে যাহা লেখা আছে তাহা এই—

"The
Three Ways of Living
being
A very useful
and
Instructive Book of Advice
to all.
Calcutta:
Lewis and Co., 71, Bentinck Street.
1883"

কি প্রকারে সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্বাহ করা যাইতে পারে পুস্তক-খানিতে তাহাই অল্প উপদেশের মধ্য দিয়া বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা খুব প্রাঞ্জল।

৬। The Calcutta Police Court

ইহা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ; আকার রয়্যাল ১৬ পেজী ১০ পৃষ্ঠা মাত্র। পুস্তিকাখানি আগাগোড়া ব্যঙ্গ কবিতায় রচিত। ইহার রচয়িতা A. F. Heberlet সংবাদপত্রের রিপোর্টার ছিলেন। পুস্তকখানির মলাটের উপর যাহা মুদ্রিত আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"Price Eight Annas
The
CALCUTTA POLICE COURT,
A
Serio-Comic Poem.
By
A. F. HEBERLET,
Reporter.
Calcutta:
LEWIS & CO.,
2, Old Court House Corner, Dalhousie
Square East.
1882
(All Rights Reserved.)"

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি কলিকাতা ৩০৯ নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থিত বোস প্রেসে, জি সি বোস এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছিল।

পুস্তকখানির কবিতাগুলি সেই সময়ের পুলিশ কোর্টের হাকিম, উকীল, পুলিশ কর্মচারী, সংবাদ-পত্রের রিপোর্টার ইত্যাদির বিষয় লইয়া রচিত। কবিতাগুলি হইতে জানিতে পারা যায় যে, স্বর্গীয় বিহারীলাল গুপ্ত এক সময়ে পুলিশ কোর্টের প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি স্থির, ধীর ও শান্ত ছিল। অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটের মধ্যে যদু (সম্ভবত

যদুনাথ মল্লিক মহাশয়), ঘোষাল, মল্লিক ও অমৃত মিত্রের উল্লেখ আছে। কবিতাগুলি পাঠে আরও জানা যায়,—সে সময়ে সরকারী উকিল ছিলেন—হিউম সাহেব। তিনি ব্যতীত 'কফারেল স্মিথ, ক্রানেনবরা, মোজেস, গোপাল শীল, কানাই মুখুজ্যে, ম্যানুয়েল' প্রভৃতি পুলিশ কোর্টের খুব পশারওয়ালা উকীল ছিলেন। এখন পশুক্লেশ-নিবারণী সমিতির নিযুক্ত কর্মচারীরা পীড়িত পশুদিগের দ্বারা গাড়ী ইত্যাদি চালাইলে অথবা পশুপক্ষী-দিগকে যন্ত্রণা দিলে অত্যাচারীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া থাকেন। সে সময় Humane Societyর পাঁচজন প্রতিনিধি পুলিশ আদালতে উপস্থিত থাকিয়া অপরাধীদিগের দণ্ড বিধানে সহায়তা করিতেন।

গ্রন্থকারের নামহীন পুস্তকের আলোচনা

নিম্নে যে সমস্ত পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম নাই, সেই সমস্ত সংগৃহীত গ্রন্থের আলোচনা লিপিবদ্ধ হইল।

১। The Artistic Photographic Views of India

ইহা একখানি ছবির বই। হাফটোন ব্লক হইতে এই সকল ছবি ছাপা হইয়াছে। ছবিগুলি আর্ট পেপারে অতি সুন্দর রূপে মুদ্রিত। এই ছবির বইখানির মলাটের উপর "Lewis & Co., Calcutta" সোনার জলে ছাপা আছে।

এই ছবির বইখানিতে যতগুলি ছবি ছাপা হইয়াছে তাহাদের পরিচয় ও সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) কলিকাতার গড়ের মাঠে অবস্থিত অক্টারলোনির সমুচ্চ স্মৃতি-স্তম্ভ হইতে গৃহীত কলিকাতার দৃশ্য।

(২) কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট প্রাসাদ।

(৩) ড্যালহৌসী স্কোয়ার বা লালদীঘি, কলিকাতা।

(৪) হাইকোর্ট, কলিকাতা।

(৫) চৌরঙ্গীর ইউনাইটেড সার্ভিস ক্লাব-ভবনের সম্মুখভাগের দৃশ্য, কলিকাতা।

(৬) চৌরঙ্গীর গ্র্যাণ্ড হোটেল, কলিকাতা।
(৭) গ্রেট ইষ্টার্ণ বা উইলসনের হোটেল, কলিকাতা।
(৮) ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটের দৃশ্য, কলিকাতা।
(৯) বাংলা গভর্ণমেণ্টের দপ্তর (রাইটার্স বিল্ডিংস্), কলিকাতা।
(১০) হাবড়ার পুল, কলিকাতা।
(১১) হাবড়ার পুল হইতে উত্তর দিকে ভাগীরথীর দৃশ্য।
(১২) নিমতলার শ্মশান ঘাটের দৃশ্য, কলিকাতা।
(১৩) কলিকাতার উপকণ্ঠে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনস্থিত বিখ্যাত বটবৃক্ষ।
(১৪) কলিকাতায় মহরমের মিছিল।
(১৫) গভর্ণমেণ্ট প্রাসাদ, বারাকপুর।
(১৬) ব্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ড ও চৌরাস্তা, দার্জ্জিলিং।
(১৭) দার্জ্জিলিংয়ের দৃশ্য।
(১৮) ভিক্টোরিয়া টারমিনাস্ ষ্টেশন, বোম্বাই।
(১৯) বোম্বাই সহরের ইউনিভার্সিটি ক্লক টাওয়ার হইতে বোম্বাই সহরের দৃশ্য।
(২০) পার্শীদিগের শ্মশান (Tower of Silence), বোম্বাই।
(২১) বোম্বাই সহরের বিশিষ্ট রাজপথ—এসপ্ল্যানেড রোড।
(২২) বোম্বাই সহরে দেশীয় অধিবাসীদিগের বাসস্থানের দৃশ্য।
(২৩) রয়্যাল ইয়াট ক্লাব-ভবন, বোম্বাই।
(২৪) বোম্বাই বন্দরে জাহাজসমূহের দৃশ্য।
(২৫) এপোলো বন্দর, বোম্বাই।
(২৬) মালাবার পাহাড় হইতে পূর্বদিকে বোম্বাইয়ের দৃশ্য।
(২৭) হাইকোর্ট, মাদ্রাজ।
(২৮) তরুবন মল্লাইয়ের প্রসিদ্ধ মন্দিরের দৃশ্য, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি।
(২৯) মাদুরার প্রসিদ্ধ মন্দিরস্থিত পবিত্র কুণ্ড বা পুষ্করিণী, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি।
(৩০) মাদুরার প্রসিদ্ধ মন্দিরের 'গোপুরম্' বা চূড়ার দৃশ্য।

(৩১) কলম্বোর সমুদ্রোপকূলবর্তী প্রধান বিহার-স্থান—গল্ ফেস (The Galle Face), সিংহল।

(৩২) গ্র্যাণ্ড ওরিয়েন্টাল হোটেল, কলম্বো।

(৩৩) ব্যাটারী রোডের দৃশ্য, সিঙ্গাপুর।

(৩৪) কলম্বোর প্রসিদ্ধ রাজপথ—গল্ হাইওয়ে (The Galle Highway)।

(৩৫) মাউন্ট ল্যাভিনিয়া হোটেল, কলম্বো।

(৩৬) হ্রদ ও বৌদ্ধ মন্দিরের দৃশ্য, ক্যাণ্ডি, সিংহল। এই বৌদ্ধ মন্দিরে বুদ্ধদেবের দন্ত রক্ষিত আছে।

(৩৭) প্রাচীন নগর অনুরাধাপুরের ধ্বংসাবশেষের একাংশ ও যুপরমা ডাগোবার দৃশ্য, সিংহল।

(৩৮) সমুদ্রের বাঁধ, কলম্বো।

(৩৯) টমাস জে লিপটনের লিম্যাষ্টোটল্ চা-বাগিচা, সিংহল।

(৪০) শ্মশান ঘাট, বারাণসী।

(৪১) সিপাহী-বিদ্রোহের ভীষণ স্মৃতিযুক্ত কূপ, কানপুর।

(৪২) হোসেনাবাদ, লক্ষ্ণৌ।

(৪৩) রেসিডেন্সি, লক্ষ্ণৌ।

(৪৪) তাজমহল, আগ্রা।

(৪৫) জুম্মা মসজিদ, দিল্লী।

(৪৬) ঔরঙ্গজেবের মসজিদ, লাহোর।

(৪৭) জয়পুর, রাজপুতানা।

(৪৮) দরবার সাহিব বা সুবর্ণমন্দির ও অমৃত সরোবর, অমৃতসর।

(৪৯) জলাশয় মধ্যবর্তী প্রাসাদের দৃশ্য, উদয়পুর।

(৫০) 'রত্ন হ্রদ'—আবুশৈল, রাজপুতানা।

(৫১) হায়দ্রাবাদে মহরমের মিছিল, নিজামরাজ্য।

(৫২) ইরাবতী নদীবক্ষ হইতে রেঙ্গুন সহরের দৃশ্য, ব্রহ্মদেশ।

(৫৩) গভর্ণমেণ্ট প্রাসাদ, রেঙ্গুন।

(৫৪) সোয়েডাগান প্যাগোডা, রেঙ্গুন।

(৫৫) উৎসবচঞ্চল মান্দালয় নগরের দৃশ্য, ব্রহ্মদেশ।

(৫৬) বেসিন—শ্যামরড হোটেল হইতে গৃহীত একটি দৃশ্য, ব্রহ্মদেশ।

(৫৭) ভামো—ষ্টীমার ঘাটের দৃশ্য, ব্রহ্মদেশ।

(৫৮) ক্যাভানাঘ ব্রিজ বা সেতুর দৃশ্য, ব্রহ্মদেশ।

(৫৯) ক্যাণ্টনমেণ্ট গার্ডেন্‌স্‌, রেঙ্গুন।

(৬০) সোয়েডাগান প্যাগোডার সুবৃহৎ ঘণ্টার দৃশ্য, রেঙ্গুন।

(৬১) ফুঙ্গি বা বৌদ্ধ পুরোহিত।

(৬২) চীনাদের প্রাচীন মন্দির।

(৬৩) শিকারের হাতী শিকারে নিহত ব্যাঘ্র বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে—মধ্যপ্রদেশের বাঘ শিকারের একটা দৃশ্য।

যে সময়ে এই ছবির বইখানি ছাপা হইয়াছিল সে সময়ে কোনও বাঙালী গ্রন্থকার বা পুস্তক প্রকাশক ছবির বই ছাপিতে অগ্রগামী হইতেন না। তখনকার দিনে অমৃতলাল এই কার্যে পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। তাঁহার এই ছবির বইখানি বিদেশীয় ভারত-ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্যই রচিত হইয়াছিল।

২। The History and Philosophy of Marriage

পুস্তকখানির আকার রয়্যাল ১৬ পেজী। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা যে কত তাহা জানিবার উপায় নাই; কারণ, সংগৃহীত পুস্তকে সকল পৃষ্ঠাগুলি নাই—মাত্র ১৮০ পৃষ্ঠা আছে। পুস্তকখানির টাইটেল-পেজে যাহা লিখিত আছে তাহা এই—

"The
History and Philosophy
of
Marriage
or
Polygamy and Monogamy
compared.

Calcutta:
Lewis and Co., 5, Lindsay Street,
Chowringhee.
[All Rights Reserved.]"

পুস্তকখানিতে এক বিবাহ ও বহু বিবাহের তুলনামূলক আলোচনা আছে।

পুস্তকখানিতে রচয়িতার নাম নাই, কিন্তু তিনি একজন আমেরিকাবাসী। তিনি নিজ পরিচয় দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"I am a native of New England" অর্থাৎ নিউ ইংল্যাণ্ড তাঁহার জন্মভূমি। অমৃতলাল দে মহাশয় প্রতিষ্ঠিত লুইস কোম্পানী এই গ্রন্থখানির প্রকাশক।

৩। The History of the Female Sex

এই পুস্তকখানির আকার রয়্যাল ৩২ পেজী; পৃষ্ঠার সংখ্যা ১১০। পুস্তকখানির টাইটেল-পেজে এইরূপ লেখা আছে—

"The
History of the
Female Sex
containing matter very curious
and
interesting.
Calcutta:
Lewis and Co.
Printed for the Publishers, Lewis and Co.,
by C. S. Boileau, at the Calcutta Printing
Company, No. 71, Bentinck Street.
1885"

পুস্তকখানির মূল্য দেড় টাকা,—মলাটের উপর ইহা মুদ্রিত আছে। পুস্তকখানির নামের অর্থ—নারী জাতির ইতিহাস। নারীজাতি আদিম বিবাহের যুগ হইতে বর্তমান সভ্যযুগের সমুন্নত বিবাহের যুগে কিরূপে উপনীত হইয়াছে, কেমন করিয়া তাহারা একটির পর একটি সভ্যতার

সোপানে আরোহণ করিয়াছে, তাহার বিষয় এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

৪। Man Metamorphosed

এই পুস্তকখানির আকার রয়্যাল ১৬ পেজী ; ইহা ২১১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পুস্তকখানির টাইটেল-পেজে যাহা লেখা আছে তাহা এই—

"Man Metamorphosed
A
New Novel,
Full of Incidents of Nature and Art,
Dramatic, Narrative and Pictorial.
The author's themes, aims, method and
performances excite the widest attention
and the liveliest discussions
throughout the whole of Europe and America.
Readers will find the book a curiosity to
say the least of it.
Calcutta:
Lewis and Co., 71, Bentinck Street,
1886
[All Rights Reserved.]"

ইহা একখানি ফরাসী উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ। দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে মানুষ কিরূপে ধর্মপথে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে সমর্থ হয়, এক সরলপ্রাণা বালিকার জীবনে তাহা উজ্জ্বল ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। মানুষ যতদিন সৎপথে থাকিয়া তাহার কর্তব্য সাধন করিয়া যায়, ততদিন সংসারে তাহার কোনও কষ্ট থাকে না। কিন্তু পাপের পথে নিপতিত হইলে তাহার জীবন কিরূপ দুঃখময় হয়, এই পুস্তকখানিতে মোটের উপর তাহাই দেখান হইয়াছে। ইহাতে ফরাসী জনসাধারণের আচার-ব্যবহার, ফ্রান্সের নগরবাসী দরিদ্রগণের জীবন-যাপন-পদ্ধতি, মানুষকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম করিবার জন্য ফরাসী জাতির প্রয়াস ইত্যাদির বর্ণনা আছে।

৫। Lover's Stratagem

এই পুস্তকখানির আকার রয়্যাল ১৬ পেজী এবং ১১০ পৃষ্ঠায় ইহা সম্পূর্ণ। ইহাও একখানি উপন্যাস। পুস্তকখানির টাইটেল-পেজ এইরূপ—

"The
Lover's Stratagem
A Most Interesting Tale.
Calcutta:
Lewis and Co., 71, Bentinck Street.
1889"

এই উপন্যাসখানির রচয়িতার নাম পুস্তকখানির কোথাও মুদ্রিত নাই। এক জার্মাণ-পরিবারের কাহিনী লইয়া উপন্যাসখানি রচিত।

৬। A Vagabond Heroine

ইহা একখানি উপন্যাস। ইহার আকার রয়্যাল ১৬ পেজী; ১৬৭ পৃষ্ঠায় ইহা সম্পূর্ণ। পুস্তকখানি কোন্ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কোনও উল্লেখ ইহাতে নাই। টাইটেল-পেজে যাহা লেখা আছে তাহা এই—

"A Vagabond Heroine
A
Pleasant Novel.
Calcutta:
Lewis and Co., 71, Bentinck Street.
[All Rights Reserved.]"

১৫টি অধ্যায়ে এই উপন্যাসখানি সম্পূর্ণ।

৭। Thirty Years in the Harem

পুস্তকখানির আকার রয়্যাল ১৬ পেজী, পৃষ্ঠা-সংখ্যা সর্বশুদ্ধ ২০০। পুস্তকখানির টাইটেল পেজ নিম্নরূপ—

"Thirty Years in the Harem
or the
Autobiography of
Melek-Hanum,
wife of
H. H. Kibrizli-Mehemet-Pasha.
Calcutta:
Lewis and Co., 71, Bentinck Street.
1888
[All Rights Reserved.]"

এই পুস্তকখানি ৩৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহা কিবরিজ্‌লি মহম্মদ পাশার পত্নী মালেক হানুমের আত্মজীবনী। ইহাতে ৩০ বৎসরের তুর্ক অন্তঃপুরের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

৮। The Lady Nana

এই পুস্তকখানির আকার রয়্যাল ১৬ পেজী এবং ইহা ৩৫৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। পুস্তকখানির টাইটেল-পেজে এইরূপ লেখা আছে—

"The
Lady Nana
A
New Novel.
Translated from French. Complete and
Unabridged. Full of incidents of
Nature and Art, Dramatic,
Narrative and Pictorial."

৯। The Philosophy of Beauty

ইহা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক; আকার রয়্যাল ১৬ পেজী; ইহাতে সর্বশুদ্ধ ৩৪টি পৃষ্ঠা আছে। পুস্তকখানি যে ছাপাখানায় ছাপা হইয়াছে তাহার নাম—"The Calcutta Printing Works"। ইহার মলাটে যাহা মুদ্রিত আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"The
Philosophy of Beauty,
containing
most instructive & interesting matters on
Material and Abstract Beauties,
their Degrees and Uses
&c., &c., &c.,
From the perusal of which
Readers will be able to ascertain
in what Beauty really consists ;
Calcutta :
Lewis & Co., Publishers & Book-sellers.
[All Rights Reserved.]"

সৌন্দর্যের দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনাই পুস্তকখানির লক্ষ্য।

ইহা সৌন্দর্য-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক। ইহাতে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা, নারীর সৌন্দর্য, স্বভাবের সৌন্দর্য, সৌন্দর্যের পরিমাপ, সৌন্দর্যের উপর আচার-ব্যবহার ও পোষাক-পরিচ্ছদের প্রভাব, শারীরিক ও মানসিক সৌন্দর্যের বিষয়ে আলোচনা-মূলক কয়েকটি সন্দর্ভ আছে। পুস্তকখানি ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

১০। How to Acquire Beauty

পুস্তকখানির আকার রয়্যাল ১৬ পেজী ; ৮৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। "দি ক্যালকাটা প্রিন্টিং কোম্পানী"র ছাপাখানা ৭১ নং বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে T. Blaquierre কর্তৃক ইহা মুদ্রিত। ইহার টাইটেল-পেজে যাহা ছাপা আছে তাহা এই—

"How to Acquire Beauty
And
The Best Methods of Preserving
it till death.
Containing Hints on Toilette, &c.,
A necessary book for the Boudoir.

Calcutta:
Lewis & Co.. 71, Bentinck Street.
1886

সৌন্দর্যের উৎকর্ষ বিধানের উপায় পুস্তকখানিতে বর্ণিত হইয়াছে।

১১। The Young Wife's Book

এই বইখানির আকার রয়্যাল ৩২ পেজী এবং ইহা ২৭৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহার টাইটেল-পেজে যে পরিচয় মুদ্রিত আছে তাহা এই—

"The
Young wife's Book,
A manual
of
Moral, Religious, and Domestic Duties.
Lewis & Co., 71, Bentinck Street.
1887"

সংসারে স্ত্রীর কর্তব্য কি—নব-পরিণীতাকে তাহা বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা এই পুস্তকখানিতে করা হইয়াছে। আত্মীয়-স্বজনগণের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, দাস-দাসীদের সহিত কিরূপ ব্যবহারে তাহারা অনুগত থাকে, কেমন করিয়া মিতব্যয়িতার অভ্যাসে পারিবারিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হয়, পোষাক-পরিচ্ছদ, সন্তান-পালন, শিষ্টাচার, পারিবারিক জীবনে নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় পুস্তকখানির গৌরব বর্ধিত করিয়াছে। এই পুস্তকখানিতেও গ্রন্থকারের নাম ছাপা নাই।

১২। A Whisper to a Married Pair

পুস্তকখানির আকার রয়্যাল ১৬ পেজী; ১১৩ পৃষ্ঠায় ইহা সম্পূর্ণ। ইহার টাইটেল-পেজে যাহা লেখা আছে তাহা এই—

"A Whisper
to a
Married Pair
From
A Widowed Wife.
Calcutta:
Lewis & Co., 71, Bentinck Street,
1886
[All Rights Reserved.]"

এই পুস্তকে স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

১৩। The Husband that will suit you

ইহা ২১৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ রয়্যাল ৩২ পেজী আকারের পুস্তক। ইহার টাইটেল-পেজ নিম্নরূপ—

"The Husband
That will suit you,
and
How to treat him.
His love sincere, his thoughts immaculate;
His heart as far from fraud as
heaven from earth.
Calcutta:
Lewis & Co., 71, Bentinck Street.
[All Rights Reserved.]"

পুস্তকখানিতে বিবাহ সম্বন্ধীয় বহু উপদেশ স্থান পাইয়াছে।

১৪। How A Rupee Became A Hundred Thousand

এই পুস্তকখানির আকার রয়্যাল ১৬ পেজী; ইহা ১১৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কেমন করিয়া একটি টাকা সম্বল করিয়াও ব্যবসা দ্বারা ধনী হওয়া সম্ভব

—এই পুস্তকে তাহারই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পুস্তকের টাইটেল পেজ নিম্নরূপ—

"How A Rupee
Became
A Hundred Thousand.
The silver key to Fortune for every
Young Man
And
To all who would transform a Rupee
to
A Hundred Thousand.
These few pages will sufficiently suggest
what they will do.
Any determined person, possessing
even but one rupee, will be enabled
to start in business for them-
selves, which carried on
according to the rules given,
must end in fortune and
fame as certainly as the
sun pursues his course
in the heavens.
Calcutta:
Lewis & Co., 71, Bentinck Street.
1884
[All Rights Reserved.]"

১৫। Questions on the History of India with Answers

এই পুস্তকখানির আকার ডিমাই ১২ পেজী ; ১৯৮ পৃষ্ঠায় ইহা সম্পূর্ণ ইহার টাইটেল-পেজে নিম্নরূপ লেখা আছে—

"Questions
on the
History of India
with Answers.
Prepared with special reference to the
Calcutta University Entrance Examination.
By
The author of the 'Student's History of India,'
'Questions on the Landmarks of
Ancient History' &c., &c.
Calcutta:
Day and Sons, 336, Upper Chitpore Road.
1870"

পুস্তকখানি বিদ্যালয় পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্র্যান্স পরীক্ষার্থীদিগের সুবিধার জন্য ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে সংক্ষেপে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। ইহা স্কুল-পাঠ্য পুস্তকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। পুস্তকখানির পরিশিষ্টে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাজবংশের বংশলতাও দেওয়া হইয়াছে।

১৬। Helen

এই পুস্তকের সংগৃহীত খণ্ড অসম্পূর্ণ। সংগৃহীত পুস্তকখানিতে ২৪তম অধ্যায়ের কয়েকটি পৃষ্ঠা পর্যন্ত আছে; পুস্তকখানির আকার রয়্যাল ১৬ পেজী; সংগৃহীত পুস্তকে ১৬০ পৃষ্ঠার বেশী নাই। এই পুস্তকের টাইটেল-পেজে যাহা ছাপা আছে তাহা এই—

"HELEN
A Love Episode.
Calcutta:
Lewis & Co., 71, Bentinck Street.
1887
[All Rights Reserved.]"

পুস্তকখানিতে প্যারিসের শিক্ষিত বিলাসি-সমাজের চিত্র প্রতিফলিত।

১৭। The Life of a Beauty

ইহা রয়্যাল ১৬ পেজী আকারের সুবৃহৎ পুস্তক; ৩৩৭ পৃষ্ঠায় ইহা সম্পূর্ণ। পুস্তকখানিতে ৮২টি অধ্যায় আছে। ইহার টাইটেল-পেজে নিম্নরূপ লেখা আছে—

"The
Life of a Beauty
containing
The life-story of Two Women
who were
Born & Bred Beauties.
Calcutta:
Lewis & Co., 5, Lindsay Street.
[All Rights Reserved.]"

ইহা একখানি উপন্যাস।

১৮। A Husband Reformed by his Wife

ইহা একখানি গল্পের বই। ইহাতে মাত্র ১৫টি পৃষ্ঠা আছে; ইহার আকার রয়্যাল ১৬ পেজী। কলিকাতা, ১৯নং লালবাজার ষ্ট্রীটে অবস্থিত 'ষ্টার প্রেসে' ইহা মুদ্রিত। পুস্তকখানিতে মুদ্রাকর, প্রকাশক বা রচয়িতা কাহারও নাম নাই। ইহার টাইটেল-পেজে যাহা লেখা আছে তাহা এই—

"The very interesting and instructive
True Story
A
Husband Reformed
by
His Wife.
Price Annas 8.
Calcutta:
Lewis & Co.,
4, Dalhousie Square East.
1880
(All Rights Reserved.)"

স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর চরিত্র সংশোধিত হইয়াছে—ইহাই এই গল্পের আখ্যান-বস্তু।

১৯। Pilgrim of Love

ইহা রয়্যাল ১৬ পেজী আকারের ১৭ পৃষ্ঠার একখানি ছোট বই। বইখানির টাইটেল-পেজ এইরূপ—

"Pilgrim of Love
A
most captivating
Fairy Romance.
Calcutta:
Lewis & Co.,
71, Bentinck Street.
1883
Price 8 Annas."

তিনটি অধ্যায়ে পুস্তিকাখানি সমাপ্ত। ইহা একখানি মিলনান্ত উপন্যাস।

২০। The Two American Lovers

এই পুস্তকখানির আকার রয়্যাল ১৬ পেজী এবং ইহা ৩০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহার রচয়িতা কে তাহা জানিবার উপায় নাই, কারণ পুস্তকে রচয়িতার নাম ছাপা নাই। পুস্তকখানির টাইটেল-পেজে এইরূপ লেখা আছে—

"The
Two American Lovers,
Or
Ambrose and Eleanor;
A Tale of the
Triumph of True Attachment
and the
Reward of Virtue.
Calcutta:
Lewis & Co., 71, Bentinck Street.
[All Rights Reserved.]"

আমেরিকার স্বাধীনতা-সমরের পূর্ববর্তী অবস্থা গল্পের মধ্য দিয়া পুস্তকখানিতে বিবৃত হইয়াছে।

২১। The Dancer's Guide and Ball-room Companion

এই পুস্তকখানির আকার ১৬ পেজী এবং ইহা ৫৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহার প্রচ্ছদ-পটে যাহা ছাপা আছে তাহা এই—

"The
Dancer's Guide
and
Ball-room Companion.
Lewis & Co.,
Calcutta."

পুস্তকখানি কোন্ ছাপাখানায় ছাপা হইয়াছে, ইহার মুদ্রাকর কে, প্রকাশক কে, অথবা রচয়িতাই বা কে, এ সকলের উল্লেখ পুস্তকের কোথাও নাই।

ইহাতে বল-নৃত্যের আলোচনা বর্তমান।

অমৃতলাল প্রণীত ১০খানি পুস্তকের মধ্যে আটখানি এবং তৎপ্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে যেগুলি সংগৃহীত হইয়াছে সেসকলের বিবরণ প্রদত্ত হইল। বাকী পুস্তকের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এগুলি ব্যতীত তিনি আরও ২।১খানি পুস্তকের মুদ্রণ-কার্য আরম্ভ করেন। সে কয়খানি সম্পূর্ণ এবং প্রকাশিত হয় নাই।

অমৃতলালের অভাবে তাঁহার আরব্ধ পুস্তক-প্রচার ও প্রকাশকার্যে শৈথিল্য ঘটে। কিন্তু তাঁহার স্থাপিত ব্যবসা-কেন্দ্রগুলির মধ্যে Lewis & Co.র আলোক-চিত্রের ব্যবসা বহুদিন পর্যন্ত চলিতে থাকে।

'রহস্য-প্রকাশ'

অমৃতলাল বাংলায় কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই বা তাঁহার পুস্তক-প্রকাশালয় হইতে কোন বাংলা বই প্রকাশের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁহার মৃত্যুর তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৩২০ বঙ্গাব্দে তাঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে মহাশয় বাংলায় "রহস্য-প্রকাশ" নামক একখানি

মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রের প্রথম সংখ্যাখানি হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সম্পাদকের নাম পাওয়া যায় না। ১৩২০ সালের আষাঢ় মাসে "রহস্য-প্রকাশের" প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। পত্রিকাখানির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২।০ এবং প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল।০ আনা। ডিমাই আট পেজী আকারে ৫২ পৃষ্ঠায় (৬।।০ ফর্ম্মা) প্রথম সংখ্যা সমাপ্ত। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধনিচয়ের মধ্যে কতকগুলি স্মলপাইকা এবং কতক-গুলি পাইকা অক্ষরে মুদ্রিত। পত্রিকার মলাট দুই রঙ্গে ছাপা।

পত্রিকাখানি ১০নং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রীট হইতে "Published by Purna Chandra Dey and Printed by G. Dey at the Calcutta Printing Works"। এই ছাপাখানা অমৃতলালই প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। পত্রিকার প্রচ্ছদ-পত্রে, সূচীপত্রের ঠিক উপরে লিখিত আছে—

"রহস্য-প্রকাশ

আবালবৃদ্ধবনিতার পাঠোপযোগী মাসিক পত্র। এই পত্রে সাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়, প্রবন্ধমালা, মনোহর গল্প, উপন্যাস, নাটক ও রহস্য, ধর্ম ও ঐতিহাসিক বিষয়, সাহিত্য-সার, শিল্প, ব্যবসায়, ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রভৃতি নানা বিষয়ের প্রবন্ধ থাকে।" প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ-মালার তালিকা দৃষ্টে ইহার বৈশিষ্ট্য বুঝা যায়।

প্রথম সংখ্যা রহস্য-প্রকাশের প্রবন্ধাবলী

প্রথম সংখ্যায় নিম্নলিখিত ১৬ দফা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে—

১। উদ্দেশ্য

২। বাংলা ভাষা ও বাংলা সাময়িক পত্র

৩। ভারত—(কবিতা)—শ্রীহাজারিলাল সেন

৪। সৌরভ (ঐ)—নিতাইচাঁদ

৫। বাও আর চাও

৬। আকিঞ্চন (কবিতা)

৭। শিয়ানা ও বোকার রূপকথা—রায় শ্রীবিহারীলাল মিত্র

৮। আমাদের সমাজ—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু-মল্লিক

৯। অপূর্ব রঙ্গ-রহস্য
১০। সরল মুষ্টিযোগ—কবিরাজ শ্রীমতীন্দ্রলাল সেনগুপ্ত
১১। কৃত্রিম মুক্তা—শ্রীহাজারিলাল সেন
১২। যুগল চিত্র—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে
১৩। সুশ্রুত কর্তৃক আয়ুর্বেদ প্রচার—কবিরাজ শ্রীমতীন্দ্রলাল সেনগুপ্ত
১৪। কৃষি-তত্ত্ব
১৫। প্রসূনমালা
১৬। প্রাপ্তি-স্বীকার

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে মহাশয় লিখিত "যুগল-চিত্র" একখানি ক্রমশ-প্রকাশ্য উপন্যাস। "শিয়ানা ও বোকার রূপকথায়" ৪খানি কাষ্ঠ--খোদিত চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

সম্পাদক-লিখিত "উদ্দেশ্য" হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"উৎকৃষ্ট সমাজে চৈতন্য, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, প্রতিভা প্রভৃতি সদ্বৃত্তিগুলির স্ফূর্তি এবং উন্নতি হইয়া থাকে। এই সমস্ত সদ্বৃত্তির অনুশীলন হইলে পীড়াগ্রস্ত দুর্বল সমাজের জড়তা কাটিয়া যায়। জড়তার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নবশক্তি সঞ্চার এবং প্রীতির বন্ধন সংস্থাপিত হইয়া থাকে। লোক-রঞ্জনের সহিত জ্ঞান ও নীতিচর্চা দ্বারা শিক্ষাবিস্তার 'রহস্য-প্রকাশে'র মুখ্য উদ্দেশ্য।

"প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, উপাখ্যান, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি যে সকল বিষয়ের অনুশীলন অভাবগ্রস্ত সমাজে মঙ্গলপ্রদ এবং ভাষার উৎকর্ষসাধন পক্ষে হিতকর এরূপ গবেষণাপূর্ণ বিষয়ের নিরপেক্ষভাবে আলোচনা 'রহস্যপ্রকাশ' পত্রের বিশেষ লক্ষ্য।

"জগতে সকল তত্ত্বই রহস্যময়,—সৃষ্টিরহস্য, জীবরহস্য, প্রেমরহস্য, লীলারহস্য প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারই রহস্যপূর্ণ। এই সকল বৈচিত্র্যময় রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটনপূর্বক তাহাদের আভ্যন্তরীণ প্রদেশে প্রবেশ করিয়া যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিতে হইলে চিন্তা, অনুশীলন এবং সাধনার প্রয়োজন এবং ত্রিবিধ শক্তির দ্বারাই এই সব তত্ত্বের রহস্যপূর্ণ ভাণ্ডারে গমনাগমন করিতে হয়। 'রহস্য-প্রকাশের' লক্ষ্য সেই সব তত্ত্বের দ্বার উন্মোচন করা।"

মধুসূদন মল্লিক

'সাধুরঞ্জন সংহিতা আদিশূর-বল্লাল উপাখ্যান'

এই গ্রন্থখানি হুগলি ঘুটিয়াবাজার নিবাসী সুবর্ণবণিক্-কুলোদ্ভব মধুসূদন মল্লিক কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ১২৯৬ সালে (১৮৮৯-১৮৯০ খৃঃ) ইহা বাহির হয়। ৩৭৪নং আপার চিৎপুর রোডস্থ (জোড়াসাঁকো) আর্ট ইউনিয়ন প্রেসে শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত। গ্রন্থখানির মূল্য চারি আনা মাত্র।

পুস্তকখানি ৫৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থের প্রারম্ভে "গীত-বন্দনা" অধ্যায়ে গ্রন্থকারের স্বরচিত চারিখানি গান রাগরাগিণী সহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দে সমগ্র গ্রন্থখানি রচিত।

গান চারখানি পাঠ করিয়া মনে হয়, গ্রন্থকার একজন ভক্ত। একখানি গান এখানে উদ্ধৃত হইল—

"রাগিণী পিলু

হরি নিত্যানন্দ শিবানন্দ চিদানন্দময়।
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড অন্তে মার্তণ্ড উদয়॥
হরি সর্ব সাক্ষ্য জ্ঞান অক্ষ বিশুদ্ধ চিন্ময়।
হরি সর্ব জীবে আবির্ভাব বেদান্তে নির্ণয়॥
সর্বাত্মা জীবাত্মা রূপে দেহীর দেহে রয়।
হরি বাসুদেব বিশ্বম্ভর বারিতে আশ্রয়॥
সৃষ্টি স্থিতি সৃষ্টিনাশ পলকে প্রলয়।
সর্ব সঙ্গ এক অঙ্গ কল্পাগ্নি সময়॥
জীবশক্তি মায়াশক্তি চিৎশক্তি চৈতন্য।
জীবে শিবে সম ভাব যদি মায়া ভিন্ন॥
হরি নির্বিকার নিরাকার নিত্য নিরঞ্জন।
ইচ্ছা হলে করেন হরি সংসার সৃজন॥

দয়াময় দয়া করে মায়া কর ক্ষয়।
সূদনের এই ভিক্ষা হওহে সদয়॥"

আনন্দ ভট্ট বিরচিত "বল্লাল-চরিত" অবলম্বন করিয়া মধুসূদন বাবু এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থমধ্যে নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলি স্থান পাইয়াছে।

গ্রন্থের বিষয়াবলী

১। উৎসর্গ পত্র
২। সনকের স্বদেশ ত্যাগ ও বঙ্গে আগমন
৩। রাজবাটী প্রবেশ ও পরিচয়
৪। রাজাকে উপঢৌকন প্রদান ও সুবর্ণবণিক্ উপাধি এবং স্বর্ণগ্রাম জায়গীর প্রাপ্তি
৫। কুঠি নির্মাণ
৬। আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ
৭। যজ্ঞ আরম্ভ
৮। বল্লাল উপাখ্যান
৯। লক্ষ্মণ সেন
১০। মণিপুর যুদ্ধ
১১। বল্লাল সেনের ডোমনী হরণ
১২। ডোমের উৎপাত
১৩। ডোমনী
১৪। অভিনয়—ডোমনীর প্রবেশ
১৫। ডোমের প্রবেশ
১৬। নাচ
১৭। গীত
১৮। মহারাজার প্রবেশ
১৯। বল্লাল সেনের প্রায়শ্চিত্ত ও যজ্ঞ
২০। নাট্যশালা—অভিনয়
২১। উপসংহার

উৎসর্গ-পত্রে গ্রন্থকারের আত্মপরিচয়

উৎসর্গ-পত্রে গ্রন্থকার মধুসূদন মল্লিক মহাশয় নিজের ও নিজ গোষ্ঠীর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। নিম্নে ইহা উদ্ধৃত হইল—

"মহামতি গোষ্ঠীপতি বাস গঙ্গাতীরে।
ধর্মে রতি কর্মে প্রীতি হুগলি নগরে॥
বিষ্ণুসেবা রাত্রিদিবা হরিনাম জপ।
হরিভক্ত প্রেমাসক্ত হরিকথা তপ॥
বহু গোষ্ঠী দীর্ঘ দৃষ্টি সর্বদা বিনয়।
মিষ্টভাষী গুণরাশি সরল হৃদয়॥
নিত্য মান করে দান বণিক্‌সকল।
গোষ্ঠীপতি এই খ্যাতি মর্যাদা সম্বল॥
সেই অংশে এই বংশে আমি অকিঞ্চন।
ভজনিক দে মল্লিক শ্রীমধুসূদন॥
সদাচারী আজ্ঞাকারী পণ্ডিত চরণে।
জ্ঞানহীন বুদ্ধি ক্ষীণ ক্ষমা কর দীনে॥
পতিরাজ দেবরাজ কর্জনাতে বাস।
আদি পুরুষ সে মানুষ আমি তাঁর দাস॥
বৈশ্য জাতি কৃষ্ণগতি বেদ বিধি মানে।
আর্য অংশে অবতংস সর্বদা ভজনে॥
ধন্য মান্য অগ্রগণ্য দেবপতি রাজ।
অদ্যাবধি এ অবধি মানিছে সমাজ॥
রাঢ়ে বঙ্গে কত শত তোমারি সন্তান।
হাজার হাজার পুত্র নাহি পরিমাণ॥
সহস্রেক বর্ষ গত তব কুলের সূত্র।
এ পর্যন্ত ভোগ করে যত তব পুত্র॥
পরিণামে সপ্তগ্রামে মল্লিকসকল।
রাঢ় ধারে বাস করে যতেক মণ্ডল॥

মানযুক্ত কৃষ্ণভক্ত তোমার পুণ্যেতে।
আশীর্বাদ করি সবি নিবেদি পদেতে॥" পৃঃ ১, ২

পুস্তকে লিখিত পরিচয় ব্যতীত মধুসূদন মল্লিক মহাশয় সম্বন্ধে অন্য কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

ইহার পরে গ্রন্থকার বলিতেছেন—

"বৈশ্য-কুলোদ্ভব কুশল আঢ্য সে বণিক্।
হীরামুক্তা প্রবালাদি প্রচুর মাণিক॥
রজত কাঞ্চনের কথা নাহি পরিমাণ।
কুলের তুল্য ধনাগার বণিক্-প্রধান॥
অযোধ্যা দেশেতে আছে রামগড় স্থান।
সেই স্থানে বাস করেন উক্ত মতিমান॥" পৃঃ ৩

সনক আঢ্যের বঙ্গে আগমন

এই কুশল আঢ্যের পুত্র সনক আঢ্য। বৌদ্ধ-বিপ্লবে কাতর হইয়া ইনি দেশত্যাগ করেন। ছয়চল্লিশ জন বণিক্, গুরু-পুরোহিত, বন্ধুবর্গ ও দাসদাসী লইয়া ইনি বাংলা দেশে আগমন করিলেন। রাজার মত বৈভব ও বহু ধনসম্পত্তি লইয়া ইনি দেশত্যাগ করিলেন—

"সঙ্গে পরিবার সবার আর দাসদাসী।
পদাতিক আশোয়ার অযোধ্যানিবাসী॥
ধনরাশি আনিতেছে শত শত গাড়ী।
তাম্বু কাণাৎ বহিতেছে কত শত করী॥" পৃঃ ৩

বঙ্গে আগমনের পূর্বে ইনি নানা তীর্থ-ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। গোকুল, হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, বারাণসী, গয়া প্রভৃতি স্থান দর্শন এবং ঐ সকল স্থানে তিনি নানা দেবতার পূজা, দানধ্যানাদি কার্য সমাপন করিলেন। তারপর—

"উতরিল পূর্ববঙ্গে ধন অধিকারী।
সনক কনক দাতা বৈশ্য শুদ্ধাচারী॥" পৃঃ ৪

রাজা আদিশূরের সহিত সনক আঢ্যের সাক্ষাৎ

পূর্ববঙ্গের রাজধানী তখন বিক্রমপুরে এবং তাহার রাজা আদিশূর। সনক আঢ্য বিক্রমপুরে আসিয়াই পাত্রমিত্র ও স্বগণ সহিত রাজবাটিতে গমন করিলেন। রাজার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে—

"রাজা বলে কেবা তুমি, পরিচয় চাহি আমি,
কোথা বাস, কি নাম তোমার।
কি কারণে এলে হেতা, কহ মোরে সত্য কথা,
কিবা জাতি তনয় কাহার॥" পৃঃ ৫

ইহার উত্তরে—

"সনক কহিছে সার, শুন রায় সমাচার,
কহি আমি যথার্থ কাহিনী।
অযোধ্যাতে বাস মম, পিতা কুশল উত্তম,
বৈশ্য জাতি গুণে গুণমণি॥
সনক আমার নাম, শুন নৃপ গুণধাম,
ছাড়িয়াছি অযোধ্যা নগর।
সর্বজাতি ধর্মভ্রষ্ট, অযোধ্যাতে পাই কষ্ট,
সর্ব লোক বৌদ্ধ ব্যবহার॥
তাই আমি এই দেশে, শুন রায় সবিশেষে,
বাণিজ্য করিব এই স্থানে।
বণিক্ সকল আসে, দাঁড়াইয়া মম পাশে,
সকল ইহারা গুণ জ্ঞানে॥
তুমি রাজা ধর্মপুত্র, শুনিয়াছি এই সূত্র,
বঙ্গে নাহি অধর্ম আচার।
নৃপতি তোমার যশ, পূরিয়াছে দিক্ দশ,
শুনিলাম সুসূক্ষ্ম বিচার॥
তাই লই তবাশ্রয়, ভাবিয়াছি এ নিশ্চয়,
পদাশ্রয় দাও দয়া করে।

আমি যে হইব ধন্য, তুমি জগতের মান্য,
রাজরাজেশ্বর বিক্রমপুরে ॥" পৃঃ ৫, ৬

তারপর সনক আঢ্য রাজাকে হীরা মাণিক প্রভৃতি নানা মূল্যবান উপঢৌকন দিলেন। এই উপঢৌকন পাইয়া রাজা বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং তিনি ব্রহ্মপুত্র নদের তটে বাসের ও কারবারের জন্য সনক আঢ্যকে সুন্দর ভূমি দান করিলেন। সুবিজ্ঞ রাজা বুঝিলেন, যদি সনক তাঁহার রাজধানীতে বাস করিয়া বাণিজ্য চালায়, তবে তাঁহার নিজের ও রাজ্যের অনেক উপকার হইবে। তাই তিনি যে স্থান সনককে বাস ও কুঠি নির্মাণের জন্য দিলেন, সেই স্থানের বর্ণনা-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"সেখানে অনেক বেণে ব্রহ্মদেশ হতে।
রজত কাঞ্চন আনে ব্যাপার করিতে॥
চীন দেশ হইতে আসে বড় সওদাগর।
হিরণ্য রজত আনে শুনেছি বিস্তর॥
সেই স্থান যোগ্য বটে মহাজনের তরে।
কুঠি কোঠা কর তথা যাহা মনে ধরে॥
তুমি এইখানে থাক ইহা করি আশা।
তোমার সাহায্য চাহি আমার ভরসা॥" পৃঃ ৬

তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, সুপণ্ডিত ও বিজ্ঞ,—বাংলাদেশে তোমার মত লোক দেখি নাই। তুমি আমার 'সৎসখা'; আর মনে রাখিয়ো আমার এ রাজদরবার তোমারই। রাজার মেলানি পাইয়া সনক রাজ-দত্ত ভূমিখণ্ডে বাসোপযোগী গৃহ ও কুঠি নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন।

সনক আঢ্যের নবনির্মিত নগর

ছচল্লিশটি বাড়ী, তাহার চতুর্দিকে প্রাচীর ও গড়খাই নির্মাণ করাইলেন। এই নব-নির্মিত নগরের খুব প্রচার হইল; বহু দোকানপশারী ও লোকজন সনকের এই নগরে বাস করিতে লাগিল। ইহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন—

"মাঠে ঘাটে হইল এই প্রকৃত সহর।
বিক্রম অপেক্ষা এই উত্তম নগর॥
দোকানী পশারী আসি ভরিল এই স্থান।
কারবারে সীমা নাই হস্তিনা সমান॥
চীন মগ ভোগ আর যত সব বেণে।
রজত কাঞ্চন তারা সকলেতে কেনে॥" পৃঃ ৭

'সুবর্ণবণিক্' নামকরণ

এই সমস্ত অবলোকন করিয়া রাজা অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি সনক ও তাঁহার স্বজাতির 'সুবর্ণবণিক্' নামকরণ করিলেন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নগরের নাম দিলেন—"স্বর্ণগ্রাম"। তাম্রফলকে এই নামকরণ তিনি উৎকীর্ণ করিয়া সনককে স্বর্ণগ্রাম জায়গীর-স্বরূপ উপহার দিলেন।

"রাজার দরবারে ইহা হইল পোষণ॥
আনন্দ ভট্টের লিপি তাহার প্রমাণ।
তাম্রফলক বণিক্ হস্তে নাহি বিদ্যমান॥" পৃঃ ৭

খুব খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সহিত স্বর্ণগ্রামে সনক গ্রাম-অধিপতির ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। লোক মধ্যেও তিনি ক্রমে জনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। বিক্রমও তাঁহার যথেষ্ট বাড়িয়া গেল, কেন না তিনি—

"আদিশূরের প্রিয়সখা মন্ত্রী শুদ্ধমতি॥"

নিজের বিষয়কর্ম ও ব্যবসা চালাইয়া—

"কখন কখন তিনি রাজ-সভায় যান।
আদিশূর মহারাজা করেন সম্মান॥" পৃঃ ৭

আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ

বহুদিন অবধি আদিশূরের সন্তানাদি হয় নাই। অতিশয় মনোদুঃখে তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় কালযাপন করিতেছিলেন। পাত্রমিত্র ও হিতৈষিবর্গের পরামর্শে তিনি পুত্র লাভের জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবেন,—ইহা স্থির করিলেন। যজ্ঞের জন্য তিনি ব্রাহ্মণ আনাইলেন, তারপর—

"রাজা কহে বিপ্রবর শুন বিবরণ॥
পুত্রেষ্টি যজ্ঞেতে আমি তোমায় করি ব্রতী।
যজ্ঞ কর রীতিমত আমার আরতি॥" পৃঃ ৮

ইহাতে ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—

"দ্বিজ কহে নাহি জানি পুত্রেষ্টির মন্ত্র।
পাঠ নাহি করি কভু হেন রূপ তন্ত্র॥
বঙ্গেতে নাহিক কেহ যে করাবে যজ্ঞ।
এ বিষয়ে বঙ্গদেশে সব দ্বিজ অজ্ঞ॥" পৃঃ ৮

পুত্রেষ্টি যজ্ঞে পরামর্শদাতা সনক

রাজাকে তখন সনক আঢ্য বলিলেন—"কান্যকুব্জে বহু বেদজ্ঞ ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ আছেন। কান্যকুব্জের রাজাকে পত্র লিখিয়া আপনি লোক পাঠান। তিনি যজ্ঞার্থ উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিবেন।"

সনকের কথা-মত আদিশূর কান্যকুব্জাধিপতির নামে পত্র লিখিয়া দূত পাঠাইয়া দিলেন। পত্র পাঠ করিয়া রাজা—

"আহ্বান করিলেন পঞ্চ বৈদিক ব্রাহ্মণ।
পঞ্চ দাস সঙ্গে দিলেন সেবার কারণ॥
ঐ পঞ্চ কায়স্থ দাস পঞ্চ দ্বিজ সঙ্গে।
প্রথম আইল তারা এই পূর্ব-বঙ্গে॥" পৃঃ ৯

বাংলা দেশে সাগ্নিক ও বেদজ্ঞ এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের দাস-রূপে পঞ্চ কায়স্থের প্রথম আগমন। আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ-সম্পাদনের জন্য ইঁহারা আসেন এবং তাঁহারই অনুরোধে স্থায়ি-ভাবে বাংলা দেশে বাস করেন।

তারপর তাঁহাদের পরামর্শ অনুসারে রাজা ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে যজ্ঞস্থান নির্মাণের অনুমতি দিলেন। মন্ত্রিগণকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন—

"যজ্ঞ-বাটি নির্মাণ করহ শীঘ্রগতি।
বিলম্ব না কর আর মন্ত্রী মহামতি॥
বাটির ভিতরে কর সভা পরিপাটি।
মধ্যে কুণ্ড হবে পরিমাণ হাত ষাটি॥

চার্দিকে বেড়িয়া হবে মঞ্চ মনোহর।
তাতে আসি বসিবেন যত নৃপবর॥
ব্রাহ্মণ বসিবার স্থান রাখ এক ভিতে।
বসিবে সকল শূদ্র উহার পশ্চাতে॥
শিল্পিগণ ডাকি আনি না কর অন্যথা।
পালন করহ আজ্ঞা এই মম কথা॥” পৃঃ ১০, ১১

যজ্ঞ-মণ্ডপ নির্মিত হইবার পর, যজ্ঞ আরম্ভ হইল। বহু ব্রাহ্মণ, নানা স্থান হইতে আগত বহু রাজা ও অভিজাত-সম্প্রদায়ের আগমনে যজ্ঞস্থল পূর্ণ হইয়া গেল। যজ্ঞ সমাপ্তির পর রাজা পঞ্চ ব্রাহ্মণের প্রত্যেককে হীরা-মুক্তা-প্রবাল এবং পাঁচশত করিয়া স্বর্ণমুদ্রা দান করিলেন। বহু দীন-দুঃখী ও অনাথ-আতুরও রাজার দান-লাভে বঞ্চিত হইল না। সমস্ত কাজ শেষ করিয়া রাজা আদিশূর—

“সনক আঢ্যে ডাকি রায় করে আলিঙ্গন।
ধন্য তুমি বৈশ্যরাজ অতি বিচক্ষণ॥
রাজ-প্রসাদ লহ কিছু আমার এই মন।
স্বহস্তে দিলেন তারে বসন ভূষণ॥” পৃঃ ১২

ইহার পর বল্লাল সেনের জন্ম।

বল্লাল সেনের জন্ম লইয়া অনেক কাহিনী ও কিংবদন্তী বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। নানা কুলজী গ্রন্থেও এ সম্বন্ধে নানা উক্তি পাওয়া যায়। গ্রন্থকার আলোচনা করিলেও, এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করা হইল না।

রাজা বল্লাল সেনের প্রকৃতি

আদিশূরের মৃত্যুর পর, বল্লাল রাজা হইলেন। আদিশূর ছিলেন,— বুদ্ধিমান ধার্মিক ও প্রজারঞ্জক রাজা, বল্লাল হইল তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বল্লাল-সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন—

“বল্লাল হইল কর্তা বিক্রমপুরেতে।
রাগে পূর্ণ জ্ঞানশূন্য মাথা কাটে হাতে॥

রাজ্যখণ্ড লণ্ডভণ্ড দস্যুভয় অতি।
জাগরণে ভয় মনে কষ্টে কাটে রাতি ॥
অবিশ্বাসী বনবাসী নরসিংহের ডরে।
সর্বনাশ বনবাস কোন দিন কি করে ॥
ব্যভিচারী দণ্ডধারী দ্বেষী অতিশয়।
নাহি মানে নাহি শুনে ধর্মের বিষয় ॥
রাজ্য করে অবিচারে প্রজা দেশ ছাড়ে।
ধর্ম ভয় নাহি হয় ধর্মকে না স্মরে ॥
মন্ত্রী তন্ত্রী যত যন্ত্রী বসে আছে বোবা।
সবে বাধ্য কার সাধ্য কথা কহে কেবা ॥
নগরে নাহিক লোক পলাইছে ছুটে।
দিনে রেতে রাতবিহারী সর্বস্ব নেয় লুটে ॥" পৃঃ ১৫

বল্লালের অনাচার ও অত্যাচারে রাজ্য-মধ্যে হাহাকার উঠিল। সাধুরঞ্জন অনেকে রাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করিল। রাজ্যের বহুকাল-প্রচলিত প্রথা ও ক্রিয়াদির পরিবর্তন হইল। খামখেয়ালী রাজা নিজের ইচ্ছা-মত অনেক কাজ করিয়া বহু লোকের বিরাগভাজন হইলেন।

কিছুদিন পরে বৈদ্যশ্রেষ্ঠ ভদ্রসেনের কন্যার সহিত মহাসমারোহে বল্লালের বিবাহ হইল। কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইবার পর, একটি সুলক্ষণযুক্ত পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। এই পুত্রের নাম হইল লক্ষ্মণ সেন।

"রূপেতে অশ্বিনী কুমার তুল্য রূপবান ॥
শাস্ত্রজ্ঞ ধর্মজ্ঞ অতিশয় পুণ্যবান।
বৃহস্পতি সম বুদ্ধি শিষ্ট মতিমান ॥
সুশিক্ষিত সে পবিত্র রাজার তনয়।
ধরাধামে সাক্ষাৎ যেন চন্দ্রের উদয় ॥" পৃঃ ১৮

পিতার আজ্ঞায় লক্ষ্মণ সেন চট্টগ্রামের শাসন-কর্তা হইলেন। তাঁহার সুশাসনে প্রজারা সন্তুষ্টচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

মণিপুর যুদ্ধ

কিছুদিন পরে মণিপুর রাজের সহিত বল্লালের যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু বল্লালের রাজকোষ অর্থশূন্য। তিনি মহাভাবনায় পড়িলেন। তাঁহাকে চিন্তান্বিত দেখিয়া মন্ত্রী বলিলেন—

"—শুন রায় পাবে মুদ্রা অতিশয়,
আছে তোমার বণিক্-নন্দন।
বল্লভানন্দ গুণমণি, রাজ আজ্ঞা তিনি শুনি
ধন দিবেন যত প্রয়োজন।" পৃঃ ১৯

বল্লভানন্দ আঢ্যের নিকট বল্লাল সেনের ঋণগ্রহণ

রাজার আজ্ঞা অনুসারে মন্ত্রী স্বর্ণগ্রামে তৎকালীন বণিক্কুলপতি বল্লভানন্দের কাছে গিয়া রাজার কথা জানাইলেন। তিনি বল্লভানন্দকে বলিলেন—

"পঁচিশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা চারি কোটি রজত।
অর্থ ব্যয় হবে যুদ্ধে হিসাব এই মত॥" পৃঃ ২০

রাজার সাহায্যের জন্য বল্লভ এই বিপুল অর্থ রাজাকে ঋণ দিলেন। মন্ত্রী রাজার নিকট এই অর্থ লইয়া গেলে—

"সন্তুষ্ট হইল রাজা পেয়ে ঐ ধন।"

বলভানন্দের অগাধ ঐশ্বর্যের কথা ভাবিয়া রাজার মনে খুবই লোভ জন্মিল, মনে মনে তিনি স্থির করিলেন—

"পাব যত লব তত যত প্রয়োজন।"

বল্লালের ডোমকন্যা বিবাহ

যুদ্ধ-সমাপ্তির পর বল্লাল এমন একটি কাজ করিলেন, যাহাতে তাঁহার অপযশ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

"নগরেতে ছিল এক ধনবান ডোম।
তাঁর কন্যা ঘরে আনে বল্লাল অধম।" পৃঃ ২১

যথাসময়ে এই ঘটনা লক্ষ্মণ সেনের কর্ণগোচর হইল। তিনি মর্মাহত হইয়া লজ্জায় ও ঘৃণায় পিতাকে সংস্কৃতে এক পত্র লিখিলেন। বল্লাল

তাহার উত্তর দিলেন। পরে পিতাপুত্রে এ বিষয় লইয়া বহু পত্র-ব্যবহার হয়। কিন্তু ইহার দ্বারা ঘটনার কোন বিশেষ পরিবর্তন ঘটিল না।

রাজা বল্লালসেনের সহিত বল্লভানন্দ আঢ্যের মনোমালিন্য

পুনরায় মণিপুরের সহিত যুদ্ধের আয়োজন হইলে, বল্লাল বল্লভানন্দের নিকট আরও এক কোটি স্বর্ণমুদ্রা ঋণ চাহিলেন। পূর্বের ঋণ শোধ হয় নাই—তারপর অনেক অর্থ অপব্যয়ে রাজা নষ্ট করিতেছেন এই সকল কারণে বল্লভ এক কোটির পরিবর্তে, এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। রাজা ইহাতে বল্লভের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন। যুদ্ধ শেষ হইবার পর রাজা ডোম-কন্যা-ঘটিত ব্যাপারের প্রায়শ্চিত্ত জন্য এক যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। বহু লোক এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইলেন। রাজার লোক বল্লভানন্দকেও নিমন্ত্রণ করিতে গেল। কিন্তু বল্লভানন্দ স্থির করিলেন—

"পাপী রাজা তুলে ধ্বজা পূর্ববঙ্গ স্থানে।
আমি বৈশ্য বেদ আস্য যাব না সেখানে॥" পৃঃ ৩৫

রাজার ক্রোধ ইহাতে সমধিক বর্ধিত হইল। বল্লভকে তিনি উপযুক্ত দণ্ড দিবার জন্য মনে মনে স্থির করিলেন।

যুবকবৃন্দের নাটক অভিনয়

ইহার পর আর একটি ঘটনায় রাজা বল্লাল ক্রোধে দিশাহারা হইলেন। রাজ্যের বৈদ্য ও বৈশ্য যুবকবৃন্দ মিলিত হইয়া একটি নাটক রচনাপূর্বক অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইল। নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় ডোম-কন্যা ঘটিত ব্যাপার।

"বৈদ্য আর বৈশ্য যুবা করিয়া মন্ত্রণা।
রাজারে দিলেন কঠোর মনের বেদনা॥
মঞ্চের উপরে কত করে অভিনয়।
কিঞ্চিৎ বর্ণনা মাত্র এই স্থানে হয়॥

বালক সকল ছিল অত্যন্ত বাচাল।
সাজিল ডোমের মত কালান্তক কাল॥" পৃঃ ৩২

ইহার ফলে বল্লাল নির্দোষ নিরীহ সুবর্ণবণিক্ জাতির উপর যে অত্যাচার করেন, সর্বজনবিদিত আনন্দ-ভট্টরচিত বল্লালচরিত ও বহু কুলজী গ্রন্থে তাহার সবিস্তার বর্ণনা আছে।

সুবর্ণবণিকের বৈশ্যাচার

উপসংহারে লেখক বলিতেছেন —

"সুবর্ণবণিক্ সব ব্যবসায়ী জাতি।
বৈশ্য ধর্মের পূর্বাপর আছে যেই রীতি॥
দুরাত্মা বল্লাল সেন ছাড়ায় বেদাচার।
অদ্যাবধি কতকগুলা আছে ব্যবহার॥
সুবর্ণ-ব্যবসা জন্য সুবর্ণবণিক্।
বিশেষণ সুবর্ণ কহিলাম সে অধিক॥
বিশেষ্য বণিক্ এতে হয়েছে প্রয়োগ।
দুই শব্দে একেবারে কর দেখি যোগ॥

* * *

* * *

পণ্ডিতাগ্রগণ্য মান্য ভরত শিরোমণি।
অঙ্গীকার আছে তাঁর মনু শাস্ত্র জানি॥
সুবর্ণবণিক্ বিনা আঢ্য আর নাই।
বৈশ্যের উপাধি ইহা দেখিবারে পাই॥
দেখি শুনি ঐ পণ্ডিত করিল নিশ্চয়।
মন মধ্যে অনুবাদে বৈশ্য বলে নয়॥
ইহারা সুবর্ণবণিক্ বৈশ্য জাতি হয়।
বৈশ্য ভিন্ন আঢ্য শব্দ আর কার নয়॥

... ...

... ...

সুবর্ণবণিক্ বৈশ্য বিশুদ্ধ এ জাতি।
সঙ্কর গোলক নহে শুদ্ধাচার অতি॥
হরিভক্ত দ্বিজ এরা শুদ্ধ মহাজন।
যার কুলে জন্ম লন ঠাকুর উদ্ধারণ॥
নিত্যানন্দের সখা প্রিয়পাত্র অতিশয়।
হরিনামে ভোর এরা জপে-তপে রয়॥

... ...

... ...

বৈশ্যনারী সদাচারী বিষ্ণুসেবা করে।
স্বহস্তে পক্কান্ন দ্রব্য দেয় ঠাকুর ঘরে॥
কিবা কব শুন সব বণিক্-আচার।
ধর্ম্মে রত কর্ম্ম যত বেদ-ব্যবহার॥" পৃঃ ৫৩, ৫৪

সপ্তগ্রামীয় সুবর্ণবণিক্-হিতসাধনী সভা

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় "সপ্তগ্রামীয় সুবর্ণবণিক্-হিতসাধনী-সভা" প্রতিষ্ঠিত হয়। সভার অধিবেশন সাধারণত বড়বাজারে স্বর্গীয় রামমোহন মল্লিক মহাশয়ের ভবনে অনুষ্ঠিত হইত।

কলিকাতা, হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, হালিসহর প্রভৃতি স্থানের বহু সুবর্ণবণিক্ এই সভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

সভার পরিচালক

১২৮৫ সালে (১৮৭৮ খৃঃ) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ইহার পরিচালক ছিলেন—

সভাপতি—রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক

সম্পাদক—প্রেমনাথ মল্লিক (৺রামমোহন মল্লিকের পুত্র)

" আশুতোষ ধর (আমড়াতলার সুপ্রসিদ্ধ ধর-বংশোদ্ভূত)

সহকারী সম্পাদক—নবীনচন্দ্র আঢ্য (বঙ্গবিদ্যা-প্রকাশিকা পত্রের সম্পাদক)

কৃষ্ণদাস পাল—আমড়াতলা নিবাসী

এই সভার নিয়মাবলী ও কার্য-বিবরণ সুবর্ণবণিক্ সমাজের ইতিহাসের একটি মূল্যবান্ উপকরণ। নিম্নে উহা আলোচিত হইল।

সভার নিয়মাবলী ও কার্য-বিবরণ

বিবাহকালীন দান সম্বন্ধে কোনরূপ ফুরান চুক্তি সমাজের পক্ষে কতদূর অনিষ্টকর এবং তদ্দ্বারা সমাজের কি অহিতসাধন হইতে পারে, তাহা বহু পূর্ব হইতেই সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ অনুভব করিতেছিলেন। এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য, সে সময়ে সুবর্ণবণিক্-হিতসাধনী সভার সভ্যগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহারা ইহার প্রতিকারকল্পে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছিলেন—

১। বিবাহকালীন দান সম্বন্ধে ফুরান চুক্তি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্বেচ্ছা-পূর্বক সম্প্রদাতা অবস্থানুসারে যাহা দান করিবেন, তাহাতে প্রতিগ্রহীতা, কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ কিম্বা অসদাচরণ করিতে পারিবেন না। এইরূপ অসন্তোষ প্রকাশ ও পীড়ন করা, ফুরান চুক্তির অনুরূপ অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইবেক।

২। বৈবাহিক-সূত্রে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবার সম্বন্ধে ফুরান চুক্তির নিবারক যে দুইটি নিয়ম ইতিপূর্বে অবধারিত হইয়াছে; তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত উক্ত কুপ্রথা-নিবারক নিয়মাবলী, সাধারণ বণিক্-সমাজে প্রচলিত থাকিবেক। যথা—

প্রথমত—বিবাহ সম্বন্ধে নিমন্ত্রণ-সূত্রে স্মারক-লিপিতে এইরূপ পাঠ ব্যবহৃত হইবেক যে 'সপ্তগ্রামীয় সুবর্ণবণিক্-হিতসাধনী সভার নিয়মানুসারে উদ্বাহ কার্য নিষ্পন্ন হইতেছে।'—উক্তরূপ স্মারকলিপি প্রাপ্ত হইলে পর, বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র গৃহীত হইবেক। যদ্যপি স্মারক-লিপি না হয়, তাহা হইলে নিমন্ত্রণ-কালে বাচনিক উক্ত বাক্যটি সকলকে জ্ঞাপন করিতে হইবেক।

দ্বিতীয়ত—যদি আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি, সভা সম্বন্ধীয় নিয়মোল্লঙ্ঘন সংবাদ, সম্পাদকগণ সমীপে উপস্থিত করেন, তাহা হইলে সম্পাদকগণ, তৎস্থানীয় অধ্যক্ষদিগের দ্বারা বিশেষরূপ তদন্ত করাইয়া, তাঁহাদিগকে সপ্রমাণপত্র, কর্মাধ্যক্ষ সভাধিবেশনে উপস্থিত সভ্যবৃন্দের গোচর করিবেন এবং তাঁহাদিগের বোধে যাহা বিচারসঙ্গত হইবে, তদনুসারে কার্য করা হইবেক।

তৃতীয়ত—বৈবাহিক সূত্রে যদি কোন স্থানে ফুরান চুক্তির অত্যাচার হয়, তবে বর ও কন্যা যে যে পল্লীতে বাস করেন, সেই সেই পল্লীর অধ্যক্ষগণ সম্পূর্ণরূপে উক্ত দোষের বিষয় অনুসন্ধান করিবেন। আর তাঁহাদিগের যদ্যপি আবশ্যক বোধ হয়, তাহা হইলে অন্য পল্লীর স্থানীয় অধ্যক্ষ ও সভ্যগণের সহায়তা অবলম্বন পূর্বক, অনুসন্ধান করিবেন। এবং পরিশেষে তাঁহাদিগের অনুসন্ধানের কার্যবৃত্তান্ত, কর্মাধ্যক্ষ সভার বিবেচনার্থ প্রেরণ করিবেন।

চতুর্থত—যে ব্যক্তি বৈবাহিক সূত্রে নিয়ম ভঙ্গ করিয়া, সভার নিকট ফুরান-চুক্তিরূপ অপরাধে অপরাধী হইবেন; তিনি যদ্যপি অনুতাপানন্তর অর্থাৎ 'তদনুরূপ কার্য করিব না' এইরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই অপরাধ সভা মার্জনা করিবেন। নতুবা তাঁহার সেই অপরাধ হেতু সমস্ত বণিক্‌মণ্ডলীর কেহই তাঁহার কন্যা বা পুত্রের বিবাহ-সূত্রে আদান-প্রদান করিবেন না; আর তাঁহার নিমন্ত্রণও গ্রহণ করা হইবেক না, এবং তাঁহার সহিত আহার-ব্যবহারও রহিত করিবেন।[১]

১২৮৫ সালের ১৬ই অগ্রহায়ণ (১৮৭৮ খৃঃ, ১লা ডিসেম্বর) স্বর্গীয় রামমোহন মল্লিক মহাশয়ের বড়বাজারস্থ ভবনে সপ্তগ্রামীয় সুবর্ণবণিক্‌গণের একটি সাধারণ সভা হয়। সেই সভায় কলিকাতা, হুগলী, চুঁচুড়া, চন্দননগর, শ্রীরামপুর, হালিসহর প্রভৃতি স্থানের "ন্যূনাধিক সহস্র"[২] সুবর্ণবণিকের সমাগম হয়। উক্ত সভায় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিবাহে পণপ্রথা ও ফুরানচুক্তি যে সমাজের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর, তাহা এই সভায় বিশেষভাবে আলোচিত হয়। কলিকাতার ও মফস্বলবাসী অধ্যক্ষগণের একটি তালিকা প্রস্তুত করাইয়া তাঁহাদিগের উপর এই অনিষ্টকর প্রথা দূরীভূত করিবার ভার দেওয়া হয়। তালিকামধ্যে ২৩ জন দলপতি এবং ৭৬ জন অধ্যক্ষের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

সভা স্থাপনের পর, সভ্যগণের উৎসাহ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। কার্য-বিবরণী হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্ত ১২৮৫ সালে সাড়ে চারি মাসের মধ্যেই পর পর তিনটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

১২৮৮ সালের ৮ই আশ্বিন পর্যন্ত অর্থাৎ তিন বৎসরের কার্যবিবরণ হস্তগত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বিবাহে কোন প্রকার ফুরান চুক্তি করিবেন না বা পণ লইবেন না এরূপ প্রতিশ্রুতি-পত্রে স্বাক্ষর-

১ এই নিয়মাবলী ১২৮৯ সালের ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখের একটি সাধারণ সভায় স্থিরীকৃত এবং সভাপতি রাজেন্দ্র মল্লিক (রাজা), সহকারী সভাপতি প্রেমনাথ মল্লিক, সম্পাদক প্রেমচাঁদ বড়াল ও সহকারী সম্পাদক নবীনচন্দ্র আঢ্য ও মাণিকচাঁদ বড়াল মহাশয়গণের স্বাক্ষরে প্রচারিত হয়।

২ ১২৮৫ সালের ১৭ই অগ্রহায়ণ তারিখের সভার কার্য-বিবরণ, পৃঃ ১।

কারিগণের একটি মূল্যবান্ তালিকাও পাওয়া গিয়াছে। এই তালিকায় ১০৬৪ জন লোকের স্বাক্ষর আছে।

১৩২৩ সনের ৯ই বৈশাখ (১৯১৬ খৃঃ) কলিকাতায় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের ভবনে "বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্-সম্মিলনী"র প্রথম অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে স্বর্গীয় কুমার নগেন্দ্র মল্লিক মহাশয় যে অভিভাষণ প্রদান করেন, তাঁহার সেই অভিভাষণের মধ্যেও এই সভার ও স্বাক্ষর-পত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রয়োজনীয় অংশটি উদ্ধৃত হইল—

"এই পণপ্রথা নিবারণের চেষ্টা আমাদের নূতন নহে। সুবর্ণবণিক্গণের 'সুবর্ণবণিক্-হিতসাধনী সভা' নামে একটি সভা ছিল। ৩৮ বৎসর পূর্বে ১৬ই অগ্রহায়ণ ১২৮৫ সালে ঐ সভার এক সাধারণ অধিবেশনে 'কি উপায় অবলম্বন করিলে পণপ্রথা রহিত হইতে পারে' তাহার আলোচনায় সমস্ত সভ্যগণের সম্মতিতে স্থির হইল, আমরা ধর্মকে সাক্ষী করিয়া অঙ্গীকার করিব যে কন্যাপুত্রের বিবাহে আমরা কেহ আদান প্রদান বিষয়ে চুক্তি বা ফুরান করিব না। এবং তদনুসারে প্রায় এক সহস্র সুবর্ণবণিক্ মহাশয় সেই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম, ধাম ও ঠিকানা সেই সভার রিপোর্ট পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন।"*

স্বাক্ষরকারিগণের তালিকা

স্বাক্ষরকারিগণের তালিকাটি নিম্নে ঠিকানার সহিত উদ্ধৃত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু অদ্বৈতচরণ মল্লিক	সাং কলুটোলা সোঃ বসাকের গলি
" অর্জুনচন্দ্র দে	" জোড়াসাঁকো ষষ্ঠীতলা
" অতুলচন্দ্র দে	" ঐ শীকদারপাড়া
" অক্ষয়কুমার শীল	" চোরবাগান
" অভয়চরণ সেন	" ঐ
" অক্ষয়কুমার মল্লিক	" বলরাম দের ষ্ট্রীট
" অনন্তরাম শীল	" কাশীনাথ মল্লিকের গলি

* বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্-সম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনের কার্য-বিবরণ, পৃঃ ১৯।

২০

শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র দে	সাং সুরতির বাগান
,, অটলবিহারী মল্লিক	,, বড়বাজার
,, অক্ষয়কুমার ধর	,, আমড়াতলা গোঃ ধরের গলি
,, অক্ষয়কুমার সেন	,, পাথুরিয়াঘাটা
,, অদ্বৈতচরণ সেন	,, কলুটোলা সোঃ বঃ গলি
,, অদ্বৈতচরণ দত্ত	,, ঐ
,, অমৃতলাল দত্ত	,, ঐ রাস্তার উপর
,, অদ্বৈতচরণ দত্ত	,, ঐ চূণাগলি
,, অমৃতলাল মল্লিক	,, ঐ
,, অক্ষয়কুমার শীল	,, হাড়কাটার গলি
,, অভয়চরণ রায়	,, চাঁপাতলা রাঃ মিস্ত্রীর গলি
,, অক্ষয়কুমার দত্ত	,, ঐ অক্রূর দত্তের গলি
,, অক্ষয়কুমার মল্লিক	,, মলঙ্গা বাঃ অঃ গলি
,, অদ্বৈতচরণ ধর	,, ঐ স্বরূপ ধরের গলি
,, অক্ষয়কুমার দত্ত	,, ঐ হলধর বধনের গলি
,, অভয়চরণ দত্ত	,, ঐ হৃদয়রাম বন্দ্যোর গলি
,, অক্ষয়কুমার শীল	,, শ্রীরামপুর
,, অক্ষয়কুমার মল্লিক	,, হুগলি ঘুঁটেবাজার
,, অন্নদাচরণ মল্লিক	,, ঐ
,, অম্বিকাচরণ মল্লিক	,, ঐ
,, অবিনাশচন্দ্র ধর	,, জোড়াসাঁকো লালমাধবের গলি
,, অটলবিহারী পাল	,, সুরতির বাগান
,, অধরচন্দ্র দে	,, ফরাসডাঙ্গা
,, আশুতোষ মল্লিক	,, পাথুরিয়াঘাটা
,, আশুতোষ ধর	,, জোড়াসাঁকো লালমাধবের গলি
,, আশুতোষ শীল	,, ঐ
,, আশুতোষ রায়	,, জোড়াসাঁকে রায়ের লেন
,, আশুতোষ ধর (বড়)	,, আমড়াতলা

শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ ধর (ছোট)	সাং আমড়াতলা
,, আশুতোষ রায়	,, বড়বাজার
,, আমিরচাঁদ মল্লিক	,, হুগলি ঘুঁটেবাজার
,, আনন্দচন্দ্র মল্লিক	,, ঐ
,, আনন্দলাল সেন	,, মলঙ্গা দুর্গা চঃ পিঃ গলি
,, আশুতোষ দে	,, ঐ গৌরদের গলি
,, আমিরচাঁদ চন্দ্র	,, ফরাসডাঙ্গা
,, ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত	,, জোড়াসাঁকো ষষ্ঠীতলা
,, ঈশানচন্দ্র মল্লিক	,, ঐ শিবু মিস্ত্রীর গলি
,, ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত	,, সিমলা চাষাধোপাপাড়া
,, ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত	,, মলঙ্গা বাঞ্ছারাম অঃ গলি
,, ঈশ্বরচন্দ্র ধর	,, ঐ স্বরূপধরের গলি
,, ঈশ্বরচন্দ্র পাল	,, শ্রীরামপুর
,, ঈশ্বরচন্দ্র মল্লিক	,, হুগলি ঘুঁটেবাজার
,, ঈশ্বরচন্দ্র দাস	,, ঐ
,, উপেন্দ্রনাথ মল্লিক	,, জোড়াসাঁকো রঃ সঃ ষ্ট্রীট
,, উমাকান্ত সেন	,, ঐ বলরামদের ষ্ট্রীট
,, উপেন্দ্রনারায়ণ সেন	,, চোরবাগান
,, উমাচরণ সেন	,, সুরতির বাগান
,, উমাচরণ আঢ্য	,, চাঁপাতলা শত্রুঘ্নের গলি
,, উদয়চাঁদ দত্ত	,, মলঙ্গা বাবুরাম শীলের গলি
,, উদ্ধবচরণ মল্লিক	,, মলঙ্গা নেবুতলা
,, উমাচরণ শীল	,, শ্রীরামপুর
,, উমাচরণ পাল	,, ফরাসডাঙ্গা
,, উমাচরণ মল্লিক	,, ঐ
,, উমাচরণ শীল	,, ঐ
,, উমাচরণ ধর	,, হুগলি ঘুঁটেবাজার
,, উপেন্দ্রনাথ ধর	,, ঐ

শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল সেন	সাং পাথুরিয়াঘাটা দঃ ঠাঃ ষ্ট্রীট
,, কানাইলাল দত্ত	,, ঐ দর্পনারায়ণ ঠাঃ ষ্ট্রীট
,, কুঞ্জবিহারী মল্লিক	,, ঐ
,, কিশোরীমোহন পাইন	,, ঐ
,, কেদারনাথ দত্ত	,, জোড়াসাঁকো ষষ্ঠীতলা
,, কুঞ্জবিহারী ধর	,, ঐ লালমাধবের গলি
,, কানাইলাল মল্লিক	,, ঐ রতন সরকারের গলি
,, কুঞ্জবিহারী মল্লিক	,, ঐ
,, কার্তিকচরণ সেন	,, ঐ
,, কেশবলাল চন্দ্র	,, ঐ
,, কিশোরীলাল দত্ত	,, ঐ রায়ের লেন
,, কৃষ্ণদাস দত্ত	,, ঐ
,, কার্তিকচরণ মল্লিক	,, ঢাকাপটী হরপ্রসাদের গলি
,, কানাইলাল মল্লিক	,, ঐ
,, কানাইলাল সেন	,, চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন
,, কানাইলাল দে	,, ঐ
,, কানাইলাল দাস	,, ঐ
,, কৃষ্ণমোহন চন্দ্র	,, ঐ
,, কানাইলাল সেন	,, ঐ সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের গলি
,, কালীপ্রসন্ন দে	,, ঐ
,, কেশবলাল মল্লিক	,, ঐ ভুবন ধরের গলি
,, কালীচরণ দে	,, ঐ
,, কৃষ্ণদাস দে	,, বৈঠকখানা স্কট্স লেন
,, কাশীনাথ দত্ত	,, চাঁপাতলা চাঁড়ালপাড়া
,, কানাইলাল শীল	,, ঐ নীলমণি দত্তের গলি
,, কাশীনাথ সেন	,, ঐ শত্রুঘ্নের গলি
,, কানাইলাল পাইন	,, মির্জাপুর অখিলমিস্ত্রীর গলি
,, কেদারনাথ দাস	,, ঐ

শ্রীযুক্ত বাবু	কানাইলাল সেন	সাং	চাঁপাতলা রামকান্তমিস্ত্রীর গলি
,,	কানাইলাল মল্লিক	,,	ঐ
,,	কানাইলাল ধর	,,	ঐ
,,	কালীচরণ দে	,,	মলঙ্গা রাস্তার উপর
,,	কাশীনাথ মল্লিক	,,	ঐ বাবুরামের গলি
,,	কৃষ্ণপ্রসাদ সেন	,,	ঐ অক্রুর দত্তের গলি
,,	কৃষ্ণদাস পাল	,,	ঐ
,,	কার্তিকচরণ পাল	,,	ঐ নেবুতলা
,,	কানাইলাল দে	,,	ঐ বাঞ্ছারাম অঃ গলি
,,	কেদারনাথ দাস	,,	ঐ
,,	কেদারনাথ দে	,,	ঐ ফকির দের গলি
,,	কৃষ্ণলাল সেন	,,	ঐ কালিদাস দত্তের গলি
,,	কালিদাস দত্ত	,,	ঐ
,,	কাশীনাথ নন্দী	,,	চাঁপাতলা রামঃ বন্দ্যোর গলি
,,	কালীচরণ ধর	,,	মলঙ্গা স্বরূপ ধরের গলি
,,	কৃষ্ণদয়াল ধর	,,	ঐ
,,	কৃষ্ণদাস দে	,,	ঐ বিশ্বনাথ মতিলালের গলি
,,	কিশরমোহন মল্লিক	,,	ঐ
,,	কৃষ্ণদাস শীল	,,	ঐ গৌরদের গলি
,,	কালিদাস শীল	,,	ঐ মদন দত্তের গলি
,,	কুঞ্জবিহারী দত্ত	,,	ঐ
,,	কানাইলাল দত্ত	,,	ঐ হলধর বর্ধনের গলি
,,	কানাইলাল দত্ত	,,	ঐ জেলেপাড়া
,,	কালীচরণ দে	,,	ঐ
,,	কৃষ্ণমোহন ধর	,,	ঐ হৃদয়রাম বন্দ্যোর গলি
,,	কিশোরীমোহন দে	,,	ঐ হলধর বর্ধনের গলি
,,	কালীচরণ দে	,,	ঐ হৃদয়রাম বন্দ্যোর গলি
,,	কৃষ্ণমোহন দে	,,	ঐ ঐ

শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস শীল	সাং মলঙ্গা পঞ্চাননতলা
,, কান্তিচরণ বড়াল	,, ঐ
,, কার্তিকচরণ দত্ত	,, ঐ
,, কৃষ্ণমোহন সেন	,, ঐ
,, কিশোরমোহন ধর	,, বহুবাজার রাস্তার উপর
,, কালীকৃষ্ণ শীল	,, ফরাসডাঙ্গা
,, কার্তিকচরণ বড়াল	,, ঐ
,, কেশবলাল দত্ত	,, ঐ
,, কুঞ্জবিহারী শীল	,, ঐ
,, কুঞ্জবিহারী পাইন	,, পাথুরিয়াঘাটা
,, কানাইলাল মল্লিক	,, ঐ
,, কেশব মল্লিক	,, রামবাগান
,, কানাইলাল শীল	,, সিমলা চাষাধোপাড়া
,, কানাইলাল দে	,, ঐ জেলেটোলা
,, কেশবলাল দত্ত	,, ঐ
,, কালীকুমার দত্ত	,, ঠনঠনে সীতারাম ঘোষের গলি
,, কানাইলাল দত্ত	,, ঐ
, কালীচরণ বড়াল	,, চোরবাগান
,, কানাইলাল মল্লিক	,, ঐ
,, কৃষ্ণদাস মল্লিক	,, ঐ
,, কালিদাস মল্লিক	,, ঐ
,, কিশোরীমোহন দে	,, ঐ
,, কৃষ্ণকিশোর সেন	,, ঐ
,, কালীচরণ দে	,. চোরবাগান
,, কালিদাস মল্লিক	,, সিন্দূরিয়াপটী
,, কৃষ্ণদাস সেন	,, তূলাবাজার
,, কানাইলাল সেন	,, সুরতির বাগান
,, কৃষ্ণমোহন দে	,, ঐ

শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার পাইন	সাং সুরতির বাগান রতুসরকারের গলি
,, কেশবলাল বড়াল	,, ঐ রামমোহন বসুর গলি
,, কৃষ্ণমোহন বড়াল	,, ঐ তারাচাঁদ দত্তের গলি
,, কালীচরণ সেন	,, ঐ
,, কালীচরণ রায়	,, বড়বাজার
,, কুঞ্জবিহারী রায়	,, ঐ
,, কার্তিকচরণ রায়	,, ঐ
,, কালীকৃষ্ণ চন্দ্র	,, ঐ সোনাপটী
,, কুঞ্জবিহারী ধর	,, আমড়াতলা
,, কুঞ্জবিহারী আঢ্য	,, ঐ
,, কালিদাস ধর	,, কলুটোলা
,, কার্তিকচরণ আঢ্য	,, আমড়াতলা
,, কৃষ্ণমোহন মল্লিক	,, কলুটোলা সোভাঃ রামঃ ষ্ট্রীট
,, কালীকুমার মল্লিক	,, ঐ
,, কেশবলাল সেন	,, ঐ
,, কালিদাস দত্ত	,, ঐ
,, কৃষ্ণচন্দ্র ধর	,, ঐ চূণাগলি
,, কেশবলাল চন্দ্র	,, ঐ
,, কেশবলাল দে	,, ঐ রাস্তার উপর
,, কানাইলাল দত্ত	,, ঐ চূণাগলি
,, কেশবলাল মল্লিক	,, ঐ
,, কৃষ্ণমোহন শীল	,, চূণারি পুকুর
,, কুঞ্জবিহারী শীল	,, সানকিভাঙ্গা
,, কুঞ্জবিহারী দে	,, চূণারী পুকুর
,, কালিদাস দত্ত	,, ঐ
,, কাশীনাথ দে	,, হাড়কাটা গোবিন্দ সেনের গলি
,, কৈলাশচন্দ্র দত্ত	,, ঐ
,, কাশীনাথ ধর	,, ঐ

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণমোহন দত্ত	সাং চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন
,, কার্তিকচন্দ্র চন্দ্র	,, ফরাসডাঙ্গা
,, কাঙ্গালীচরণ আঢ্য	,, চুঁচুড়া চৌমাথা
,, কৈলাশচন্দ্র শীল	,, হুগলি ঘুঁটেবাজার
,, কানাইলাল মল্লিক	,, ঐ
,, কেশবলাল নন্দী	,, ঐ
,, কেদারনাথ মল্লিক	,, ঐ
,, কানাইলাল শীল	,, ঐ
,, কানাইলাল মল্লিক (১ম)	,, ঐ
,, কানাইলাল মল্লিক (২য়)	,, ঐ
,, কুঞ্জলাল নন্দী	,, ঐ
,, কিশোরীলাল শীল	,, ঐ
,, কানাইলাল মল্লিক (৩য়)	,, ঐ
,, কৃষ্ণদাস লাহা	,, মলঙ্গা বহুবাজার
,, গয়াপ্রসাদ মল্লিক	,, দর্পনারায়ণ ঠাঃ ষ্ট্রীট
,, গোপীমোহন মল্লিক	,, ঐ
,, গোবিনলাল মল্লিক	,, —
,, গোপাললাল মল্লিক	,, ঐ
,, গোপালচন্দ্র আঢ্য	,, ঐ
,, গোষ্ঠবিহারী সেন	,, ঐ
,, গুরুদাস দত্ত	,, জোড়াসাকো ষষ্ঠীতলা
,, গুরুচরণ রায়	,, ঐ ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট
,, গোপালচন্দ্র মল্লিক	,, ঐ কবরডাঙ্গা
,, গঙ্গানারায়ণ মল্লিক	,, ঐ হাঁসপুকুর
,, গোবিন্দচন্দ্র সেন	,, সিমলা জেলেটোলা
,, গোষ্ঠবিহারী ধর	,, ঐ
,, গোবর্ধন দত্ত	,, ঠন্‌ঠনে
,, গগনচন্দ্র পাইন	,, ঐ সীতারাম ঘোষের গলি

কুমার গিরীন্দ্র মল্লিক	সাং চোরবাগান
শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র দত্ত	,, ঐ
,, গোষ্ঠবিহারী বড়াল	,, ঐ
,, গঙ্গাগোবিন্দ সেন	,, ঐ
,, গোপীবল্লভ দত্ত	,, কাশীনাথ মল্লিকের গলি
,, গোষ্ঠবিহারী দত্ত	,, সুরতির বাগান
,, গোপালচন্দ্র দে	,, ঐ
,, গিরিধর মল্লিক	,, ঐ
,, গৌরমোহন বড়াল	,, ঐ তারাচাঁদ দত্তের গলি
,, গোষ্ঠবিহারী রায়	,, বড়বাজার
,, গোরাচাঁদ আঢ্য	,, আমড়াতলার গলি
,, গোবিন্দচন্দ্র আঢ্য	,, ঐ
,, গুরুপ্রসন্ন ধর	,, ঐ
,, গোষ্ঠবিহারী শীল	,, ঐ
,, গৌরমোহন ধর	,, কলুটোলা সোভারামঃ ষ্ট্রীট
,, গোকুলচন্দ্র মল্লিক	,, ঐ সোঃ বসাকের ষ্ট্রীট
,, গোবিন্দচন্দ্র পাইন	,, ঐ
,, গোপালচন্দ্র শীল	,, ঐ
,, গোবিন্দচন্দ্র শীল	,, ঐ
,, গোপীনাথ দাস	,, চূণাগলি
,, গোকুলচন্দ্র নন্দী	,, হাড়কাটা গোবিন্দ সেনের গলি
,, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত	,, চাঁপাতলা সিদ্ধেশ্বরের গলি
,, গোপালচন্দ্র দত্ত	,, বৈঠকখানা স্কট্‌স লেন
,, গোষ্ঠবিহারী দে	,, চাঁপাতলা নীলমণি দত্তের গলি
,, গোবিন্দচন্দ্র শীল	,, পটলডাঙ্গা নিমু খানসামার গলি
,, গোরাচাঁদ মল্লিক	,, মলঙ্গা স্কেভেঞ্জরের গলি
,, গোবর্ধন দত্ত	,, চাঁপাতলা শত্রুঘ্নের গলি
,, গোপালচন্দ্র দত্ত	,, ঐ অখিল মিস্ত্রীর গলি

শ্রীযুক্ত বাবু	গোপালচন্দ্র পাল	সাং	মলঙ্গা বাবুরাম শীলের গলি
,,	গুরুচরণ আঢ্য	,,	ঐ
,,	গঙ্গানারায়ণ শীল	,,	ঐ
,,	গোপীনাথ দত্ত	,,	ঐ কৃষ্ণ লাহার গলি
,,	গোবিন্দচন্দ্র লাহা	,,	ঐ
,,	গোপালচন্দ্র দত্ত	,,	বহুবাজার ফকির দের গলি
,,	গোপেশ্বর আঢ্য	,,	মলঙ্গা বহুবাজার
,,	গোবর্ধন পাইন	,,	চাঁপাতলা রাস্তার উপর
,,	গোপালচন্দ্র পাইন	,,	ঐ
,,	গোষ্ঠবিহারী দে	,,	মলঙ্গা বিশ্বনাথ মতিঃ গলি
,,	গুরুচরণ শীল	,,	ঐ
,,	গোষ্ঠবিহারী ধর	,,	ঐ
,,	গোকুলচন্দ্র দে	,,	ঐ গৌরদের গলি
,,	গোষ্ঠবিহারী দে	,,	ঐ
,,	গঙ্গাধর দত্ত	,,	ঐ হলধর বর্ধনের গলি
,,	গোবিন্দচন্দ্র দাস	,,	ঐ
,,	গোবিন্দচন্দ্র ধর	,,	ঐ জেলেপাড়া
,,	গোরাচাঁদ শীল	,,	ঐ
,,	গোষ্ঠবিহারী সেন	,,	ঐ
,,	গৌরমোহন বড়াল	,,	ঐ হৃদয়রাম বন্দ্যোর গলি
,,	গোবিন্দচন্দ্র দত্ত	,,	ঐ
,,	গোষ্ঠবিহারী ধর	,,	ঐ হৃদয় বন্দ্যোর গলি
,,	গোবিন্দচন্দ্র পাইন	,,	ঐ বাঞ্ছারামের গলি
,,	গোরাচাঁদ বড়াল	,,	ঐ হৃদয়রামের গলি
,,	গোবিন্দচন্দ্র সেন	,,	ঐ দুর্গাপিথুরীর গলি
,,	গোপালচন্দ্র দত্ত	,,	ঐ পঞ্চাননতলা
,,	গোবর্ধন শীল	,,	ঐ
,,	গোকুলচাঁদ মল্লিক	,,	বহুবাজার রাস্তার উপর

শ্রীযুক্ত বাবু গোবিনচাঁদ পাইন	সাং শ্রীরামপুর
,, গোপীনাথ পাইন	,, ঐ
,, গগনচন্দ্র নন্দী	,, ফরাসডাঙ্গা
,, গোবিন্দচন্দ্র মল্লিক	,, ঐ
,, গোপালচন্দ্র আঢ্য	,, ঐ
,, গিরীশচন্দ্র বড়াল	,, ঐ
,, গোষ্ঠবিহারী দে	,, হুগলি বালি
,, গোপালচন্দ্র পাইন	,, ঐ ঘুঁটেবাজার
,, গৌরমোহন মল্লিক	,, ঐ
,, গোষ্ঠবিহারী শীল	,, ঐ
,, গদাধর মল্লিক	,, ঐ
,, চৈতন্যচরণ মল্লিক	,, জোড়াসাঁকো
,, চন্দ্রকুমার নন্দী	,, ঐ রতন সরকার্স গার্ডেন ষ্ট্রীট
,, চরণদাস মল্লিক	,, মণ্ডল ষ্ট্রীট
,, চন্দ্রকুমার দত্ত	,, সুরতির বাগান রাঃ সাহার গলি
,, চুণীলাল বড়াল	,, ঐ তারাচাঁদ দত্তের গলি
,, চুণীলাল বড়াল	,, কলুটোলা সোঃ বঃ গলি
,, চন্দ্রমোহন মল্লিক	,, জোড়াসাঁকো শিঃ মঃ গলি
,, চন্দ্রকুমার বড়াল	,, ফরাসডাঙ্গা
,, চন্দ্রশেখর মল্লিক	,, ঐ
,, চন্দ্রকুমার শীল	,, হুগলি ঘুঁটেবাজার
,, চন্দ্রকুমার ধর	,, ঐ
,, চন্দ্রশেখর শীল	,, ঐ
,, চুণীলাল শীল	,, ঐ
,, চুণীলাল দত্ত	,, চুণারিপুকুর লেন
,, চণ্ডীচরণ মল্লিক	,, চাঁপাতলা নিলমণি দঃ গলি
,, চুণীলাল দত্ত	,, মলঙ্গা হৃদয়রাম বন্দোঃ গলি
,, জগমোহন বড়াল	,, বাঁশতলার গলি

শ্রীযুক্ত বাবু জয়নারায়ণ সেন (১ম)	সাং কলুটোলা
,, জয়নারায়ণ সেন (২য়)	,, ঐ সোঃ বঃ গলি
,, জহরলাল মল্লিক	,, চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন
,, জগমোহন সেন	,, ঐ রমাকান্ত মিস্ত্রীর গলি
,, জহরলাল ধর	,, ঐ
,, জয়গোপাল সেন	,, ঐ সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের গলি
,, জয়গোপাল দত্ত	,, ঐ নীলমণি দত্তের গলি
,, জহরলাল দত্ত	,, মলঙ্গা বাবুরাম শীল গলি
,, জগদ্বন্ধু দে	,, ঐ বিশ্বঃ মতিলাল গলি
,, জহরলাল চন্দ্র	,, ঐ
,, জয়নারায়ণ মল্লিক	,, ঐ
,, জহরলাল দে	,, ঐ গৌর দের গলি
,, জহরলাল সেন	,, ঐ মদন দত্তের গলি
,, জগমোহন মল্লিক	,, ঐ জেলেপাড়া লেন
,, জগমোহন ধর	,, ঐ হৃদয়রাম বন্দ্যোর গলি
,, জনার্দন দে	,, ঐ
,, জহরলাল আঢ্য	,, ঐ
,, জীবনকৃষ্ণ শীল	,, ঐ পঞ্চাননতলার গলি
,, জয়গোপাল দত্ত	,, শ্রীরামপুর
,, জহরলাল চন্দ্র	,, ফরাসডাঙ্গা
,, জয়চাঁদ দে	,, ঐ
,, জীবনচন্দ্র ধর	,, ঐ
,, জহরলাল মল্লিক	,, হুগলী ঘুঁটে বাজার
,, জহরলাল নন্দী	,, ঐ
,, জহরলাল দে	,, ঐ
,, জীবনকৃষ্ণ মল্লিক	,, ঐ
,, জহরলাল দত্ত	,, সিমলা চাষাধোপাপাড়া
,, ঠাকুরদাস পাইন	,, পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট

শ্রীযুক্ত বাবু ঠাকুরদাস সেন	সাং চোরবাগান
,, ঠাকুরদাস দত্ত	,, আমড়াতলার গলি
,, ঠাকুরদাস দে	,, কলুটোলা সোঃ বঃ গলি
,, ঠাকুরলাল মল্লিক	,, মলঙ্গা স্কেভেঞ্জরের লেন
,, ঠাকুরদাস নন্দী	,, ঐ
,, ঠাকুরদাস দাস	,, ঐ নেবুতলা
,, ঠাকুরদাস নন্দী	,, ঐ হলধর বর্ধনের গলি
,, ঠাকুরদাস দে	,, চূণাগলি কলুটোলা
,, তিনকড়ি দত্ত	,, জোড়াসাঁকো ষষ্ঠীতলা
,, তুলসীদাস পাইন	,, ঐ রতন সরঃ ষ্ট্রীট
,, তুলসীদাস চন্দ্র	,, বাঁশতলার গলি
,, তুলসীদাস আঢ্য	,, সিমলা চাষাধোপাপাড়া
,, তুলসীদাস মল্লিক	,, ঐ শিবু মিস্ত্রীর গলি
,, তুলসীদাস দত্ত	,, কাশীনাথ মল্লিকের গলি
,, তুলসীদাস দত্ত	,, সুরতির বাগান
,, তুলসীদাস সেন	,, ঐ
,, তারকনাথ দে	,, ঐ
,, তারাচাঁদ পাইন	,, ঐ রতু সরকারের গলি
,, তুলসীদাস মল্লিক	,, বড়বাজার
,, তারকনাথ দে	,, আমড়াতলার গলি
,, তারাচাঁদ মল্লিক	,, কলুটোলা সোঃ রাঃ গলি
,, তুলসীদাস দত্ত	,, হাড়কাটার গলি
,, তুলসীদাস পাল	,, চাঁপাতলা ভুবন ধরের গলি
,, তুলসীদাস চন্দ্র	,, চোরবাগান
,, তারকনাথ দে	,, বহুবাজার ফকির দের গলি
,, তুলসীদাস দে	,, মলঙ্গা হলধর বর্ধনের গলি
,, তিতুরাম দাস	,, ঐ
,, তিনকড়িলাল দাস	,, ঐ

শ্রীযুক্ত বাবু তুলসীদাস দত্ত	সাং মলঙ্গা হৃদয়রাম বন্দ্যোর গলি
,, তুলসীদাস দে (১ম)	,, ঐ
,, তুলসীদাস দে (২য়)	,, ঐ
,, তারিণীচরণ বড়াল	,, ঐ পঞ্চাননতলার গলি
,, তিনকড়ি বড়াল	,, ঐ
,, তুলসীদাস রায়	,, ঐ
,, ত্রৈলোক্যনাথ শীল	,, শ্রীরামপুর
,, তুলসীদাস চন্দ্র	,, চোরবাগান
,, তুলসীদাস দত্ত	,, মলঙ্গা হলধর বর্ধনের গলি
,, তুলসীদাস লাহা	,, ঐ কৃষ্ণ লাহার গলি
,, দীনবন্ধু সেন	,, পাথুরিয়াঘাটা দর্পঃ ঠাঃ
,, দেবেন্দ্রনাথ দত্ত	,, ঐ
,, দয়ালচাঁদ পাইন	,, ঐ
,, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক	,, জোড়াসাঁকো ষষ্ঠীতলা
,, দীননাথ দত্ত	,, ঐ
,, দেবেন্দ্রনাথ দত্ত	,, ঐ
,, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক	,, ঢাকাপটী শিব ঠাঃ গলি
,, দুর্গাপ্রসাদ শীল	,, জোড়াসাঁকো দয়েপটী
কুমার দীনেন্দ্রনারায়ণ রায়	,, ঐ
শ্রীযুক্ত বাবু দেবীপ্রসাদ রায়	,, পোস্তা দরমাহাটা
,, দীননাথ রায়	,, সিমলা সাগর ধরের গলি
কুমার দৌলতচন্দ্র রায়	,, চিৎপুর
শ্রীযুক্ত বাবু দয়ালচাঁদ শীল	,, সিমলা চাষাধোপাপাড়া
,, দ্বারকানাথ দত্ত	,, ঠনঠনে
,, দেবেন্দ্রনাথ শীল	,, সিমলা চাষাধোপাপাড়া
,, দ্বারকানাথ মল্লিক	,, ঐ কাঁসারিপাড়া
,, দীননাথ দত্ত	,, ঠনঠনে
,, দ্বারকানাথ মল্লিক	, সিকদারপাড়া

শ্রীযুক্ত বাবু দামোদর বড়াল	সাং চোরবাগান
কুমার দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক	,, ঐ
শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ দত্ত	,, ঐ
,, দুর্গাদাস ধর	,, ঐ
,, দয়ালচাঁদ মল্লিক	,, সিন্দূরিয়াপটী
,, দীনেন্দ্রনাথ মল্লিক	,, ঐ
,, দেবেন্দ্রনাথ দে	,, ঐ রামপ্রসাদ সাহার গলি
,, দেবেন্দ্রনাথ ধর	,, সুরতির বাগান
,, দীননাথ পাইন	,, ঐ
,, দ্বারকানাথ সেন	,, ঐ
,, দীননাথ দত্ত	,, ঐ রতু সরকারের গলি
,, দীননাথ পাল	,, তারাচাঁদ দত্তের গলি
,, দ্বারকানাথ সেন	,, কলুটোলা সোঃ বসাকের গলি
,, দেবীচরণ পাল	,, ঐ
,, দ্বারকানাথ দত্ত	,, ঐ গোপাল চন্দ্রের গলি
,, দীননাথ দে	,, ঐ
,, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক	,, চূণাগলি কলুটোলা
,, দয়ালচাঁদ দে	,, চূণারী পুকুর লেন
,, দ্বারকানাথ দে	,, ঐ
,, দীননাথ ধর	,, ঐ
,, দীননাথ দত্ত	,, হাড়কাটা গোঃ সেঃ গলি
,, দুর্গাচরণ সেন	,, চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন
,, দীননাথ সেন	,, ঐ সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের গলি
,, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক	,, ঐ ভুবনধরের গলি
,, দীননাথ সেন	,, ঐ শত্রুঘ্ন ঘোষের গলি
,, দ্বারকানাথ সেন	,, ঐ
,, দুর্গাচরণ ধর	,, ঐ রামকান্ত মিস্ত্রীর গলি
,, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক	,, বড়বাজার

শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু পাল	সাং মলঙ্গা নেবুতলা
,, দামোদর পাইন	,, ঐ কৃষ্ণ লাহার গলি
,, দুর্গাচরণ চন্দ্র	,, ঐ
,, দীননাথ পাল	,, বহুবাজার
,, দীননাথ মল্লিক	,, ঐ বিশ্বনাথ মতিলাল গলি
,, দয়ালচাঁদ দে	,, ঐ গৌর দের গলি
,, দীনবন্ধু দে	,, ঐ
,, দীননাথ দে	,, ঐ ফিরিঙ্গীপাড়া
,, দীননাথ পাল	,, মলঙ্গা জেলেপাড়া লেন
,, দীননাথ দত্ত	,, ঐ পঞ্চাননতলা গলি
,, দ্বারকানাথ দে	,, বহুবাজার রাস্তার উপর
,, দ্বারকানাথ সেন	,, সিমলা প্যারী দের গলি
,, দীননাথ চন্দ্র	,, শ্রীরামপুর
,, দেবনারায়ণ পাল	,, ফরাসডাঙ্গা
,, দীননাথ চন্দ্র	,, ঐ
,, দ্বারকানাথ শীল	,, ঐ
,, দ্বারকানাথ আঢ্য	,, ঐ হাটখোলা
,, দীননাথ ধর	,, ঐ
,, দয়ালচাঁদ মল্লিক	,, চুঁচুড়া চৌমাথা
,, দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক	,, হুগলি ঘুঁটেবাজার
,, দুর্গাচরণ শীল	,, ঐ
,, দেবেন্দ্রনাথ দে	,, ঐ
,, দয়ালচাঁদ শীল	,, ঐ
,, দ্বারকানাথ দত্ত	,, চাঁপাতলা রাস্তার উপর
,, দয়ালচাঁদ নন্দী	,, হুগলী ঘুঁটেবাজার
,, দুর্গানারায়ণ মল্লিক	,, ঐ
,, দয়ালচাঁদ মল্লিক	,, ঐ
,, দুর্গাচরণ নন্দী	,, ঐ

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক	সাং হুগলী ঘুঁটেবাজার
,, দয়ালচাঁদ শীল	,, ঐ
,, দ্বারকানাথ লাহা	,, মলঙ্গা হৃদয়রাম বন্দ্যোঃ গলি
,, দয়ালচাঁদ লাহা	,, ঐ গৌর দের গলি
,, ধনঞ্জয় মল্লিক	,, ঢাকাপটী শিবতলার গলি
,, ধর্ম্মদাস দে	,, ফরাসডাঙ্গা
,, নীলমণি আঢ্য	,, দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট
,, নন্দলাল মল্লিক	,, ঐ
,, নিমাইচরণ মল্লিক	,, ষষ্ঠীতলার গলি
,, নিতাইচরণ রায়	,, ঐ
,, নরসিংহচন্দ্র চন্দ্র	,, জোড়াসাঁকো রতন সরকারের ষ্ট্রীট
,, নরসিংহদাস শীল	,, ঐ
,, নন্দরাম দে	,, ঐ
,, নরসিংহদাস রায়	,, ঐ রায়ের লেন
,, নকুড়চন্দ্র মল্লিক	,, ঢাকাপটী শিব ঠাকুরের গলি
,, নবকিশোর মল্লিক	,, পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট
,, নন্দলাল মল্লিক	,, জোড়াসাঁকো দয়েপটি
,, নরসিংহদাস আঢ্য	,, পায়রাটোলার গলি
,, নন্দলাল বর্দ্ধন	,, হাঁসপুকুর
,, নিতাইচাঁদ মল্লিক	,, বলরাম দের ষ্ট্রীট
,, নরসিংহদাস মল্লিক	,, জোড়াসাঁকো শিবু মিস্ত্রীর গলি
,, নন্দলাল দে	,, ঐ চাষাধোপার গলি
,, নন্দলাল দত্ত	,, ঐ সিংহির বাগান
,, নন্দলাল মল্লিক	,, চোরবাগান
,, নন্দলাল দে	,, সিন্দূরিয়াপটী কাশীঃ গলি
,, নীলমাধব সেন	,, সুরতির বাগান
,, নন্দলাল পাল	,, ঐ
,, নটবর দে	,, ঐ

শ্রীযুক্ত বাবু নিতাইচরণ মল্লিক	সাং সুরতির বাগান
,, নন্দলাল বড়াল	,, ঐ তারাচাঁদ দত্তের গলি
,, নবীনচন্দ্র আঢ্য	,, আমড়তলা
,, নিতাইচাঁদ দত্ত	,, কলুটোলা চূণাগলি
,, নীলমণি মল্লিক	,, ঐ সোভারাম বঃ গলি
,, নবীনচন্দ্র সেন	,, ঐ
,, নন্দদুলাল পাইন	,, ঐ চূণাগলি
,, নিতাইদাস দে	,, ঐ সোভারাম বসাক গলি
,, নদেরচাঁদ মল্লিক	,, ঐ ,,
,, নীলমণি ধর (১ম)	,, ঐ ,,
,, নকুড়চন্দ্র শীল	,, ঐ ,,
,, নীলমণি ধর (২য়)	,, ঐ ,,
,, নীলমণি দে	,, ঐ ,,
,, নন্দকুমার দত্ত	,, ঐ ,,
,, নবীনচন্দ্র দে	,, চাঁপাতলা
,, নরসিংহচন্দ্র দে	,, হাড়কাটা গোবিন্দ সেনের গলি
,, নীলমাধব দাস	,, চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন
,, নিতাইচরণ মল্লিক	,, ঐ
,, নীলমণি মল্লিক	,, ঐ
,, নকুড়চন্দ্র দে	,, ঐ
,, নিত্যানন্দ মল্লিক	,, বৈঠকখানা এসঃ লেন
,, নন্দলাল দত্ত	,, চাঁপাতলা নীলমণি দত্তের গলি
,, নীলমণি দত্ত	,, ঐ
,, নন্দলাল সেন	,, ঐ শত্রুঘ্নের গলি
,, নবীনচন্দ্র সেন	,, ঐ
,, নবীনচন্দ্র দে	,, ঐ রামকান্ত মিস্ত্রীর গলি
,, নিত্যানন্দ শীল	,, মলঙ্গা পঞ্চাননতলা
,, নারায়ণচন্দ্র ধর	,, ঐ ,,

শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি দে	সাং মলঙ্গা বাঙ্গারামের গলি
,, নিতাইবিহারী দে	,, বহুবাজার চৈঃ সেনের গলি
,, নীলমণি দত্ত	,, মলঙ্গা জেলেপাড়া লেন
,, নীলকমল দত্ত	,, ঐ স্কেভেঞ্জর গলি
,, নীলমণি দে	,, ঐ বাবুরাম শীলের গলি
,, নারায়ণচন্দ্র শীল	,, ঐ
,, নকুড়চন্দ্র দে	,, ঐ
,, নন্দলাল পাল	,, ঐ
,, নিত্যানন্দ দত্ত	,, ঐ কৃষ্ণ লাহার গলি
,, নীলমণি পাল	,, বহুবাজার
,, নীলমণি নন্দী	,, চাঁপাতলা রাম বন্দ্যোঃ গলি
,, নীলমণি মল্লিক	,, মলঙ্গা হৃদয়রাম বন্দ্যোর গলি
,, নিতাইচাঁদ ধর	,, শ্রীরামপুর
,, নবীনচন্দ্র চন্দ্র	,, ফরাসডাঙ্গা
,, নবকিশোর মল্লিক	,, ঐ
,, নবদ্বীপ দত্ত	,, চুঁচুড়া চৌমাথা
,, নবীনচন্দ্র মল্লিক	,, ঐ
,, নবীনচন্দ্র মল্লিক	,, হুগলি বালি
,, নবীনচন্দ্র পাল	,, ঐ
,, নগেন্দ্রনাথ ধর	,, ঐ ঘুঁটেবাজার
,, নবকুমার মল্লিক	,, ঐ
,, নীলমণি শীল	,, ঐ
,, নবীনচন্দ্র চন্দ্র	,, ফরাসডাঙ্গা
,, নন্দলাল দত্ত	,, মলঙ্গা সোঃ শীলের গলি
,, নন্দলাল দে	,, ঐ বিশ্বনাথ মতিলাল গলি
,, নন্দলাল ধর	,, ঐ
,, নন্দলাল পাল	,, ঐ মদন দত্তের গলি
,, নবীনচন্দ্র সেন	,, ঐ

শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র দাস	*সাং মলঙ্গা*
,, নন্দলাল সেন	,, ঐ
,, নীলমণি দে	,, বহুবাজার ফিরিঙ্গীপাড়া
,, নকুড়চন্দ্র দে	,, ঐ
,, নন্দলাল সেন	,, মলঙ্গা হলধর বর্ধনের গলি
,, নকুড়চন্দ্র দত্ত	,, ঐ
,, নারায়ণচন্দ্র শীল	,, ঐ জেলেপাড়া
,, নন্দলাল মল্লিক	,, ঐ হৃদয়রাম বন্দ্যোর গলি
,, নিত্যানন্দ দত্ত	,, ঐ
,, নীলমণি দে	,, ঐ হৃদয়রাম বন্দ্যোর গলি
,, নিতাইচাঁদ শীল	,, ঐ
,, নিত্যানন্দ বর্ধন	,, ঐ পঞ্চাননতলা
,, প্রেমনাথ মল্লিক	,, বড়বাজার সূতাপটী
,, প্রসাদদাস মল্লিক	,, দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট
,, প্রসাদদাস দত্ত	,, জোড়াসাঁকো ষষ্ঠীতলা
,, পুলিনবিহারী দত্ত	,, ঐ
,, প্যারীমোহন ধর	,, ঐ লালমাধব গলি
,, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র	,, ঐ রতন সরকারের ষ্ট্রীট
,, প্রসাদদাস মল্লিক	,, মণ্ডল ষ্ট্রীট
,, পতিতপাবন সেন	,, সিমলা সুকিয়া ষ্ট্রীট
,, পূর্ণচন্দ্র দত্ত	,, ঐ চাষাধোপাপাড়া
,, পান্নালাল দত্ত	,, ঐ
,, প্রাণকৃষ্ণ ধর	,, সুরতির বাগান
,, পূর্ণচন্দ্র দে	,, ঐ
,, প্যারীলাল মল্লিক	,, ঐ
,, পুলিনবিহারী পাইন	,, ঐ
,, প্রসাদদাস মল্লিক	,, বড়বাজার সূতাপটী
,, পুলিনচন্দ্র রায়	,, ঐ

শ্রীযুক্ত বাবু পুলিনবিহারী দত্ত	সাং আমড়াতলার গলি
,, প্রসাদদাস সেন	,, কলুটোলা সোভারাম বঃ গলি
,, পীতাম্বর দত্ত	,, ঐ
,, পার্বতীচরণ পাল	,, ঐ
,, পূর্ণচন্দ্র শীল	,, ঐ
,, পাঁচকড়ি পাল	,, ঐ
,, পীতাম্বর দত্ত	,, ঐ চূণাগলি
,, প্রেমচাঁদ বড়াল	,, চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন
,, পঞ্চানন বর্ধন	,, মলঙ্গা জেলেপাড়া
,, প্রসন্নকুমার দত্ত	,, ঐ হৃদয়রাম বন্দ্যোঃ গলি
,, পুলিনবিহারী বড়াল	,, ঐ
,, প্রাণকৃষ্ণ নন্দী	,, ঐ পঞ্চাননতলার গলি
,, পূর্ণচন্দ্র শীল	,, ঐ
,, পাঁচকড়ি শীল	,, ঐ
,, প্রসাদদাস মল্লিক	,, বড়বাজার সোনাপটী
,, পান্নালাল আঢ্য	,, জগন্নাথের ঘাট
,, প্রিয়নাথ আঢ্য	,, বাঁশতলা পায়রাটোলার গলি
,, প্রাণকৃষ্ণ শীল	,, ঐ বটতলা
,, পূর্ণচন্দ্র পাল	,, মলঙ্গা অক্রূর দত্তের গলি
,, প্রেমচাঁদ দত্ত	,, সিন্দূরিয়াপটীর গলি
,, পূর্ণচন্দ্র দে	,, হাবড়া পঞ্চাননতলা
,, পূর্ণচন্দ্র পাইন	,, শ্রীরামপুর
,, পীতাম্বর শীল	,, ঐ
,, পাঁচকড়ি দত্ত	,, চুঁচুড়া
,, প্রসাদদাস সেন	,, ঐ
,, প্রসাদদাস মল্লিক (১ম)	,, হুগলি ঘুঁটেবাজার
,, পার্বতীচরণ মল্লিক	,, ঐ
,, প্রসাদদাস মল্লিক (২য়)	,, ঐ

শ্রীযুক্ত বাবু পীতাম্বর ধর	সাং লালবাজার
,, ফকিরচাঁদ শীল	,, মলঙ্গা পঞ্চাননতলা
,, বলাইচাঁদ মল্লিক	,, জোড়াসাঁকো ষষ্ঠীতলা
,, ব্রজনাথ দে	,, ঐ
,, বিহারীলাল মল্লিক	,, ঐ
,, বৃন্দাবন মল্লিক	,, ঐ
,, বৈদ্যনাথ মল্লিক	,, ঐ রতন সরকার ষ্ট্রীট
,, বনমালী সেন	,, ঐ
,, বলরাম দে	,, ঐ
,, বলাইচাঁদ চন্দ্র	,, ঐ ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট
,, বীরচন্দ্র রায়	,, ঐ রায়ের লেন
,, বলাইচাঁদ দত্ত	,, কালাকর ষ্ট্রীট
,, বলাইচাঁদ মল্লিক	,, ঢাকাপটী শিবতলা
,, বিহারীলাল মল্লিক	,, পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট
,, বলাইচাঁদ আঢ্য	,, বাঁশতলা পায়রাটোলা গলি
,, বিহারীলাল আঢ্য	,, ঐ বটতলা
,, বনমালী মল্লিক	,, হাঁসপুকুর
,, বলাইচাঁদ দত্ত	,, বলরাম দের ষ্ট্রীট
,, বিহারীলাল সেন	,, ঐ
,, ব্রজনাথ ধর	,, ঐ
,, বটুবিহারী ধর	,, সিমলা সাগর ধরের গলি
,, ব্রজলাল দত্ত	,, ঐ চাষাধোপাপাড়া
,, বিপিনবিহারী আঢ্য	,, ঐ
,, বিনোদচাঁদ মল্লিক	,, ঐ জেলেটোলা
,, ব্রজনাথ বর্ধন	,, ঐ রামতনু বসুর গলি
,, বিপিনবিহারী দত্ত	,, ঐ বিন্দুপালিতের গলি
,, বঙ্কুবিহারী দে	,, ঐ
ব্রজনাথ দত্ত	ঠনঠনে

শ্রীযুক্ত বাবু বৈষ্ণবচরণ সেন	সাং চোরবাগান
„ বলাইচরণ মল্লিক	„ ঐ
„ বীরচাঁদ দত্ত	„ সিন্দূরিয়াপটী
„ বলাইচাঁদ মল্লিক	„ ঐ
„ বলাইচাঁদ দত্ত	„ ঐ
“ বলাইচাঁদ দে	„ ঐ
„ বিশ্বনাথ দে	„ চোরবাগান
„ বেণীমাধব সেন	„ তূলাবাজার
„ বলাইচাঁদ সেন	„ ঐ
„ বিপিনবিহারী মল্লিক	„ সুরতির বাগান
„ বিনোদবিহারী মল্লিক	„ বড়বাজার সূতাপটী
„ বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক	„ ঐ
„ বীরেন্দ্রনাথ মল্লিক	„ মলঙ্গা নেড়াগিরিজা
„ বলাইচাঁদ ধর	„ আমড়াতলার গলি
„ বনবিহারী ধর	„ ঐ
„ বঙ্কুলাল ধর	„ ঐ
„ ব্রজলাল দাস	„ ঐ
„ বিহারীলাল আঢ্য	„ ঐ
„ বাদলচন্দ্র মল্লিক	„ কলুটোলা সোভারাম বঃ গলি
„ ব্রজেন্দ্রনাথ মল্লিক	„ ঐ
„ বলরাম দে	„ ঐ
„ বলাইদাস মল্লিক	„ দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট
„ ব্রজবন্ধু আঢ্য	„ ঐ
„ বৈকুণ্ঠনাথ সেন	„ জোড়াসাঁকো মনসাতলা
„ বদনচন্দ্র ধর	„ কলুটোলা সোভারাম বঃ ষ্ট্রীট
„ বলাইচাঁদ ধর	„ ঐ
„ বেণীমাধব মল্লিক	„ ঐ
„ বেণীমাধব দে	„ আরপুলি লেন

শ্রীযুক্ত বাবু বৈদ্যনাথ দে	সাং হাড়কাটা গোবিন্দ সেনের গলি
,, বিপিনবিহারী দত্ত	,, ঐ
,, বৈকুণ্ঠনাথ বড়াল	,, ঐ
,, বলাইচাঁদ দত্ত	,, চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন
,, বৈদ্যনাথ দত্ত	,, ঐ
,, বিশ্বনাথ দত্ত	,, ঐ
,, বঙ্কুবিহারী ধর	,, ঐ
,, বেণীমাধব সেন	,, চাঁপাতলা সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের গলি
,, বেণীমাধব দে	,, ঐ ভুবন ধরের গলি
,, বদনচন্দ্র দত্ত	,, বৈঠকখানা স্কটস্ লেন
,, ব্রজনাথ শীল	,, ঐ
,, ব্রজনাথ শীল	,, চাঁপাতলা গোয়ালাপুকুর
,, ব্রজনাথ চন্দ্র	,, ঐ
,, বীরচাঁদ দাস	,, ঐ অখিল মিস্ত্রীর গলি
,, বিশ্বনাথ দত্ত	,, ঐ রামমোহন মিস্ত্রীর গলি
,, বিহারীলাল দে	,, ঐ
,, বিপিনবিহারী দে	,, ঐ
,, বিশ্বম্ভর দত্ত	,, মলঙ্গা স্কেভেঞ্জর গলি
,, ব্রজনাথ সেন	,, ঐ বাবুরাম শীলের গলি
,, ব্রজনাথ দাস	,, নেবুতলা নেড়াগিরিজা
,, বলদেব ধর	,, মলঙ্গা বাঞ্ছারাম অক্রুরের গলি
,, বীরচাঁদ মল্লিক	,, ঐ
,, বীরচাঁদ পাইন	,, ঐ কৃষ্ণলাহার গলি
,, বিনোদবিহারী দাস	,, চাঁপাতলা রামচন্দ্র বঃ গলি
,, বিহারীলাল ধর	,, ঐ রাধানাথ মল্লিকের গলি
,, বেণীমাধব ধর	,, মলঙ্গা স্বরূপ ধরের গলি
,, বিহারীলাল দে	,, ঐ বিশ্বনাথ মতিলালের গলি
,, ব্রজলাল দে	,, ঐ

শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী দত্ত	সাং	মলঙ্গা মদন দত্তের গলি
,,	বলাইচাঁদ সেন	,,	ঐ সেকরাপাড়ার গলি
,,	বিহারীলাল আঢ্য	,,	ঐ ঠাকুরদাস পালিতের গলি
,,	ব্রজলাল দে	,,	ঐ
,,	বলাইচাঁদ রায়	,,	ঐ জেলেপাড়া লেন
,,	বলাইচাঁদ শীল	,,	ঐ
,,	বিহারীলাল দে	,,	ঐ
,,	বিশ্বনাথ দত্ত	,,	ঐ পঞ্চাননতলার গলি
,,	বলাইচাঁদ রায়	,,	ঐ হৃদয়রাম বন্দ্যোঃ গলি
,,	বঙ্কুবিহারী সেন	,,	মির্জাপুর অবিনাশ মিত্র গলি
,,	বনমালী সেন	,,	মলঙ্গা মদন দত্তের গলি
,,	ব্রজবল্লভ মল্লিক	,,	ঐ বহুবাজার
,,	ব্রজনাথ শীল	,,	ঐ দুর্গাচরণ পিথুরির গলি
,,	বেণীমাধব দত্ত	,,	ঐ হৃদয়রাম বন্দ্যোর গলি
,,	বল্লভচরণ মল্লিক	,,	ঐ
,,	বৈষ্ণবচরণ দত্ত	,,	ঐ
,,	বিহারীলাল দে	,,	চাঁপাতলা লেন
,,	বলাইচাঁদ দে	,,	মলঙ্গা হৃদয়রাম বন্দ্যোঃ গলি
,,	বৈষ্ণবচরণ দত্ত	,,	ঐ পঞ্চাননতলার লেন
,,	বনমালী সেন	,,	ঐ
,,	ব্রজবল্লভ মল্লিক	,,	ঐ নেবুতলা
,,	বনমালী পাল	,,	ঐ সাঁকারিটোলা
,,	ব্রজনাথ মল্লিক	,,	চাঁপাতলা সিদ্ধেশ্বর চঃ গলি
,,	ব্রজলাল সেন	,,	ঐ
,,	বঙ্কুবিহারী আঢ্য	,,	বড়বাজার
,,	বিনোদবিহারী আঢ্য	,,	সিমলা জেলেটোলা
,,	বিহারীলাল ধর	,,	হাড়কাটা গোবিন্দ সেনের গলি
,,	বিপিনবিহারী মল্লিক	,,	শ্রীরামপুর

শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী পাইন	সাং	শ্রীরামপুর
" বলরাম চন্দ্র	"	ঐ
" বিশ্বম্ভর দত্ত	"	ঐ
" বীরচাঁদ বড়াল	"	ফরাসডাঙ্গা
" বনমালী ধর	"	ঐ
" বিপিনবিহারী চন্দ্র	"	ঐ
" বনমালী ধর	"	ঐ
" বিহারীলাল দত্ত	"	চুঁচুড়া চৌমাথা
" বেণীমাধব সেন	"	হুগলী বালি
" বঙ্কুবিহারী শীল	"	ঐ
" বৈষ্ণবচরণ মল্লিক	"	ঐ ঘুঁটেবাজার
" বিহারীলাল শীল (১ম)	"	ঐ
" বলাইলাল নন্দী	"	ঐ
" বিহারীলাল শীল (২য়)	"	ঐ
" বিপিনবিহারী দে	"	ঐ
" ব্রজমোহন মল্লিক	"	ঐ
" বটকৃষ্ণ মল্লিক	"	ঐ
" বেচারাম মল্লিক	"	ঐ
" বলরাম মল্লিক	"	ঐ
" বেণীমাধব মল্লিক	"	ঐ
" বৈকুণ্ঠনাথ মল্লিক	"	ঐ
" বিহারীলাল মল্লিক (১ম)	"	ঐ
" বিপিনবিহারী মল্লিক	"	ঐ
" বিহারীলাল মল্লিক (২য়)	"	ঐ
" ব্রজনাথ শীল	"	চাঁপাতলা সেকেণ্ড সেন
" ভোলানাথ মল্লিক	"	বড়বাজার সূতাপটি
" ভগবতীচরণ মল্লিক	"	ঐ
" ভুবনমোহন ধর	"	সিমলা জেলেটোলা ষ্ট্রীট

শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ দত্ত	সাং ঠনঠনে সীতারাম ঘোষ গলি
„ ভুবনমোহন দে	„ চোরবাগান
„ ভুবনমোহন সেন	„ ঐ
„ ভুবনমোহন নন্দী	„ ঐ
„ ভগবতীচরণ মল্লিক	„ বড়বাজার
„ ভোলানাথ পাইন	„ চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন
„ ভুবনমোহন পাইন	„ ঐ
„ ভোলানাথ সেন	„ মলঙ্গা দুর্গাচরণ পিথুরির গলি
„ ভুবনমোহন বড়াল	„ ঐ হলধর বর্ধনের গলি
„ ভোলানাথ দে	„ ফরাসডাঙ্গা
„ ভোলানাথ ধর	„ হুগলী ঘুঁটেবাজার
„ ভোলানাথ মল্লিক (১ম)	„ ঐ
„ ভোলানাথ মল্লিক (২য়)	„ ঐ
„ ভবানীচরণ ধর	„ ঐ
„ ভীমলাল সেন	„ আরপুলি লেন
„ ভোলানাথ সেন	„ মলঙ্গা হৃদয়রাম বন্দ্যোঃ গলি
„ ভোলানাথ পাল	„ ফরাসডাঙ্গা
„ মাণিকলাল মল্লিক (১ম)	„ দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট
„ মাণিকলাল মল্লিক (২য়)	„ ঐ
„ মহীন্দ্রলাল চন্দ্র	„ জোড়াসাঁকো রতন সঃ গাঃ ষ্ট্রীট
„ মহীন্দ্রনাথ রায়	„ ঐ
„ মধুসূদন দে	„ ঢাকাপটী শিবতলা
„ মহীন্দ্রনাথ পাইন	„ পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট
„ মধুসূদন রায়	„ জোড়াসাঁকো দয়েপটী
„ মণিমোহন আঢ্য	„ জগন্নাথের ঘাট কালাকর ষ্ট্রীট
„ মধুসূদন ধর	„ সিমলা সাগর ধরের গলি
কুমার মণীন্দ্র মল্লিক	„ চোরবাগান
শ্রীযুক্ত বাবু মাণিকলাল দে	„ ঐ

শ্রীযুক্ত বাবু মণিলাল দত্ত	সাং সিন্দূরিয়াপটী
,, মহীন্দ্রনাথ দে	,, ঐ রামপ্রসাদ সাঃ গলি
,, মাধবলাল দে	,, কাশীনাথ মল্লিকের গলি
,, মাণিকলাল বড়াল	,, সুরতির বাগান রাজমোহন গলি
,, মহীন্দ্রনাথ সেন	,, ঐ কন্দকাটার গলি
,, মহেশচন্দ্র মল্লিক	,, বড়বাজার সূতাপটী
,, মহাভারত দে	,, ঐ সোনাপটী
,, মতিলাল ধর	,, আমড়াতলার গলি
,, মহীন্দ্রলাল ধর	,, ঐ
,, মধুসূদন সেন	,, কলুটোলা সোভারাম বঃ ষ্ট্রীট
,, মূলুকচাঁদ সেন	,, ঐ
,, মধুসূদন ধর	,, ঐ
,, মাণিকলাল পাইন	,, আরপুলি লেন
,, মদনগোপাল দে	,, ঐ
,, মধুসূদন দত্ত	,, পটলডাঙ্গা কলেজ ষ্ট্রীট
,, মহীন্দ্রলাল বড়াল	,, হাড়কাটা গোঃ সেনের গলি
,, মধুসূদন দত্ত	,, চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন
,, মধুসূদন দত্ত	,, ঐ নিতাই বাবুর লেন
,, মাধবচন্দ্র দত্ত	,, ঐ সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র গলি
,, মথুরামোহন দে	,, ঐ ভুবন ধরের গলি
,, মতিলাল দে	,, বৈঠকখানা স্কটস্ লেন
,, মাণিকলাল দে	,, চাঁপাতলা নীলমণি দত্তের গলি
,, মহীন্দ্রনাথ ধর	,, ঐ গয়লাপুকুর
,, মতিলাল মল্লিক	,, মলঙ্গা স্কেভেঞ্জরের গলি
,, মহীন্দ্রনাথ দে	,, ঐ ফকির দের গলি
,, মাণিকলাল দে	,, ঐ বহুবাজারের গলি
,, মুচকুন্দলাল মল্লিক	,, ঐ গোঃ সরকারের গলি
, মাণিকলাল দে	,, ঐ গৌর দের গলি

শ্রীযুক্ত বাবু	মথুরামোহন দত্ত	সাং	মলঙ্গা মদন দত্তের গলি
,,	মাণিকলাল বড়াল	,,	ঐ সেকরাপাড়ার গলি
,,	মতিলাল মল্লিক	,,	ঐ
,,	মাধবচন্দ্র সেন	,,	ঐ হলধর বর্ধনের গলি
,,	মাধবচন্দ্র মল্লিক	,,	ঐ হৃদয়রাম বন্দ্যোঃ গলি
,,	মহীন্দ্রনাথ পাইন	,,	শ্রীরামপুর
,,	মতিলাল পাইন	,,	ঐ
,,	মতিলাল শীল	,,	ঐ
,,	মধুসূদন দে	,,	ফরাসডাঙ্গা
,,	মুরারিমোহন নন্দী	,,	ঐ
,,	মতিলাল মল্লিক	,,	চুঁচুড়া চৌমাথা
,,	মোহনবিহারী মল্লিক	,,	ঐ
,,	মতিলাল বড়াল	,,	হুগলি বালি
,,	মতিলাল সেন	,,	ঐ
,,	মধুসূদন মল্লিক	,,	ঐ ঘুঁটেবাজার
,,	মুরারিমোহন শীল	,,	ঐ
,,	মহীন্দ্রনাথ শীল	,,	ঐ
,,	মধুসূদন মল্লিক	,,	ঐ
,,	মদনমোহন শীল	,,	ঐ
,,	মতিলাল শীল	,,	ঐ
,,	মতিলাল মল্লিক	,,	মলঙ্গা বহুবাজার
,,	মধুসূদন ধর	,,	সিমলা চাষাধোপাপাড়া
,,	মণিমাধব সেন	,,	চোরবাগান
,,	মাধবরাম দে	,,	জোড়াসাঁকো রতন সঃ ষ্ট্রীট
,,	যদুলাল মল্লিক	,,	পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট
,,	যাদবচন্দ্র মল্লিক	,,	জোড়াসাঁকো রঃ সঃ ষ্ট্রীট
,,	যাদবরাম দে	,,	ঐ
,,	যাদবলাল মল্লিক		ঐ ষষ্ঠীতলার গলি

শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র শীল	সাং সিমলা সাগর ধরের গলি
,, যোগেন্দ্রনাথ শীল	,, ঐ চাষাধোপাপাড়া
,, যত্নাথ বড়াল	,, ঐ
,, যোগেন্দ্রনাথ নন্দী	,, ঐ জেলেটোলা
,, যতীন্দ্রমোহন দত্ত	,, জোড়াসাঁকো বিঃ পাঃ গলি
,, যাদবচন্দ্র মল্লিক	,, ঐ সিকদারপাড়া ষ্ট্রীট
কুমার যোগেন্দ্র মল্লিক	,, চোরবাগান
শ্রীযুক্ত বাবু যত্নাথ সেন	,, ঐ
,, যাদবচন্দ্র চন্দ্র	,, কলুটোলা সোঃ বঃ লেন
,, যজ্ঞেশ্বর দে	,, ঐ
,, যত্নাথ ধর	,, ঐ চূণারি পুকুর লেন
,, যাদবচন্দ্র দত্ত	,, হাড়কাটা গলি সেঃ গলি
,, যত্নাথ দে	,, মলঙ্গা বাঞ্ছারাম অক্রুরের গলি
,, যজ্ঞেশ্বর দে	,, ঐ ফকির দের গলি
,, যাদবচন্দ্র সেন	,, ঐ বহুবাজার
,, যাদবচন্দ্র মল্লিক	,, ঐ মির্জাপুর বৈঠকখানা লেন
,, যত্নাথ সেন	,, বহুবাজার সেকরাপাড়া
,, যোগেন্দ্রনাথ সেন	,, মঙ্গলা হলধর বর্ধন গলি
,, যত্নাথ মল্লিক	,, ঐ
,, যত্নাথ দে	,, খিদিরপুর
,, যাদবরাম দে	,, ফরাসডাঙ্গা
,, যাদবচন্দ্র দত্ত	,, চুঁচুড়া
,, যজ্ঞেশ্বর মল্লিক	,, হুগলি ঘুঁটেবাজার
,, যাদবচন্দ্র মল্লিক	,, ঢাকাপটী হরপ্রসাদের গলি
রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক	,, চোরবাগান
কুমার রাজকুমার রায়	,, দরমাহাটা পোস্তা
,, রাধাপ্রসাদ রায়	,, ঐ
শ্রীযুক্ত বাবু রাজবল্লভ আঢ্য	,, ঐ

শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল মল্লিক্	সাং পাথুরিয়াঘাটা দঃ ঠাঃ ষ্ট্রীট
„ রাসবিহারী আঢ্য	„ ঐ
„ রঘুনাথ রায়	„ জোড়াসাঁকো রতন সঃ ষ্ট্রীট
„ রামমোহন দে	„ ঐ
„ রসিকলাল চন্দ্র	„ চূণাগলি কলুটোলা
„ রামসেবক মল্লিক	„ জোড়াসাঁকো কবরডাঙ্গা
„ রাধানাথ আঢ্য	„ সিমলা
„ রাজনারায়ণ দে	„ জোড়াসাঁকো বিন্দু পাঃ গলি
„ রাখালচন্দ্র দে	„ সিন্দূরিয়াপটী
„ রাজকৃষ্ণ আঢ্য	„ সুরতির বাগান
„ রমানাথ শীল	„ ঐ
„ রামচাঁদ শীল	„ ঐ
„ রাধানাথ সেন	„ ফৌজদারী বালাখানা
„ রসিকলাল ধর	„ আমড়াতলা
„ রাজনারায়ণ দত্ত	„ কলুটোলা ষ্ট্রীট
„ রাজবল্লভ ধর	„ ঐ সোভারাম বসাকের ষ্ট্রীট
„ রসিকলাল পাইন	„ আরপুলি লেন
„ রাজকৃষ্ণ বর্দ্ধন	„ চূণারিপুকুর লেন
„ রামরত্ন ধর	„ ঐ
„ রাধাকৃষ্ণ দত্ত	„ চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন
„ রামধন ধর	„ ঐ
„ রাজনারায়ণ পাইন	„ ঐ
„ রামকান্ত ধর	„ ঐ
„ রাজনারায়ণ আঢ্য	„ ঐ
„ রাখালদাস পাইন	„ ঐ
„ রাজনারায়ণ মল্লিক	„ ঐ সিদ্ধেশ্বর চন্দ্রের গলি
„ রাজনারায়ণ দে	„ ঐ
„ রাজনারায়ণ সেন	„ ঐ

শ্রীযুক্ত বাবু রামধন দে	সাং বৈঠকখানা স্কট্‌স্ লেন
,, রাজকৃষ্ণ মল্লিক	,, ঐ
,, রসিকলাল দে	,, মলঙ্গা স্কেভেঞ্জরস্ গলি
,, রসিকলাল নন্দী	,, চাঁপাতলা অখিল মিস্ত্রীর গলি
,, রাখালনাথ দত্ত	,, মলঙ্গা বাবুরাম শীলের গলি
,, রমানাথ ধর	,, ঐ
,, রামেশ্বর দে	,, ঐ ফকিরচাঁদ দের গলি
,, রসিকলাল ধর	,, চাঁপাতলা রাধানাথ মল্লিক গলি
,, রাজবল্লভ দাস	,, মলঙ্গা বিশ্বনাথ মতিলালের গলি
,, রতনলাল দে	,, ঐ ফিরিঙ্গীটোলা
,, রামনারায়ণ চন্দ্র	,, ঐ হলধর বর্ধনের গলি
,, রসিকলাল শীল	,, ঐ জেলেপাড়া লেন
,, রামনারায়ণ দত্ত	,, ঐ হৃদয়রাম বন্দ্যোর গলি
,, রাজকৃষ্ণ শীল	,, ঐ
,, রাজকৃষ্ণ সেন	,, ঐ
,, রূপচাঁদ আঢ্য	,, ঐ
,, রসিকলাল সেন	,, ঐ পঞ্চাননতলা গলি
,, রাসবিহারী শীল	,, ঐ
,, রূপচাঁদ চন্দ্র	,, শ্রীরামপুর
,, রমানাথ ধর	,, ঐ
,, রামচন্দ্র চন্দ্র	,, ঐ
,, রামদয়াল দে	,, ঢাকাপটী শিবঠাকুরের গলি
,, রসিকলাল দে	,, ফরাসডাঙ্গা
,, রসিকলাল শীল	,, ঐ
,, রাধাবল্লভ বড়াল	,, ঐ
,, রসিকলাল ধর	,, ঐ
,, রাধাবল্লভ শীল	,, ঐ
,, রামচরণ মল্লিক	,, চুঁচুড়া চৌমাথা

শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল বর্দ্ধন	সাং চুঁচুড়া চৌমাথা
„ রাজনারায়ণ মল্লিক	„ হুগলি বালি
„ রাজনারায়ণ মল্লিক	„ ঐ ঘুঁটেবাজার
„ রাখালদাস পাইন	„ ঐ
„ রাধাবল্লভ মল্লিক	„ ঐ
„ রামগোপাল দে	„ ঐ
„ রামচাঁদ নন্দী	„ ঐ
„ রাজনারায়ণ মল্লিক	„ ঐ
„ রাজেন্দ্রলাল মল্লিক	„ ঐ
„ রামচাঁদ পাইন	„ ঐ
„ রমানাথ শীল	„ মির্জাপুর দপ্তরিপাড়া
„ লালমোহন মল্লিক	„ সিন্দূরিয়াপটী
„ ললিতমোহন মল্লিক	„ ঐ
„ লালমোহন শীল	„ জোড়াসাঁকো ষষ্ঠীতলা
„ লালচাঁদ চন্দ্র	„ ঐ রতন সরকারের গলি
„ লালমোহন বড়াল	„ সুরতির বাগান
„ ললিতবল্লভ শীল	„ ঐ
„ ললিতমোহন সেন	„ ঐ রাজমোহন বসুর গলি
„ ললিতমোহন মল্লিক	„ বড়বাজার সূতাপটী
„ লোকনাথ রায়	„ কলুটোলা সোভাঃ বঃ ষ্ট্রীট
„ ললিতমোহন বড়াল	„ ঐ
„ ললিতমোহন দে	„ ঐ
„ লোকনাথ বড়াল	„ হাড়কাটা গোবিন্দ সেনের গলি
„ লোকনাথ ধর	„ মলঙ্গা বহুবাজারের গলি
„ লোকনাথ ধর	„ ঐ সনাতন শীলের গলি
„ ললিতবিহারী দে	„ ঐ গৌর দের গলি
„ লালবিহারী দে	„ ঐ
„ লালবিহারী দে	„ বহুবাজার চৈতন্য শীলের গলি

শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন নন্দী	সাং বহুবাজার চৈতন্য শীলের গলি
,, লাটুরাম সেন	,, হুগলি বালি
,, লক্ষ্মীনারায়ণ বড়াল	,, ঐ
,, লক্ষ্মণচন্দ্র পাল	,, ঐ
,, ললিতমোহন দে	,, মলঙ্গা গৌর দের গলি
,, ললিতমোহন শীল	,, ঐ হলধর বর্দ্ধনের গলি
,, লক্ষ্মীনারায়ণ মল্লিক	,, জোড়াসাঁকো ষষ্ঠীতলা
,, লক্ষ্মীনারায়ণ চন্দ্র	,, ফরাসডাঙ্গা
,, শিবচন্দ্র মল্লিক	,, দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট
,, শ্রীনাথ চন্দ্র	,, ঐ
,, শ্রীনাথ সেন	,, জোড়াসাঁকো রতন সরকারের ষ্ট্রীট
,, শিবচন্দ্র নন্দী	,, ঢাকাপটী শিবতলা
,, শিবচন্দ্র শীল	,, সিমলা সাগর ধরের গলি
,, শ্রীদামচন্দ্র সেন	,, তূলাবাজার
,, শ্রীনাথ সেন	,, সুরতি বাগান তাঃ দঃ গলি
,, শ্রীনাথ সেন	,, কলুটোলা সোভারা বঃ ষ্ট্রীট
,, শিবচরণ মল্লিক	,, ঐ
,, শ্রীনাথ রায়	,, ঐ গোপালচন্দ্রের গলি
,, শ্রীনাথ ধর	,, চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন
,, শিবচন্দ্র শীল	,, ঐ ভুবন ধরের গলি
,, শীতলচন্দ্র সেন	,, ঐ অখিল মিস্ত্রীর গলি
,, শ্রীকৃষ্ণ সেন	,, মলঙ্গা সেকরাপাড়া লেন
,, শ্রীনাথ বড়াল	,, ঐ
,, শিবচন্দ্র সেন	,, ঐ কালিদাস দত্তের গলি
,, শ্রীনাথ দে	,, ঐ বিশ্বনাথ মতিলালের গলি
,, শ্রীনাথ ধর	,, ঐ বাবুরাম শীলের গলি
,, শ্রীনাথ ধর	,, বহুবাজার রাস্তার উপর
,, শিবচন্দ্র ধর	,, মলঙ্গা স্কেভেঞ্জর গলি

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীদামচন্দ্র দে | সাং সুরতির বাগান
,, শশিভূষণ শীল | ,, মলঙ্গা পঞ্চাননতলা
,, শ্রীনাথ দত্ত | ,, চাঁপাতলা নীলমণি দত্তের গলি
,, শিবচন্দ্র বড়াল | ,, হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় গলি
,, শরৎচন্দ্র পাল | ,, ফরাসডাঙ্গা
,, শরৎচন্দ্র পাল | ,, ঐ
,, শশিভূষণ চন্দ্র | ,, ঐ
,, শ্রীনাথ দত্ত | ,, হুগলি বালি
,, শ্রীনাথ মল্লিক | ,, ঐ ঘুঁটেবাজার
,, শিবচন্দ্র শীল | ,, ঐ
,, শশিভূষণ শীল | ,, ঐ
,, শ্রীনাথ শীল | ,, শ্রীরামপুর
,, শিবচন্দ্র দত্ত | ,, বৈঠকখানা স্কটস্ লেন
,, শ্যামসুন্দর আঢ্য | ,, দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট
,, শ্যামাচরণ সেন | ,, ঐ
,, শ্যামচাঁদ সেন | ,, জোড়াসাঁকো বলরাম দের ষ্ট্রীট
,, শ্যামচাঁদ আঢ্য | ,, আমড়াতলা গলি
,, শ্যামলাল মল্লিক | ,, ঢাকাপটী হরপ্রসাদের গলি
,, শ্যামচাঁদ আঢ্য | ,, মলঙ্গা হৃদয়রাম বন্দ্যোর গলি
,, শ্যামলাল সেন | ,, ঐ বাঞ্ছারাম অক্রুরের গলি
,, শ্যামলাল দত্ত | ,, ঐ দুর্গাচরণ পিথুরির গলি
,, শ্যামচাঁদ মল্লিক | ,, ঐ পঞ্চাননতলা লেন
,, শ্যামলাল ধর | ,, ঐ
,, শ্যামলাল দে | ,, ঐ স্কেভেঞ্জরের গলি
,, শ্যামাচরণ দত্ত | ,, হুগলি ঘুঁটেবাজার
কুমার শ্যামচাঁদ রায় | ,, চিৎপুর কাশিপুর
শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র রায় | ,, জোড়াসাঁকো রায়ের লেন
,, শম্ভুচন্দ্র দত্ত | ,, সিমলা চাষাধোপাপাড়া

শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুনাথ দত্ত	সাং সিন্দূরিয়াপটীর গলি
,, শম্ভুনাথ পাইন	,, কলুটোলা সোভারাম বসাঃ ষ্ট্রীট
,, শম্ভুনাথ পাল	,, চাঁপাতলা অখিল মিস্ত্রীর গলি
,, শম্ভুচন্দ্র পাল	,, ফরাসডাঙ্গা হাটখোলা
,, শম্ভুচরণ শীল	,, মলঙ্গা পঞ্চাননতলা
,, শম্ভুচন্দ্র চন্দ্র	,, ফরাসডাঙ্গা
,, শারদাচরণ মল্লিক	,, হুগলি ঘুঁটেবাজার
,, শম্ভুচন্দ্র শীল	,, ঐ
,, শ্রীনাথ সেন	,, কলুটোলা সোভারাম বঃ গলি
,, শিবচন্দ্র মল্লিক	,, বহুবাজার রাস্তার উপর
,, শ্যামাচরণ দে	,, হুগলি ঘুঁটেবাজার
,, শ্রীদামচন্দ্র শীল	,, ঐ
,, শ্রীনাথ ধর	,, চাঁপাতলার গলি
,, ষষ্ঠীচরণ মল্লিক	,, হুগলি ঘুঁটেবাজার
,, ষষ্ঠীদাস শীল	,, ঐ
,, ষষ্ঠীদাস সেন	,, মলঙ্গা দুর্গাচরণ পিথুরির লেন
,, সিদ্ধেশ্বর মল্লিক (১ম)	,, হুগলি ঘুঁটেবাজার
,, সিদ্ধগোপাল দত্ত	,, ঐ
,, সিদ্ধেশ্বর মল্লিক (২য়)	,, ঐ
,, সিদ্ধেশ্বর সেন	,, মলঙ্গা গৌর দের গলি
,, সুবলদাস রায়	,, জোড়াসাঁকো রায়ের লেন
,, সুবলদাস মল্লিক	,, ঐ রতন সরকারের ষ্ট্রীট
,, সুবলচন্দ্র দত্ত	,, ঐ সিংহির বাগান
,, সুবলদাস মল্লিক	,, সিকদারপাড়া লেন
,, সুবলচন্দ্র বড়াল	,, সুরতির বাগান
,, সুবলচন্দ্র ধর	,, বৈঠকখানা স্কটস্ লেন
,, সুবলচন্দ্র দে	,, মলঙ্গা পঞ্চাননতলা গলি
,, সুবলচন্দ্র শীল	,, শ্রীরামপুর

শ্রীযুক্ত বাবু সুবলচন্দ্র মল্লিক	সাং শ্রীরামপুর
,, সুবলচন্দ্র মল্লিক	,, হুগলি ঘুঁটেবাজার
,, সূর্যকুমার দে	,, জোড়াসাঁকো লালমাধবের গলি
,, সূর্যমোহন দত্ত	,, ঐ ষষ্ঠীতলার গলি
,, সূর্যকুমার মল্লিক	,, বড়বাজার মল্লিক ষ্ট্রীট
,, সূর্যকুমার সেন	,, মলঙ্গা হৃদয়রাম বন্দ্যোর গলি
,, সূর্যকুমার ধর	,, হুগলি ঘুঁটেবাজার
,, সত্যচরণ দে	,, চোরবাগান
,, সাধুচরণ রায়	,, সিন্দূরিয়াপটীর গলি
,, সিংহচরণ দত্ত	,, আমড়াতলা মল্লিক ষ্ট্রীট
,, সাধুচরণ দে	,, চূণারিপুকুর লেন
,, সনাতন শীল	,, হাড়কাটা গোবিন্দ সেনের গলি
,, সনাতন সেন	,, বৈঠকখানা স্কটস্ লেন
,, সীতানাথ সেন	,, চাঁপাতলা চাড়ালপাড়া
,, সাতকড়ি চন্দ্র	,, ফরাসডাঙ্গা
,, সীতানাথ সেন	,, সুরতির বাগান
,, সহদেব দে	,, হুগলি ঘুঁটেবাজার
,, সিদ্ধেশ্বর মল্লিক	,, ঐ
,, সাক্ষিগোপাল ধর	,, সিমলা জেলেটোলা
,, হেমলাল আঢ্য	,, পাথুরিয়াঘাটা দর্পঃ ঠাকুরের ষ্ট্রীট
,, হরিমোহন শীল	,, জোড়াঃ রঃ সঃ গাঃ ষ্ট্রীট
,, হরিদাস দত্ত	,, রায়ের লেন
,, হরপ্রসাদ দে	,, ঢাকাপটী হরপ্রসাদের গলি
,, হীরালাল আঢ্য	,, জগন্নাথের ঘাট
,, হরনাথ মল্লিক	,, চিৎপুর কবরডাঙ্গা
,, হরিদাস মল্লিক	,, চোরবাগান
,, হরিদাস মল্লিক	,, সিন্দূরিয়াপটী
,, হরিচরণ বড়াল	,, সুরতির বাগান রাজ মোঃ গলি

শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল ধর	সাং সুরতির বাগান রতুসরকারের গলি
,, হরিদাস পাইন	,, ঐ
,, হরিমোহন দে	,, বড়বাজার সুতাপটী
,, হরিদাস শীল	,, কলুটোলা সোভারাম বঃ গলি
,, হরিদাস চন্দ্র	,, ঐ
,, হরিদাস সেন	,, ঐ
,, হরিদাস দত্ত	,, ঐ
,, হরিনারায়ণ পাইন	,, ঐ চূণাগলি
,, হেমচন্দ্র দে	,, ঐ সোভারাম বসাঃ গলি
,, হরিদাস শীল	,, সানকিভাঙ্গা
,, হলধর সেন	,, চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন
,, হরিনারায়ণ চন্দ্র	,, মলঙ্গা কৃষ্ণলাহার গলি
,, হরনাথ দে	,, ফকির দের গলি
,, হরিমোহন পাল	,, মির্জাপুর বৈঠকখানা
,, হরিচরণ শীল	,, মলঙ্গা হৃদয়রাম বন্দ্যোঃ গলি
,, হারাধন সেন	,, ঐ পঞ্চাননতলার গলি
,, হেমচন্দ্র দে	,, ঐ বিশ্বনাথ মতিলালের গলি
,, হেমচন্দ্র চন্দ্র	,, শ্রীরামপুর
,, হরিশ্চন্দ্র শীল	,, ঐ
,, হরিদাস শীল	,, ফরাসডাঙ্গা
,, হরিদাস নন্দী	,, ঐ
,, ক্ষেত্রমোহন সেন	,, পাথুরিয়াঘাটা দর্পঃ ঠাঃ ষ্ট্রীট
,, ক্ষেত্রমোহন শীল	,, জোড়াসাঁকো রতনসরকারের গলি
,, ক্ষেত্রমোহন রায়	,, ঐ ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট
,, ক্ষেত্রমোহন মল্লিক	,, হাঁসপুকুর
,, ক্ষেত্রমোহন দে	,, কালাকর ষ্ট্রীট
,, ক্ষেত্রমোহন মল্লিক	,, চোরবাগান
,, ক্ষেত্রমোহন পাল	,, সুরতিরবাগান রাজ গলি

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রলাল ধর	সাং আমড়াতলার গলি
,, ক্ষেত্রমোহন সেন	,, কলুটোলা সোভারাম বঃ গলি
,, ক্ষেত্রনাথ মল্লিক	,, ঐ চূণাগলি
,, ক্ষেত্রমোহন সেন	,, ঐ
,, ক্ষেত্রমোহন মল্লিক	,, চাঁপাতলা নীলমণি দত্তের গলি
,, ক্ষেত্রমোহন পাল	,, মলঙ্গা অক্রুর দত্তের গলি
,, ক্ষেত্রমোহন ধর	,, ঐ সনাতন শীলের গলি
,, ক্ষেত্রমোহন দে	,, ঐ বিশ্বনাথ মতিলালের গলি
,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত	,, ঐ মদন দত্তের গলি
,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত	,, ঐ হৃদয়রাম বন্দ্যোর গলি
,, ক্ষেত্রমোহন বড়াল	,, ঐ
,, ক্ষেত্রমোহন দত্ত	,, মলঙ্গা পঞ্চাননতলা লেন
,, ক্ষেত্রমোহন নন্দী	,, ঐ
,, ক্ষেত্রমোহন সেন	,, হুগলি বালি
,, ক্ষেত্রমোহন দে	,, ফরাসডাঙ্গা হাটখোলা
,, ক্ষেত্রমোহন সেন	,, মলঙ্গা হলধর বর্ধনের গলি

'দূতীবিলাস' গ্রন্থ ও স্বরূপচন্দ্র মল্লিক

'দূতীবিলাস' আদিরসঘটিত একখানি কাব্য। সুবর্ণবণিক্‌কুলোদ্ভব দানবীর স্বর্গীয় নিমাইচরণ মল্লিকের সপ্তম পুত্র স্বরূপচন্দ্র মল্লিক মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়নে "সমাচার চন্দ্রিকার" সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে প্ররোচিত করেন এবং স্বরূপচন্দ্রেরই অর্থ-সাহায্যে এ গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহার বহু সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইটি সংস্করণ পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে প্রাপ্ত দুইটি সংস্করণের পুস্তকেরই প্রচ্ছদ-পত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল—

চতুর্থ সংস্করণের প্রচ্ছদ-পত্রের প্রতিলিপি

"শ্রীশ্রীহরিঃ।
কাব্যগ্রন্থঃ
গৌড়দেশচলিতভাষা ভাষিত
সুকোমলপয়ারাদি নানা চ্ছন্দ রচিত
শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত
আদিরস ভক্তিরস ঘটিত
দূতীবিলাস
সুরসিক রসদায়ক পুস্তক
কলিকাতা কবিতা রত্নাকর যন্ত্রে
চতুর্থবার
মুদ্রাক্ষরে মুদ্রিত হইল।
সন ১২৫৩ সাল তারিখ ৪ চৈত্র।"

পরবর্তী সংস্করণের প্রচ্ছদ-পত্র

(১৭৮২ শকাব্দা বা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত)
"শ্রীশ্রীজগদীশ্বর।
শরণং।

দূতীবিলাস

নামক কাব্য।

৺ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্তৃক

আদিরস ও ভক্তিরসঘটিত পিযূষ প্রবন্ধে পয়ারাদি

নানাবিধ ছন্দে

বিরচিত হইল।

ইদানীং।

শ্রীরসিকলাল চন্দ্রের

আদেশানুসারে।

———

কলিকাতা

গরানহাটা ষ্ট্রীটে ৯২নং ভবনে

এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান যন্ত্রে মুদ্রিত।

শকাব্দ ১৭৮২।

মূল্য ।৶০ ছয় আনা"

গ্রন্থ-পরিচয়

চতুর্থ সংস্করণের পুস্তকখানি ডিমাই আট পেজী আকারে, ১১৭ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। তুলোট কাগজে গ্রন্থখানি মুদ্রিত। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থের প্রারম্ভে চারি পৃষ্ঠা ব্যাপী 'নির্ঘণ্ট' ও এক পৃষ্ঠা ব্যাপী 'গুরুবন্দনা' আছে। গুরুবন্দনার পর, গণেশবন্দনা, সূর্যবন্দনা, দুর্গাবন্দনা, শিববন্দনা, বিষ্ণুবন্দনা, সরস্বতী-বন্দনা স্থান পাইয়াছে। ইহার পর গ্রন্থের সূচনা। এই গ্রন্থের "সূচনায়" ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৺নিমাইচরণ মল্লিক ও স্বরূপচন্দ্র মল্লিকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সূচনার সেই অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"গ্রন্থের সূচনা

নিবেদন শুন সব রসিক সুজন।

যে কারণে এই গ্রন্থ হইল রচন॥

কলিকাতা নগরস্থ নিমাঞিঃ চরণ।
মল্লিক উপাধি তিনি প্রতাপে রাবণ॥
কীর্তির তুলনা তুল্য পাওয়া নাহি যায়।
মৃত্যুকীর্তি ঘোষে লোকে ভীষ্মমৃত্যুপ্রায়॥
আট পুত্র তাঁহার সকল গুণবান্।
এক্ষণে তাহার সাত জন বর্তমান॥[১]
তার মধ্যে সপ্তম স্বরূপচন্দ্র নাম।[২]
দেবগুরু দ্বিজে ভক্তি অতি কৃপাধাম॥
ধনি গুণি মানি লোক মান্য করে মানে।
একদিন সেই জন বসিয়া বাগানে॥
বহুতর বিজ্ঞবর লয়ে গুণি সব।
করিতেছিলেন নানা আনন্দ উৎসব॥
নানা রস রাগ প্রসঙ্গ উঠিল।
মুদ্রাক্ষরে বহুগ্রন্থ প্রকাশ হইল॥
কিন্তু আদি রস কাব্য দেখিতে না পাই।
যে দেখি ভারতকৃত নব্য কিছু নাই॥
এখন কতক নব্য নায়ক মজিয়া।
করে কত রস নানা নায়িকা লইয়া॥
সে রস বর্ণিলে ভাল গ্রন্থ এক হয়।
তাহারা কুকর্ম ত্যজে ইথে সুখোদয়॥
সভাস্থ সকলে বলে তাহার নিকটে।
এই মত গ্রন্থ করা যুক্তিসিদ্ধ বটে॥
অনন্তর কহিলেন বিজ্ঞবিচক্ষণ।
ব্যক্তি কোথা পাব গ্রন্থ করিবে রচন॥
কেহ পরে কহিলেন তাঁহার কথায়।
ভবানীচরণ নাম বন্দ্য উপাধ্যায়॥

---

১ এই গ্রন্থ-প্রকাশের পূর্বে নিমাইচরণের ষষ্ঠ পুত্র হীরালালবাবু ১২২৫ সালে মারা যান।

২ স্বরূপচন্দ্র মল্লিক মহাশয় ১২৫৫ সালে পরলোক গমন করেন।

সমাচার চন্দ্রিকা আকর তাঁরে জানি।
তাঁহা হৈতে হইবেক এই অনুমানি॥
সকলের সহ তিনি করিয়া মন্ত্রণা।
আদেশ দিলেন গ্রন্থ করিতে রচনা॥
তাঁহার বিনয় বাক্য স্বীকার করিয়া।
কি ভাবে রচিব গ্রন্থ না পাই ভাবিয়া॥
ভাবিতে ভাবিতে ভাব হইল উদয়।
নূতন ২ দূতী আছে কতিপয়॥
প্রবলা হইয়া তারা নব্যে করে বশ।
কত স্থানে কত মতে করে কত রস॥
দূতীভক্তি দূতীস্তুতি করে বহুজন।
গোপনে কেমনে দূতী করয়ে মেলন॥
যুবক যুবতী পেয়ে করে কি আচার।
এ সব বর্ণন করি করিয়া বিস্তার॥
প্রধানা এই গ্রন্থ মধ্যে হইবেক দূতী।
অতএব দূতী বিনা সাক্ষ্য এই পুতি॥
ভবানী চরণ ভাবি এ সকল মনে।
আলোচনা গ্রন্থারম্ভিল রচনে॥" (পৃষ্ঠা ৩ ও ৪)

গ্রন্থের সূচনার পর আরও ৯৪টি অধ্যায় আছে।

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণের শেষভাগে পরলোকগত ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন রেভারেণ্ড লং সাহেবের "Descriptive Catalogue of printed Bengali Books" মুদ্রিত করিয়াছেন। উহার ৬৭৯ পৃষ্ঠায় আলোচ্য গ্রন্থ সম্বন্ধে "Duty Bilas pp. 60"—এই বিবরণটুকু মাত্র আছে। পুস্তকের মূল্য ও রচয়িতার নামের কোন উল্লেখ নাই।

গ্রন্থখানি কোন্ সময়ে রচিত এবং ইহার প্রথম সংস্করণ কবে প্রকাশিত হয়, ইহা অনুসন্ধান করিবার একটি প্রকৃষ্ট পন্থা গ্রন্থকার তৎলিখিত সূচনা-মধ্যেই নিবদ্ধ করিয়াছেন—

"আট পুত্র তাঁহার সকলে গুণবান্।
এক্ষণে তাহার সাত জন বর্তমান॥"

নিমাইচরণের আট পুত্র। ক্রমানুযায়ী ইঁহাদের মৃত্যুর সাল নিম্নে প্রদান করা হইল—

ষষ্ঠ পুত্র	হীরালাল	...	মৃত্যু ১২২৫ সাল
৪র্থ "	রামকানাই	...	" ১২৩৪ "
১ম "	রামগোপাল	...	" ১২৪০ "
২য় "	রামরতন	...	" ১২৪৬ "
৮ম "	মতিলাল	...	" ১২৫৩ "
৭ম "	স্বরূপচন্দ্র	...	" ১২৫৫ "
৩য় "	রামতনু	...	" ১২৷৭ "
৫ম "	রামমোহন	...	" ১২৭০ "

এই তালিকা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ১২২৫ হইতে ১২৩৪ সাল মধ্যে অর্থাৎ যে সময় নিমাইচরণের আট পুত্রের মধ্যে সাত জন বর্তমান ছিলেন,—সেই সময়েই এই গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়।

১৭৮২ শকাব্দে প্রকাশিত সংস্করণ ডিমাই আটপেজী আকারে ৯৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। বটতলার বহু ধর্ম ও নানাবিষয়ক গ্রন্থের প্রকাশক সুবর্ণবণিক্কুলোদ্ভব রসিকলাল চন্দ্র মহাশয় ইহা প্রকাশ করেন। এই সংস্করণে "গুরুবন্দনা" অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

'বাসুদেব ঘোষের কড়চা'র প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠার প্রতিলিপি

বাসুদেব ঘোষের কড়চায় সুবর্ণবণিকের কথা

বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ (পদকল্পতরু-সম্পাদক) মহোদয় 'সুবর্ণবণিক্ সমাচারে'র প্রথম বর্ষে, ১৩২৫ সাল শ্রাবণ সংখ্যায় (পৃঃ ৩৩৮-৩৩৯) 'একখানি প্রাচীন পুঁথি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

"সম্প্রতি আমি কাটোয়া পরিভ্রমণে গিয়া কৈচর নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বামদেব গোস্বামী মহাশয়ের সাদর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছি। সেখানে উদ্ধারণ দত্তের জীবন-পঞ্জী দেখিয়া আসিয়াছি। বৈষ্ণব সাধক বাসুদেব উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে উদ্ধারণ দত্তের অনেক কথা জানিতে পারা যায়, ইহাতে সুবর্ণবণিক্ জাতির আভিজাত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমার ইচ্ছা সুবর্ণবণিক্‌গণ এই পুস্তকখানির প্রচার করুন।

* * * *

"আমি যে বাসুদেবের গ্রন্থ দেখিয়া আসিয়াছি, উহাতে উদ্ধারণ দত্ত ও তাঁহার সমসাময়িক কয়েকজন ভক্তের সাধন-প্রভাব অঙ্কিত হইয়াছে। সুবর্ণবণিক্‌গণ যদি এই গ্রন্থের প্রচার করিতে পারেন, তাঁহাদের অতীত গৌরব সমগ্র বঙ্গে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। উদ্ধারণের ইতিবৃত্তও সম্পূর্ণ হইবে।

* * * *

"বাসুদেবের কাব্য—ভক্তের রচনা। সুবর্ণবণিক্‌গণ কেন নিত্যানন্দের মন্ত্রশিষ্য হইয়াছিলেন, এ সকল কথা উক্ত গ্রন্থ পাঠে বিশদরূপে জানিতে পারা যায়। সে যুগের সামাজিক তথ্যও বুঝিতে পারা যায়। নিত্যানন্দ প্রভুর অনন্ত করুণা কিরূপে শ্যামার দেশকে শ্যামের ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিল—তাহা জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?" পৃঃ ৩৩৮, ৩৩৯

লেখকের মত এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, "সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক্ জাতির এবং বৈষ্ণব-ধর্মের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার হইতে পারে।"

আলোচ্য পুঁথিখানি পাওয়া গিয়াছে। ইহা দুই পৃষ্ঠায় লেখা ও ৩২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ হইতে ৯ পংক্তি লেখা আছে। পুঁথির শেষ পৃষ্ঠার শেষ তিন পংক্তিতে লেখা আছে—"ইতি শ্রীমন্নিত্যানন্দ স্বরূপ কিঙ্কর শ্রীবাসুদেব ঘোষ রচিত কড়চা সমাপ্তা॥ শ্রীশ্রীপুরন্দর শর্মণঃ পুস্তক মিদং স্বাক্ষরঞ্চ॥ শুভমস্তু শকাব্দা ১৭৬৮। তেরিখ পৈঞ্চিঠা আশ্বিন॥ ওঁ শ্রীরস্তু॥"

ইহা দ্বারা জানিতে পারা যায় যে, পুঁথিখানির তারিখ ১৭৬৮ শকাব্দা অর্থাৎ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ। নব্বই বৎসরের পুঁথি হইলেও, ইহার লেখা বহুস্থলে অস্পষ্ট হইয়াছে।

নিম্নে পুঁথিখানি উদ্ধৃত হইল—

"শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ জয়তি

প্রথমে শ্রীচৈতন্য বন্দো নদিয়ার চান্দ্র।
সাক্ষাত নারায়ণ যেঁহ অপরূপ ফান্দ॥
ঠাকুর নিত্যানন্দ বন্দো বলাই অবতার।
নিচ পাপী মূর্খ জনে যে কৈলা উদ্ধার॥
বন্দো ভক্তিভরে শ্রীআচার্য অদ্বৈত।
যার প্রাঙ্গণে গোসাঞি আপনি কৈলা নৃত্য॥
বন্দো মালিনির পতি পণ্ডিত শ্রীবাস।
যার গৃহে চৈতন্যের পিরিতি বিলাস॥
বন্দো চন্দ্রসেখর পরম গুণমন্ত।
যার মুখে ব্যক্ত সদা ভাগবত গ্রন্থ॥
বন্দো পরম পুরুষ গঙ্গাদাস দ্বিজ।
যারে আলিঙ্গিল মহাপ্রভুর দ্বিভুজ॥
বন্দো নত শিরে পুণ্ডরিক গুণনিধি।
গৌরচন্দ্র যাঁর নামে কান্দে নিরবধি॥
বন্দো রসশেখর পণ্ডিত বক্রেশর।
যার কীর্তনে প্রভুর হয় আনন্দ অপার॥

বন্দো প্রদ্দুম্ন ব্রহ্মচারী গোরার প্রিয়পাত্র।
গোরার নামে সদা যার রোমাঞ্চ হয় গাত্র॥
বন্দো বুঢ়ন গ্রামের সে ঠাকুর হরিদাস।
যাঁকর সরনে হয় ভব বন্ধ নাস॥
বন্দো ছোট হরিদাস ভক্ত শিরোমণি।
প্রকৃতি সম্ভাসে যার দণ্ড* হৈল জানি॥ *[১ম পৃষ্ঠা শেষ]
বন্দো প্রিয়কর অচ্যুত মহেশ্বর।
আগুসরি হৈল যারা প্রভুর কিঙ্কর॥
শ্রীসুনন্দ গোবিন্দ বন্দো কীর্তন বিলাসি।
যাঁর যশে মলিন আকাশের কোটি শশি॥
বন্দো শিবানন্দ সেন বসু রামানন্দ।
বন্দো রাঘব পণ্ডিত রায় কবিচন্দ্র॥
বন্দো শ্রীবিজয় দাষ প্রভুর আখরিয়া।
নদিয়ায় যার খ্যাতি রত্ন বাহু বলিয়া॥
বন্দো সদাশিব পণ্ডিত শুদ্দ সত্ত মতি।
নিতাইর সঙ্গে যার ভাবের পিরিতী॥
বন্দো সে পুরুষোত্তম মুরারি সঞ্জয়।
প্রভুর শিষ্য হঞা যারা সেবানন্দে রয়॥
বন্দো শুক্লাম্বর আচার্য মহামতি।
যার অন্ন কাড়ি খায় শচির সন্ততি॥
বন্দো জগদীশাচার্য রতন গুপ্ত আর।
প্রভুর আপ্তগণ বলি জগতে প্রচার॥
বন্দো খঞ্জ ঠাকুর দাষ রবাই ঠাকুর।
সদাশিব সুদর্শন বৈদ্য কৃষ্ণানন্দ পুর॥
বন্দো সুলোচন দাষ মাধব যদুনাথ।
বন্দো মহেশ হলায়ুধ হিরণ্য ভাগবত॥
বন্দো শ্রীমুরারি গুপ্ত বৈদ্য চূড়ামণি।
প্রভুর দক্ষিণ হস্ত বলে* যারে জানি॥ *[২য় পৃষ্ঠা শেষ]

বন্দো বৈষ্ণব পুরন্দর বুদ্ধিমন্ত খান।
বন্দো ধনঞ্জয় প্রভুর ভক্তপ্রধান ॥
বন্দো কাশী মিশ্র বিপ্র শ্রীশিখি মাইতি।
বন্দো সার্বভৌম কণ্ঠ মহেশ কুলপতি ॥
বন্দো খোলা কোটা শ্রীধর ভাগ্যবান।
বন্দো উদ্ধারণ দত্ত স্বামী অভিরাম ॥*॥*॥

ইতি বৈষ্ণব বন্দনা ॥*॥*॥

জয় জয় নিত্যানন্দ ইষ্টদেব মোর।
যাঁকর চরণ কৃপায় ভাগ্যের নাই ওর ॥
মুক্তিদাতা হলধর শ্রীঅনন্ত ফণী।
হাড়োর ওরসে পদ্মার গর্ভে সমজনি ॥
চৈতন্য চন্দ্রের যিনি আত্মার বিগ্রহ।
যার নামে ঘুচে জীবের ভববন্ধ মোহ ॥
কি কহিব মঝু পর কি যে কৃপা তাঁর।
চরণে পাইলাঙ ঠাঞি করুণা অপার ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু কামদেব ঈশ্বরের ভেদ।
মোর কাছে সেই সর্ব প্রভু বলদেব ॥
আদি সংকর্শন প্রভু নানাতীর্থ ঘুরি।
আইলেন ঝাঁট চলি নবদ্বীপ পুরে ॥
চৈতন্য প্রকাশ প্রভু আগে হৈতে জানে।
উভয়ে চিনিল উভ স্বভ দরশনে ॥
বৈষ্ণবগণের প্রাণে বড় সুখ হৈল।
আকাশেতে দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি কৈল ॥
বৃন্দাবন দাস ঠাকুর পরম ভাগ্যবন্ত।
সঙরি প্রভুর গুণ* যে লিখিল গ্রন্থ ॥
গূঢ় মর্মে সমুঝিল গৌর নিতাই লীলা।
সেই মোরে দয়া করি সঙ্গেতে লইলা ॥

*[৩য় পৃষ্ঠা শেষ]

প্রভুর চরণে আনি কৈল উপনীত।
রাঙ্গা চরণ ধূলা মাখি মুঞি হৈলাঞ পবিত্র ॥
প্রেম মন্ত্র দিলা প্রভু মো পামরের কানে।
কে হেন দয়াল আছে প্রভুর সন্নিধানে ॥
আরে আরে প্রভু মোর নিত্যানন্দ রায়।
যাঁকো নাম বদনে লৈলে জীব মুক্তি পায় ॥
অশেষ জন্ম হৈতে মানব হয় সে উদ্ধার।
বাসু বলে মোর নিতাই প্রেম অবতার ॥*॥*॥*॥
অথ নিত্যানন্দ মহিমা কথনং ॥*॥*॥
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রেমকীর্তন সিমা
যেঁহ সে জানেন গৌরচান্দের মহিমা ॥
ভক্ত অগ্রগণ্য প্রভু চৈতন্যবিলাস।
করিলেন হরিনামের গৌরব প্রকাশ ॥
গৌরাঙ্গের প্রাণ হেন পরম বৈরাগী।
প্রেম পরচার তঝু রাধাকৃষ্ণ লাগি ॥
কত অভু তভু প্রভু পাতসা উজির।
যাঁকর চরণে ভয়ে নোঙাইল শির ॥
যাঁক গুণে কান্দে পশু গলয়ে পড়ে শিলা।
বাসু বলে কি কহব সে নিতাইর লিলা ॥*॥*॥ [৪র্থ পৃষ্ঠা শেষ]

স্বয়ং বৃন্দাবন দাষ গৌরাঙ্গ প্রভুর সন্নাস
বিস্তারিয়া করিলা প্রচার।
সে দারুণ শোকের কথা বৈষ্ণবের বক্ষে ব্যথা
মুই মূর্খ কি কহিব আর ॥
মত্ত হঞা প্রভু ধায় সঙ্গে সভে যাইতে চায়
উচ্চ স্বরে করএ রোদন।
ফুকারিআ হাহুতাশে কান্দে যত স্ত্রীপুরুষে
তবে প্রভু করেন বারণ ॥

মোর প্রতি এ সিনেহ সঙ্গে না যাইঞ কেহ
মোর কার্য কর ঞিহা থাকি।
মোর প্রিয় এ নদিআ মোর অধিকার নিআ
নাম যাচ পাষণ্ডীরে ডাকি॥
পাতকী তারিতে মুঞি পূর্ণ অবতার হই
বহু পাতকি রহিল পড়িঞা।
হরিনাম দাও সভে যেমতে উদ্ধার হবে
গৌড়ের ঘরে ঘরে গিয়া॥

শ্রীমুখের বাক্য শুনি ললাটেতে কর হানি
ভক্তগণ তিতে অশ্রু নীরে।
গৌর তনু আলিঙ্গিয়া ভক্ত*গণে সঙ্গে লৈয়া *[৫ম পৃষ্ঠা শেষ]
নিতাঈ চান্দ আসিলেন ফিরে॥
মুখে নাহি বাক্য স্ফুরে সকলের চক্ষু ঝুরে
শ্রীচৈতন্যের সঙ্গি হৈতে সাধ।
গোরা বিনু প্রাণ রাখা অন্ধ জনু দেহ থাকা
বাসু বলে একি পরমাদ॥*॥*॥

গোরা চান্দের আজ্ঞা পাঞা পাতকী তারিতে।
চলিলেন অবধূত কান্দিতে কান্দিতে॥
অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ মনেতে জানিলা।
ভাবরূপি হঞা প্রভু দরশন দিলা॥
অবধূতের দেহে হৈল গোপাল প্রকাস।
বাহু প্রসারিআ ঘন পড়ে নিসোয়াস॥
ক্ষেণে আঁখি ঝুরে ক্ষেণে মুখে অট্টহাস।
গর্জন করিআ প্রভু ছাড়েন চিৎকার।
দেখিয়া পথের লোক মানে চমৎকার॥
পরম উদ্দামভাব আপনি পাসরি।
ভক্তগণ* উচ্চস্বরে বলে হরি হরি॥ * [৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা শেষ]

ভাবাবেসে ভগবান ভাবের নাই অন্ত।
বাসুঘোষ বলে মোর প্রভু শ্রীঅনন্ত ॥*॥*॥

আগে নিত্যানন্দনাথ আপ্তগণ পশ্চাত
ত্যজ্য করি নীলাচলের পথ।
দণ্ডে ক্রোশ দুই চারি সুখে অতিক্রম করি
গৌড়ে আসি হৈল উপনীত॥
কৃষ্ণদাস রঘু বৈদ্দ পণ্ডিত পরমারাধ্য
রামদাস পুরন্দর আদি।
ভক্তিরসে রসময় গদাধর মহাশয়
পরমেশ্বর স্বরূপ সংহতি॥
আপনা পাসরে হায় কেহ নাচে কেহ গায়
মধুর কীর্তন কুতূহলে।
প্রভুর প্রসাদ লাগি তবু প্রেম ভিক্ষা মাগি
বাহু ভাসে নয়নের জলে ॥*॥*॥
সর্বগোষ্ঠিসহ ফালগুণি মাহ
নবদ্বীপে প্রভু আসে।
দণ্ড পরনামে পহেলি বাখ্যানে
শ্রীশচি মাতার* পাশে॥ *[৭ম পৃষ্ঠা শেষ]
পুত্রের বারতা শুনি পাঞা ব্যথা
কান্দে মাতা উচ্চরোলে।
মুরছিত ভেল ভূমিতে পড়িল
প্রভু লইলেন কোলে॥
ঠাকুরে না পাঞা কান্দে বিষ্ণুপ্রিয়া
এ বড়ি বিসম সোক।
অতি দ্রুতগতি ছুটি আইল তথি
নদিয়ার যত লোক॥
মুখে জল দিআ সম্বিত্ত করিআ
করে সভে দোঁহে শান্ত।

বাসু ঘোষ বলে এমতি কান্দিলে
মিলিব কি রাধাকান্ত ॥*॥*॥*॥

নিতাই চান্দের কাছে সুতের মঙ্গল পুছে
শচীমাতা পাগলিনি প্রায়।
বলে কবে দেখা পাব চান্দ মুখে চুম্ব দিব
মা বলে সে ডাকিবে আমায় ॥

যতি সন্নাসির বেশে আছে বাছা কোন* দেশে *[৮ম পৃষ্ঠা শেষ]
কে যোগায় ক্ষুধায় আহার।
নিদ্রায় আলস হঞা পড়ে যবে ঘুমাঞা
কেবা দেঅ আঁচোর বিথার ॥

এইরূপ কান্দে মাতা আবল শোকের গাথা
সোঙরিআ ছাবালের মুখ।
গোরা বিনু কোন মতে ধৈরজ ধরিঅ চিতে
বাসু ঘোষের মনে রৈল দুঃখ ॥*॥*॥*॥

শচিরে প্রবোধ দিয়া সর্ব পারিসদ লঞা
নবদ্বীপ ছাড়ি প্রভু চলে।
গঙ্গার উভয় কূলে আনন্দে নিতাঈ বুলে
ফুকারিয়া হরি হরি বলে।

নীচ পাপীগণ তবে নিস্তার পাইল সভে
কুলের বহু না বসয়ে পাটে।
কি পুরুষ কিবা নারী সভে বোলাইয়া হরি
আইলেন প্রভু ত্রিবেণীর ঘাটে ॥

এ ঘাটের কি মহিমা ব্রহ্মা নারে দিতে সিমা
সর্বতীর্থ বিরাজেন ইথি।
তিন দেবী একত্রে মিলিয়াছে ইহ ক্ষেত্রে
গঙ্গা যমুনা সরস্বতি ॥

তিনের সঙ্গম* ফলে ত্রিবেণীতে স্নান কৈলে *[৯ম পৃষ্ঠা শেষ]
অশেষ পাপ হৈতে পরিত্রাণ।

নিতাঈ পরম আনন্দে সঙ্গে লঞা ভক্তবৃন্দে
সেই ঘাটে করিলেন স্নান ॥
স্নান শেষ ভক্তগণ পট্ট বস্ত্র পরিধান
করাইল মনের হরিষে।
চন্দন অগুরু চূআ অঙ্গে দিল লেপিআ
গলে দিল পুষ্প মাল্য পাসে ॥
রূপের নিছনি লঞা সব লোক দেখে যাঞা
তান শোভা কোটি কাম জিনি।
লোকে পরিচয় চায় ইতি উতি সুধায়
ন্যাসি মুনি কেগো বটেন ইনি ॥
অপরূপ অবধূত করে লোকে দণ্ডবৎ
ধাঞা আইসে জীর্ণ জরারোগী।
ধরি নিতাই চান্দের পায় আর্ত মহৌষধি চায়
বলে মঝু দয়া কর যোগী ॥
প্রভু বলে ভয় নাই একবার বল ভাই
হরি হরি চৈতন্য ঠাকুর।
ভবের জীবে বড় দয়া* নামে যাঁর সর্বজয়া *[১০ম পৃষ্ঠা শেষ]
ভবের বেয়াধি সরণে হউ দুর ॥
গলত কুষ্ঠি অন্ধ খোঁড়া হরি হরি বলরে তোরা
হেন দয়াল জগতে নাই আর।
বাসু ঘোষের কপাল মন্দ গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ
পাষণ্ডীরে করহুঁ নিস্তার ॥*॥*
কিজে কৃপা নিতাই চান্দের কহিতে না পারি।
রোগ হৈতে মুক্তি হৈল কতহু নরনারী ॥
সবে ঠারাঠুরি করে এই বটে ঈশ্বর।
মানুস কেমতে হব এমতি শক্তি ধর ॥
জন্মান্ধের চক্ষু হৈল খোঁড়ার হৈল পা।
কন্দর্পের তুল্য হৈল মহাব্যাধির গা ॥

পঙ্গু অন্ধ খঞ্জ সভে বলে হরি হরি।
বাসু বলে মোর নিতাই ভবপারের কাণ্ডারি॥

কতক্ষণ ভগবান্ ত্রিবেণী ছাড়িয়া যান* *[১১শ পৃষ্ঠা শেষ]
যত লোক হাহাকার করে।
এমতি প্রভুর মায়া কুলের কুলবধূ হঞা
সেই না তিষ্ঠিতে পারে ঘরে॥
গৃহে শিশু পুত্র কান্দে নিরখিতে নিতাই চান্দে
বাউরা হঞা পাছু পাছু ধায়।
প্রভুর চরণে পড়ি ভূমে দেয় গড়াগড়ি
আলি বুলি ধূলা মাখে গায়॥
গোষ্ঠী সঙ্গে হেন মতে
নিতাঈ চান্দ যাইলেন সপ্তগ্রামে।
বাজে খোল রকর কাড়া চৌদিকে পড়িল সাড়া
সভে মত্ত সংকীর্তন গানে॥*॥
অথ সপ্তগ্রামের মহিমা॥*॥
সপ্ত ঋষির বাসস্থান তেঞি আখ্যা সপ্তগ্রাম
খ্যাত ঞিহ সকল ভুবনে।
যার নাম লইলে হয় সপ্ত জন্মের পাপ ক্ষয়
উক্তি বটে বেদে ও পুরাণে॥
দ্বিজ বৈদ্য করণ তাঁতি বৈসে নর নানা জাতি
ঝালো মালো মালি ক্ষৌরকার।
বাসুক বারুই ভাস* কুম্ভকার ভঙ্গে দাস *[১২শ পৃষ্ঠা শেষ]
তিলি তাম্বুলি পরিবার॥
কৈবর্ত কাবরা ধাওআ নবশাঁক সাতি ভুঞা
বরিজ বানিআ মহাজন।
দোকানী পসারি মুদি আনন্দে করে বেসাতি
আড়ে বাড়ে আইসে রত্নধন॥

যত বণিক্ সওদাগর কমলার কিঙ্কর
ভারে ভারে তঁথা ঘরে তোলে।
দেব দ্বিজে সদা ভক্তি দান করে যথাশক্তি
তেঞি লোক সাধু সাধু বলে॥
বেনে * * * নর মাঝ • আছিল এক পাকুড় গাছ
প্রভু তথি কৈল অধিষ্ঠান।
বাসু বলে যেন মুঞি সপ্তগ্রামের মাটি হই
আপনে যথা আইলেন ভগবান॥*॥
প্রভুর বার্তা পাঞা ঝাট আইসে ধাঞা
শ্রীকর বেনের পুত্র।
সপ্তগ্রামে ধাম দিবাকর নাম
কমলার প্রিয়পাত্র॥
অনন্ত ঐশ্বর্য নাহি মাৎসর্য
বেনে বড় সদাশয়।
এক পুত্র রাখি বেনেনি দিছে ফাঁকি
তেঞি মনের দুখে রয়॥
সংসারেতে বৈসে পরম ঔদাস্যে
মায়া মোহাতীত প্রায়।
পঙ্কাল* মাছ পঙ্কেতে বাস *[১৩শ পৃষ্ঠা শেষ]
পঙ্ক নাহি জস্থ গায়॥
প্রভুর চরণে লইল শরণে
দিবাকর দত্ত বেনে।
বাসু ঘোষ ভণে বারেক ঈক্ষণে
জহুরি জহর চিনে॥*॥
দিবাকর দত্ত করে দৈন্যে রোদন।
গলে বস্ত্র বাঁন্ধি পড়ে প্রভুর চরণ॥
প্রভু কহে উঠ উঠ কান্দ নাহি আর।
আজ হৈতে হৈলে তুমি কিঙ্কর আমার॥

দয়া করে দিলেন প্রভু শিরে দুই হাত।
আশীর্বাদ কৈলা পুছি মঙ্গল বাত॥
দত্ত বলে মুঞি নীচ পাষণ্ডী পাতকী।
আমাপর তোমার যেহেন দয়া দেখি॥
প্রভুর সঙ্গে এই মতে দত্তের ঠারাঠুরি।
বাসু বলে অভাগিয়া মুঞি গেনু ঝুরি॥*॥
তবে প্রভু দিবাকরের মুখ চাঞা কয়।
তোর ঘরে ভিক্ষা আজ মনে ইহ লয়॥
দিবাকর বলে তাঁকে জোড়হাত করি।
মো অধমের কি যে ভাগ্য কহিতে না পারি॥
কৃত্য সারি ভোগ ধরি দিব তোমার কাছে।
তোমার প্রসাদ প্রভু পাব মুঞি পাছে॥
তিন উপবাস অন্তে আজি মোর পারণা।
বিলম্ব না কর তূরিতে পুরাও প্রার্থনা॥
বাসু বলে বেনে তোর* পুণ্যের ওর নাই। *[১৪শ পৃষ্ঠা শেষ]
ঘরে বস্থা পাইলে হেন দয়াল গোসাঞি॥*॥
মহাজ্ঞানী নিত্যানন্দ তেজীয়ান্ অতি।
পথ আল করি চলে বেনের সংহতি॥
অপরূপ রূপ কাঞ্চন জিনি অঙ্গ।
কে দেখি ধৈরজ ধরে নয়ন তরঙ্গ॥
আজানুলম্বিত ভুজ কনকের স্তম্ভ।
অরুণ বসন কটি বিপুল নিতম্ব॥
মালতীর মালা গলে আপন দোলনি।
বাসু কহে চল দিব পরাণ নিছনি॥*॥

থির বিজুরি হরিতাল হরি
প্রভুর বরণ জনু।
নবনি ছানিয়া মধু নিঞাড়িয়া
গড়িল বুঝি বা তনু॥

চন্দন চরচিত অঙ্গ শোভিত
বনমালা দোলে গলে।
বদন শ্রীযুত দশন মুকুত
তিলক বিন্দু ভালে ॥
দিব্য বস্ত্র পরি গতি মত্ত করী
চরণে নূপুর বাজে।
পিরীতি কন্দ ঠাকুর নিত্যানন্দ
হরি হরি বলি নাচে ॥

যত আপ্তগণ করয়ে কীর্তন
নারী দেঈ হুলুধ্বনি।
বাসু ঘোষ বলে তুলনা না মিলে
মোর নিতাই গুণমণি ॥*॥

আরে আরে প্রভু মোর সন্ন্যাসী নিতাই।
পাপী তাপী* যতজনে তরাইল ভক্তিদানে *[১৫শ পৃষ্ঠা শেষ]
এমন দয়াল দাতা নাই ॥

বাল বৃদ্ধ যুবা নারী দাড়াঞা সারি সারি
প্রভুর মুখের পানে চায়।
পুলকেতে অবসন্ন অশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য
উঠে বৈসে বাউরার প্রায় ॥

প্রভু কন তো সবার ধারি মুঞি বহু ধার
আইনু তেঞি এখানে ধাইয়া।
হুহুঙ্কার মালসাটে পাষণ্ডীর বুক ফাটে
ভক্ত কান্দে চরণে পড়িয়া ॥

প্রভুর নেত্রে বহে ধারা ভাইআর ভাবে মাতোআরা
প্রেম ধন ভুবনে বিলায়।
বাহু পসারিআ বলে আইস আইস করি কোলে
পতিতের ধরিআ গলায় ॥

উত্তম অধম নাই যারে পায় তার ঠাঞি
প্রেমভিক্ষা মাঙ্গে অবধূত।
পাষাণ সমান হিআ সেহ দিলা গলাইয়া
বাসু কেনে হৈল বঞ্চিত ॥*॥ [১৬শ পৃষ্ঠা শেষ]
অপার করুণা প্রভুর ইহ গৌড় দেশে।
নাচিয়া বুলেন কিবা মনের হরিষে॥
দিবাকরে প্রাণ হেন ভাবেন গোসাঞি।
ভাবের আবেশ ভি * * * হুঁহু দোঁহা চাই॥
দিবাকরের গৃহে প্রভু পরম আনন্দে।
কোটি ভৃত্য সেবা করে ঠাকুর নিত্যানন্দে॥
অতি সুশীল ভক্ত তেঁহো বণিক্কুমার।
মধুর বচনে মন তোষে সবাকার॥
রাজসেবা তুল্য করে বৈষ্ণব সন্তোষ।
দিবাকরের গুণ গায় অধম বাসু ঘোষ ॥*॥
মার্গশীর্ষ শুভক্ষণে সপ্তমী তিথির দিনে
তবে প্রভু বেণের কর্ণেতে।
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিয়া ভাগবত শুনাইয়া
নাম কৈল অর্থের সহিতে॥
কোটি জন্মের পুণ্যসূত্র ধন্য হৈল বণিক্পুত্র
কান্দে প্রভুর পাদুইখানি ধরি।
পুলকে পূরল তনু কদম্ব কেশর জনু
ভক্তগণ বলে হরি হরি ॥*॥
প্রভু কহে হাসি হাসি বণিক্কুমার।
বণিক্কুল তোমা হৈতে হইল উদ্ধার॥
দিবাকর করি নাম না পুছিবে কেহ। [১৭শ পৃষ্ঠা শেষ]
আজি হৈতে মোরদত্ত নাম তুমি লহ॥
বণিক্কুল উদ্ধার করিলি বটে সেকারণ।
আজি হৈতে তোর নাম রহুঁ উদ্ধারণ॥

* * গৌড়ে মোর কোন প্রয়োজন।
তোমার উদ্ধার লাগি ইহ আগমন ॥
সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি শুনি তোর প্রীত।
তেঞি তোর ঘরে মুঞি হইলাঙ অতিথ ॥
বাসু বলে দত্ত তোর ভাগ্যের ওর নাই।
ঘরে বৈস্যা পাইলে হেন দয়াল গোসাঞি ॥*॥
সরস্বতীর জলে প্রভু করিলেন সিনান।
পরিপাটি পট্টবাস তহি পরিধান ॥
পড়সি জনে উদ্ধারণ ডাকিয়া আনিল।
নবাত ফানিত খণ্ড হরির লুট দিল ॥
প্রভুর চরণ ধূলা লঞা নিজ মাথে।
পরম প্রসাদ দত্ত দেই সভার হাতে ॥
প্রভু কন আছি মুই উপবাস করে।
পারনা করিমু বেণে আজি তোর ঘরে ॥
প্রভুর আদেশ পাঞা দত্ত মহামতি।
চিড়া দধি ভারে ভারে লইয়া আসে তথি ॥ [১৮শ পৃষ্ঠা শেষ]
লকলকি কলা খণ্ড সিতা নাড়ুযোগ।
আঙ্গটিয়া কলার পাতে বাঢ়াইল ভোগ ॥
পরম পবিত্র বটে ঐছে আন অন্ন।
উচ্ছিষ্ট ভোজন করি ভক্ত হৈল ধন্য ॥
বাসু ঘোষ বলে বেণে তুঞি ভাগ্যবান্।
তোর ঘরে হইল প্রভুর প্রেম সমাধান ॥*॥
অলৌকিক লীলা প্রভু দেখায় ক্ষণে ক্ষণে।
সপ্তগ্রাম হৈল যেন নববৃন্দাবনে ॥
দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ধরে কোল দেই প্রেম সবাকারে যাচে ॥
দিনে দিনে প্রেমসিন্ধু উছলে লহরী।
কান্দে প্রভু ভক্ত উদ্ধারণের গলা ধরি ॥

গোরা গোরা বলি মুহু ছোড়য়ে হুঙ্কার।
শুনি সপ্তগ্রামের লোক হৈল চমৎকার॥
প্রভু কহে গতি নাই মোর গোরা বিনে।
হরি হরি বল্যা ভাই মোরে লও কিন্যা॥
তো সবার লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
মুঞি অভাগিয়া লৈলাঙ তো সবার ভার॥
বাসু বলে ভাল জান ভক্ত বাঢ়াইতে।
মুঞি প্রভু পাষণ্ডী রহিলাম বঞ্চিতে॥*॥ [১৯শ পৃষ্ঠা শেষ]
বড় গূঢ় ঠাকুর নিত্যানন্দ অবতার।
নীচ পাপী মূর্খ জনে কৈলা নিস্তার॥
কত লীলা করে মোর দয়াল অবধূত।
দেখিয়া উন্মত্ত হৈল ভদ্রাবতীসুত॥
সকল ভকত লৈয়া প্রভু বৈসেন আসরে।
শুভ দৃষ্টি পাত কৈল সবার উপরে॥
তখনে হইল প্রভুর কীর্তনের সাধ।
দাণ্ডাইল ভক্তগণ করি জোড় হাত॥
চতুর্দশ মৃদঙ্গ বাজে আটাইস করতাল।
তথি মধ্যে নৃত্য করেন হাড়াইর দুলাল॥
সহস্র ভক্ত মিলে হরিনাম গায়।
সংকীর্তনে চতুর্দশ লোক আনন্দ পায়॥
প্রভুর দুই পার্শ্বে নাচে রামাই উদ্ধারণ।
প্রদক্ষিণ করি বুলে আর আর ভক্তগণ॥
নারীগণ দূরে রঞা দেয় করতালি।
আউলাইয়া পড়ে দেহ শিথিল কবরী॥
হুলাহুলি দেয় যত ঝিয়ারী বহুরী।
সর্ব বৈষ্ণবের প্রাণে প্রেমানন্দ স্ফূরি॥
বাসু বলে মোর নিতাই সকল নাটের গুরু।
প্রাণ নিতাই* ভক্তিরসের কল্পতরু॥*॥ * [২০শ পৃষ্ঠা শেষ]

এইরূপে প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ রায়।
তারে করে আলিঙ্গন যারে কাছে পায়॥
কীর্তন সমাপ্ত হেরি লোকে চমৎকার।
ভক্ত সনে করেন প্রভু শাস্ত্রের বিচার॥
নিতাই চান্দের খেলা নিতুই নূতন।
নানা দেশ হৈতে হয় ভক্ত সমাগম॥
এমতি যে প্রেম ধর্ম ভিক্ষা নির্বাহন।
প্রেমে সভে কান্দাইল পদ্মার নন্দন॥
বাসু বলে পূর্ণকৃপা প্রভুর উদ্ধারণে।
ভক্তের মনবাঞ্ছা হয়ত পূরণে॥*॥
উদ্ধারণের ঘরে বৈসে নিত্যানন্দ রায়।
প্রভুরে দেখিতে কত ভক্ত আইসে যায়॥
দত্তের সেবা দেখি সবার মুগ্ধ মন।
নিষ্ঠা করি নানা খাদ্য যোগায় উদ্ধারণ॥
নিত্য বাণিয়ার ঘরে মহোৎসব হয়।
মহোৎসবের কি আনন্দ কহনে না যায়॥
কৃষ্ণ মন্ত্র শুনি অঙ্গে কম্প পুলক স্বেদ।
হুঁহু নেত্রে অশ্রু ঝরে বৈবর্ণ্য স্বরভেদ॥
বৈষ্ণবগণের ভাবাবেশ দিখি হেন।
ফুকারি ফুকারি কান্দে দত্ত উদ্ধারণ॥
অকৈতবে কৃষ্ণ প্রেম প্রভু শিখাইল।
যত ভক্ত উদ্ধারণে আলিঙ্গন* কৈল॥ *[২১শ পৃষ্ঠা শেষ]
তিঁহো জন্মে পবিত্র সুবর্ণবণিক্‌কুল।
বাসুদেবের প্রাণে বড় আনন্দ বাড়িল॥*॥
ঐছে মহোৎসবে কিবা আনন্দ অপার।
দত্তের ঘরে কৈল সভে সেবা অঙ্গীকার॥
প্রভু নিত্যানন্দ তবে সাঙ্গোপাঙ্গ লঞা।
সাঁঝ বেলে আইলেন ফিরা নগর নেউটিআ॥

দয়াল ঠাকুর হেন নাহি কোন যুগে।
দুয়ারে দুয়ারে বুলে প্রেম তেঁহ মাগে ॥
তলাসিয়া যাকে তাকে নাম দেয় গোসাঞি।
হেন অবতার আর কভু দেখি নাই ॥
গৌড়দেশে যেবা ছিল জড় পশু অন্ধ।
প্রেমে সভে কান্দাইল ঠাকুর নিত্যানন্দ ॥
যুগল ভজন গুণ লীলা আস্বাদনে।
উদ্ধারণ সভে ডাকে ভোগের আয়োজনে ॥
সমিতা শর্করা খণ্ড ঘৃত ঝাল মহুরী।
বানাইল মালপুআ তুলসী মঞ্জরী ॥
আনন্দে বৈষ্ণবগণ করয়ে ভোজন।
আচমনান্তে মুখবাস তাম্বুল চর্বণ ॥
উত্তম শয্যায় শেষে সকল শুতিল।
সবাকার পদ দত্ত সম্বাহন কৈল ॥
উচ্ছিষ্ট ভোজন করি হৈল তেঁহ ধন্য।
বাসু বলে ভক্তে প্রভু পরম পরসন্ন ॥*॥ [২২শ পৃষ্ঠা শেষ]

ব্রজরসপুর ভক্তি সে নিগূঢ়
প্রভু কৈলা প্রচারে।
চারি ভক্ত সঙ্গে ভিক্ষা মাগি রঙ্গে
নাম দিলা ঘরে ঘরে ॥
মূঢ়াধম জনে কৃষ্ণ প্রেমদানে
নিস্তার করিলা তেহঁ।
পড়ি ভক্তিগ্রন্থ হইল ভক্তিমন্ত
যতেক সার্থবাহ ॥
ধুয়া গানে মত্ত উদ্ধারণ দত্ত
অকৈতব ভক্তি তান।
নিতাইর বিলাস তব্ধু পদে আশ
বাসু ঘোষ করে গান ॥*॥

একদিন আইল দ্বিজ প্রভুরে ভেটিতে।
ভক্তি গেয়ান শ্রেষ্ঠ কিবা হৈল মীমাংসিতে ॥
উভয়ের তর্কে তবে বেলা বাড়ি গেল।
আগন্তু ব্রাহ্মণ বড় ক্ষুধার্ত হৈল ॥
প্রভু উদ্ধারণে ডাকি করিলা ইঙ্গিত।
অভুক্ত না ফিরে যেন ব্রাহ্মণ অতিথ ॥
সরস্বতীর জলে দ্বিজ করিতে গেল স্নান।
যোড়হাতে দাঁড়াঞা দত্ত প্রভুর বিদ্যমান ॥
উদ্ধারণ বলে আজ্ঞা দেহ দয়াময়।
কি রন্ধন হবে আজ কি ভোগ ইচ্ছা হয় ॥
সেহ ব্রাহ্মণের লাগি কিবা আয়োজন।
তব্ধু অগ্রে কোন্ দ্রব্য করিমু নিবেদন ॥*॥ [২৩শ পৃষ্ঠা শেষ]
প্রভু কন দত্ত তুমি জিজ্ঞাসহ কেনে।
আজি মোর পাচক হইবা তুঞি বেণে ॥
ফল মূল খাঞাছি বহু মুঞিত সন্ন্যাসী।
চিড়া দধি আম অন্নে সকৃত উপবাসী ॥
একভোজ্য খাইমু সভে বসি একসাথ।
ভক্তগণে বন্টি দেহ কাছন প্রসাদ ॥
ব্রাহ্মণের ভোজ্য হয় পরমান্ন জানি।
পরম সাত্ত্বিক ভোগ দুগ্ধ তণ্ডুল চিনি ॥
ক্ষত্রিয়ের ভোজ্য হয় পলান্ন পাকালি।
বৈশ্যে খাইবে খেচরান্ন চালি আর ডালি ॥
শূদ্রের শুধু অন্ন শাস্ত্রের উপদেশ।
শাক শুক্ত বটক ছোঁকা ব্যঞ্জন অশেষ ॥
খেচরান্ন অবিলম্বে আন পাক করি।
বাসুবলে মুঞি ঞিহো উচ্ছিষ্ট ভিখারী ॥*॥
ঠাকুরের আদেশ পাঞা উদ্ধারণ* দত্ত। *[২৪শ পৃষ্ঠা শেষ]
পাকশালে যাঞা হৈল রন্ধনে প্রবর্ত ॥

পাকশেষে বণিক্‌পুত্র পাখালিল হাত।
ভৃত্যগণ অঙ্গনে পাতিঞা দিল পাত॥
ভোজনে বসিলা প্রভু বৈষ্ণব সংহতি।
হেন কালে সেহ দ্বিজ উপনীত তথি॥
আইস আইস বলে প্রভু ডাকেন ব্রাহ্মণে।
বিস্ময় উপজিল তবে বড়ু বিপ্রের মনে॥
সবার আগে উদ্ধারণ অন্ন দেয় ঢালি।
রক্তচক্ষু ব্রাহ্মণে মনেতে পাড়ে গালি॥
অন্তর্যামী নিতাই মনের কথা জানি।
বসাইলেন বিপ্রবরে আপনে মেলানি॥
দ্বিজ কহে অবধূত মাথায় রহু ভক্তি।
কেমতে শূদ্রের সঙ্গে হইবে এক পংক্তি॥
বাণিয়ার পাচিত অন্ন কেমতে খাইব।
ছিয়ে ছিয়ে এমতে কি জাতি খণ্ডাইব॥
হাসি হাসি বলে প্রভু তুমি মহাশয়।
অন্নদোষ সন্ন্যাসীর কখন না হয়॥
উদ্ধারণ কৈলা পাক গোবিন্দের প্রসাদ।
ইথে তার নাই লও কোন অপরাধ॥
গুণ কর্মে হৈলা* ঞিহো জাতির উৎপত্তি। *[২৫শ পৃষ্ঠা শেষ]
লিখা জোখা ভাগবতে ভগবানের উক্তি॥
পরম ভক্ত বেণে এই উচ্চ-জাতি পাই।
তার গৃহে তার অন্ন মুঞি কিন্তু খাই॥
বাসু বলে হেন কথা কৈতে কে বা পারে।
এই মত কৃপা রহু মুঞি অভাগারে॥*॥
এই মত বোলাবুলি দুইজনে করে।
উদ্ধারণ দোঁহার আগে অন্ন দিল ধরে॥
সভা মধ্যে দেখি বেণের এমতি আচার।
দ্বিজ বলে কেনে তোর এতেক অহঙ্কার॥

তোর অন্ন কে ছুঁইবে ধিক ছন্নমতি।
মোহারে না জান মুঞি হই অবসতি॥
বিপ্রের কথায় দত্ত দাবি ফেলে দিল।
ভূমে পড়ি কাষ্ঠ দার্বি তরু মুঞ্জরিল॥
বিস্ময়ে বিপ্রের মুখে বাক্য নাহি সরে।
ভক্তগণ উচ্চ স্বরে হরি ধ্বনি করে॥
এতক্ষণে হৈল দ্বিজের জ্ঞানচক্ষু* লাভ। *[২৬শ পৃষ্ঠা শেষ]
ভাল জানা গেল ইথি বৈষ্ণবের পরতাপ॥
দ্বিজ বলে দত্ত তুমি কেবা মহাশয়।
হেন কার্য মানুষে সম্ভব কভু নয়॥
দেব অংশে জন্ম হবে নিশ্চয় তোমার।
সব সন্দেহ নিরসন হৈল মোর এবার॥
কাষ্ঠ দার্বি হৈতে যাঁহা বৃক্ষ মুঞ্জরিল।
কান্দিতে কান্দিতে দ্বিজ শির নোঙাইল॥
সে স্থানের মৃত্তিকা লৈয়া আপনে মাথে গায়।
হাত পাতি উদ্ধারণের কাছে অন্ন চায়॥
স্বরূপ ধরি নিতাইচাঁদ বিপ্রে দিলেন দেখা।
বাসু বলে ভক্তেরে প্রভু কিছুই নাঞি লুকা॥*॥
মঙ্গল কাহালে হরিধ্বনি কোলাহল।
আনন্দে ভোজনে বৈসে বৈষ্ণবদল॥
রামাই ঠাকুর লঞা অবধূতের ঝুটা।
সর্বজনে বাটি দেয় এক এক মুঠা॥
ভক্তগণ ঝুটা তুলি লৈল নিজ মাথে।
বড় তৃপ্তি হৈল খাঞা উদ্ধারণের হাতে॥
বিপ্রের কাকু শুনি প্রভুর পরম সন্তোষ।
কৃতার্থ হঞা প্রসাদ মাঙ্গে বাসুঘোষ॥*॥ [২৭শ পৃষ্ঠা শেষ]
আরে আরে দয়াল মোর ঠাকুর নিতাই চান্দ।
গৃহী উদ্ধারিতে হৈল গৃহী হৈতে সাধ॥

কমলাকান্তের মুখে ভাব হৈল ব্যক্ত।
শুনি বড় প্রীত হৈল উদ্ধারণ দত্ত ॥
আপনে তলাসে বেণে নগরে নগরে।
রূপে গুণে লক্ষ্মী কন্যা আছে কোন ঘরে ॥
অম্বিকা নগরে এক বড়ুয়ার কুটীরে।
রেবতীর উদ্ভব তাহা জানি সশরীরে !
যাঞা উদ্ধারণ তথি মাগিল মেলানি।
প্রভুর স্বীকার্য তথি জাহ্নবা ঠাকুরাণী ॥
তান পাহুখানি দত্ত সাপটিয়া ধরে।
বলে মা কমলা তুমি চলু মোর ঘরে ॥*॥
নিতাই চান্দের বামে জাহ্নবা ঠাকুরাণী।
হীরায় হেরিলাঙ জনু কনক বেষ্টনী ॥
বৈষ্ণব সমাজে কত আনন্দ না জানি।
অবাধ প্রেমের সিন্ধু খুলিল মোহানি ॥
বাসু বলে মোর নিতাই না ভজিল যেবা।
অনল ভেজাবা* তার মুখে মুঞি কিবা ॥:॥ :[২৮শ পৃষ্ঠা শেষ]
এইরূপে বহুদিন থাকি সপ্তগ্রামে।
ঠাকুর নিতাই চলিলেন পাণিহাটী গ্রামে ॥
প্রভুর বিরহে দত্ত কান্দিয়া আকুল।
আছাড়ি পাছাড়ি পড়ে ছিণ্ডে মাথার চুল ॥
জাহ্নবার সঙ্গে প্রভু শুভ যাত্রা করে।
দত্ত তান বাহুড়িয়া লৈতে নেয় ঘরে ॥
দত্ত বলে কাঁহা যাও মোরে পায়ে ঠেলে।
তোমার বিরহে মুঞি ভক্ষিমু গরলে ॥
তুয়া গুণে বিকাঞিছি তেঞি ঝুরে প্রাণ।
কোথাকে না যাইও প্রভু ছাড়ি সপ্তগ্রাম ॥
প্রভু বলে মুঞি জানি চৈতন্য কিঙ্কর।
প্রভুর কার্য সাধিব অবনী ভিতর ॥

রাঘব পণ্ডিতের ঘরে এবে মোর স্থিতি।
না কান্দ না বান্ধ মোরে দত্ত মহামতি ॥
তোর পীরিতি আমার যে পরাণ সনে জড়া।
কদাচ নহিব মুঞি সপ্তগ্রাম ছাড়া ॥
সপ্তগ্রামে থাকি তুমি সাধন করহ।
হরিনাম প্রচার হকু ধরায় অহরহ ॥
তোর ঘরে রৈল মোর সকল বিলাস।
তোর জাতি আজি হৈতে হৈল মোর দাস ॥
কমলা অচলা হৈঞা রবে তিঁহো পাটে।
প্রাণ বান্ধা রৈল মোর বাণিয়ার নিকটে ॥ [২৯শ পৃষ্ঠা শেষ]
উদ্ধারণের সাধন লীলা কহিতে চমৎকার।
আপনে নিতাই দিলা কৃষ্ণ মন্ত্র যার ॥
তিন সন্ধ্যা সরস্বতীর জলে করে স্নান।
চব্বিশ প্রহর করে জপ রাধাকৃষ্ণ নাম ॥
অন্নজল ত্যাগ করি দুগ্ধ খাঞা রয়।
এক দণ্ড নিদ্রা সেহো সব দিন নয় ॥
মহাকৃপাপাত্র প্রভুর উদ্ধারণ বেণে।
বাসুঘোষ বলে মুঞি বঞ্চিত রৈনু কেনে ॥*॥
একপুত্র দত্তের প্রিয়ঙ্কর নাম।
তারে ডাকি দিল ভার বিষয় বরিহান ॥
কাইচারে কুটীর বান্ধি তাঁহা কৈল বাস।
মস্তক মুড়াঞা লৈল কৌপীন বহির্বাস ॥
কণ্ঠে তুলসীর হার তিন গুঞ্জ হালি।
নাসাগ্রে তিলক পঙ্ক শোভা পায় ভালি ॥
ধনরত্ন দান কৈল বৈষ্ণব ব্রাহ্মণে।
ইহো তো প্রভুর কার্য বাসুঘোষ ভণে ॥*॥
প্রভুর বিরহে দত্ত হঞা আউলিয়া।
ভিক্ষা মাগি বুলে লোকে হরি বোলাইয়া ॥

তবে ডাকি সূত্রধর আর পটুয়াগণে।
আজ্ঞা দিল দত্ত প্রভুর শ্রীমূর্তি গঠনে॥
কণ্টক নগর* মধ্যে যতহুঁ গ্রাম ছিল। *[৩০শ পৃষ্ঠা শেষ]
সর্বত্র প্রভুর মূর্তি উদ্ধারণ স্থাপিল॥
সহস্র দেউলে নিত্যানন্দের বিগ্রহ।
শোভা পায় শ্রীচৈতন্যের দারুমূর্তি সহ॥
ফুল তুলসী দিয়া দত্ত অতিভক্তি ভরে।
পরম যতনে প্রভুর নিত্যসেবা করে॥
সর্বস্ব সঁপিয়া দিল সেবার প্রচারে।
ধন্য উদ্ধারণ দত্ত বাণিয়ার ঘরে॥
নিত্যানন্দের কীর্তনীয়া ষষ্ঠীবর দাস।
প্রভুর আদেশে কৈল সপ্তগ্রামে বাস॥
ষষ্ঠীবর গায় গান উদ্ধারণ নাচে।
নিতাই চান্দে হেন ভক্তি কোথা কারে আছে॥
গৌড়দেশ হইতে আসি যত ভক্তগণ।
উদ্ধারণ দত্তের গৃহে করে সম্মিলন॥
তেঁহ উদ্ধারণ প্রেম ভক্তির অধিকারী।
প্রভুর বিরহে হৈল যতি দণ্ডধারী॥
বাসু বলে বৈকুণ্ঠের লীলা দত্তের ঘরে।
উদ্ধারণে ভজিলে নিতাই কৃপা করে॥*॥
নিতাই চান্দের ভাবাবেশে হঞা উন্মত্ত।
কাটোয়ার পথে ভ্রমে একেলি দত্ত॥
ধ্রুব প্রহ্লাদ সম তেঁহ নিতাই ভজিল।
বৈকুণ্ঠে তানকো লাগি* দুন্দুভি বাজিল॥ *[৩১শ পৃষ্ঠা শেষ]
উদ্ধারণের প্রেম ভক্তি অকথ্য কথনে।
চৈতন্য নিতাই নাম মাত্র বদনে।
দ্বাপরের সুবাহু গোপাল ঞিহো জান।
যার শ্রদ্ধায় বাধ্য হৈলা আপনে নারায়ণ॥

জয় জয় উদ্ধারণ নিতাই চান্দের প্রিয়।
যাকর গুণগান শ্রবণে অমিয় ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ কৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি।
তোমার চরণে মোর সদা রহু ভক্তি ॥
বাসু ঘোষ বলে মুঞি নাজানি বাখান।
যে তে মতে নিতাইর গুণ করি গান ॥
যাহা জানি তাহা লিখি প্রভুর পীরিতে।
নহুক আমার কোন অপরাধ ইথে ॥
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বড় কৃপা মোকে।
সংসার সাগর পার হঞা যামু সুখে ॥
জয় জয় প্রভু নিত্যানন্দ গুণধাম।
তব পদযুগে রহুঁ বান্ধা মোর প্রাণ ॥

ইতি শ্রীমন্নিত্যানন্দস্বরূপকিঙ্কর শ্রীবাসুদেব ঘোষ রচিত কড়চা সমাপ্তা ॥*॥ শ্রীশ্রীপুরন্দর শর্ম্মাণঃ পুস্তকমিদম্ স্বাক্ষরঞ্চ ॥ শুভমস্তু শকাব্দা ১৭৬৮ তেরিখ পৈঞিঠা আশ্বিন ॥* ওঁ শ্রীরস্তু ॥*" [৩২শ পৃষ্ঠা শেষ]

ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও তৎপরবর্তীকালের বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। আলোচ্য "বাসুদেব ঘোষের কড়চা" গ্রন্থে দত্ত ঠাকুরের বিষয়ে অনেক কিছু বিবৃত হইয়াছে।

বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থে উদ্ধারণ দত্তের উল্লেখ

শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থের অন্ত্যখণ্ডের দুইস্থানে দত্ত ঠাকুরের উল্লেখ আছে। উক্ত খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৪৭৪ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে আছে (শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত সংস্করণ)—

"উদ্ধারণ দত্ত—মহা বৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দ সেবায় যাঁহার অধিকার ॥

দত্ত ঠাকুর মহাশয় শ্রীপাদ নিত্যানন্দের অকৈতব ভক্ত ও একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচয়িতা বৃন্দাবন দাস মহাশয় দত্ত ঠাকুরকে নিত্যানন্দ-সেবার একমাত্র অধিকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত

গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে সপ্তগ্রাম ও দত্তঠাকুর সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত বিবরণ আছে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"কথোদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তগ্রাম আইলেন সর্বগণ-সহে॥
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত-ঋষি-স্থান।
জগতে বিদিত সে 'ত্রিবেণীঘাট' নাম॥
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্বে সপ্ত-ঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দচরণ॥
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম॥
প্রসিদ্ধ 'ত্রিবেণীঘাট' সকল ভুবনে।
সর্ব পাপ ক্ষয় হয় যার দরশনে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম আনন্দে।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সর্ব-বৃন্দে॥
উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥
কায়-মনো-বাক্যে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের সেবা অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ, কিবা ভাগ্য আর॥
জন্মজন্ম নিত্যানন্দস্বরূপ ঈশ্বর।
জন্মজন্ম উদ্ধারণো তাঁহার কিঙ্কর॥
যতেক বণিক্‌কুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে॥
বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ-অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেম-ভক্তি-অধিকার॥
সপ্তগ্রামে প্রতি-বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনি শ্রীনিত্যানন্দ কীর্তনে বিহরে॥

বণিক্‌সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ॥
বণিক্‌-সভের কৃষ্ণভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে॥

* * *
* * *

সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়।
গণ সহ সঙ্কীর্তন করেন লীলায়॥
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্তন বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার॥
পূর্বে যেন সুখ হৈল নদীয়ানগরে।
সেই মত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম পুরে॥
রাত্রিদিনে ক্ষুধাতৃষ্ণা নাহি নিদ্রা ভয়।
সর্ব দিগ হৈল হরিসঙ্কীর্তনময়॥
প্রতি-ঘরে-ঘরে প্রতি-নগরে-চত্বরে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কীর্তনে বিহরে॥
নিত্যানন্দস্বরূপের আবেশ দেখিতে।
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে॥

* * *
* * *

এই মতে সপ্তগ্রামে অম্বুয়া-মুলুকে।*
বিহরেন নিত্যানন্দস্বরূপ কৌতুকে॥"

(পৃঃ ৪৬২, ৪৬৩, পূর্ব সংস্করণ)

উপরি উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে সপ্তগ্রামের, উহার অধিবাসী সুবর্ণবণিক্‌কুলের এবং দত্ত ঠাকুরের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা অন্যত্র দেখা যায় না।

পরবর্তীকালের বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহে (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, বৈষ্ণববন্দনা ও ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে) দত্ত ঠাকুরের উল্লেখ বা তাঁহার সম্বন্ধে কিছু

* অম্বুয়া-মুলুকে অর্থাৎ অম্বিকা-নগর (কাল্‌না,—অম্বিকাদেবীর পীঠস্থান)।

কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। ঠাকুর মহাশয়ই উদ্যোগী হইয়া নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিবাহ দিয়াছিলেন, তাহার কথা বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কৃত "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ বংশ-বিস্তার" গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারা যায়। দত্ত ঠাকুর সম্বন্ধে এই সমস্ত বিবরণ ব্যতীত আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। আলোচ্য পুঁথিখানি হইতে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

বাসুদেব ঘোষের জীবন-কথা

আলোচ্য পুঁথিখানি ১৭৬৮ শকাব্দের (অর্থাৎ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ) ১লা আশ্বিন 'শ্রীশ্রীপুরন্দর শর্মা' কর্তৃক স্বাক্ষরিত বা লিখিত হয়। বাসুঘোষ মহাশয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। তাঁহারা তিন সহোদর—মাধব, গোবিন্দ ও বাসুদেব। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত কড়চার যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা নব্বই বৎসর পূর্ব্বের লেখা হইলেও, তাহার রচনা যে বহু পূর্ব্ববর্তীকালের, তাহা কড়চার ভাষা হইতে বুঝিতে পারা যায়।

পদকর্তা বাসুদেব সুগায়ক ও শ্রীগৌরনিত্যানন্দের একজন অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিলেন। কিন্তু মুরারি গুপ্ত প্রভৃতির ন্যায় তাঁহারও একখানি কড়চা ছিল, তাহা এতাবৎকাল জানা যায় নাই। আলোচ্য কড়চার যদি আর কোন পুরাতন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, তবে বৈষ্ণব-সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকের পক্ষে অনেক সাহায্য হইবে, কারণ ইহাতে যে সময়কার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—সে সময়কার এরূপ বিবরণ অন্য কোন গ্রন্থে নাই।

বাসুঘোষের বিস্তৃত জীবনী পাওয়া যায় না। তবে 'শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিণী'র ১ম সংস্করণের সম্পাদক জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের উপক্রমণিকায় (পৃঃ ১২৫-১২৭) যাহা লিখিয়াছেন, এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"কেহ কেহ বলেন, বাসু ঘোষের মাতুলালয় শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত বুড়ন বা বুরাকী গ্রামে ছিল, ঐ স্থানেই বাসুদেবের জন্ম হয়। ইঁহার

অপর দুই সহোদরের নাম মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ। কোন কারণে বাসুদেব ঘোষের পিতা কুমারহট্টে আসিয়া বাস করেন; পরে তথা হইতে তিন ভ্রাতা নবদ্বীপে আসিয়া অবস্থিতি করেন। ইঁহারা তিন জনেই শ্রীগৌরাঙ্গের সমসাময়িক, তিনজনেই গৌরাঙ্গ-ভক্ত, এবং গৌরাঙ্গ-গঠিত তিন সঙ্কীর্তনদলের মূল গায়ক ছিলেন। ইঁহাদিগের নবদ্বীপবাসের ইহাই প্রধান কারণ বলিয়া অনুমান হয়। তিন ভ্রাতাই পদকর্তা, এবং তিন ভ্রাতাই সুকণ্ঠ সঙ্গীতকার ছিলেন।.........তিন ভ্রাতাই শ্রীগৌরাঙ্গের গণ; কিন্তু গোবিন্দ ভিন্ন অপর দুই ভ্রাতা প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌড়মণ্ডলে নাম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহারা নিত্যানন্দ-পরিবারের মধ্যও গণ্য।

চৈতন্যচরিতামৃতে, যথা—

'নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলা যবে গৌড়ে যাইতে।
মহাপ্রভু এই দুই দিলা তাঁর সাথে॥
অতএব দুই গণে দোঁহাই গণন।
মাধব বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ॥'

বাসুদেব ঘোষ গৌরাঙ্গ-লীলার অতি প্রধান পদকর্তা[১]। তত্ত্বনিধি[২] মহাশয় বলেন, 'অনেক সময় তিনি প্রভুর সঙ্গে থাকিতেন বলিয়া তাঁহার রচিত পদের ঐতিহাসিক গৌরবও সামান্য নহে।' বাসুর পদাবলী এমনই সুন্দর ও মনোমদ যে কবিরাজ গোস্বামী কহিয়াছেন—

'বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥'

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর মাধব ঘোষ দাঞীহাটায় ও বাসুঘোষ তমলুকে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবাচারদর্পণে বাসুঘোষ সম্বন্ধে লিখিত আছে—

'গুণতুল্য সখী এবে বাসুঘোষ খ্যাতি।
গৌরাঙ্গের শাখা তমলুকেতে বসতি'॥"

---

১ স্বর্গীয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে, বাসুদেব ঘোষের পদ-সংখ্যার সমষ্টি—১৩৪। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ২৭১, পঞ্চম সংস্করণ।

২ 'শ্রীহট্টের ইতিহাস'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি।

বাসু ঘোষের জাতি সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। স্বর্গীয় দীনেশ বাবু তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থের ২৮৫ পৃষ্ঠায় (৫ম সংস্করণ) লিখিতেছেন, —"সুবিখ্যাত নবদ্বীপবাসী কীর্তন গায়ক গৌরদাসের মতে ইঁহারা সদ্‌গোপ জাতীয় ছিলেন।" কিন্তু শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী (২য় সংস্করণ) সম্পাদক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ মহাশয়ের মতে "ইঁহারা উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ*।"

বাসুদেব ঘোষের পদাবলীর নমুনা

বাসু ঘোষের রচিত পদাবলী যে কত সুন্দর, বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই তাহা জানেন। অল্প কথায় গভীরভাবাত্মক বিষয়কে তিনি কি সুন্দর রূপ দিতে পারেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত পদটি পড়িলেই বুঝিতে পারা যাইবে। পদটি পূর্বরাগের, জনৈকা নাগরী বলিতেছেন—

কামোদ

"নিরমল গোরা তনু কষিল কাঞ্চন জনু
হেরইতে ভৈ গেলুঁ ভোর।
ভাঙ-ভুজঙ্গমে দংশন মঝু মন
অন্তর কাঁপয়ে মোর॥
শজনি, যব হাম পেখলুঁ গোরা
আকুল দীগ বিদিগ নাহি পাইয়ে
মদনলালসে মন ভোরা॥
অরুণিত-নয়নে তেরছ অবলোকনে
বরিখে কুসুম-শর সাধে।
জিবইতে জীবনে থেহ নাহি পারলুঁ
ডুবলুঁ গাঙ্গ অগাধে॥
মন্ত্র-মহৌষধি তুহুঁ জানসি যদি
মঝু লাগি করবি উপায়।
বাসুদেব ঘোষ কহে শুন শুন এ সখি
গোরা লাগি প্রাণ মোর যায়॥"

* শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী, ২য় সংস্করণ, পরিকর ও ভক্তদিগের পরিচয়, পৃঃ ২০৯।

বাসুদেব ঘোষের কড়চার আলোচনা

কড়চার প্রথমেই বৈষ্ণব-বন্দনা স্থান পাইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের বন্দনা করিয়া ঘোষ মহাশয় অন্যান্য বৈষ্ণবভক্তবৃন্দের বন্দনা করিয়াছেন। এই বন্দনার শেষ পংক্তিতে ঠাকুর উদ্ধারণ দত্তের নামও উল্লিখিত হইয়াছে—

"বন্দো উদ্ধারণ দত্ত স্বামী অভিরাম ॥" পৃঃ ৩

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান পরিকরগণ মধ্যে গণ্য হইলেও বাসু ঘোষ শ্রীনিত্যানন্দ-শিষ্য ছিলেন—

"ভাবাবেসে ভগবান ভাবের নাই অন্ত।
বাসুঘোষ বলে মোর প্রভু শ্রীঅনন্ত ॥" পৃঃ ৭

'মোর প্রভু শ্রীঅনন্ত' অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ।

শ্রীনিত্যানন্দের মহিমাবর্ণনা অনেক ভক্ত পদকর্তাই করিয়াছেন। কিন্তু আলোচ্য কড়চায় "নিত্যানন্দমহিমা কথনম্" অধ্যায়ে বাসু ঘোষ নিত্যানন্দের যে চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা উজ্জ্বল ও পরিস্ফুট—

"ভক্ত অগ্রগণ্য প্রভু চৈতন্যবিলাস।
করিলেন হরিনামের গৌরব প্রকাশ ॥
গৌরাঙ্গের প্রাণ হেন পরম বৈরাগী।
প্রেম পরচার তত্ত্ব রাধাকৃষ্ণ লাগি ॥
* * *
যাঁর গুণে কান্দে পশু গলয়ে পড়ে শিলা।
বাসু বলে কি কহব সে নিতাইর লিলা ॥" পৃঃ ৪

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞায় বাসুঘোষ, মাধব ও অন্যান্য ভক্তগণ সমভিব্যাহারে নিত্যানন্দ গৌড় অভিমুখে গমন করিলেন—

"গোরাচাঁদের আজ্ঞা পাঞা পাতকী তারিতে।
চলিলেন অবধূত কান্দিতে কান্দিতে ॥" পৃঃ ৬

শ্রীশচী মাতাকে প্রবোধ দিবার জন্য নিত্যানন্দ ভক্তগণ সঙ্গে নবদ্বীপে আগমন করিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সঙ্গিগণ লইয়া যখন নবদ্বীপে আগমন করেন তখন ফাল্গুন মাস—

"সর্বগোষ্ঠিসহ ফাল্‌গুনি মাহ
নবদ্বীপে প্রভু আসে।" পৃঃ ৭

প্রথমেই তাঁহারা শচীমাতার নিকট গমন করিয়া মহাপ্রভুর বিষয় ও নীলাচলধামে তাঁহার চির অবস্থানের কথা বিজ্ঞাপন করিলেন। ইহার ফলে—

"পুত্রের বারতা শুনি পাঞা ব্যথা
কান্দে মাতা উচ্চরোলে।
মূরছিত ভেল ভূমিতে পড়িল
প্রভু লইলেন কোলে॥" পৃঃ ৮

তারপর বিষ্ণুপ্রিয়া,—তিনিও অনেক কাঁদিলেন। নিত্যানন্দের আগমন বার্তার সংবাদ পাইয়া নদীয়ার যত নরনারী শচীদেবীর গৃহে একে একে সমবেত হইলেন। শ্রীচৈতন্য-বিরহে সকলেই শোকাকুল, সকলেরই নয়নে অশ্রু, মুখে হা হুতাশ। শ্রীচৈতন্যের মিলনে একদিন যেমন নবদ্বীপে নাম-কীর্তনের প্রবল রোল উঠিয়াছিল, আজ তেমনি তাঁহার বিরহে ক্রন্দনের ধ্বনিতে নবদ্বীপের আকাশ-বাতাস পূর্ণ হইয়া গেল। তাই কবি বাসু ঘোষ দুঃখ করিয়া বলিতেছেন—

"বাসু ঘোষ বলে এমতি কান্দিলে
মিলিব কি রাধাকান্ত॥" পৃঃ ৯

শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্রন্দনে পাষাণ গলিয়া যায়। একমাত্র পুত্র, তাহার বিরহ, একি সহ্য করা যায়? পাগলিনীর মত শচী বলিতেছেন—

"বলে কবে দেখা পাব চান্দ মুখে চুমা দিব
মা বলে সে ডাকিবে আমায়॥
যতি সন্ন্যাসীর বেশে আছে বাছা কোন দেশে
কে যোগায় ক্ষুধায় আহার।
নিদ্রায় অলস হঞা পড়ে যবে ঘুমাঞা
কেবা দেঅ আঁচোর বিথার॥" পৃঃ ৮, ৯

যাহা হউক, শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া ও অন্যান্য সকলকে প্রবোধ দিয়া নিত্যানন্দ ভক্তগণের সহিত নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিলেন। পথে তিনি

নরনারী সকলকেই হরিনাম বিলাইতে বিলাইতে অবশেষে ত্রিবেণীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ত্রিবেণী ঘাটের মহিমা

কবি ত্রিবেণী ঘাটের মহিমা বর্ণনা করিতেছেন—

"এ ঘাটের কি মহিমা ব্রহ্মা নারে দিতে সিমা
সর্ব তীর্থ বিরাজেন ইথি।
তিন দেবী একত্রে মিলিয়াছে ইহক্ষেত্রে
গঙ্গা যমুনা সরস্বতি ॥
তিন সঙ্গমের ফলে ত্রিবেণীতে স্নান কৈলে
অশেষ পাপ হইতে পরিত্রাণ।" পৃঃ ৯, ১০

সেই পুণ্য সঙ্গমে নিত্যানন্দ ভক্তগণ সহিত স্নানাদি করিলেন। তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্য, ভাবোন্মত্ত দেহ দর্শনে সমবেত নরনারী মুগ্ধ হইয়া গেল। সকলেই তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। নিত্যানন্দ ও ভক্তগণের মুখে হরিধ্বনি শুনিয়া ও তাঁহাদের পবিত্র স্পর্শ লাভ করিয়া—

"রোগ হৈতে মুক্তি হৈল কতহু নরনারী ॥
সবে ঠারাঠুরি করে এই বটে ঈশ্বর।
মানুষ কেমতে হব এমতি শক্তিধর ॥
জন্মান্ধের চক্ষু হৈল খোঁড়ার হৈল পা।
কন্দর্পের তুল্য হৈল মহাব্যাধির গা ॥
পঙ্গু অন্ধ খঞ্জ সভে বলে হরি হরি।" পৃঃ ১১

ত্রিবেণী ত্যাগ করিয়া সঙ্গীগণ সহ নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে আসিলেন। তাঁহাদের আগমনে সপ্তগ্রামে একটা বিরাট্ সাড়া পড়িয়া গেল—প্রেমের বিরাট্ বন্যায় সমস্ত সপ্তগ্রাম যেন উচ্ছলিত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

সপ্তগ্রামের মহিমা বর্ণনা

"অথ সপ্তগ্রামের মহিমা" শীর্ষক অধ্যায়ে বাসু ঘোষ সপ্তগ্রামের মহিমা-কীর্তন করিতেছেন—

"সপ্ত ঋষির বাসস্থান তেঞি আখ্যা সপ্তগ্রাম
খ্যাত ঞিহ সকল ভুবনে।
যার নাম লঈলে হয় সপ্ত জন্মের পাপ ক্ষয়
উক্তি বটে বেদে ও পুরাণে॥" পৃঃ ১২

এই বর্ণনার শেষে কবি বলিতেছেন—

"বাসু বলে যেন মুঞি সপ্তগ্রামের মাটি হই
আপনে যথা আইলেন ভগবান্॥" পৃঃ ১২

সপ্তগ্রাম তখন সুখসমৃদ্ধিপরিপূর্ণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র নানা জাতির আবাস-স্থান। তখন সপ্তগ্রামে—

"দ্বিজ বৈদ্য করণ তাঁতি বৈসে নর নানা জাতি
ঝালো মালো মালি ক্ষৌরকার।
বাসুক বারুই ভাস কুম্ভকার ভঙ্গে দাস
তিলি তাম্বুলী পরিবার॥
কৈবর্ত কাবরা ধাওআ নবশাঁক সাতি ভুঞা
বরিজ বাণিআ মহাজন।
দোকানী পসারি মুদি আনন্দে করে বেসাতি
আড়ে বাড়ে আইসে রত্নধন॥
যত বণিক্ সওদাগর কমলার কিঙ্কর
ভারে ভারে তঁথা ঘরে তোলে।
দেব দ্বিজে সদা ভক্তি দান করে যথা শক্তি
তেঞি লোক সাধু সাধু বলে॥" পৃঃ ১২, ১৩

সেই সপ্তগ্রামে এক পাকুড় গাছের নিম্নে নিত্যানন্দ ভক্তগণের সহিত অধিষ্ঠান করিলেন।

বাসুদেব ঘোষের কড়চায় উদ্ধারণের পরিচয়

এই কড়চা হইতে জানিতে পারা যায়, নিত্যানন্দের সপ্তগ্রাম আগমনের পূর্বে উদ্ধারণের নাম ছিল দিবাকর—

"প্রভুর বার্তা পাঞা ঝাট আইসে ধাঞা
শ্রীকর বেণের পুত্র।
সপ্তগ্রামে ধাম দিবাকর নাম
কমলার প্রিয় পাত্র।" পৃঃ ১৩

নিত্যানন্দই তাঁহার উদ্ধারণ নামকরণ করেন—

"প্রভু হাসি হাসি কহে বণিক্‌কুমার।
বণিক্‌কুল তোমা হৈতে হইল উদ্ধার॥
দিবাকর করি নাম না পুছিবে কেহ।
আজি হৈতে মোর দত্ত নাম তুমি লহ॥
বণিক্‌কুল উদ্ধার করিলি বটে সে কারণ।
আজি হৈতে তোর নাম রহুঁ উদ্ধারণ॥ পৃঃ ১৭, ১৮

নিত্যানন্দ কর্তৃক এই নব নামকরণের পর দিবাকর জনসাধারণের মধ্যে উদ্ধারণ নামে পরিচিত হইলেন। তাঁহার পরিচয় সম্পর্কে বাসু ঘোষ বলিতেছেন—

"অনন্ত ঐশ্বর্য নাহি মাৎসর্য
বেণে বড় সদাশয়।
এক পুত্র রাখি বেণেনি দিছে ফাঁকি
তেঞি মনের দুখে রয়॥
সংসারেতে বৈসে পরম ঔদাস্যে
মায়ামোহাতীত প্রায়।
পঙ্কাল মাছ পঙ্কেতে বাস
পঙ্ক নাহি জসু গায়॥" পৃঃ ১৩ ও ১৪

এই বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, সে সময় উদ্ধারণ বিপত্নীক এবং তাঁহার এক পুত্র বর্তমান। তিনি পরম ভাগবত, অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াও তাঁহার মাৎসর্য নাই, সংসারে বাস করিলেও তিনি মায়া-মোহের অতীত। গভীর পঙ্ক-মধ্যে বাস করিলেও, পাঁকাল মাছের গায়ে যেমন পাঁক লাগে না, তেমনই সংসারে বাস করিয়াও তিনি মুক্ত-পুরুষ, সংসাররূপ পঙ্ক হইতে তিনি সম্পূর্ণভাবে নির্মুক্ত।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত উদ্ধারণ দত্তের সাক্ষাৎ

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে দর্শন করিয়া—

"দিবাকর দত্ত করে দৈন্যে রোদন।
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে প্রভুর চরণ॥" পৃঃ ১৪

ইহাতে,—

"প্রভু কহে উঠ উঠ কান্দ নাহি আর।
আজ হৈতে হৈলে তুমি কিঙ্কর আমার॥
দয়া করে দিলেন প্রভু শিরে দুই হাত।
আশীর্বাদ কৈলা পুছি মঙ্গল বাত॥" পৃঃ ১৪

তারপর নিত্যানন্দ দিবাকরকে বলিলেন, আজি আমি তোমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিব। প্রভুর এই অনুগ্রহে দিবাকর কৃতার্থ হইলেন। তিন দিন দিবাকর উপবাস করিয়া আছেন। তিন দিনের উপবাসের পর আজি তাঁহার পারণ, আর এই পারণ-মুখে নিত্যানন্দ স্বেচ্ছায় তাঁহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। এই শুভ-সংযোগে তাঁহার হৃদয় পুলকানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল—

"দিবাকর বলে তাঁকে জোড় হাত করি।
মো অধমের কি যে ভাগ্য কহিতে না পারি॥
কৃত্য সারি ভোগ ধরি দিব তোমার কাছে।
তোমার প্রসাদ প্রভু পাব মুঞি পাছে॥
তিন উপবাস অন্তে আজি মোর পারণা।
বিলম্ব না কর তুরিতে পুরাও প্রার্থনা॥" পৃঃ ১৪

ইহার পরে, নিত্যানন্দের সহিত দিবাকর গৃহে গমন করিলেন। তাঁহাদের গমন-পথে সপ্তগ্রামবাসী নরনারী দেখিলেন—

"মহাজ্ঞানী নিত্যানন্দ তেজীয়ান অতি।
পথ আল করি চলে বেণের সংহতি॥" পৃঃ ১৫

শ্রীনিত্যানন্দের রূপ-বর্ণনা

বৈষ্ণব কবিগণের অনেকেই বহু বৈষ্ণব গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের

রূপ-বর্ণনা করিয়াছেন,—কিন্তু কবি বাসু ঘোষ এইখানে—নিত্যান্দ-দিবাকর-মিলন-প্রসঙ্গে নিত্যানন্দের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর—

"থির বিজুরি হরিতাল হরি
প্রভুর বরণ জনু।
নবনি ছানিয়া মধু নিঙ্গাড়িয়া
গড়িল বুঝি বা তনু॥
চন্দন চরচিত অঙ্গ শোভিত
বনমালা দোলে গলে।
বদন শ্রীযুত দশন মুকুত
তিলক বিন্দু ভালে॥
দিব্য বস্ত্র পরি গতি মত্ত করী
চরণে নূপুর বাজে।
পীরিতি কন্দ ঠাকুর নিত্যানন্দ
হরি হরি বলি নাচে॥" পৃঃ ১৫

সপ্তগ্রামে শ্রীনিত্যানন্দ

সত্যসত্যই—"পাতকী তারিতে যাঁর হৈল অবতার"—সেই প্রেমাবতার নিত্যানন্দের দৈন্য ও আর্তি, প্রেম ও করুণা কিভাবে মূর্ত হইয়া সপ্তগ্রাম-বাসীকে প্রেমদানে উদ্ধার করিল তাহার চিত্র কবির সুনিপুণ তুলিকায় এখানে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—

"এমন দয়াল দাতা নাই॥
বাল বৃদ্ধ যুবা নারী দাঁড়াঞা সারি সারি
প্রভুর মুখের পানে চায়।
পুলকেতে অবসন্ন অশ্রু কম্প বৈবর্ণ্য
উঠে বৈসে বাউরার প্রায়॥
প্রভু কন তো সবার ধারি মুঞি বহু ধার
আইনু তেঞি এখানে ধাইয়া।

হুহুঙ্কার মালসাটে পাষণ্ডীর বুক ফাটে
ভক্ত কান্দে চরণে পড়িয়া ॥
প্রভুর নেত্রে বহে ধারা ভাইআর* ভাবে মাতোয়ারা
প্রেমধন ভুবনে বিলায়।
বাহু পসারিআ বলে আইস আইস করি কোলে
পতিতের ধরিআ গলায় ॥
উত্তম অধম নাই যারে পায় তার ঠাঞি
প্রেমভিক্ষা মাঙ্গে অবধূত।
পাষাণ সমান হিআ সেহ দিল গলাইয়া
বাসু কেনে হৈল বঞ্চিত ॥" পৃঃ ১৬

উদ্ধারণ দত্তের দীক্ষা ও নামকরণ

তারপর দিবাকরের গৃহে পরমানন্দে নিত্যানন্দ ভক্তগণের সহিত ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। নিজ আত্মীয় ও স্বজাতিগণকে লইয়া ভক্তির সহিত সকলের সেবা লইলেন। তাঁহার মধুর বচন ও দীনভাবে সকলে বিমুগ্ধ হইলেন। ভোজনান্তে শ্রীনিত্যানন্দ

"মার্গশীর্ষ শুভক্ষণে সপ্তমী তিথির দিনে
তবে প্রভু বেণের কর্ণেতে।
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিয়া ভাগবত শুনাইয়া
নাম কৈল অর্থের সহিতে ॥" পৃঃ ১৭

'মার্গশীর্ষ' অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের সপ্তমী তিথির দিনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু উদ্ধারণকে 'রাধাকৃষ্ণ' মন্ত্রে দীক্ষা দেন।

দিবাকরকে দীক্ষা দান করিবার পর, নিত্যানন্দ কহিলেন—

"প্রভু কহে হাসি হাসি বণিক্‌কুমার।
বণিক্‌কুল তোমা হৈতে হইল উদ্ধার ॥
দিবাকর করি নাম না পুছিবে কেহ।
আজি হৈতে মোর দত্ত নাম তুমি লহ ॥

* 'ভাইআর ভাবে',—অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের ভাবে।

বণিক্‌কুল উদ্ধার করিলি বটে সে কারণ।
আজি হৈতে তোর নাম রহু উদ্ধারণ॥" পৃঃ ১৭, ১৮

তিনি আরও জানাইলেন যে, গৌড়ে অর্থাৎ বঙ্গদেশে তাঁহার আগমনের কোনই প্রয়োজন ছিল না। উদ্ধারণের উদ্ধারের জন্যই তাঁহার এখানে আগমন। তারপর পুণ্যতোয়া সরস্বীতে স্নান করিয়া প্রভু উদ্ধারণের গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশিবর্গকে ডাকিয়া আনিয়া উদ্ধারণ 'হরির লুট' দিলেন। ইহার পরে, নিত্যানন্দ উদ্ধারণকে বলিলেন—"আমি উপবাসী আছি, আজ তোমার গৃহে 'পারণা' করিব।" নিত্যানন্দের এই আদেশ পাইয়া, উদ্ধারণ মহোৎসবের আয়োজন করিলেন—

"প্রভুর আদেশ পাঞা দত্ত মহামতি।
চিড়া দধি ভারে ভারে লইয়া আসে তথি॥
লকলকি কলা খণ্ড সিতা নাড়ু যোগ।
আঙ্গটিয়া কলার পাতে বাড়াইল ভোগ॥" পৃঃ ১৮, ১৯

ভোগাদির পর উদ্ধারণ সমবেত জনগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করিলেন। গ্রন্থকর্তা বাসু ঘোষ এইখানে বলিতেছেন,—"উদ্ধারণ তুমি বিশেষ ভাগ্যবান, কেন না তোমার গৃহেই আজ নিত্যানন্দ প্রভুর 'প্রেম-সমাধান' হইল।"

শ্রীনিত্যানন্দের দেহে ভাবের বিকাশ

মহাভাবময় নিত্যানন্দের দেহে অপূর্ব ভাবের বিকাশে প্রেম-সাগর উথলিয়া উঠিল—ক্ষণে ক্ষণে তিনি অলৌকিক লীলা দেখাইতে লাগিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া বাসু ঘোষ বলিতেছেন—

"সপ্তগ্রাম হৈল যেন নববৃন্দাবনে॥" পৃঃ ১৯

দীনহীন, পতিতপামর কাহারও কোন বিচার না করিয়া, সকলকেই ধরিয়া ধরিয়া কোল দিতে লাগিলেন। আর সকলেরই কাছে প্রেম-ভিক্ষা করিলেন গৌরলীলার প্রথম ও প্রধান প্রচারক নিত্যানন্দ—

"কান্দে প্রভু ভক্ত উদ্ধারণের গলা ধরি॥
গোরা গোরা বলি মুহু ছোড়য়ে হুঙ্কার।

শুনি সপ্তগ্রামের লোক হৈল চমৎকার ॥
প্রভু কহে গতি নাই মোর গোরা বিনে।
হরি হরি বল্যা ভাই মোরে লও কিন্যা ॥" পৃঃ ১৯

এ যেন সেই প্রাচীন পদেরই প্রতিধ্বনি—

"অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥
যে না লয় তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি ॥"

উদ্ধারণের গৃহে কীর্তনের চিত্র

নিত্যানন্দ ও উদ্ধারণের মিলনে যে প্রেমের বন্যা সপ্তগ্রামে বহিয়া গেল, এইরূপ বন্যা একদিন নবদ্বীপে ও শান্তিপুরে বহিয়া সমস্ত বাংলা দেশকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। উদ্ধারণের গৃহে কীর্তনের যে অনুষ্ঠান হইল, তাহার চিত্র কবি বাসু ঘোষ সুন্দরভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন—

"তখনে হইল প্রভুর কীর্তনের সাধ।
দাণ্ডাইল ভক্তগণ করি জোড় হাত ॥
চতুর্দশ মৃদঙ্গ বাজে আটাইস করতাল।
তথি মধ্যে নৃত্য করে হাড়াইর* তুলাল ॥
সহস্র ভক্ত মিলে হরিনাম গায়।
সংকীর্তনে চতুর্দশ লোক আনন্দ পায় ॥
প্রভুর তুই পার্শ্বে নাচে রামাই উদ্ধারণ।
প্রদক্ষিণ করি বুলে আর আর ভক্তগণ ॥
নারীগণ দূরে রঞা দেয় করতালি।
আউলাইয়া পড়ে দেহ শিথিল কবরী ॥
হুলাহুলি দেয় যত ঝিয়ারী বহুরী।
সর্ব বৈষ্ণবের প্রাণে প্রেমানন্দ স্ফূরি ॥" পৃঃ ২০

সপ্তগ্রাম ও তন্নিকটবর্তী গ্রামসমূহ উদ্ধারণের কৃপায় ভক্তিরসে নিমজ্জিত

* হাড়াইর অর্থাৎ হাড়াই পণ্ডিত—নিত্যানন্দের পিতা।

হইয়া গেল। দূরাগত বহু দেশ হইতেও অনেকানেক ভক্তের সমাগমে উদ্ধারণের গৃহ আনন্দ-মুখরিত হইল। সপ্তগ্রামের সমস্ত বণিক্‌কুল এক উদ্ধারণের জন্য যে অকৈতব অমূল্য সম্পদের অধিকার লাভ করিল, তাহার বর্ণনায় বাসু ঘোষ বলিতেছেন—

"বাসু বলে পূর্ণ কৃপা প্রভুর উদ্ধারণে।
ভক্তের মনোবাঞ্ছা হয়ত পূরণে॥
উদ্ধারণের ঘরে বৈসে নিত্যানন্দ রায়।
প্রভুরে দেখিতে কত ভক্ত আইসে যায়॥
দত্তের সেবা দেখি সবার মুগ্ধ মন।
নিষ্ঠা করি নানা খাদ্য যোগায় উদ্ধারণ॥
নিত্য বাণিয়ার ঘরে মহোৎসব হয়।
মহোৎসবের কি আনন্দ কহনে না যায়।" পৃঃ ২১

কেবল উদ্ধারণের গৃহে নয়, সপ্তগ্রামের ঘরে ঘরে এইরূপ কীর্তনানন্দ—এইরূপ মহোৎসব। সারা সপ্তগ্রামের আকাশে বাতাসে একটা অপার্থিব আনন্দের প্লাবন বহিয়া যাইতে লাগিল।

যতদিন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে ছিলেন, ততদিন উদ্ধারণের গৃহে 'দীয়তাং ভুজ্যতাং'। উদ্ধারণ-গৃহে যত ভক্তেরই সমাগম হউক না কেন, উদ্ধারণ সকলেরই সেবা গ্রহণ করেন।—

"যুগল ভজন গুণ লীলা আস্বাদনে।
উদ্ধারণ সভে ডাকে ভোগের আয়োজনে॥
সমিতা শর্করা খণ্ড ঘৃত ঝাল মহুরী।
বানাইল মালপুআ তুলসী মঞ্জরী॥
আনন্দে বৈষ্ণবগণ করয়ে ভোজন।
আচমনান্তে মুখবাস তাম্বুল চর্বণ॥
উত্তম শয্যায় শেষে সকলে শুতিল।
সভাকার পদ দত্ত সম্বাহন কৈল॥
উচ্ছিষ্ট ভোজন করি হৈল তেহুঁ ধন্য।" পৃঃ ২২

উদ্ধারণের এই ভক্তসেবা ও দৈন্য দেখিয়া নিতানন্দ প্রভু তাঁহার প্রতি পরম প্রসন্ন হইলেন।

উদ্ধারণের মাহাত্ম্য প্রকাশ

ইহার পর একদিনের এক অদ্ভূত ঘটনা। এই ঘটনায় উদ্ধারণের মাহাত্ম্য সমধিক পরিবর্ধিত হইল।

> "একদিন আইল দ্বিজ প্রভুরে ভেটিতে।
> ভক্তি গেয়ান শ্রেষ্ঠ কিবা হৈল মীমাংসিতে॥" পৃঃ ২৩

'ভক্তি শ্রেষ্ঠ কিম্বা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ'—ইহা লইয়া সমাগত ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ের তর্কে ও শেষ মীমাংসায় অনেক বেলা বাড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত হইলেন। তাঁহার ভাব উপলব্ধি করিয়া নিত্যানন্দ উদ্ধারণকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন,—ব্রাহ্মণ অতিথি যেন অভুক্ত অবস্থায় ফিরিয়া না যান। তারপর তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"আপনি সরস্বতীর জলে স্নানাদি সমাপন করিয়া আসুন।" ব্রাহ্মণ স্নানার্থ গমন করিলে, উদ্ধারণ নিত্যানন্দ-সমীপে যোড়হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

> "উদ্ধারণ বলে আজ্ঞা দেহ দয়াময়।
> কি রন্ধন হবে আজ কি ভোগ ইচ্ছা হয়॥
> সেহ ব্রাহ্মণের লাগি কিবা আয়োজন।
> তবু অগ্রে কোন্ দ্রব্য করিমু নিবেদন॥" পৃঃ ২৩

ইহার উত্তরে নিত্যানন্দ বলিলেন—

> "প্রভু কন দত্ত তুমি জিজ্ঞাসহ কেনে।
> আজি মোর পাচক হইবা তুঞি বেণে॥
> ফল মূল খাঞাছি বহু মুণ্ডিত সন্ন্যাসী।
> চিড়া দধি আম অন্নে সকৃত উপবাসী॥
> এক ভোজ্য খাইমু সভে বসি একসাথ।
> ভক্তগণে বন্টি দেহ কাছন প্রসাদ॥

ব্রাহ্মণের ভোজ্য হয় পরমান্ন জানি।
পরম সাত্ত্বিক ভোগ দুগ্ধ তণ্ডুল চিনি॥
ক্ষত্রিয়ের ভোজ্য হয় পলান্ন পাকালি।
বৈশ্যে খাইবে খেচরান্ন চালি আর ডালি॥
শূদ্রের শুধু অন্ন শাস্ত্রের উপদেশ।
শাক শুক্ত বটক ছোঁকা ব্যঞ্জন অশেষ॥
খেচরান্ন অবিলম্বে আন পাক করি।" পৃঃ ২৪

নিত্যানন্দের আদেশ পাইয়া উদ্ধারণ পাকশালে গমনপূর্বক রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। পাকাদি সমাধার পর ভৃত্যগণ অঙ্গনে আসন ও পাতা সাজাইল। তারপর নিত্যানন্দ ভক্তগণ সঙ্গে আসনে উপবেশন করিলেন। এই সময় স্নানাদি সমাপনপূর্বক পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণ তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নিত্যানন্দ পাতে বসিবার জন্য আহ্বান করিলেন। কিন্তু উদ্ধারণ পরিবেশন করিতেছেন, আর সকলে একসঙ্গে আহারে বসিয়াছেন,—ইহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ক্রোধে তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল।

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ তাঁহার মনের কথা জানিতে পারিয়া, স্মিতহাস্যে হাত ধরিয়া ব্রাহ্মণকে বসাইলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিলেন—

"—অবধূত মাথায় রহু ভক্তি।
কেমতে শূদ্রের সঙ্গে হইবে এক পংক্তি॥
বাণিয়ার পাচিত অন্ন কেমতে খাইব।
ছিয়ে ছিয়ে এমতে কি জাতি খণ্ডাইব॥" পৃঃ ২৫

উত্তরে নিত্যানন্দ বলিলেন—"সন্ন্যাসীর কখনও অন্নদোষ হয় না। উদ্ধারণ গোবিন্দের প্রসাদ পাক করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কোনও অপরাধ নাই। আরও—

গুণ কর্মে হৈলা ঞিহো জাতির উৎপত্তি।
লিখা জোখা ভাগবতে ভগবানের উক্তি॥
পরম ভক্ত বেণে এই উচ্চ-জাতি পাই।
তার গৃহে তার অন্ন মুঞি কিন্তু খাই॥" পৃঃ ২৫, ২৬

ইহার পর ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দের সহিত আসনে উপবেশন করিলেন। কিন্তু উদ্ধারণকে অন্ন পরিবেশন করিতে দেখিয়া, ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দের সমস্ত যুক্তি ও সান্ত্বনা-বাক্য ভুলিয়া গেলেন, উদ্ধারণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন—

"—কেনে তোর এতেক অহঙ্কার ॥
তোর অন্ন কে ছুঁইবে ধিক ছন্নমতি।
মোহারে না জান মুই হই অবসতি ॥" পৃঃ ২৬

বিপ্রের এই কথায় উদ্ধারণ দর্বী (হাতা) ফেলিয়া দিল। কিন্তু কাষ্ঠের হাতা ভূমিতে পড়িবামাত্র—"তরু মুঞ্জরিল।" ইহা দর্শনে বিপ্রের মুখে আর বাক্য সরিল না। তখন বিস্ময়াবিষ্ট বিপ্র উদ্ধারণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"—দত্ত তুমি কেবা মহাশয়।
হেন কার্য মানুষে সম্ভব কভু নয় ॥
দেব অংশে জন্ম হবে নিশ্চয় তোমার।
সব সন্দেহ নিরসন হৈল মোর এবার ॥" পৃঃ ২৭

তারপর যেখানে তরু মুঞ্জরিত হইয়া উঠিল, সেইখানে মস্তক অবনত করিয়া ব্রাহ্মণ আপনার সর্বাঙ্গে মাটি মাখিতে লাগিলেন এবং হাত পাতিয়া উদ্ধারণের কাছে অন্ন চাহিয়া সানন্দে খাইতে লাগিলেন।

উদ্ধারণ দত্তের পাটে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ মাধবীলতা সেই মুঞ্জরিত তরু।

অতঃপর
"স্বরূপ ধরি নিতাইচাঁদ বিপ্রে দিলেন দেখা।
বাসু বলে ভক্তেরে প্রভু কিছুই নাঞি লুকা ॥" পৃঃ ২৭

নিত্যানন্দের স্বরূপ দর্শনে সমবেত ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া ভোজনে উপবেশন করিলেন। রামাই ঠাকুর নিত্যানন্দের প্রসাদ লইয়া সকল ভক্তকে বাঁটিয়া দিলেন। তখন—

"ভক্তগণ ঝুটা তুলি লৈল নিজ মাথে।
বড় তৃপ্তি হৈল খাঞা উদ্ধারণের হাতে ॥" পৃঃ ২৬

উদ্ধারণের চেষ্টায় শ্রীনিত্যানন্দের বিবাহ

সপ্তগ্রামে কিছুদিন বাস করিবার পর, নিত্যানন্দের—

"গৃহী উদ্ধারিতে হৈল গৃহী হৈতে সাধ।" পৃঃ ২৮

নিত্যানন্দের পরম ভক্ত কমলাকান্তের মুখে এই ভাব ব্যক্ত হইল। ইহা শুনিয়া উদ্ধারণ অতিশয় প্রীতি অনুভব করিলেন এবং নিজে ও লোকজনের দ্বারা উপযুক্ত কন্যার সন্ধান করিতে লাগিলেন—

"রূপে গুণে লক্ষ্মী কন্যা আছে কোন্ ঘরে।" পৃঃ ২৭

সন্ধানের ফলে উদ্ধারণ জানিতে পারিলেন—

"অম্বিকা নগরে এক বড়ুয়ার কুটীরে।
রেবতীর উদ্ভব তাহা জানি সশরীরে॥" পৃঃ ২৮

এই 'বড়ুয়া' হইতেছেন—শ্রীসূর্যদাস পণ্ডিত (সরখেল)। ইঁহার আদি নিবাস সানিগ্রাম। ইহা নবদ্বীপের নিকটবর্তী। বসুধা ও জাহ্নবা নামে ইঁহার দুইটি কন্যা ছিলেন। আলোচ্য পুঁথির মতে উদ্ধারণ অম্বিকায় গিয়া সূর্যদাসের কাছে, ইঁহাদের মধ্যে একটিকে অর্থাৎ জাহ্নবা ঠাকুরাণীকে প্রার্থনা করিলেন—

"যাঞা উদ্ধারণ তথি মাগিল মেলানি।
প্রভুর স্বীকার্য তথি জাহ্নবা ঠাকুরাণী॥" পৃঃ ২৮

তারপর উদ্ধারণ জাহ্নবা দেবীর পা দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"মা তুমি সাক্ষাৎ কমলা, আমার গৃহে চল—

তান পা দু'খানি দত্ত সাপটিয়া ধরে।
বলে মা কমলা তুমি চলু মোর ঘরে॥" পৃঃ ২৮

নিত্যানন্দের সহিত জাহ্নবা দেবীর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। আর বিবাহের উদ্যোক্তা হইলেন—উদ্ধারণ। কিন্তু ভক্তিরত্নাকর ও নিত্যানন্দ-বংশবিস্তার গ্রন্থদ্বয়ের মতে নিত্যানন্দের সহিত বসুধা ও জাহ্নবা উভয় ভগ্নীরই বিবাহ হয়।

বিবাহের পর নিত্যানন্দ জাহ্নবার সহিত সপ্তগ্রামে আগমন করিলেন। সপ্তগ্রামে পত্নী সহ কিছুদিন অবস্থান করিয়া, নিত্যানন্দ উদ্ধারণকে

জানাইলেন যে, তিনি পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের গৃহে গমন করিবেন। নিত্যানন্দের মুখে এই নিদারুণ বাণী শ্রবণ করিয়া—

"প্রভুর বিরহে দত্ত কান্দিয়া আকুল।
আছাড়ি পাছাড়ি পড়ে ছিণ্ডে মাথার চুল॥" পৃঃ ২৯

তারপর যখন নিত্যানন্দ জাহ্নবা দেবীর সহিত পানিহাটি যাত্রার উদ্যোগ করিলেন, তখন—

"দত্ত বলে কাঁহা যাও মোরে পায়ে ঠেলে।
তোমার বিরহে মুঞি ভক্ষিমু গরলে॥
তুয়া গুণে বিকাঞিছি তেঞি ঝুরে প্রাণ।
কোথাকে না যাইও প্রভু ছাড়ি সপ্তগ্রাম॥" পৃঃ ২৯

নিত্যানন্দ যে সপ্তগ্রাম অন্ধকার করিয়া চলিয়া যাইবেন, উদ্ধারণ ইহা ভাবিতেই পারেন না। তাঁহার প্রাণ নিত্যানন্দগত, নিত্যানন্দের আগমন ও অবস্থিতিতে সপ্তগ্রামে আনন্দের বন্যা বহিয়া যাইতেছে। সে বন্যা থামিয়া যাইবে ইহা যে একেবারে ধারণার অতীত। কিন্তু উত্তরে নিত্যানন্দ উদ্ধারণকে জানাইলেন—

"প্রভু বলে মুঞি জানি চৈতন্যকিঙ্কর।
প্রভুর কার্য সাধিব অবনী ভিতর॥
রাঘব পণ্ডিতের ঘরে এবে মোর স্থিতি।
না কান্দ না বান্ধ মোরে দত্ত মহামতি॥" পৃঃ ২৯

উদ্ধারণ তুমি কাঁদিও না, আর আমাকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টাও করিও না। তুমি ত জান, আমি শ্রীচৈতন্যের কিঙ্কর। তাঁহার আজ্ঞায় তাঁহার কাজ আমাকে সমাপন করিতে হইবে। দেশে দেশে তাঁহার নাম প্রচার কার্যে আমি যে নিযুক্ত, এক জায়গায় আমি ত আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারি না। তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে আমার অনেক কষ্ট হইতেছে, তুমি যে আমার প্রাণপ্রিয়—

"তোর পীরিতি যে আমার পরাণ সনে জড়া।
কদাচ নহিব মুই সপ্তগ্রাম ছাড়া॥

সপ্তগ্রামে থাকি তুমি সাধন করহ।
হরিনাম প্রচার হকু ধরায় অহরহ॥
তোর ঘরে রৈল মোর সকল বিলাস।
তোর জাতি আজি হৈতে হৈল মোর দাস॥
কমলা অচলা হৈঞা রবে তিহো পাটে।
প্রাণ বান্ধা রৈল মোর বাণিয়ার নিকটে॥" পৃঃ ২৯

এইখানেই নিত্যানন্দের কৃপা এই উক্তির ভিতর দিয়া, সহস্রধারে উদ্ধারণের উপর ঝরিয়া পড়িতেছে। আর উদ্ধারণের ভক্তিতে নিত্যানন্দের প্রাণ—

"বান্ধা রৈল বাণিয়ার নিকটে।"

প্রাচীন গীতে নিত্যানন্দ-উদ্ধারণের মিলন-চিত্র

বাউলের একখানি প্রাচীন গানে, সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দ-উদ্ধারণ-মিলনের চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়—

"নৃত্য করে নিত্যানন্দ ভক্তবৃন্দ মণ্ডলে।
হরি হরি বলে সদা প্রেমে ঢলে,
ভক্তিসিন্ধু উথলে॥
(তোরা দেখে যা যে জন ভাবের ভাবী
যে জন প্রেম মহাজন রসিক সুজন
ভক্তিসিন্ধু উথলে।)
উদ্ধারণ সঙ্গে সখা সপ্তগ্রামে হইল দেখা,
প্রেমভক্তি দিলে বণিক্ বৈশ্যকুলে,
যোগী ঋষি যা না পায় যোগ বলে।
(উদ্ধারণ সখা সনে দেখা,
যিনি দ্বাপর যুগে ছিলেন সুবাহু গোপাল।)
ধন্য পুরী সপ্তগ্রাম সপ্ত ঋষির পুণ্যধাম,
ভাগীরথী আর সরস্বতীর মুক্তবেণী চলে॥
(ধন্য পুরী সপ্তগ্রাম,

যথায় হরি বরাহ-রূপে কেলি কুশলে
বিচরণ করেছিলে।)

সুবর্ণবণিক্ বৈশ্য, ভক্তি-প্রভাবে নমস্য,
সাধু সদাচারী, সিঞ্চে ভক্তিবারি,
নিতাইচাঁদের কৃপা-বলে ॥
(আমার দয়াল নিতাইচাঁদের কৃপা বলে
ঐ প্রেমদাতা নিতাইচাঁদের কৃপা বলে।)"

উদ্ধারণের কঠোর সাধনা

নিত্যানন্দের সপ্তগ্রাম পরিত্যাগের পর উদ্ধারণ কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন—

"উদ্ধারণের সাধন-লীলা কহিতে চমৎকার।
আপনে নিতাই দিলা কৃষ্ণমন্ত্র যার ॥
তিন সন্ধ্যা সরস্বতীর জলে করে স্নান।
চব্বিশ প্রহর জপে রাধাকৃষ্ণ নাম ॥" পৃঃ ৩০

আর—

"অন্ন জল ত্যাগ করি দুগ্ধ খাঞা রয়।
একদণ্ড নিদ্রা সেহো সব দিন নয় ॥" পৃঃ ৩০

ক্রমে উদ্ধারণ পুত্র প্রিয়ঙ্করের* উপর সমস্ত বিষয়-কর্ম্মের ভার অর্পণ করিয়া নিজে সম্পূর্ণভাবে ধর্ম-সাধনায় নিযুক্ত হইলেন। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত (সম্প্রতি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত) কাইচার (কৈচর) গ্রামে কুটির বাঁধিয়া সেইখানে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি মস্তক মুণ্ডন করিয়া কৌপীন-বহির্বাস গ্রহণ করিলেন। আর—

"কণ্ঠে তুলসীর হার তিন গুঞ্জ হালি।
নাসাগ্রে তিলক পঙ্ক শোভা পায় ভালি ॥

* কিন্তু 'পদসমুদ্র'-গ্রন্থে উদ্ধারণ সম্বন্ধে যে পদটি আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়—
'পুত্র শ্রীনিবাসে, রাখিয়া আবাসে
হইলা বিবেকচারী।'

ধনরত্ন দান কৈল বৈষ্ণব ব্রাহ্মণে।
ইহাতো প্রভুর কার্য বাসুঘোষ ভণে॥" পৃঃ ৩০

কিন্তু এ সমস্ত কার্য করিয়াও উদ্ধারণ নিত্যানন্দের বিরহ সহ্য করিতে পারিলেন না, অতুল ধন-সম্পদের অধিকারী উদ্ধারণ—

"প্রভুর বিরহে দত্ত হঞা আউলিয়া।
ভিক্ষা মাগি বুলে লোকে হরি বোলাইয়া॥" পৃঃ ৩০

নিত্যানন্দ প্রভুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা

উদ্ধারণ লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি সূত্রধর ও পটুয়াদিগকে ডাকিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর মূর্তি নির্মাণে আদেশ দিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা-প্রচারে এবং নিত্যানন্দ-পূজায় উদ্ধারণ অগ্রণী হইলেন—

"কণ্টকনগর মধ্যে যতহুঁ গ্রাম ছিল।
সর্বত্র প্রভুর মূর্তি উদ্ধারণ স্থাপিল॥
সহস্র দেউলে নিত্যানন্দের বিগ্রহ।
শোভা পায় শ্রীচৈতন্যের দারুমূর্তি সহ॥" পৃঃ ৩০

কণ্টকনগর অর্থাৎ কাটোয়ার মধ্যে যত গ্রাম ছিল, সমস্ত গ্রামেই উদ্ধারণ নিতাই-গৌরের বিগ্রহ স্থাপন করিলেন। ভক্তিসহকারে ফুল-তুলসী দিয়া তিনি প্রভুদ্বয়ের নিত্য সেবা করিতে লাগিলেন এবং নিজের যথাসর্বস্ব প্রভুর সেবা ও নাম-প্রচারের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

নিত্যানন্দের প্রিয় কীর্তনীয়া ষষ্ঠীবর দাস, নিত্যানন্দের আদেশে সপ্তগ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ষষ্ঠীবরের আগমনে সপ্তগ্রামে কীর্তনের হাট বসিয়া গেল—

"ষষ্ঠীবর গায় গান উদ্ধারণ নাচে॥
নিতাইচান্দে হেন ভক্তি কোথা কার আছে॥" পৃঃ ৩১

ক্রমে উদ্ধারণের গৃহ গৌড়দেশবাসীর সম্মিলন-স্থল হইয়া উঠিল। তাঁহার গৃহে বহু ভক্তের সমাগম হইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই উদ্ধারণ

প্রভুর বিরহ সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহার প্রাণ প্রভুর জন্য গুমরিয়া উঠিতে লাগিল, অবশেষে তিনি

"প্রভুর বিরহে হৈল যতি দণ্ডধারী॥" পৃঃ ৩১

নিত্যানন্দের ভাবে উন্মত্ত হইয়া উদ্ধারণ কাটোয়ার পথে পথে একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মুখে তাঁহার নিত্যানন্দের নাম, সর্বাঙ্গ ভাবে আবিষ্ট। গ্রন্থকর্তা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন—

"বাসু বলে বৈকুণ্ঠের লীলা দত্তের ঘরে।
উদ্ধারণে ভজিলে নিতাই কৃপা করে॥

ধ্রুব প্রহ্লাদ সম তেঁহ নিতাই ভজিল।
বৈকুণ্ঠে তানাকো লাগি দুন্দুভি বাজিল॥" পৃঃ ৩১

উদ্ধারণের ভক্তি ও প্রেম, সেবা ও সাধনার জয়ধ্বনিপূর্বক বাসুঘোষ নিম্নলিখিতভাবে তাঁহার কড়চার উপসংহার করিয়াছেন—

"উদ্ধারণের প্রেমভক্তি অকথ্য কথনে।
চৈতন্য নিতাই নাম মাত্র বদনে॥
দ্বাপরের সুবাহু গোপাল ঝিহো জান।
যার শ্রদ্ধায় বাধ্য হৈলা আপনে নারায়ণ॥
জয় জয় উদ্ধারণ নিতাইচান্দের প্রিয়।
যাকর গুণগান শ্রবণে অমিয়॥" পৃঃ ৩২

শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও তাঁহার প্রিয় কীর্তনীয়া মুকুন্দ দাসও উদ্ধারণ-মহিমা-কীর্তনে মুখর হইয়াছেন—

"শাণ্ডিল্য প্রবর, শ্রেষ্ঠ শান্ত ধীর
সুবর্ণবণিক্ খ্যাতি।
রাধাকৃষ্ণ-পদ ধ্যায় নিরন্তর
বৈশ্যকুলেতে উৎপত্তি॥

নীলাচল পুরে প্রভু মিলিবারে
সদা ইতি উতি ধায়।
আশা ঝুলি লয়ে ভিখারী হইয়ে
প্রসাদ মাগিয়া খায়।
প্রভু ভক্তগণ, পাই নিজ জন
রাখিয়া যতন করি।
এ দাস মুকুন্দ, দেখিয়া আনন্দ
দত্তের দৈন্যতা হেরি॥"

"নিত্যানন্দ-উদ্ধারণ" মিলন-দ্যোতক এই কড়চাখানি ভবিষ্য উদ্ধারণ-জীবনী-লেখকের বিশেষ সহায়তা করিবে।

বলাইচাঁদ সেন

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্ত কবি অধরলালের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺বলাইচাঁদ সেন মহাশয়ও লেখক ছিলেন। বলাইবাবু গদ্য ও পদ্যে কয়েকখানি গ্রন্থ বাংলায় রচনা করেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া গিয়াছে—

১। বিলাপ-লহরী
২। কল্কিপুরাণ
৩। রুসিয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
৪। সুবর্ণবণিক্
৫। আকৃতিতত্ত্ব

এই পাঁচখানি গ্রন্থের মধ্যে সবগুলি পাওয়া যায় নাই। বলাইবাবুর সুবর্ণবণিক্ পুস্তক হইতে কিয়দংশ স্বর্গীয় কুঞ্জলাল মল্লিক (ভূতি) মহাশয় তাঁহার রচিত সুবর্ণবণিক্ পুস্তকের ২য় খণ্ডের ৫৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বলাইবাবু রামগোপাল সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বাল্যাবধি গ্রন্থপাঠে ইঁহার অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। অনেক মূল্যবান্ ও প্রয়োজনীয় পুস্তক ক্রয় করিয়া ইনি নিজ পাঠাগার সজ্জিত করিয়াছিলেন। অতিরিক্ত অধ্যয়ন-হেতু শেষ বয়সে ইঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটে। বলাইবাবু অধরলাল অপেক্ষা বয়সে প্রায় কুড়ি বৎসরের বড় ছিলেন।

১৩০৪ সালের ১লা শ্রাবণ (১৮৯৭ খৃঃ, ১৬ই জুলাই) শুক্রবার বলাইবাবু প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে মারা যান।

গ্রন্থ-প্রকাশের তারিখ

বলাইবাবুর প্রথম গ্রন্থ—বিলাপ-লহরী কবিতার বই; ইহা ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল প্রকাশিত হয়; তারপর

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের, ২২শে ডিসেম্বর কল্কিপুরাণ,

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের, ২৬শে জুলাই রুশিয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
১৮৭০ „ ৩রা আগষ্ট স্বুবর্ণবণিক্

বাহির হয়। আকৃতিতত্ত্ব তাঁহার শেষ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রকাশ-কাল জানা যায় নাই।

‘কল্কিপুরাণ’

বলাইবাবুর দ্বিতীয় গ্রন্থ—“কল্কিপুরাণ”। “বিলাপ-লহরী” গ্রন্থে প্রকাশিত নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন-পাঠে জানা যায় যে, “বিলাপলহরী” প্রকাশের সময় (১২৭৪ সাল) কল্কিপুরাণের মুদ্রণকার্য আরম্ভ হয়—

“বিজ্ঞাপন

সর্ব সাধারণ জনগণকে জ্ঞাত করা হইতেছে যে, কল্কি নাম্নী পুরাণ মুদ্রিত হইতেছে।

স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ১।০
বিনা স্বাক্ষরকারীর প্রতি মূল্য ১॥০

শ্রীবলাইচাঁদ সেন”

কল্কিপুরাণের সংগৃহীত পুস্তকখানি অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত। কত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত তাহা জানিবার উপায় নাই। সংগৃহীত পুস্তকে ১৪২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আছে। এই ১৪২ পৃষ্ঠায় “ত্রয়ত্রিংশৎ অধ্যায়” আরম্ভ হইয়াছে। পুস্তকের “নির্ঘণ্ট-পত্রাঙ্ক” দৃষ্টে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহার পরে আর দুইটি অধ্যায়ে (গঙ্গার স্তব ও সূতের প্রস্থান) গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় আনুমানিক ১৫০ বা ১৫২ পৃষ্ঠায় গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ।

ডিমাই ১২ পেজী আকারে, পাইকা অক্ষরে গ্রন্থখানি মুদ্রিত। প্রাপ্ত পুস্তকখানির প্রচ্ছদ-পত্র নাই। প্রথমে “উৎসর্গ” ও “পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন” আছে। পুস্তকখানি বলাইবাবু তাঁহার পূজনীয় পিতা রামগোপাল সেন মহাশয়ের নামে উৎসৃষ্ট করেন। “উৎসর্গ” ও “পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন” দুইটি অংশ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইল—

"উৎসর্গ

পূজ্যপাদ মহাগুরু শ্রীল শ্রীযুক্ত রামগোপাল সেন
অতুল শ্রদ্ধাস্পদ পিতাঠাকুর শ্রীচরণকমলেষু—

পিতঃ! আপনকার অনুগ্রহে এই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি এবং মহাশয়ের অনুকম্পায় অমূল্য বিদ্যারত্নও লাভ করিয়াছি। এক্ষণে কৃতজ্ঞচিত্তে আপনার শ্রীচরণে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থরূপ পুষ্প প্রদান করিতেছি, অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে এ দাস নিতান্ত চরিতার্থ হয়।

ভবদীয় একান্ত বশম্বদ
শ্রীবলাইচাঁদ সেন"

"পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন

গুণগ্রাহি পাঠক মহোদয়গণ! আমরা পণ্ডিতবর ৺মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের বঙ্গানুবাদানুসারে এই কল্কিপুরাণখানি রচনা করিয়াছি। এখানি বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কৃত কল্কিপুরাণের অনুরূপ অনুবাদ নহে। কোন কোন স্থান অসংলগ্ন বোধ হওয়াতে একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে সভয়চিত্তে পাঠক মহাশয়দিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছি যে আমাদিগের অনবধানতা প্রযুক্ত মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি ভ্রমপ্রমাদ হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে সেই সকল ভ্রমপ্রমাদগুলির যতদূর পারি আমরা নিবারণের চেষ্টা পাইব।

কলিকাতা
বেনেটোলা ষ্ট্রীট
শকাব্দা ১৭৯০
} শ্রীবলাইচাঁদ সেন"

এই দুইটির (উৎসর্গ ও পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন) পরে দুই পৃষ্ঠাব্যাপী "নির্ঘণ্ট-পত্রাঙ্ক"; তারপর "শুদ্ধিপত্র", ইহাও দুই পৃষ্ঠা স্থান অধিকার করিয়াছে।

'কল্কিপুরাণে'র আলোচনা

পুস্তকখানি কবিতায় অনূদিত। অধিকাংশই পয়ার ছন্দ, ৩।৪ স্থানে

দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দও আছে। গ্রন্থকারের রচনা বেশ মার্জিত ও প্রাঞ্জল। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, যেন কবি কাশীরাম বা কৃত্তিবাসের রচনা পঠিত হইতেছে।

প্রথম অধ্যায়ের প্রারম্ভে গ্রন্থকার ভগবানের বন্দনা গাহিয়াছেন। তারপর গ্রন্থ-রচনার প্রাক্কালে তিনি ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"দীননাথ বিশ্বভাব করি দরশন।
অন্তরে না পাই কিছু ভাবের লক্ষণ॥
কি ভাবে করিছ এই বিশ্বের স্বজন।
নাহি শক্তি মোর কিছু করি যে বর্ণন॥
পদ নাই তবু কর সর্বত্রে গমন।
চক্ষু নাই কর প্রভু সকলি দর্শন॥
কর্ণ নাই তবু কর সকলি শ্রবণ।
হস্ত নাই কর বিভু সকলি গ্রহণ॥
কিরূপে বর্ণিব প্রভু ভাবিয়া না পাই।
কি বলিব কি করিব কোথায় বা যাই॥" পৃঃ ১, ২

ইহার পরেই সংসারের অনিত্যতা ও আত্মোপদেশ আছে। এই অংশ হইতে গ্রন্থকারের তৎকালীন মনোভাব ও তিনি কোন্ পথের পথিক ছিলেন, তাহা বেশ বোঝা যায়। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল—

"শুন রে পামর মন করিরে বারণ।
দেহ অভিমান তুমি করো না কখন॥
এ সকল যত দেখ সকলি অলীক।
কে তোমার তুমি কার কহ দেখি ঠিক॥
কাল বশে যাবে সব রবে মাত্র শব।
মিছে তুমি কেন কর আমি আমি রব॥
মায়ায় হয়েছ মুগ্ধ কি বলিব আর।
বৃথা তুমি কেন কর আমার আমার॥
এই যে প্রেয়সী তব নবীনা যুবতী।
দেখিতে রূপসী অতি মৃদুমন্দ গতি॥

পঞ্চভূতে এই দেহ যখন মিশিবে।
বল তব সেই প্রিয়া কোথায় রহিবে॥
এই দেখ ধন মান আর পরিজন।
এই দেখ মাতাপিতা আর বন্ধুগণ॥
এই দেখ ঘরবাড়ি আর টাকা কড়ি।
এই দেখ সুখৈশ্বর্য আর গাড়ি ছড়ি॥
এ সবের মধ্যে তব কে হয় আপন।
কহ দেখি শুনি আমি ওরে মূঢ় মন॥

* * *

* * *

মানবের মত তুমি না করিছ কর্ম।
বানরের মত তুমি আচরিছ ধর্ম॥
কারে বল নর আর কে হয় বানর।
যেই জন ভাবে বিভু তারে বলি নর॥
আর যত দেখ তুমি নর রূপধর।
দেখিতে মানব বটে ভিতরে বানর॥" পৃঃ ২,

এই আত্ম-প্রশ্ন বা আত্ম-জিজ্ঞাসার পর তিনি ভগবানের চরণে আ সমর্পণ করিবার জন্য মনকে যে উপদেশ দিতেছেন, সেই অংশে প্রতি পংতি আদ্যক্ষরে সুকৌশলে "শ্রীবলাইচাঁদ সেন দ্বারা বিরচিত হইয়াছে"—লিপিব করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য অংশটি এখানে উদ্ধৃত হইল—

"শ্রী-কৃষ্ণ চরণ পদ্মে মজ ওরে মন।
ব-দন ভরিয়া গুণ করহ কীর্তন॥
লা-ভ হবে মোক্ষপদ সেবিলে সে পদ।
ই-ন্দ্রাদি দেবতা সেবি পেয়েছে সম্পদ্॥
চাঁ-দ ছাঁদ শ্রীচরণে শোভা করে যাঁর।
দ-রশনে যে চরণ ভবসিন্ধু পার॥
সে-পদ সতত মন করহ স্মরণ।
ন-রক যাতনা যাতে হবে নিবারণ॥

দ্বা-র ঘর আদি যত সকলি অসার।
রা-খ সদা এই বাক্য মনরে আমার ॥
বি-ষয় বৈভব যত সকলি নশ্বর।
র-সনায় বল সদা হরি অনশ্বর ॥
চি-ত্তেতে উদয় কর জ্ঞান রূপ শশি।
ত-ত্ত্বে দূর করে দিবে মোহরূপ মশি ॥
হ-র্ষ চিতে রবে সদা ওরে মূঢ় মন।
ই-ন্দ্রাদি দেবতা যাঁর সেবে শ্রীচরণ ॥
যা-গ যজ্ঞ মিছে কেন কর মূঢ় মন।
ছে-দ কর মহা মোহ বিভু নিরঞ্জন ॥" পৃঃ ৩, ৪

ইহার পরেই মূল গ্রন্থ আরম্ভ—"শৌনকাদির সহিত সূতের সংবাদ।"

আলোচ্য গ্রন্থমধ্যে স্থানে স্থানে বলাইবাবু প্রাকৃতিক বর্ণনার যে নমুনা দিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে একজন সুকবি ছিলেন তাহা বুঝা যায়। অষ্টম অধ্যায়ে (পৃঃ ৪২-৪৪) কবি সিংহলের রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সুন্দর।

কল্কিপুরাণ গ্রন্থখানির মাঝে মাঝে বলাইবাবু আত্মোপদেশ দিয়াছেন। বিভ্রান্ত চিত্তকে সংযত করিবার জন্য, তিনি ভগবানের পদে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার বলিবার ভাষা সরল ও হৃদয়গ্রাহী। কল্কিপুরাণের ৩৮ ও ৩৯ পৃষ্ঠায় দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দের যে কবিতাটি আছে, এখানে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"শুন মন পাপমতি, করি তোরে এ মিনতি,
ভাব সদা সেই সার ধন।
সর্বব্যাপী নিরাকার, নিরাময় নির্বিকার,
দীনবন্ধু সত্য সনাতন ॥
অসার সংসার এই, সার মাত্র হয় সেই,
বলি তোরে সার বিবরণ।
আমি আমি সদা করি, বৃথা কেন কাল হরি,
অসুখেতে করহ যাপন ॥

মায়াতে মোহিত হ'য়ে, দারা পরিজন লয়ে,
আমার আমার সদা কও।
মুখে কর আমি রব, কর দেখি অনুভব,
আমি তুমি কেবা তুমিহও ॥
এ সকল দেখ যত, সকলি হইবে হত,
অন্তকাল করহ চিন্তন।
ধরিয়া ভীষণ বেশ, করিতে তোরে নিঃশেষ,
কালের হইবে আগমন ॥
এই বেলা ওরে মন, চিন্ত সেই নিত্যধন,
করিলাম তোরে সাবধান।
গেল কাল নাহি কাল, এলো এলো পরকাল,
গেল গেল গেল তোর প্রাণ ॥
তাই বলি মূঢ় মন, ভাব সদা সনাতন,
যমের যাতনা তবে যাবে।
ভাবিলে অভয় পদ, তুচ্ছ করি ব্রহ্ম পদ,
কাল সদা ভয়েতে পলাবে ॥" পৃঃ ৩৮, ৩৯

এই কবিতাটির মধ্যে স্থানে স্থানে অনুপ্রাসের সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়।

বলাইবাবু সংস্কৃতে রচিত মূল কল্কিপুরাণ হইতে এই পদ্যানুবাদ করেন নাই। পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ভাষানুবাদ হইতে তিনি কবিতায় এই অনুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা পাঠে মনে হয় না যে, কোন গ্রন্থের অনুবাদ পড়া হইতেছে।

ইতিপূর্বে পয়ারে রচিত কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, কিরূপ সুকৌশলে বলাই বাবু প্রত্যেক পংক্তির আদ্যক্ষরের দ্বারা "শ্রীবলাই-চাঁদ সেন দ্বারা বিরচিত হইয়াছে" এই কথাগুলি গ্রথিত করিয়াছেন। গ্রন্থের আরও এক স্থানে, একটি দীর্ঘ ত্রিপদী কবিতার প্রত্যেক পদের আদ্যক্ষর দ্বারা "শ্রীবলাইচাঁদ সেন" নামটি গাঁথিয়াছেন। ইহা আরও কঠিন কাজ। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

"শ্রী-নাথ সৃজনপতি, শ্রী-নিবাস রমাপতি,
শ্রী-পতিরে ভাব মূঢ় মন।
ব-সন যে পীতাম্বর, ব-লানুজ ডাকে নর,
ব-শিষ্ঠাদি ভাবে অনুক্ষণ॥
লা-ভ হবে মোক্ষ পদ লা-ঞ্ছন হইরে রদ
লা-লসাতে হবে তুমি পার।
ই-ন্দ্রত্ব যে তুচ্ছ করি, ই-হকাল যাবে তরি,
ই-ষ্ট পূর্ণ হইবে তোমার॥
চাঁ-চর চিকুর কেশ, চাঁ-দ মুখ সুশ্রী বেশ,
চাঁ-পা যুক্ত পদ হয় যার।
দ-য়া কর দুখহর দ-র্শন শ্রবণ কর
দ-ণ্ডধরে ভয় কিবা আর॥
সে নাম কি চমৎকার, সে-ই ভব কর্ণধার,
সে নাম তুলনা শেষ হয়।
ন-ম নম ভবধব, ন-তি করি পদে তব,
ন-রকের দূর কর ভয়॥" পৃঃ ৩৮

'সুবর্ণবণিক্'

বলাই বাবুর চতুর্থ গ্রন্থ "সুবর্ণবণিক্" পাওয়া যায় নাই—তবে স্বর্গীয় কুঞ্জলাল মল্লিক (ভূতি) মহাশয়ের "সুবর্ণবণিক্" দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৬ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে জানিতে পারা যায় যে, ১৪৯নং মানিকতলা ষ্ট্রীটস্থ (কলিকাতা) নূতন বাঙ্গলা যন্ত্রে ১৯২৬ সংবতে (১২৭৬ সালে) ইহা মুদ্রিত হয়। কুঞ্জলাল বাবু এই গ্রন্থের "সমুদ্রযাত্রা" বিষয়ক অংশটি তাহার গ্রন্থের ৫৬-৫৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই উদ্ধৃত অংশের কিছু এখানে পুনরুদ্ধৃত করিয়া বলাই বাবুর গদ্য-রচনার ধারা এবং তাঁহার বক্তব্য বিষয় বলিবার প্রণালীর কিছু পরিচয় দেওয়া গেল। "সুবর্ণবণিক্" গ্রন্থে উদ্ধৃত চার পৃষ্ঠা পড়িয়া বোঝা যায় যে, বলাই বাবু

তাঁহার রচিত "সুবর্ণবণিক্" গ্রন্থ রচনা-ব্যপদেশে মহাভারত, স্কন্দপুরাণ, স্মৃতিগ্রন্থ, কহ্লন রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি বহু গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন।

'সুবর্ণবণিক্' গ্রন্থের উদ্ধৃতাংশ

"এক্ষণে অনেকে জলপথে বাণিজ্য করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন, তাঁহাদের মত যে কতদূর সঙ্গত, তাহা বলিতে পারি না। পূর্বেই পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন যে, বণিক্গণ জলপথে বাণিজ্য করিতে পারেন। বাণিজ্য সুখের মূল, বাণিজ্যই ধনের আকর এবং বাণিজ্যই উন্নতির প্রধান হেতু। কিন্তু কোন কোন গ্রন্থে সমুদ্র-যাত্রা নিষেধ করিয়াছে। পূর্বতন মান্যগণেরা অধিক শাস্ত্র জানিতেন ও আমাদিগের অপেক্ষা সহস্রগুণে জ্ঞানী ছিলেন। যখন তাঁহারা পুরাণের নিষেধ না মানিয়া, সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন ঐ সকল আধুনিক বচনও নিষেধ বলিয়া গণ্য ও মান্য ছিল না। ভূপতি মিহিরকুল স্বীয় সুশিক্ষিত সৈন্যের সহিত সিংহলাধিকারীকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, তৎকালে সমুদ্র-যাত্রা নিষেধ বলিয়া গণ্য ছিল না।"*

মূল (সুবর্ণবণিক্) গ্রন্থখানি না পাওয়ায় গ্রন্থের অন্যান্য বিবরণ প্রদান করিতে পারা গেল না।

'আকৃতি-তত্ত্ব'

বলাই বাবুর শেষ গ্রন্থ আকৃতি-তত্ত্ব। আকৃতি-তত্ত্বের প্রাপ্ত কাপিতে ৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী গদ্যে লিখিত একটি ভূমিকা এবং আরও ৮ পৃষ্ঠা "শব্দকল্পদ্রুম হইতে উদ্ধৃত" সংস্কৃত শ্লোক আছে। এই ১৬ পৃষ্ঠার পর আর পাওয়া যায় নাই। পুস্তকখানি ডিমাই আট পেজী আকারে ছাপা।

'আকৃতি-তত্ত্বে'র ভূমিকা

বলাইবাবুর লিখিত ভূমিকাটিতে পাণ্ডিত্য ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে তাহার মধ্য হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত হইল—

---

* কুঞ্জলাল মল্লিক (ভুতি) প্রণীত সুবর্ণবণিক্, পৃঃ ৫৬, ৫৭

SEN'S SERIES.

আকৃতি-তত্ত্ব।

শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ সেন কর্ত্তৃক
প্রণীত।

কলিকাতা

পাতরিয়াঘাটা সাহিত্য যন্ত্রে

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৭৮।

বিনা মূল্যে বিতরিত।
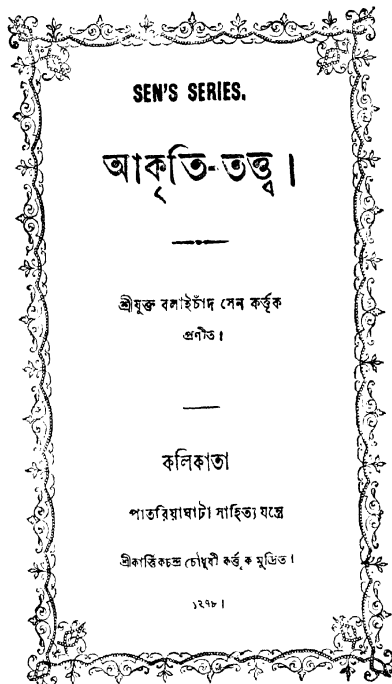
'আকৃতি-তত্ত্ব' পুস্তকের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি

জ্ঞানচন্দ্রিকা।

কৃষ্ণাগ্রজ পত্রিকা।

১ খণ্ড] ১২৬৭ সাল। মাসিক মূল্য ৵০ আনা মাত্র। [৫ সংখ্যা।

জ্ঞান।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষ।

বিপন্ন ব্যক্তির বিপদ বিমোচন, উপকার দাতার নিকট উপকার স্বীকার ও প্রত্যুপকার সাধন ইত্যাদি উত্তম কর্ম্মচয়কে শ্রীচরণারবিন্দ দ্বন্দ্ব ক্ষরিত মকরন্দ পানানন্দে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। পরন্তু বিজ্ঞ বুধবর্গ জ্ঞানকে দ্বিবিধ প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন যথা বিজ্ঞান ও তত্ব জ্ঞান, বহু শাস্ত্রাধ্যয়নে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে

"যে বিজ্ঞান দ্বারা জীবদিগের দেহ, বিশেষত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া প্রকৃতির উত্তমতা বা অধমতা বিচার করা যায়, তাহাকে আকৃতি-তত্ত্ব বলে। আত্মা যাহার সঙ্গে থাকিলে সুখ বোধ করেন, তাহারই সহিত থাকিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন। এই আত্ম-ক্রিয়ার নাম অনুরাগ এবং বিপরীত ক্রিয়ার নাম বিরাগ। সকলের মুখমণ্ডল, সমুদয় আকৃতি, সমুদয় জীব পরস্পর বিভিন্ন এবং তাহাদের দৈহিক বিভিন্নতার ন্যায় মানসিক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।" তাঁহার এই বক্তব্যগুলি বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলাই-বাবু আকৃতি-তত্ত্ব-বিদ্যার উৎপত্তি ও প্রসারের পরিচয় দিতেছেন—"আকৃতি-তত্ত্ব ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তৎপরে ইজিপ্ট বা মিসর দেশে প্রচলিত হয়। পিথ্যাগোরস ইজিপ্ট দেশ হইতে শিক্ষা করিয়া গ্রীশ দেশে (ইহা) প্রচলিত করেন। পিথ্যাগোরসের মত যাঁহারা শিক্ষার নিমিত্ত আগমন করিতেন, প্রথমত তাঁহাদের আকৃতির পরীক্ষা হইত, পরীক্ষোত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা বিদ্যালাভ করিতেন। বিখ্যাত প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল বলিয়া গিয়াছেন যে, মুখ ও দেহের দ্বারা মানসিক ভাব জানা যায়। সিসিরোও আকৃতি-তত্ত্বের শ্রদ্ধা করিতেন। রোমনদিগের মধ্যেও এই বিদ্যার দ্বারা অনেকের জীবিকা নির্বাহ হইত। কারণ ইতিহাসবেত্তা সিউটোনিয়ম বর্ণনা করিয়াছেন যে, বৃট্যানিয়াসের আকৃতি পরীক্ষার্থে নার্সিসাস একজন আকৃতি-তত্ত্ববেত্তাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিশেষ গুণসম্পন্ন চতুষ্পদ ও মানবদিগের আকৃতি-সাদৃশ্য বিচার করিবার চেষ্টা ডেলাপর্টা নামক জনৈক সুধী প্রথম আরম্ভ করেন এবং তাঁহার পর টিস্কবীন আরো চেষ্টা করিয়াছিলেন। টমাস ক্যামপেলেনা আকৃতি-তত্ত্বের যথোচিত অনুশীলন করিতেন এবং ইহার পর বিখ্যাত ল্যাবেটার অধিক চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

বলাইবাবুর মতে "স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের অপেক্ষা আকৃতি-তত্ত্বে সুনিপুণ হইয়া থাকে।" এই ব্যপদেশে তিনি বলিতেছেন—"কত শত পুরুষ স্ত্রীর পরামর্শানুসারে কর্ম করিলে বিপদ্, বিষয়-নাশ, মান-নাশ হইতে রক্ষা পাইতেন। যথার্থই কোন কোন স্ত্রীলোকের চরিত্র-পরীক্ষার জ্ঞান এত তীক্ষ্ণ যে, প্রায়ই তাহা অভ্রান্ত হইয়া থাকে।"

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে যে, মুখ দেখিয়া মানুষকে

৩৩

বুঝিতে পারা যায়। এটা সাধারণ কথা। যাঁহাদের এ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আছে বা যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন, তাঁহারা লোকের মুখ দেখিয়া অনেক কথাই বলিতে পারেন। বলাইবাবুও সুপ্রসিদ্ধ চরিত্রজ্ঞানবেত্তা পণ্ডিত ল্যাবেটারের কথা বলিতে গিয়া লিখিতেছেন—"ল্যাবেটারের ন্যায় যাহাদিগের চরিত্র-পরীক্ষার জ্ঞান তীক্ষ্ণ আছে, তাহারা *প্রথম সাক্ষাতে অপরিচিত ব্যক্তিদের যথার্থ প্রকৃতি নির্ণয়* করেন।"

বলাইবাবুর এই ভূমিকা তথ্যপূর্ণ। তিনি ইহার মধ্যে হস্তরেখা-বিচার বিদ্যা ও ফ্রেনোলজি বা মস্তিষ্কগঠনতত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন।

ভূমিকার শেষে বলাইবাবু বলিতেছেন—"মুখ ও দেহের দ্বারা যে চরিত্র জানা যায়, ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু গুরুতর চরিত্রব্যঞ্জক লক্ষণ অবগত হওয়া সুকঠিন। ল্যাবেটার স্বীয় আকৃতি-তত্ত্বে বিজ্ঞানবিদের ন্যায় আলোচনা করেন নাই। যদি কেহ বুদ্ধিতত্ত্ববেত্তা গলের ন্যায় কিম্বা জীবদেহতত্ত্বদর্শী ওয়েলের ন্যায় পরিশ্রম, অসাধারণ বুদ্ধি ও ক্ষমতা সহকারে আকৃতি-তত্ত্বের প্রতি যত্নশীল হন, তাহা হইলে মানবগণ অনেক নূতন জ্ঞান লাভ করিবেন।.........ল্যাবেটারের ন্যায় চিত্রিত মূর্তি সংগ্রহ করিতে তাঁহাকে ক্লেশানুভব করিতে হইবে না। কারণ তিনি ভাশ্চিত্র-বিদ্যা বা ফটোগ্র্যাফি দ্বারা বর্তমান লোকদিগের চিত্র অক্লেশে প্রাপ্ত হইতে পারেন এবং যে সকল ব্যক্তি বহুকাল গত হইয়াছেন, তাহাদের স্থিত চিত্রপটের অনুরূপ লইতে পারেন।"

ভূমিকার শেষে বলাইবাবু আমাদের দেশে বহুদিন হইতে পুরুষ ও স্ত্রী লক্ষণমূলক যে সামুদ্রিক শাস্ত্র বর্তমান আছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই উদ্ধৃতাংশ তিনি শব্দকল্পদ্রুমের "সামুদ্রকম্" শব্দ ব্যাখ্যা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন*।

'বিলাপলহরী'

বলাই বাবুর রচিত প্রথম গ্রন্থ "বিলাপলহরী" পুস্তকখানি ১২৭৪ সনে প্রকাশিত হয়। ডিমাই বার পেজী আকারে ১৩ পৃষ্ঠায় ইহা সমাপ্ত।

---

* [illegible]

পুস্তকখানি রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে, বলাই বাবুর তৃতীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শ্যামলাল সেন মহাশয়ের নিকট জানিতে পারা গেল যে, বলাই বাবুর প্রথম পুত্রের মৃত্যু-উপলক্ষে "বিলাপলহরী" রচিত হয়। বলাই বাবুর এই পুত্রটির নাম নসীরাম সেন। দশ বৎসর বয়সে, ইংরেজী ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বালকটির মৃত্যু হয়। পুত্র-বিয়োগে বলাই বাবু খুবই কাতর হইয়া পড়েন। মনের শান্তির জন্য তিনি সাহিত্য-সেবায় মনোনিবেশ করেন। তাহারই ফল—এই "বিলাপলহরী" গ্রন্থ।

বলাই বাবুর একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় ছিল। হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া, তিনি নিজেই সমাগত রোগিগণের চিকিৎসা করিতেন। ঔষধ-বিতরণ-কালে বলাইবাবুর পুত্র প্রায়ই উপস্থিত থাকিত এবং পিতার কার্যে সাধ্যমতে সাহায্য করিত। গ্রন্থ-মধ্যে ইহার আভাস আছে। অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"প্রাতঃকাল হ'লে তুমি ওরে বাপধন।
দ্বার খুলে কর তুমি মধুরালাপন॥

* * *

ঔষধের তরে লোক এখনি আসিবে।
তৃষিত চাতক মত তাহারা রহিবে॥
তাহাদের কষ্ট আমি, হেরিতে নারিব।
উঠ বাবা, কিবা আর তোমায় বলিব॥

* * *

ইহার মধ্যেতে তুমি ঔষধ আনিতে।
কোনদিন রোগীদের, তুমি জিজ্ঞাসিতে॥
কিরূপেতে ছিলে কাল বলহ সবাই।
ঔষধেতে উপকার, কিছু হয় নাই॥
রীতিমত চলো তুমি, ব্যবস্থা যেমন।
কোনমতে অত্যাচার না হয় কখন॥" পৃঃ ৫, ৬

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য পুস্তকখানি মুদ্রিত হয়। নিম্নে গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

‘বিলাপলহরী’ গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্র

“বিলাপলহরী।

শ্রীবলাইচাঁদ সেন কর্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা

হিন্দু প্রেসে মুদ্রিত।

আহিরী টোলা ৯২ নং বাটী।

বিনা মূল্যে বিতরীত

সন ১২৭৪ সাল”

“বিলাপলহরী” পুস্তকখানি দুষ্প্রাপ্য এবং ইহার আকার ক্ষুদ্র। সমগ্র গ্রন্থখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

“বিলাপলহরী

সুজন দেশেতে কোন, বণিক্ সুজন।
ধনে মানে কুলে শীলে, শ্রেষ্ঠ সেই জন॥
একমাত্র বংশধর, পুত্র ছিল তার।
অকালে কালের করে, সে হলো সংহার॥
মনের দুঃখেতে সাধু, রহে অনুক্ষণ।
দুই চক্ষে বহে জল, নাহি নিবারণ॥
বিষয় বিভবে তার, নাহি কোন সুখ।
দুঃখের কারণে তার, সদা ম্লান মুখ॥
এমন সময় তার, বন্ধু কোন জন।
হেরিতে তাহারে সেই, করে আগমন॥
হেরিলেক প্রিয়বরে, বিরলে বসিয়া।
রহিয়াছে হেট মাথে, গালে হাত দিয়া॥
বণিকের হেন দশা, করে নিরীক্ষণ।
সুমধুর বচনেতে, করে আলাপন॥

কি কারণে হেন দশা, হইল তোমার।
গীত বাদ্য হাস্যরব, কেন নাহি আর॥
কিসের কারণে তব, আঁখি ছল ছল।
কিসের কারণে তব, দেহে নাহি বল॥
কিসের কারণে শাস্ত্র, নাহি আলাপন।
কিসের কারণে একা, রহ সর্বক্ষণ॥
প্রকাশিয়া গুপ্ত কথা, করহ বর্ণন।
শুনিয়া হইবে মম, চরিতার্থ মন॥
শুনিয়া বন্ধুর কথা, বণিক্ সুধীর।
এস বন্ধু মিষ্ট বাক্যে, কহে ধীর ধীর॥
বহু দিন দেখি নাই, তোমার বদন।
বহু দিন তব কথা, করি না শ্রবণ॥
বলিতে বিদীর্ণ বুক, না সরে বচন।
বংশধর পুত্র মম, হয়েছে নিধন॥
শোকজ্বরে জর জর, শরীর হয়েছে।
পূর্বমত জ্ঞান বুদ্ধি, আর কি রয়েছে॥
সুখরূপ জ্যোতি আর, নাহিক এখন।
দুখরূপ তমঘন, করে আচ্ছাদন॥
বিকল হয়েছে মন, নাহি রয় স্থির।
শোকানলে পুড়ে সদা, হতেছে অস্থির॥
চতুর্দিক্ অন্ধকার, না হেরে তাহায়।
মনোময় পুত্র রূপ, সতত ধেয়ায়॥
দিন দিন তনু মম, হইতেছে ক্ষীণ।
পূর্বমত বাহুবলে, হইয়াছি হীন॥
মনোদুঃখে রহি একা, না করি প্রকাশ।
বেঁচে থাকিবার তরে, নাহি করি আশ॥
বলিতে বলিতে, শোক-সরোবর তার।
পাড় ভেঙ্গে উথলিয়া, উঠে পুনর্বার॥

এস বাপ একবার, করি দরশন।
কি করিছ কোথা আছ, বলহ এখন॥
বল দেখি কে তোমার, দিতেছে ওদন।
কার কাছে আছ তুমি, করিয়া শয়ন॥
কার কাছে কর তুমি, বিদ্যা অধ্যয়ন।
কার কাছে খেলা তুমি, কর বাপধন॥
কার সঙ্গে কর তুমি, হাস্য পরিহাস!
কার কাছে বস্ত্র পরি, মিটাতেছ আশ॥
কার কাছে স্নান কর, ওরে নীলমণি।
কার কাছে মনোদুঃখ বল যাদুমণি॥
কার কাছে কর তুমি, লেখনী শোধন।
কার সঙ্গে ব্যায়ামেতে, প্রফুল্লিত মন॥
কার ঘর আলো করে, আছ চাঁদমুখ।
কার সুখে সুখী তুমি, কার দুঃখে দুখ॥
না হেরিয়া তব মুখ, বুক ফেটে যায়।
হরিষে বিষাদ মোর, কে করিল হায়॥
ওহে বন্ধু হিতকথা, করহ শ্রবণ।
ক্ষান্ত হও ধৈর্য ধর, সম্বর ক্রন্দন॥
শরীরেতে রোগ হলে, অসুখী যেমন।
শারীরিক তত্ত্বে আছে, সত্য নিরূপণ॥
ধর্ম মোক্ষ প্রদায়িনী, সুবর্ণনিকর।
তাহার নিকটে যদি, রাখ ততঃপর॥
সুন্দর সুরভি ফুল, করিলে বর্ষণ।
যার গন্ধে আমোদিত, হয় ত্রিভুবন॥
মধুর সঙ্গীত রব, আর বীণাধ্বনি।
বিরক্ত হইয়া উঠে, শুনিলে তখনি॥
গজেন্দ্রগামিনী ধনী, হৃদি বিমোহিনী।
সরোজনয়নী ধনী, সুভাষভাষিণী॥

রূপসী রমণী আর, নাহি ধরাতলে।
যারে হেরে মুনিদের মন যায় টলে॥
এমন রূপসী যদি, করে আলিঙ্গন।
স্পর্শ সুখ অনুভব, না হয় তখন॥
খাবার দ্রব্যের নাম, করিলে শ্রবণ।
মুখ হতে লাল সদা, হয় নিঃসরণ॥
সুস্বাদ সুগন্ধি দ্রব্য, করে আয়োজন।
তাহার সুমুখে দেখ, করিয়া স্থাপন॥
খাইতে অনিচ্ছা দেখে, অসুখ বর্ধন।
কিছুতেই নাহি হয়, সন্তোষিত মন॥
মিছে খেদে দেহ নষ্ট, কেন কর ভাই।
চির দিন খেদ করি, যদি তারে পাই॥
আগুনেতে পুড়ে মরি, যদি তারে পাই।
সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিই, যদি তারে পাই॥
পর্বত উপাড়ে ফেলি, যদি তারে পাই।
স্বীয় প্রাণ দান করি, যদি তারে পাই॥
অমোঘ ঈশ্বর আজ্ঞা, কে করে লঙ্ঘন।
কার সাধ্য পারে তারে, করিতে রক্ষণ॥
স্থির হও ধৈর্য ধর, করহ শ্রবণ।
পুনরায় হবে তব, বিশিষ্ট নন্দন॥
আমি তো ভুলিতে চাই, ভুলে নাহি মন।
যখন তখন তারে, করয় স্মরণ॥
তার গুণ আলোচন, করে অনুক্ষণ।
শুনিতে তাহার বাক্য, ইচ্ছা সর্বক্ষণ॥
প্রাতঃকাল হলে তুমি, ওরে বাপধন।
দ্বার খুলে কর তুমি, মধুরালাপন॥
উঠ বাবা রাত নাই, কাকে করে ধ্বনি।
প্রাতঃকর্ম সেরে শীঘ্র, এসহ আপনি॥

ঔষধের তরে লোক, এখনি আসিবে।
তৃষিত চাতক মত, তাহারা রহিবে॥
তাহাদের কষ্ট আমি, হেরিতে নারিব।
উঠ বাবা কিবা আর, তোমায় বলিব॥
শুনিয়া তোমার কথা, উঠিয়া তখন।
প্রাতঃকর্ম শীঘ্র করি, করে সমাপন॥
বাহিরেতে এসে শীঘ্র, খুলে দিয়া ঘর।
সংবাদের পত্র পাঠ, করি তারপর॥
ইহার মধ্যেতে তুমি, ঔষধ আনিতে।
কোন দিন রোগীদের, তুমি জিজ্ঞাসিতে
কিরূপেতে কল্য ছিলে, বলহ সবাই।
ঔষধেতে উপকার, কিছু হয় নাই॥
রীতিমত চলো তুমি, ব্যবস্থা যেমন।
কোন মতে অত্যাচার, না হয় কখন॥
একদা বলিলে তুমি, ওরে বাপধন।
পিতা তুমি সকলেরে, কর নিমন্ত্রণ॥
বহুদিন দেখি নাই, তব প্রিয়গণে।
চরিতার্থ হব আমি, হেরিয়া নয়নে॥
শুনিয়া তোমার কথা, করিলাম স্থির।
পরদিন নিমন্ত্রণ, হইল বাহির॥
রাত্রিকালে সকলের, হলো আগমন।
উপস্থিত তুমি তথা, ছিলে যে তখন॥
সেই শেষ ভোজন, করিয়া বাপধন।
জনমের মত নিলে, বিদায় গ্রহণ॥
অসুস্থ শরীর মোর, হইত যখন।
অস্থির হইতে তুমি, করিয়া শ্রবণ॥
সুধাইতে তুমি মোরে, ওরে নীলমণি।
যথার্থ পীড়িত কি না, বলহ আপনি॥

আমার কাছেতে বাপ, করিয়া গোপন।
কিছুই তো হয় নাই, না কর চিন্তন॥
এখন আমায় আর, জিজ্ঞাসা কে করে।
দেখনা তোমার তরে, চক্ষে জল ঝরে॥
যে ব্যথা পেয়েছি আমি, জন্মে না ভুলিব।
কে আছে এখন আর, কারে বা বলিব॥
কার্য স্থান হতে দেরী, হইত যখন।
কভু না করিতে তুমি, শয্যাতে শয়ন॥
গৃহেতে আইলে তুমি, কহিতে বচন।
বল বাবা এত দেরী, হলো কি কারণ॥
তোমার তরেতে আমি, না করি শয়ন।
বিবেচনা তোমার কি, নাহিক এখন॥
আজ হতে কাল তুমি, শীঘ্রই আসিবে।
না হলে তোমার তরে, কে আর জাগিবে॥
আর না জাগিতে হবে, কহিবে বচন।
চিরকাল নিদ্রা যাবে, না হবে চেতন॥
অন্ন বিদ্যা ঔষধ, করেছি বিতরণ।
তাতেই কি এইরূপ, হয়েছে ঘটন॥
বলিতে বিদীর্ণ বুক, না সরে বচন।
বংশধর পুত্র মোর, হয়েছে নিধন॥
দান আদি শুভ কর্ম, করিলে কখন।
গোপনেতে সদা তাহা, করিবে রক্ষণ॥
শোকাবেগে তাহা তুমি, করেছ প্রকাশ।
দোষ না ধরিবে কেহ, করি এই আশ॥
তোমাপেক্ষা শতগুণে, শ্রেষ্ঠ কতজন।
ধর্ম কর্মে রত তারা, ছিল সর্বক্ষণ॥
কালের বিচিত্র গতি, ভেবে উঠা ভার।
পৃথ্বী দান করে কারু, মরেছে কুমার॥

কোথা গেল দুর্যোধন, কুরু অধিপতি।
কোথা তার ভাই বন্ধু, কর্ণ মহামতি॥
অযোধ্যার রামচন্দ্র, কোথায় এখন।
কোথা গেল কালিদাস, কবির ভূষণ॥
কালেতে জনম সব, কালেতে নিধন।
এই কাল শেষ কালে, হইবে নিধন॥
স্থির হও ধৈর্য ধর, করহ শ্রবণ॥
পুনরায় হবে তব, বিশিষ্ট নন্দন॥
হারে ওরে ধর্ম দেখি, বিচার কেমন।
কি দোষেতে হেন ধনে, করিলি হরণ॥
যদিস্যাৎ করিয়াছি, পাপ সমুদয়।
পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত, অনুতাপ হয়॥
যথা ধর্ম তথা জয়, সকলেতে কয়।
কিন্তু মোর ভাগ্যে দেখি, বিপরীত হয়॥
দেখ আসি ওরে বাপ, মোর দুঃখ যত।
তব লাগি হাহাকার, করিতেছি কত॥
মনে ছিল সুখে যাবে, মোর শেষ দশা।
বিধি বাধ সেধে মোরে, করিল নির্ভর্সা॥
দেখ তব বস্ত্র কত, রয়েছে হেথায়।
দেখ তব শাল আর, কেবা দিবে গায়॥
দেখ হার বালা আংটী, আর কে পরিবে।
দেখ দেখি মোর কাছে, পরীক্ষা কে দিবে॥
দেখ না পণ্ডিত তব, এসে ফিরে যায়।
মানা কর ওরে বাপ, যাইতে তাহায়॥
তব কিবা রূপ ছিল, আমরি আমরি।
ইচ্ছা হয় দিবানিশি, দরশন করি॥
নবনীর দেহখানি, সুন্দর সুঠাম।
কিবা ভূরু কিবা আঁখি, সুন্দর বয়ান॥

মনে হলে তব রূপ, দুঃখে ভাসে বুক।
কিছুতেই শান্তি নহে, নাহি কোন সুখ ॥
কোনখানে নাহি যেতে, না বলে আমায়।
না বলে আমায় তুমি, গিয়াছ কোথায় ॥
একবার দেখা দেহ, রাখহ বচন।
জনমের মত নাই, করি নিরীক্ষণ ॥
কনক সমান ছিল, দেহের বরণ।
দেখিতে দেখিতে একি, হলো অনুক্ষণ ॥
কত কষ্টে করিয়াছি, লালন পালন।
একেবারে ভুলে গেছ, ওরে বাপধন ॥
কার কাছে উপদেশ, করিয়া গ্রহণ।
শত্রুদের করে গেলে, হরিষ বর্ধন ॥
দেখিতেছি তারা সবে, সুখী অতিশয়।
বিদ্রূপ করিছে কত, সহ্য নাহি হয় ॥
যখন হইবে তারা, আমার মতন।
কার নাম শোক, তারা বুঝিবে তখন ॥
তোমার প্রসূতি দেখ, তোমার খেদেতে।
হাহাকার করিতেছে, সদা দিন রেতে ॥
মুখে জল দেয় তার, নাহি কোন জন।
তোমা বিনা কেবা তার, তুষ্ট করে মন ॥
ওরে মৃত্যু তোর মৃত্যু কিছুতে কি নাই।
জলেতে কি আগুনেতে, মরনা বালাই ॥
দিবানিশি খাইতেছ, পেট নাহি পূরে।
এবাড়ী ওবাড়ী সদা, বেড়াতেছ ঘুরে ॥
যেখানেতে আছে পুত্র, তথায় যাইবে।
মনের যতেক ক্লেশ, তবে ত ঘুচিবে ॥
হেরিয়া হইবে পুত্রে, সন্তোষিত মন।
পায়ে ধরি ওরে মৃত্যু, কররে গ্রহণ ॥

বলিতে বিদীর্ণ বুক, না সরে বচন।
বংশধর পুত্র মোর, হয়েছে নিধন॥
বহুবিধ পুণ্য কর্ম, করিয়া সাধন।
পেয়েছ অমূল্য এই, শরীর রতন॥
জীবের প্রধান নর, সকলেতে বলে।
এমন জনম আর, নাহি ধরাতলে॥
যখন পতন হবে, এই দেহ তার।
তোমায় আমায় দেখা, কোথা হবে আর॥
ধন জন দারা সুত, গৃহ পরিবার।
সহায় সম্পদ্ গেলে, হয় আর বার॥
সন্তানের শোক-শেলে, হারাইয়া জ্ঞান।
মনোময় পুত্রে কেন, করিতেছ ধ্যান॥
যতই ভাবিবে শোক, হইবে অপার।
কোন ক্রমে নিদর্শন, নাহি পাবে তার॥
ইচ্ছা করি হেন দশা, কাহার না হয়।
শত্রু মিত্র আদি করি, যত জীবচয়॥
এ সময় অনুতাপে, আর কিবা হবে।
নিজ নিজ কর্ম ফল, ভোগ করে সবে॥
অতিশয় জ্ঞানী তুমি, বিদ্বান্ সুধীর।
নিয়ত চঞ্চল মন, করে রাখ স্থির॥
মৃত্যু যদি না থাকিত, ওহে মতিমান।
সতত অনিষ্ট হত, এতে নাহি আন॥
যতেক সম্বন্ধ-সূত্র, করিয়া ছেদন।
পাপেতে হইত লিপ্ত, সবাকার মন॥
মৃত্যু আছে তাই আছে, ধর্মে কর্মে মন।
নহিলে ঈশ্বরে কেবা, করিত ভজন॥
পত্নী হয়ে পতি সেবা, কেহ না করিত।
পুত্র হয়ে পিতৃআজ্ঞা, কেহ না বহিত॥

সতত বিভুরে তুমি, করহ স্মরণ।
পুনরায় হবে তব, বিশিষ্ট নন্দন॥
হে অনাথ, অখিল তারণ।
দীনবন্ধু দীননাথ, দুর্গতি হরণ॥
নিরাকার নির্বিকার, জগত-পালক।
সর্বাধার সর্বাশ্রয়, জগত-নাশক॥
পঞ্চভূতাতীত তুমি, ওহে দয়াময়।
গুণাতীত বুদ্ধ্যাতীত, গুণে গুণময়॥
দিয়ে ধন পুনরায়, করিলে হরণ।
দত্তহারি নাম নাথ, করিলে গ্রহণ॥
গুরুতর দণ্ড ভোগ, করি হায় হায়।
এ কোন বিচার তব, বলনা আমায়॥
তোমার ক্রোধেতে ব্যস্ত, আছি অতিশয়।
পিতা হয়ে পুত্র প্রতি, এত নিরদয়॥
কখন কি ভাবে তুমি, কাহারে বাড়াও।
কখন কি ভাবে তুমি, কাহারে কমাও॥
এই দেখি ধনে মানে, পূর্ণ কোন জন।
পুনরায় তার কিছু, নাহি নিদর্শন॥
এই দেখি দীনদুঃখী, অতি অভাজন।
পুনরায় দেখি তার, সৌভাগ্য বর্ধন॥
অবজ্ঞা যাহারে আমি, করি এই ক্ষণ।
পুনরায় তার কাছে, নত সর্বক্ষণ॥
বিচিত্র তোমার লীলা, বুঝে ওঠা ভার।
বুঝেছে তোমারে যেই, করিয়াছে সার॥
মায়া-মোহে বদ্ধ আমি, আছি সর্বক্ষণ।
জ্ঞান-জ্যোতি কৃপা করে, কর বিতরণ॥
যখন যেদিকে আমি, নয়ন ফিরাই।
তোমার অনন্ত শক্তি, দেখিবারে পাই॥

জগতেতে হেন লোক, করিনা দর্শন।
আছে শক্তি বালুকণা, করিতে সৃজন॥
জগতের যত বস্তু, কিছু না রহিবে।
শেষেতে তোমার সঙ্গে, সকলি মিশিবে॥
তোমার কাছেতে নাথ করি যোড় হাত।
ঘুচাও ঘুচাও নাথ, যতেক উৎপাত॥
তোমার কাছেতে নাথ, নাহি ভেদ জ্ঞান।
ছোট বড় যত আছে সকলে সমান॥
যখন নিদ্রার ঘোরে হই অচেতন।
তখনও তুমি সদা করহ রক্ষণ॥
ব্যাধির মন্দির বটে, এই দেহ ভার।
নাহি জানি কবে হবে, ইহার সংহার॥
আর ক্লেশ সহ্য আমি, করিতে না পারি।
পথের সম্বল নাই, ওহে অধিকারি॥
বেদের নাহিক শক্তি, বর্ণিতে তোমারে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সীমা, করিতে কে পারে॥
চন্দ্রতারা আদি করি, নক্ষত্র তপন।
আজ্ঞাধারী হয়ে তারা, রহে অনুক্ষণ॥
শীত গ্রীষ্ম আদি করি, যত ঋতুগণ।
তোমার আজ্ঞাতে তারা, করয় ভ্রমণ॥
এই করো দীননাথ, দয়ার আধার।
মৃত্যু কালে স্থান দিও, চরণে তোমার॥

সমাপ্ত”

বলাইবাবু বহুদিন ফলিত জ্যোতিষের চর্চা করিয়াছিলেন। গৃহে সমাগত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার এ বিষয়ে সময়ে সময়ে আলোচনা হইত। অবৈতনিক ভাবে তিনি কোষ্ঠীবিচার ও কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতেন।

'রুষীয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'

বলাইচাঁদ সেন প্রণীত "রুষীয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" পুস্তকখানি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা ডিমাই আটপেজী আকারে ৩৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এবং কলিকাতার পদ্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। পুস্তকের প্রচ্ছদ-পত্রে প্রকাশ সালের পর "Gratis" শব্দ মুদ্রিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা অনুমান হয়, এই গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। নিম্নে প্রচ্ছদ-পত্রের একটি নকল প্রদত্ত হইল—

"Brief Survey
of the
History of Russia
by
Bully Chund Sain
Author of
Belap Lohory, and Kolkie Pooran
Calcutta
Printed by
Pran Kristo Dutt at the Podya Prokash
Press 1869
Gratis
All rights Reserved."

গ্রন্থকার ভগবান্‌কে এই গ্রন্থ অর্পণ করিয়া "গ্রন্থার্পণ" নামে যে কয়েক পংক্তি লিখিয়াছেন, তাহা পাঠে জানা যায় যে, তিনি বাল্যকাল হইতে নানা প্রকার রোগ ও বিপদে আক্রান্ত হন। সেই পংক্তি কয়টি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"গ্রন্থার্পণ।

হে করুণাসিন্ধু বিশ্বপতে হরে! ভবদীয় করুণা গুণেই এখনও জীবন ধারণ করিতেছি। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া বিবিধ রোগাক্রান্ত, এমন

কি অন্ধ পর্যন্ত হইয়াছিলাম। কেবল আপনার অনুগ্রহেই চক্ষুষ্মান হইয়াছি। বাল্যকালে জাহ্নবী-জলে অবগাহন কালে যখন সলিলমগ্ন হই, তখনও আপনি এই অকৃতজ্ঞ পাপীকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। আবার যৎকালীন জ্বর-রোগাক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষুপ্রায় হইয়াছিলাম, তৎকালেও ভবদীয় কৃপাগুণে এই দীনহীনকে নীরোগ করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন, আমার শরীর ও প্রাণ আপনারই কৃপাধীন, অতএব এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আপনাতেই অর্পণ করিলাম।

কলিকাতা বেণিয়াটোলা ইষ্ট্রীট নং ৯৭ শকাব্দ ১৭৯১	ভবদীয় অকৃতজ্ঞ পুত্র শ্রীবলাইচাঁদ সেন"

জ্ঞানচন্দ্রিকা

১২৬৭ সালে (১৮৬০ খৃঃ) "জ্ঞানচন্দ্রিকা" বাহির হয়। ইহা মাসিক পত্রিকা। বলাইচাঁদ সেন মহাশয় এই পত্রিকার অধ্যক্ষ ও সম্পাদক ছিলেন।

রয়্যাল আট পেজী আকারে আট পৃষ্ঠায় প্রত্যেক সংখ্যা সমাপ্ত। প্রত্যেক সংখ্যা দুই কলমে বিভক্ত। জ্ঞানচন্দ্রিকায় গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকার রচনাই বাহির হইত। প্রত্যেক সংখ্যার মূল্য /০ আনা হিসাবে নির্ধারিত ছিল।

এই পত্রিকার দুইজন সহকারী সম্পাদক ছিলেন,। ইহা ৬ষ্ঠ সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদ-পাঠে জানিতে পারা যায়—

"শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল চন্দ্র ও শ্রীযুক্ত বাবু নীলমাধব বসু এই দুই মহাত্মা জ্ঞানচন্দ্রিকার মান্যসূচক সহকারী সম্পাদক হইয়াছেন।"

এই রসিকলাল চন্দ্র মহাশয় সুবর্ণবণিক্-কুলোদ্ভব এবং বটতলার একজন সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা ছিলেন। এই পত্রিকা "গরাণহাটা ষ্ট্রীটে ৯২ নম্বর ভবনে এ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ান যন্ত্রে শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত" হইত।

পত্রিকার শীর্ষদেশে মুদ্রিত "জ্ঞানচন্দ্রিকার" নীচে "কৃষ্ণাগ্রজ পত্রিকা" মুদ্রিত হইয়াছে। সম্ভবত কৃষ্ণের অগ্রজ বলাই বিধায় এই পত্রিকার "কৃষ্ণাগ্রজ পত্রিকা" নাম দেওয়া হইয়াছে।

'জ্ঞানচন্দ্রিকার' আলোচনা

৫ম সংখ্যার প্রথম দুই পৃষ্ঠা (৩৩ ও ৩৪ পৃঃ) ও শেষের দুই পৃষ্ঠা (৩৯ ও ৪০ পৃঃ) সংগৃহীত হইয়াছে। মধ্যের চারি পৃষ্ঠা (৩৫-৩৮ পৃঃ) পাওয়া যায় নাই। এই সংখ্যার প্রথমেই "জ্ঞান" নামে একটি প্রবন্ধ আছে। ইহা পূর্বপ্রকাশিত অংশের শেষ। সম্পাদকীয় রচনা বলিয়া মনে হয়। প্রবন্ধটির শেষের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"পরন্তু বিজ্ঞ বুধবর্গ জ্ঞানকে দ্বিবিধ প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন যথা বিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান। বহু শাস্ত্রাধ্যয়নে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে বিজ্ঞান বলা যায়। অপিচ যে জ্ঞান-সহায়তায় সেই তারক ব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারা যায় সেই জ্ঞানই সম্যক্ প্রকারে মহৎ। তাহার নাম তত্ত্বজ্ঞান। বিজ্ঞানের প্রযোজকতায় তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। তৎকারণ এই যে বিজ্ঞান দ্বারা মানস নির্মল ও পবিত্র হয় সুতরাং সেই পরমোপকারী জগচ্চিন্তামণির তত্ত্ব নির্ধারণের কোন ব্যাঘাত থাকে না। তত্ত্বজ্ঞানীরা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের একমাত্র কারণ স্বরূপ বিশ্বকারণকে স্মরণ করিয়া সর্ব কর্মই সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে শক্য হয়েন।"

প্রবন্ধটির পরেই "স্বভাব" নামে একটি কবিতা আছে। ইহার পরে আরও দুইটি কবিতা আছে। একটির নাম "পয়ার", অপরটির নাম "কৃষ্ণাগ্রজ ছন্দ"—শেষোক্ত কবিতার অংশ খণ্ডিত। ৩৯ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে অন্যতম সহকারী সম্পাদক রসিকলাল চন্দ্র মহাশয়ের একটি কবিতার শেষাংশ আছে। রসিকবাবুও যে একজন কবি ছিলেন, তাহা তাঁহার কবিতাংশ পাঠে বুঝিতে পারা যায়। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল—

"থাকেনাক মান যাহে থাকেনাক মান।
দুঃখের আধার নহে সুখের নিদান॥

পদে পদে বিপদের আকর যে পদ।
তাহারে ভাবিছে সদা সুখের সুপদ॥
যেইরূপ কারাবাসে কারাবাসিগণ।
দিন দিন ক্রমে দিন করিয়া হরণ॥
কারার যাতনা আর যাতনা বলিয়া।
বারেক না মনে করে ভ্রমেও ভুলিয়া॥
একেবারে ভুলে যায় খুলে যায় মন।
ইহারাও হইয়াছে তাদের মতন॥
বহুদিন পরাধীন বাসে করি বাস।
মানসের ভাব ক্রমে হয়েছে বিকাশ॥
পরাধীন দুঃখে আর দুঃখবোধ নয়।
কারাবাসি মত সদা সুখের নিলয়॥
তা নহিলে হস্তাক্ষর পক্ক করিবারে।
দশম দ্বাদশ বর্ষ মধ্যে অনুসারে॥
মিছা ভণ্ড পরিশ্রম কেন এরা করে।
কিছুই বুঝিতে নারি মনের ভিতরে॥
কি কারণে বহিবারে অধীনতা ভার।
পরের দ্বারেতে করে চাকরী স্বীকার॥
মনুষ্য উচিত নাম পরিহার করি।
কেন বা বেড়ায় সদা প্রভুপদ ধরি॥
কেন বা তাদের দ্বারে করিছে ভ্রমণ।
লালায়িত হয়ে যেন কাকের মতন॥
কোনখানে কর্মখালি হইলে কখন।
কার মুখে একবার করিলে শ্রবণ॥
ঝাঁকে ঝাঁকে ঠিক যেন শকুনির দল।
ঝাঁকে আসে চারিদিক্ হইতে সকল॥
গোল করে কেহ কেহ কত বোল ছাড়ে
কেহ কেহ বেট্টার লেট্টার আনি ঝাড়ে॥

পাঠের প্রশংসা পত্র কেহ কেহ লোয়ে।
*　　　*　　　নিয়ে যায় বোয়ে॥"

"পত্রাধ্যক্ষ ও সম্পাদক শ্রীবলাইচাঁদ সেনস্য" স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন পাঠে জানিতে পারা যায় যে, এই পঞ্চম সংখ্যাখানি ১২৬৭ সালের "শারদীয়া পূজা"র পূর্ববর্তী সংখ্যা।

"এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা গুণগ্রাহক গ্রাহকমহোদয়গণকে সবিশেষ জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা অনুকম্পা প্রকাশ পূর্বক এই মাসিক পত্রের মূল্য শীঘ্র প্রদান করিবেন। যেহেতু শ্রীশ্রী৺শারদীয়া পূজা অতি নিকটবর্তী হইতেছে।"

৬ষ্ঠ সংখ্যার আটটি পাতাই পাওয়া গিয়াছে, তবে তাহা মাঝে মাঝে খণ্ডিত। ইহার প্রথমেই সাড়ে চারি কলমব্যাপী "বিদ্যা" নামক একটি গদ্য রচনা স্থান পাইয়াছে। ইহার পরে নিম্নলিখিত পদ্য ও গদ্য রচনাগুলি আছে—

১। পদ্য (ইহাতে সুস্থল নামক স্থানের রাজা তারাপতির কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।)

২। পদ্য (ক্রমশ প্রকাশ্য রচনা)

৩। প্রেরিত পত্র (পদ্য রচনা, শৈশব, বাল্য ও যৌবন এই তিন সময়ের বর্ণনামূলক)

৪। জীবের প্রতি উপদেশ (গদ্য রচনা, ইহা প্রেরিত পত্র)

৫। পদ্য (রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় রচিত, ইহাও প্রেরিত পত্রের অন্তর্গত)

৬। মাসিক সমাচার (ইহাতে দেশীয় ও বিদেশীয় তেরটি সমাচার আছে)

৭। বিজ্ঞাপন

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে আকৃতি-তত্ত্বে'র উল্লেখ

"আকৃতি-তত্ত্ব" সম্বন্ধে সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে (৫ই পৌষ ১২৭৮, ইং ১৯শে ডিসেম্বর ১৮৭১) নিম্নলিখিত সংবাদটি দেখিতে পাওয়া যায়—

"শ্রীযুক্ত বাবু বলাইচাঁদ সেন কর্তৃক প্রণীত 'আকৃতি-তত্ত্ব' নামক পুস্তকের একখণ্ড প্রাপ্ত হইয়া আমরা গ্রন্থকার সমীপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা পরে ইহার সমালোচনা করিব।"

সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে রচনা প্রকাশ

বলাই বাবু সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। উক্ত পত্রে তাঁহার অনেকগুলি কবিতা ও গান প্রকাশিত হয়।

নিম্নে দুইখানি গান ও একটি কবিতা উদ্ধৃত হইল—

গান

(১)

হরি, দীননাথ নাম করেছ ধারণ।
দীনে দয়া নাহি কর কি কারণ॥
অকৃতি সন্তান আমি, শুন ওহে বিশ্বস্বামী
নিজ গুণে কর কৃপা ওহে নিরঞ্জন।

(২)

অধম জনেরে কৃপা কর নারায়ণ।
তব গুণ গানে রত হই সর্বক্ষণ॥
আমি অতি দুরাচার
করি অতি পাপাচার,
নাম যে মন আমার
বুঝাই যে ক্ষণে ক্ষণ॥

ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুতে কবিতা রচনা

১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ শনিবার (২১শে জানুয়ারী ১৮৫৯) "সংবাদ প্রভাকর"-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় পরলোকগমন করেন। তাঁহার পরলোকগমনে বলাইবাবু নিম্নলিখিত কবিতাটি রচনা করেন। ইহা ১২৬৫ সালের ৩০শে মাঘের (১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৯) সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে প্রকাশিত হয়—

"সম্পাদক মহাশয় কি কহিব আর।
বর্ণনে বিদীর্ণ হয় হৃদয় আমার॥
একি একি পোড়া কথা, শুনি অকস্মাৎ।
বিনা মেঘে মাথে কে হানিল বজ্রাঘাত॥
ঈশ্বর ঈশ্বর না কি করেছে হরণ।
কে আর শিখাবে বল কবিতা রচন॥
কে আর কহিবে বল দেশের মঙ্গল।
রাজার প্রজার দোষ কে লিখিবে বল॥
ওহে ধর্ম কহ দেখি একি তোর ধর্ম।
ধর্ম হ'য়ে কেন তোর নিদারুণ কর্ম॥
জগতের সার কবি ছিল যেই জন।
কি দোষে হরণ তারে করিলি দুর্জন॥
ধরায় এমন কবি হবে নাক আর।
যার জন্যে ছেলে বুড়ো করে হাহাকার॥
কহিয়া মনের দুঃখ পূরিত বাসনা।
থাকিত আমার যদি অনন্ত রসনা॥"

বলাইচাঁদ সেনের স্মৃতিরক্ষার্থ দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা

বলাইবাবুর পরলোক গমনের পর তাঁহার পুত্রগণ পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ একটি দাতব্য আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয় স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্রেরাই ইহার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতেন। প্রায় ১০।১২ বৎসর এই ঔষধালয় পরিচালিত হইয়াছিল। আহিরীটোলাস্থ ২৮।১ নং হরঢোলের লেনে ইহা স্থাপিত ছিল। "যোগবল" মাসিক পত্রের সম্পাদক এবং কয়েকখানি আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ-রচয়িতা, সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ মহাশয় "বলাই স্বাস্থ্য-সদনের" ব্যবস্থাপক কবিরাজ ছিলেন।

কানাইলাল চন্দ্র

১২৪৪ সালের ৮ই আশ্বিন (ইং ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ, ২৩শে সেপ্টেম্বর) শনিবার ঝামাপুকুরের প্রসিদ্ধ চন্দ্র-বংশে কানাইলাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালাচাঁদ চন্দ্র ও পিতামহের নাম গোবিনচাঁদ চন্দ্র। কালাচাঁদ বাবুর উদয়চাঁদ নামে একটি কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন, তিনি অপুত্রক থাকায় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনাথকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন।

কালাচাঁদ বাবুর সর্বসমেত আট পুত্র। তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে কানাইলাল ও শ্রীনাথ নামে দুই পুত্র ও দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে শ্রীদাম, সুবলচাঁদ, মহেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, যোগীন্দ্রনাথ ও রাজেন্দ্রলাল নামে ছয় পুত্র হয়।

বিদ্যাশিক্ষা

কানাইলাল ৺গৌরমোহন আঢ্যের স্থাপিত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি বেশ শান্তশিষ্ট ও মেধাবী ছিলেন। বিদ্যালয়ের তৎকালীন শিক্ষকবর্গ তাঁহাকে ভালবাসিতেন। আপনার স্বভাবগুণে কানাইলাল সকলের প্রিয় ছিলেন।

শিক্ষকবর্গের প্রশংসাপত্র

ঐ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রোজারিও সাহেব (Pascal de Rozario) নিম্নলিখিত প্রশংসা করিয়াছেন—

"I have much pleasure in certifying the attainments and good conduct of Cany Loll Chunder who was student for the space of seven years at the Oriental Seminary, but under my immediate tuition for three years. I found him to be remarkably attentive, zealous and diligent in his studies. He possesses excellent parts and if he should prosecute his studies after his separation

from the school, he will in time become an ornament to the Hindu community.

Pascal de Rozario,
2nd January, 1856. First Asst. Master."

গৌরমোহন আঢ্যের বিদ্যালয়ে নয় বৎসর পাঠ সমাপন করিয়া তিনি হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে ভর্তি হন। ক্যাপ্টেন ডি এল্ রিচার্ডসন সাহেব সে সময়ে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। কানাইলাল সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন—

"Baboo Connoy Lall Chunder was I believe about nine years in the Oriental Seminary and has been about a year in the Hindu Metropolitan College. He has been attentive to his studies and has made a respectable progress in English literature.

D. L. Richardson,
Principal,
April 19th, 1857. Hindu Metropolitan College."

পঠদ্দশায় ভৈরবচন্দ্র আঢ্য (স্বর্গীয় গৌরমোহন আঢ্যের পুত্র) ও স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন।

কানাইলাল বৈষ্ণব-পরিবারভুক্ত ছিলেন। তাঁহার গৃহে নানা পূজা-পার্বণ ও ব্রতাদি উপলক্ষে পাঠ ও কথকতা হইত। এই পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনে কানাইলালের হৃদয়ে কৈশোরকাল হইতেই ধর্মভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

কর্মজীবনে কানাইলাল

তাঁহার পিতা কালাচাঁদ বাবু সওদাগরী অফিসের মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। পুত্রকেও তিনি নিজের কাজে সহকারিরূপে গ্রহণ করেন। ইহার পূর্বে তিনি কিছুদিনের জন্য ষ্টক ব্রোকার ছিলেন এবং সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক-বিক্রেতা থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোম্পানীতে কাজ করেন।

পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি Argenti Schilijwanty & Co.তে যোগদান করেন। নিজের কর্মদক্ষতা দেখাইয়া তিনি এই অফিসের কর্মচারী হন। ইহার পরে তিনি Williamson Brothers & Co.তে কর্ম করেন। তারপর এই অফিসের সমস্ত কাজের ভার George Henderson & Co.র উপর পড়িলে—তাহাতেও কাজ করেন। তাঁহার গুণে কর্মকর্তারা তাঁহাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরদিন, George Henderson & Co.এর বড় সাহেব তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত নদেরচাঁদ চন্দ্র মহাশয়কে নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখেন—

"Messrs. George Henderson & Co.
100 Clive Street,
Calcutta, March 8, 1909.

Dear Babu,

It is with the deepest regret that I know of the death of our old and valued friend, your father. You have my sincere sympathy in your loss.

Yours sincerely
W. R. Craik"

পারিবারিক বিবরণ

কানাইলাল জোড়াসাঁকোর হরনাথ মল্লিক মহাশয়ের মধ্যমা কন্যাকে বিবাহ করেন। পূর্ণচাঁদ, নদেরচাঁদ ও গোলকচাঁদ নামে তাঁহার তিন পুত্র হয়। ১৩১৫ সালের ২৩শে ফাল্গুন (ইং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই মার্চ) রবিবার কানাইলাল দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছিল।

বৈষ্ণব ধর্মে অনুরাগ

বহু পূর্বে চোরবাগানে "বিশ্ববৈষ্ণব সভা" নামে একটি ধর্মসভা ছিল। সুবর্ণবণিক্‌বংশীয় মনোমোহন দত্ত মহাশয় ইহার প্রতিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। ইনি কানাইলালের বন্ধু। ইঁহার সঙ্গে কানাইলাল

উক্ত সভায় ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিতে যাইতেন। সেইখানে তাঁহার সহিত প্রভুপাদ নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয়ের পরিচয় হয়। এই পরিচয়ের পর তিনি নিজগৃহে শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থের পাঠের ব্যবস্থা করেন। নীলকান্ত গোস্বামী, গোকুলচাঁদ গোস্বামী, শ্রীঅতুল-কৃষ্ণ গোস্বামী, মানসদাস বাবাজী, বৈষ্ণবচরণ কুণ্ডু প্রভৃতি ভাগবতগণ প্রতি সপ্তাহে তাঁহার গৃহে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। এই পাঠের সময় বাড়ীর লোক ব্যতীত বাহিরের বহুলোকের সমাগম হইত। মৃত্যুর ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব হইতেই কানাইলাল এইভাবে তাঁহার অবসরজীবন ধর্মালোচনায় অতিবাহিত করিতেন।

নীলকান্ত গোস্বামী মহোদয় সুপণ্ডিত ও সুব্যাখ্যাতা ছিলেন। তাঁহার ব্যাখ্যামুখে কানাইলাল যে সমস্ত ভাগবততত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন, তাহা তিনি ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। তাহার ফলে তাঁহার কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়।

'শ্রীশ্রী৺ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাদির অপ্রাকৃতত্ব স্থাপনা'

১৩০৩ সালে (১৮৯৬।৯৭ খৃষ্টাব্দ) কলিকাতার হেয়ার প্রেস হইতে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়।

গ্রন্থের ভূমিকায় কানাইলাল বলিতেছেন—"বিজাতীয় রাজশাসনে আমাদিগের ধর্ম কখন উন্নত হইবার সম্ভব নহে। এই কারণে আমাদিগের যে সকল ধর্মশাস্ত্র ও পুস্তক আছে, তাহা ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে; এবং যে সকল গ্রন্থ সচরাচর ব্যবহৃত হয় তাহারও অর্থ বুঝিতে না পারিয়া অনেকে অধ্যয়নের উপযুক্ত নহে কহিয়া থাকেন। এমন যে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ, যাহা বেদের পঞ্চমভাগ বলিতে পারা যায়, ও যাহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরম লীলা সকলের বর্ণনা আছে, তাহার গুহ্যভাব না বুঝিতে পারিয়া অনেকে সেই সকল লীলাকে অশ্লীল কহিয়া থাকেন। উত্তম ব্যাখ্যা ব্যতীত ভাগবতের সংশয় নিরাকরণের কোন উপায় নাই। আমার ভাগ্যক্রমে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী প্রভুকে পাইয়া

অনেক সংশয় বিনষ্ট হইয়াছে, এবং যে সকল বিষয় ভক্ত জ্ঞানীরা অশ্লীল ও পরিত্যাগযোগ্য কহিয়াছেন, সেই সকলের আধ্যাত্মিক ভাব ও শাস্ত্রের রহস্য প্রকাশ করিয়া তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্থাপনা দেখাইয়া দিয়াছেন। আমি কি সামান্য, পণ্ডিতগণেরা, যাঁহারা তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছেন সেই ব্যাখ্যা তাঁহাদিগেরও অঞ্জন স্বরূপ হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বস্ত্রহরণলীলা ও রাসলীলা, যাহা আমি তাঁহার প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, তাহা এত আশ্চর্য ও এত জ্ঞানপ্রদায়ক যে, অন্ধের নয়ন প্রাপ্তি বলিলে বলা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পাঠ সমাপ্তে, সকল ব্যাখ্যা স্মরণশক্তিতে রাখিতে পারা যায় না। যাহা যৎ-কিঞ্চিৎ স্মরণ ছিল তাহাই প্রকাশ করিলাম। এবং যাহা প্রকাশ হইল তাহা আত্মবন্ধুদিগের আনন্দের নিমিত্ত। অতএব যদ্যপি ইহার ছন্দ ও ভাষা পাঠের উপযুক্ত না হইয়া থাকে, ইহা স্মরণ করিতে হইবেক যে ইহা সাধারণের নিমিত্ত প্রকাশিত হয় নাই।"

পুস্তকখানিতে মূল্যের কোন উল্লেখ নাই—আত্মীয়-স্বজন ভাগবতগণের মধ্যে ইহা বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল।

সাত কি আট বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে, কানাইলালের পরলোক গমনের পর ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৫৮ ও ১২নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট হইতে সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক এস্ সি আঢ্য এণ্ড কোম্পানী ইহা প্রকাশ করেন। এ সংস্করণেও মূল্যের কোন উল্লেখ নাই। এবং এই সংস্করণে কানাইলালের আর একখানি পুস্তক (জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এবং উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ)এর সহিত একত্র করিয়া উহা প্রকাশিত হয়।

'শ্রীশ্রী৺ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাদির অপ্রাকৃতত্ব স্থাপনা' গ্রন্থের আলোচনা

'শ্রীশ্রী৺ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাদির অপ্রাকৃতত্ব স্থাপনা' গ্রন্থখানি ডিমাই ১২ পেজী আকারে ৪২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। গ্রন্থকার কানাইলাল চন্দ্র মহাশয় এই গ্রন্থের দুইটি অধ্যায়ে দুইটি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন,

একটি—'বস্ত্রহরণ; এ প্রাকৃত বস্ত্র নহে' এবং দ্বিতীয়টি—'রাসলীলা বিহার সম্বন্ধীয়'।

প্রথম অধ্যায়ে তিনি ব্রজগোপিকাগণের বস্ত্রহরণ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার বলিতেছেন—"তাঁহারা (অর্থাৎ গোপ-বালিকারা) অগ্রহায়ণ মাসের অতি প্রত্যূষে অরুণোদয়ে নিদ্রোত্থিত হইয়া পরস্পরে শ্রীযমুনার অতি শীতল জলে স্নান করত, বালুকানির্মিত কাত্যায়নী প্রতিমার পূজা, দিবসে হবিষ্যান্ন ও রাত্রিতে শয্যাত্যাগ পূর্বক ভূমিতে শয়ন করেন।" (পৃঃ ১) ব্রজজনজীবন শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার অভিলাষেই তাঁহাদের এই কঠোর ব্রত গ্রহণ। মন্ত্র তন্ত্র তাঁহারা বিশেষ কিছুই জানিতেন না। এস্থলে কানাইলাল বলিতেছেন—"কিন্তু কৃষ্ণপূজার মন্ত্র বড় আবশ্যক হয় না; নির্মল মন ও অনুরাগ তাহার মন্ত্র। পিতৃলোকেরা মন্ত্র অপেক্ষা করেন, কিন্তু দেবতারা মন্ত্র চাহেন না, কেবল মন চাহেন। গোস্বামী পাদেতে কহিয়াছেন যে, ভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণের আকর্ষণীয় মন্ত্র আর নাই; এই হেতু ইহা বলা যাইতে পারে যে, কৃষ্ণ পাইবার এমন সহজ উপায় আর নাই, এবং এমন কঠিনও আর নাই।" (পৃঃ ২) এই উপায় একাধারে সহজ ও কঠিন কেন, তাহা গ্রন্থকার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি এবং চিত্তকে স্থির করা, গ্রন্থকারের মতে, এই দুইটি অমোঘ উপায়েই গোপিকারা কৃষ্ণলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কাত্যায়নী-পূজা সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিতেছেন—"গোপবালিকারা ব্রতপ্রসঙ্গে কাত্যায়নী পূজা করিত। পূজা কাত্যায়নীর বটে, কিন্তু ধ্যান কৃষ্ণের উপর। কার্যতও তাহাই দেখা যায় যে, তাহাদের ব্রত উদ্‌যাপনের দিন তাহারা কাত্যায়নীর দেখা পাইল না, পরন্তু কৃষ্ণ আসিয়া তাহাদের বস্ত্রহরণ করত কৃষ্ণময়ী গোপবালিকাদিগের নয়ন-পথবর্তী হইলেন। বস্তুত যখন কোন কামনা করিয়া আমরা দেবদেবীর পূজা করি, তখন ইহা বুঝিতে হইবেক যে, সে পূজা দেবদেবীর নয়, আমরা সেই কামনার পূজা করিতেছি।" (পৃঃ ৩) গ্রন্থকারের এই উক্তির দ্বারা স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, তাঁহাদের এই কাত্যায়নী-পূজা কৃষ্ণ-পূজা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইখানে তিনি আরও বলিতেছেন—"গোপবালিকা-

দিগের আকাঙ্ক্ষা অতি উচ্চ। কৃষ্ণভক্তি নয়, কৃষ্ণদর্শন নহে—কৃষ্ণকে আলিঙ্গন।" (পৃঃ ৪)

গোপিকারা কৃষ্ণকে পতি-রূপে কামনা করিয়া কাত্যায়নী দেবীর পূজা করিতেন, তাহা তাঁহাদের কৃত নিম্নলিখিত স্তব হইতেই বুঝা যায়—

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ॥"

তাঁহাদের এই একাগ্র ভক্তি ও কামনার বলেই তাঁহারা পতিরূপে জগৎ-পতি শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন। এইভাবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"কৃষ্ণ সকলে পায় না, যে ভক্ত সেই পায়।" তবে তাঁহার মতে—"ভক্তির ও প্রেমের বিপরীত গতি; প্রাকৃত অবস্থায় চক্ষু উন্মীলন করিলে আমাদিগের দৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু অপ্রাকৃতে চক্ষু মুদিয়া গোপিকারা কৃষ্ণকে দর্শন করিতেন।" (পৃঃ ৫)

বস্ত্রহরণের সময়—"শ্রীকৃষ্ণেরও বয়ক্রম শৈশব-সীমা উত্তীর্ণ হয় নাই, এই নিমিত্ত কুমারীদিগের সহিত এই ক্রীড়া। বস্ত্রহরণের সময়ে তিনি চারিটি শিশু বালক সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ঐ বালকেরা এত শিশু যে, বস্ত্র পরিধান করিতে জানিতেন না।" (পৃঃ ৮)

এই চারিজনের নাম—দাম, সুদাম, বসুদাম ও কিঙ্কিনি। গ্রন্থকার ইঁহাদের স্বরূপ পরিচয় দিবার ব্যপদেশে বলিতেছেন—"ইহারা ভগবানের অন্তঃকরণের চারি অংশ। স্বাভাবিক আমাদিগের অন্তঃকরণ চারিভাগে বিভক্ত; চিত্ত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও মন। ... ... গোপবালিকাদিগের কঠোর ব্রতাচারে কৃষ্ণ তাহাদিগের এত বশীভূত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তঃকরণের চারি অংশকে পূর্ণ করিয়া, তিনি তথায় আগমন করত গোপিকাদিগের বস্ত্র লইয়া বৃক্ষে উঠিলেন, আর তাহাদিগকে ডাকিলেন যে তোমরা আমার নিকটে আসিয়া তোমাদিগের স্বীয় স্বীয় বস্ত্র দেখিয়া লও।" (পৃঃ ৮-৯) কিন্তু তখনও গোপিকাদিগের লজ্জা ছিল, তাই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানে বস্ত্রহীন অবস্থায় তাঁহার নিকট গিয়া স্বীয় স্বীয় বস্ত্র গ্রহণ করিতে পারেন নাই। গ্রন্থকার-উক্ত—"অপ্রাকৃত ভগবানের সহিত বিহারে আমাদিগের মায়া-আবরণ ত্যাগ না

হইলে কখন জীবাত্মার পরমাত্মাতে সংযোগ সম্ভবে না।"—খুবই সত্য কথা। বস্ত্রাদি ছিল গোপিকাদিগের মায়া-আবরণ, সেই মায়া-আবরণ ঘুচাইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মিলনের পথ খুলিয়া দিলেন, তারপর পুনরায় তাঁহাদিগকে বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া গৃহে যাইতে বলিলেন। এখানে গ্রন্থকার প্রশ্নোত্তরস্থলে কয়টি কথা বলিতেছেন—"এক্ষণে ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে গোপিকারা একবার আবরণ ত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণ প্রেমের কৃপাপাত্রী হইয়া কিরূপে আপন আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ও কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আবরণ ঘুচাইয়া পুনর্বার বাস সকল কেন প্রদান করিলেন। ইহার উত্তর এই যে, মায়া-বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া জীবাত্মা যদি পরমাত্মাতে সংযুক্ত হয় সে সংযোগে আর মায়া তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না।" (পৃঃ ১২)

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিকাদিগের যে আসক্তি তাহা তাঁহাদের অকপট ভক্তি ও নির্মল প্রেমেরই পরিচায়ক। এবং এই কারণেই কৃষ্ণও তাঁহাদের ভক্তি ও প্রেমে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ। গ্রন্থকার বলিতেছেন—"এ কাম নয়, এ প্রেম। দুইই এক বর্ণ বটে কিন্তু এক জাতি নহে। উহা জীবের উপর পতিত হইলে কাম, কৃষ্ণের উপর হইলে প্রেম। কাম এক স্থানে স্থায়ী নহেন, প্রেম কৃষ্ণ প্রতি লীন হইলে, প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই।" (পৃঃ ১৩)

অনেকের মনে হইতে পারে যে হেমন্তকালের প্রাতে শীতল জলে অবস্থান হেতু গোপিকাদিগের কষ্ট হইয়াছিল কিন্তু কোন কষ্টই তাঁহাদের হয় নাই—তাহা গ্রন্থকার যুক্তিসহ নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—"এমন কি যতক্ষণ তাহারা (অর্থাৎ গোপিকারা) সলিলনিমগ্না ছিল, তাহাতেও তাহাদিগের কোন ক্লেশ ছিল না, কেন না তাহারা কৃষ্ণদর্শনে যে পরিমাণে আনন্দ পাইয়াছিল, তাহাতে হেমন্তকালের প্রাতে শীতল জলে অবগাহন-জনিত কষ্টকে তাহাদের কষ্ট বলিয়া অনুভূত হয় নাই। আনন্দ ও দুঃখ দুইটি বিপরীত ভাব, যেমন জল ও অগ্নি। উভয়ের উভয়কে নষ্ট করিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু যিনি প্রবল হইবেন, তিনি তাঁহার বৈরীকে নাশ করিতে পারিবেন; যদি অগ্নির ভাগ অধিক হয়, জল শুষ্ক হইবে, কিম্বা জলের ভাগ অধিক হইলে, অগ্নিকে নির্বাণ করিবে।

এখানে কৃষ্ণদর্শনে গোপিকাদিগের এত অধিক সুখবোধ হইয়াছিল যে, তাহারা কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া জ্ঞান করে নাই।...আমরা যেমন সূর্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে আলোক ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাই না, তেমনি নিত্যানন্দের সম্মুখে থাকিলে আনন্দলাভই হইয়া থাকে।" (পৃঃ ১৫)

গোপিকারা আদর্শ ভক্তিমতী ছিলেন এবং ভক্তিযোগের সাধনায় তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধিলাভ করেন। তাই তাঁহারা মায়া ও লজ্জা ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাতে লীন হইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত এবং লীন হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের দীনভাব ঘুচে নাই। উদাহরণ স্বরূপে গ্রন্থকার কৃষ্ণভক্ত উদ্ধবের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন—"উদ্ধব মহাশয় ভগবানের একজন প্রধান সখা, আর যতদূর জ্ঞানী হইতে হয় তাহা ছিলেন, কিন্তু যখন কৃষ্ণ তাঁহাকে যোগ উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনি স্পষ্টই কহিয়াছিলেন যে, তিনি এরূপ উচ্চ উপদেশের যোগ্য পাত্র নহেন। অতএব ভগবানের কৃপাপাত্র হইলেই তাহাকে দীন ভাবাপন্ন হইতে হইবেক।" (পৃঃ ১৭)

ভক্তই একমাত্র ভক্তির দ্বারা ভগবানকে বাঁধিতে সমর্থ হয়। জাগতিক সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য তাঁহার বিরাট্ ও অনন্ত ঐশ্বর্যের নিকট ম্লান ও হীন হইয়া যায়। মানুষের নির্মল মন ও ঐকান্তিক ভক্তিই তাঁহাকে বাঁধিতে সমর্থ হয়। যতক্ষণ মানুষ সবল থাকে, ততক্ষণ সে তাঁহাকে ধরিতে পারে না। গ্রন্থকারও বলিতেছেন—"বল থাকিতে কৃষ্ণ পাইবার সম্ভব নাই। যখন মা যশোমতী (কৃষ্ণকে) বন্ধন করিবার আশা প্রায় ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন ভগবান্ দয়াভাবে মায়ের মনোরথ পূর্ণ করিয়া দামোদর নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।" (পৃঃ ১৮)

যশোমতী বাৎসল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিয়াছিলেন, কিন্তু পঞ্চ রসের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ—সেই মধুর রসের দ্বারা গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন—লজ্জা, মান, ভয় বিসর্জন দিয়া একান্তভাবে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন—ইহার ফলেই তাঁহাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ বাঁধা পড়েন। অধ্যায়-শেষে গ্রন্থকার ভক্ত-সাধক দরাফ্ খাঁর কৃষ্ণস্তুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও এক স্থানে গোপিকার প্রেমের কি সুন্দর অভিব্যক্তি রহিয়াছে—

"হে প্রভু তোমার সকল বৈভবই আছে, আমি তোমাকে কি উপহার দিয়া পূজিব, তাহা স্থির করিতে পারি না। কিন্তু আমি দেখি তোমার এক অভাব আছে। সে অভাব কি? তোমার মন। তোমার মন শ্রীবৃন্দাবনে গোপিকারা হরণ করিয়া লইয়াছে। অতএব আমার মন তোমাকে অর্পণ করি, তাহাই গ্রহণ কর।" (পৃঃ ১৮)

"শ্রীশ্রী৺ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাদির অপ্রাকৃতত্ব স্থাপনা" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে কানাইলাল চন্দ্র মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই ভাগের নাম—"রাসলীলা বিহার সম্বন্ধীয়"। শ্রীকৃষ্ণ অবতারে ভগবান্ যে সমস্ত লীলা করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই রাসলীলাই শ্রেষ্ঠলীলা কিন্তু সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য।

ভগবানের মহিমা ও মাধুর্য প্রকটিত হয়—এই লীলার মধ্য দিয়াই। সাধারণ জীব এই লীলার মধ্যেই তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারে। তাই লীলামুগ্ধ ভক্তেরা, তাঁহার ষড়ৈশ্বর্যময় মূর্তি না দেখিয়া, তাঁহাকে 'লীলাময় বিগ্রহ' রূপে দর্শন করেন। গোলোকের ঠাকুর নরলোকে আসিয়া তাঁহার সৃষ্ট নর ও পশুপক্ষীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া যে লীলা করেন, সেই লীলাই স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেয়—জীব তাঁহার কত আপনার। তাঁহার সহিত জীবের যে একটা মধুর ও নিকট সম্পর্ক আছে, তাহা এই লীলার মধ্যেই মূর্ত হইয়া উঠে। ভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র না হইলে, এই লীলা কেহ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না। তাই গোপবালকগণের সহিত তাঁহার গোষ্ঠলীলা দর্শন করিয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারও বিভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল। প্রাকৃত দেহ অবলম্বন করিয়া, সেই অপ্রাকৃত দেহী লীলার মধ্যে আপনাকে সহস্রদলে বিকশিত করিয়া তুলেন। ভক্ত ব্যতীত অন্য কেহ তাহার যথার্থ রস ও মাধুর্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না।

আলোচনার প্রারম্ভে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"ভগবানের আবির্ভাব যদিও লীলাবশত তত্রাচ অপ্রাকৃত। যদিও সগুণ কেন না লীলা হেতু রূপধারণ, কিন্তু প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহ নহে। মাংস, মূত্র, পুরীষ ও অস্থিতে যে দেহ, তাহা এ দেহ নহে। কেবল চৈতন্যময় পদার্থ, ভক্তের মনোরঞ্জন হেতু ভগবান্ দেহী হইয়া বহুবিধ লীলা করিয়াছেন।" (পৃঃ ২০)

গ্রন্থকারের মতে ইহা দ্বারা ভগবানের প্রাকৃত শরীরের কোন মতে স্থাপনা হইতে পারে না। ইহার কতকগুলি কারণ তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রথম কারণ—"আবির্ভাব-দেহ প্রাকৃত পুত্রের মত জন্ম নহে।" (পৃঃ ২০) এইখানে পাদ টীকায় গ্রন্থকার তাঁহার উক্তির সমর্থনকল্পে লিখিতেছেন—"৺ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব অতি আশ্চর্য। চতুর্ভুজ মূর্তি হইয়া উপস্থিত হইলেন, হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও বলয়। পরিধানে পীতবস্ত্র এবং গলদেশে বনমালা ও কৌস্তুভমণি শোভমান। কারাগারের প্রহরী সকলেই মায়ানিদ্রাতে অচেতন ইত্যাদি।"

দ্বিতীয় কারণ—"লীলা আদি সকলি অপ্রাকৃত। সঙ্কটাশূর বধ ইত্যাদি।"

তৃতীয় কারণ—"শ্রীশ্রীরাসলীলাতে অন্তর্ধান ও আবির্ভাব অপ্রাকৃত।"

চতুর্থ কারণ—একই সময়ে একই দেহ লইয়া বিভিন্ন স্থানে অবস্থান। "রাত্রিযোগে মাতা যশোমতী দেখিতেন, তাঁহার ক্রোড়ে তাঁহার গোপাল নিদ্রিত আছেন; কিন্তু রাধার সহিত ও গোপীমণ্ডলীর সহিত তিনি সমস্ত রাত্রি বিহার করিতেন।" (পৃঃ ২১)

পঞ্চম কারণ—"প্রাকৃত হইলে তাঁহার দেহ পাঞ্চভৌতিক হইত এবং আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন শূন্য হইত না; কিন্তু যাহা অপ্রাকৃত বস্তু, কেবল ঘন চৈতন্য ও তেজোময়, তাহা এ সকলের অতীত।" ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গ্রন্থকার বলিতেছেন—"অপ্রাকৃত দেহেতে কোন কর্ম করিতে হয় না, কিন্তু কর্মের ফল হয়। যেমন দুর্বাসার পারণে লোক দেখাইবার জন্য এক কণামাত্র খাইয়া ভগবান্ ক্ষুধা তৃপ্তি করিলেন ও ষাট হাজার ঋষিদের ক্ষুধা তৃপ্তি করাইলেন।" (পৃঃ ২১)

আরও অনেকগুলি কারণ গ্রন্থকার দিয়াছেন। সকল গুলিরই প্রতিপাদ্য বিষয়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহ অপ্রাকৃত। তিনি যোগেশ্বরেশ্বর, যে শরীর ইচ্ছা তিনি তাহাই ধারণ করিতে পারিতেন এবং যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানেই প্রবেশ করিতে পারিতেন। সাধারণ মানুষ বা প্রাকৃত দেহীর পক্ষে ইহা সম্ভবে না।

এক স্থানে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"এই যে জড় দেহ, ইহা আহার ব্যতীত রক্ষা পায় না ; কিন্তু অপ্রাকৃত দেহ যাহা কেবল চৈতন্যঘন মাত্র, সে দেহ রক্ষা হেতু আহারের আবশ্যক হয় না। কারণ উহার ধ্বংস নাই ; তবে যে ভগবানের আহারাদি ও দেহের বাহ্যিক কার্যের বিষয় পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে, তাহা সকলই ইন্দ্রজালের ন্যায়।

......যদিও তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত ও নিগুর্ণ, তত্রাচ দেহের কার্যসকল না হইলে, লীলা স্থাপন হয় না।" (পৃঃ ২৫) এই লীলা স্থাপনের জন্যই অনেক স্থলে, অপ্রাকৃত দেহী হইলেও প্রাকৃত দেহীর ন্যায় ভগবান্‌কে কার্য করিতে হইয়াছে।

তাঁহার রাসলীলা সম্বন্ধে একটি কথা আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের অংশ ও কণা ও রাধিকা তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি। গোপিকা ও রাধার সহিত রাসে বিহার অর্থে তাঁহার নিজেরই অংশকণা ও শক্তির সহিত তিনি বিহার করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়াদির আকাঙ্ক্ষা-বিরহিত হইয়া কৃষ্ণ রাসমণ্ডলে বিহার করিয়াছেন এবং যে প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া গোপিকারা কৃষ্ণের সহিত রাসে সম্মিলিত হন, সে প্রেম কামগন্ধহীন। তাই তাঁহারা বিভূতি, বীর্য, শ্রী, যশ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ষড়ৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ কৃষ্ণের সহিত লীলা করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন।

গ্রন্থকার অন্য একস্থলে শ্রীমতী রাধিকাকে মহাভাবের মূর্তিরূপে বর্ণনা উপলক্ষে একটি সুন্দর পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন —"একদা নারদ ভগবানের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে বড় কে? তিনি জানিতেন যে ভগবান্ বারম্বার কহিয়াছেন যে সৃষ্টির মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু এখানে নারদের প্রতারণা দেখ ; ভগবান্ যদ্যপি আপনাকে বড় বলেন, তাহা হইলে আত্মশ্লাঘা হয় ; যদ্যপি অন্য কাহাকে কহেন, তাহা হইলে মিথ্যা হয়। এখানে উভয় সঙ্কট ; কিন্তু ভগবানের নিকট নারদের চাতুরী খাটিল না। তিনি কহিলেন, হে নারদ এই ব্রহ্মাণ্ডে তুমিই বড়। নারদ কহিলেন, সে কি প্রভু, আমি আপনার সম্মুখে কিরূপে বড় হইলাম বুঝিতে পারিলাম না ; অনুগ্রহপূর্বক আমাকে বুঝাইয়া দিন। ভগবান্ কহিলেন দেখ নারদ,

প্রথমত আমি দেখিতেছি যে, সকল অপেক্ষা পৃথিবীকে বড় বলিতে হইবেক, যে হেতু পৃথিবীর ভিতরে আমরা সকলে আছি, কিন্তু পৃথিবী আবার সমুদ্রেতে বেষ্টিত। অতএব তাহা অপেক্ষা সমুদ্র বড়। সমুদ্রকে অগস্ত্য মুনি পান করিয়াছিলেন, তবে সমুদ্র হইতে অগস্ত্য বড়। ঐ অগস্ত্য আকাশমণ্ডলে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্রের মধ্যে গণনীয়; সুতরাং অগস্ত্য অপেক্ষা আকাশ বড়। ঐ আকাশ আমার বামন অবতারে একটি পায়ের দ্বারা আমি ব্যাপ্ত করিয়াছিলাম, তবে আকাশ অপেক্ষা আমাকে বড় বলিয়া মানিতে হইবেক। কিন্তু আমি এত বড় হইয়াও তোমার হৃদয়ে অবস্থিত আছি। এই বিচারে তোমাকে আমি বড় বলিলাম।" (পৃঃ ২৮, ২৯) ইহার পর গ্রন্থকার সিদ্ধান্ত করিতেছেন—"ভগবান্ ভক্তির বশ। এই ভক্তিরস গাঢ় হইলে উহাকে প্রেম কহে, যাহা প্রেমরস অপেক্ষা গাঢ় তাহা ভাবরস। ভাবরস গাঢ় হইলে তাহাকে মহাভাব কহে। এই মহাভাবের মূর্তি শ্রীরাধা। এই রসে গঠিত মূর্তিতে কোন অসার পদার্থ নাই ও তাঁহার লীলা ৺ভগবানের সহিত কেবল সম্ভবে, যে হেতু তিনি সাক্ষাৎ আনন্দের মূর্তি।" পৃঃ ২৯, ৩০

ব্রজগোপিকাদিগের প্রকৃত কাম্য কি ছিল, তাহা ভক্ত গ্রন্থকার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"তাহারা সকলে সমর্থ অর্থাৎ কেবল কৃষ্ণ সুখে সুখী। সময়ে সময়ে কৃষ্ণ-বিরহে তাহারা জীবন্মৃত হইয়া থাকিত, তত্রাচ কৃষ্ণের সুখের কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য না ঘটে তাহাদের তদ্বিষয়ে যত্ন থাকিত।......কৃষ্ণ-বিরহ তাহাদিগের সহ্য হইল না।" পৃঃ ৩১

"মহারাসে যতগুলি গোপী কৃষ্ণকেও ততগুলি মূর্তি ধারণ করিতে হইল। ইহার কারণ কি? গাঢ় প্রেম। এ প্রেম আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আশা মিটিত না এবং গোপিকাদিগেরও আশা মিটিত না।...... শ্রীমতীর রস আস্বাদনে বাঞ্ছা পূর্ণ হয় না ও ভগবানেরও রস প্রদান করিয়া আশা পূর্ণ হয় না।" (পৃঃ ৩১, ৩২) শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিয়া রাধার আশা মেটে না, আবার রাধিকাকে দেখিয়া দেখিয়াও কৃষ্ণের নয়ন পরিতৃপ্ত হয় না। তাই ভক্ত মহাকবি তাঁহার অমর লেখনী-মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"জনম অবধি হাম্ রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু
তবু হিয়া জুড়ান না গেল।"

রাধাকৃষ্ণের এ প্রেম সুরনরবাঞ্ছিত; এমন কি "শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবীও বৃন্দাবন-বিহার দেখিয়া ঐ সুখ প্রার্থনা করিয়াছিলেন।" পৃঃ ৩৫

গ্রন্থকার পরিশেষে বলিতেছেন—"রাসলীলার আধ্যাত্মিক ভাব এই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের পরমাত্মা, তাঁহার শক্তি কিম্বা প্রকৃতি আমাদিগের জীবাত্মা। ইঁহারা দুইজনে আমাদিগের অন্তরে বিরাজ করেন। পরমাত্মা জীবের সুখদুঃখের ভাগী নন; কিন্তু জীবাত্মা জীবের সুখদুঃখ-ভাগী। যদিও জীবাত্মা পরমাত্মার শক্তি, তত্রাচ জীবের সুখদুঃখ ভোগের নিমিত্ত তিনি স্বামিছাড়া ও পরম সুখে বঞ্চিত। জীবের স্বামীতে তাঁহার স্বামিবোধ, জীবের পুত্রে তাঁহার পুত্রবোধ, জীবের সুখে তিনি আনন্দিত ও জীবের দুঃখে তিনি দুঃখিত।...জীব যদ্যপি তাঁহার জীবাত্মাকে সংযত করিয়া পরমাত্মাতে নিক্ষেপ করিতে পারেন, তাহার ফলে দেখিবেন যে, মহারাসেতে যেমন মহা আনন্দের উদ্ভব হইয়াছিল, ইহাতেও তাহা হইবেক। পরমাত্মার সহিত বিহারে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই অধিকার আছে। স্থূল শরীরে স্ত্রী ও পুরুষ ভেদ আছে, কিন্তু আত্মাতে সে ভেদাভেদ নাই।" পৃঃ ৩৯, ৪০

'জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ'

কানাইলাল বাবুর দ্বিতীয় গ্রন্থ "জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ।" এ পুস্তকখানিও ছোট। ডিমাই ১২ পেজী আকারে ত্রিশ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহা ব্যতীত চারিপৃষ্ঠাব্যাপী একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। এ গ্রন্থেরও দুইটি সংস্করণ হয়। দ্বিতীয় সংস্করণের একখানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকাটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"ভূমিকা

"জীব অনাদিকাল অবধি অদৃষ্টবশত ভ্রমণ করিতেছে, এবং অশীতি লক্ষ যোনি গমনাগমন করিয়া অবশেষে মনুষ্য-জন্ম প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য-জন্ম অতি

দুর্লভ জন্ম, কারণ এ জন্ম ব্যতীত অন্য কোন নিকৃষ্ট জন্মে ভগবানকে জানিবার উপায় নাই। পশ্বাদি প্রভৃতির আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন পরিতৃপ্ত হইলেই তাহারা সুখী। মনুষ্যেরও এ চারি ধর্ম আছে এবং উহাদিগের সন্তোষের নিমিত্ত বিচরণ করিতে হয় বটে, কিন্তু কেবল ঐ চারিটি যাহাদিগের লক্ষ্য তাহাদিগের মনুষ্য কহা যাইতে পারে না।

'আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্।

ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষো ধর্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥'

"অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এ চারি গুণ মনুষ্যতে ও পশুতেও আছে। মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতার কারণ এই যে, তিনি ভগবৎ ধর্ম আচরণ করিতে পারেন। অতএব যে মনুষ্য-ধর্মবর্জিত, তাহাকে পশুর সমান গণনা করা যাইতে পারে।

"দেব নারায়ণ আত্মশক্তি—মায়া দ্বারা বৃক্ষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি শরীর সৃষ্টি করিয়া তাঁহার চিত্ত সন্তুষ্ট হইল না। কারণ তিনি দেখিলেন যে, এই সকল শরীরে ব্রহ্মদর্শন হইতে পারিবে না। যেমন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহার পুত্রদিগের কষ্ট নিবারণের ও সুখ বৃদ্ধির জন্য ধনসঞ্চয় দ্বারা আয় বৃদ্ধি করিয়া সন্তোষ লাভ করেন, সেইরূপ অবশেষে ভগবান্ মনুষ্য শরীর সৃষ্টি করিয়া তাঁহার চিত্ত সন্তুষ্ট হইল যেহেতু এই মনুষ্য জন্ম মুক্তির দ্বার ও সেই দ্বার সর্বদা খোলা থাকিবে। কিন্তু ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্রেরা যদ্যপি সুচরিত্র না হয়, সেই ধন কোন মতে রক্ষা হয় না, সেইরূপ জীব যদ্যপি কেবল বিষয়াসক্ত থাকেন ও ইন্দ্রিয় পুষ্টির নিমিত্ত অন্ধ হইয়া বিচরণ করেন, সেই মুক্তির দ্বার তাহার নয়নগোচর হয় না, এবং প্রতিফল এই হয় যে নিশ্চয় পুনঃ অধঃপতন। অতএব এই সংসারে মনুষ্যের সর্বপ্রকারে ধর্মানুশীলন করা উচিত; কিন্তু এই অনুশীলনের দুই পন্থা আছে, এক যোগ ও আর এক ভক্তি। প্রাচীন যোগী, ঋষি ও মুনিগণ যোগের দ্বারা তাঁহাদিগের জীবন সার্থক করিয়াছেন। কিন্তু কালপ্রভাবে এক্ষণে দুইই সম্যক্রূপে সমাধা হইতে পারে না। স্থিরমনাঃ ব্যক্তি বড় বিরল এবং সম্পূর্ণ মনঃস্থির ও মায়া ত্যাগ না হইলেও যোগে কিরূপে আরূঢ় হওয়া যাইতে পারে।

"ভক্তি পক্ষে, শ্রীচৈতন্য দেব স্বয়ং কহিয়াছেন যে যথার্থ ভক্তি দূরে থাকুক্, ভক্তির আভাসমাত্রও আমার মিলিল না। ইহার অভিপ্রায় কি? অভিপ্রায় এই যে, তিনি স্বয়ং অবতার হইয়াও যখন এ উক্তি করিয়াছেন, তখন সাধারণ জীবের পক্ষে অসাধ্য, তাহার সন্দেহ কি; কিন্তু তত্রাচ কলির জীবের পক্ষে তিনি এক প্রকার উপায় রচনা করিয়া দিয়াছেন। কিয়দংশে মনঃস্থির করিয়া জীব যদ্যপি ৺ভগবানের নামের শরণাগত হয়, ও সদ্গুরুর সঙ্গ লাভ করিতে পারে, তবে তাহাদিগের পরিশ্রম নিশ্চয়ই সফল হইবেক।

"যোগ ও ভক্তি সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা, বর্ণনা ও তুলনা মহামহা পণ্ডিতের পক্ষেও অসাধ্য, যেহেতু এই দুই প্রকরণ ৺ভগবানের শ্রীমন্দিরের পথ। আমি যদিও এ বর্ণনে কোনমতে উপযুক্ত নহি, তথাপি এ পুস্তকে ভগবানের নামের উল্লেখ থাকাতে পাঠকগণের পরিত্যজ্য হইতে পারিবে না; যেমন কোন হীন জাতির অগ্নি হইতে হোমাদির অগ্নি প্রতিষ্ঠা হইলে কোন দোষ পোঁছে না, কিম্বা সেই অগ্নি অনায়াসে স্বুবর্ণকে খাদ হইতে শোধন করিতে পারে, তেমনি জ্ঞানী কিম্বা যথাযোগ্য ব্যক্তিদিগের এ পুস্তক পাঠে তাঁহাদিগের স্বার্থলাভ ব্যতীত কোন হানি হইবে না।"

'জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ' গ্রন্থে মূল্যের কোন উল্লেখ নাই। সম্ভবত ইহা বিতরণের জন্যই প্রকাশিত হয়।

'জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—উহাদের পরস্পর সম্বন্ধ' গ্রন্থের আলোচনা

আলোচ্য গ্রন্থের আলোচনা-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার কানাইলাল বাবু বলিতেছেন—"এই পৃথিবীমণ্ডলে আমাদিগের সকলেরই বাঞ্ছা যে দুঃখের পরিহার হইয়া সুখ উৎপন্ন হউক এবং এই অভিলাষে জীবসকল নানা দিকে বিচরণ ও নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছে।" (পৃঃ ১) এই সুখ নানা প্রকার। কিন্তু গ্রন্থকারের মতে অধিকাংশ লোকই দিবারাত্র কেবল শারীরিক সুখের জন্যই চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই চেষ্টার ফলে, তাঁহারা অনেক সময় সুখের সন্ধান ত পান না, অধিকন্তু বিপথে পরিচালিত হইয়া দুঃখকেই বরণ

করেন। প্রসঙ্গত গ্রন্থকার এখানে পারমার্থিক সুখের কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন—"যে পর্যন্ত কায়িক ও মানসিক কার্য ৺ভগবানে নিযুক্ত না হয়, সে পর্যন্ত দুঃখের শেষ কিম্বা সুখের কোন সম্ভব নাই।" (পৃঃ ১) ইঁহার কারণ নির্দেশে তিনি লিখিতেছেন—"৺ভগবান্ আনন্দের মূর্তি এবং ঈশ্বর ব্যতীত আনন্দ আর কোথাও নাই। যেমন সূর্যকে সম্মুখে রাখিলে আলোক ও পশ্চাদ্ভাগে রাখিলে অন্ধকার, সেই মত ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া ভাবনা করিলে সুখ ও পশ্চাতে রাখিলে অর্থাৎ বিস্মৃত হইলে অপার দুঃখ। পৃথিবীর মধ্যে তিনিই একমাত্র ঐকান্তিক সুখের প্রতিমা।"
পৃঃ ১, ২

তাঁহার এই উক্তির সমর্থন কল্পে তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটি অনুবাদ সহ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

অর্থাৎ আমাকে সকলে জানে যে আমি ব্রহ্ম, কিন্তু আমি তাহা নহি, আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, যেমন রৌদ্রের প্রতিষ্ঠা সূর্য, আমি মোক্ষ, শাশ্বতধর্ম এবং ঐকান্তিক সুখের প্রতিমা। আমি পরমানন্দ স্বরূপ।" পৃঃ ২

পূর্বকথিত 'কায়িক ও মানসিক কার্য ৺ভগবানে নিযুক্ত' করিতে হইলে, ভগবানে নিষ্ঠা প্রয়োজন। এখন কথা হইতেছে, জীবের ভগবানের উপর এই নিষ্ঠা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে। গ্রন্থকার বলিতেছেন—"পূর্ব-জন্মার্জিত পুণ্য ব্যতীত উহা (অর্থাৎ ঐ নিষ্ঠা) ঘটিতে পারে না।" তারপর তিনি বলিতেছেন—"যদ্যপি তাহাই হয় তবে সকল জীব কি প্রকারে সাধনায় নিযুক্ত হইতে পারে? যাহাদিগের পূর্বজন্মের পুণ্য-সঞ্চয় নাই, তবে কি তাহারা উপায়হীন?" ইহার মীমাংসার্থ তিনি লিখিয়াছেন—"তাহাদিগের সাধুসঙ্গ ব্যতীত আর গতি নাই। এই সাধুসঙ্গে তাহাদিগের পাপ ধ্বংস হইয়া তাহাদিগের মন ভগবানে ধাবিত হইবেক। এবং প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা জ্ঞানমার্গে ও কেহ বা ভক্তিমার্গে অবস্থিতি করিবেক ও এইরূপ অবস্থিতিতে পাপ ধ্বংস করিয়া চিত্তের মলিনত্বশূন্য হইয়া উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইবেক।" (পঃ ২, ৩) এই মলিনত্ববিহীন, উজ্জ্বল চিত্তই যোগ-সাধনার

প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। এবং এই ক্ষেত্রেই ভগবানের প্রতিবিম্ব উত্তমরূপে প্রতিফলিত হয়।

এইবার গ্রন্থকার 'যোগ ও ভক্তি' কাহাকে বলে, তাহার অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন মহাশয়কে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতে নানাবিধ যোগের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ৩য় ও ৫ম অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ-শিক্ষা বিস্তারপূর্বক কহিয়াছেন। উহার সংক্ষেপ মর্ম এই যে, সন্ন্যাস ধর্ম আশ্রয় করিয়া বিবেকী হওয়া, বাহ্য বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, চিত্ত সংযত করিয়া ভগবানে নিক্ষেপ, প্রাণায়ামে অর্থাৎ পূরক, কুম্ভক, রেচক, অল্প আহার ও অল্প নিদ্রা, শীত-গ্রীষ্ম সমানভাবে ভোগ, কর্মে নির্লিপ্ত থাকা এবং সকল আত্মাকে আপনার আত্মসমান জ্ঞান করা।" পৃঃ ৩

ভক্তির পরিচয় দিতে ও ব্যাখা করিতে যাইয়া গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে নিম্নলিখিত দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম।
আনুকূল্যে সর্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণানুশীলন॥
এই শুদ্ধ ভক্তি ইহা হইতে প্রেম হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়॥"

মধ্যলীলা, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

"সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু

"অর্থাৎ অন্য বাসনা বিসর্জন করত একাগ্র মনে ও বিশুদ্ধভাবে ইন্দ্রিয় ব্যাপার দ্বারা যে কৃষ্ণানুশীলন তাহাই ভক্তি বলিয়া কথিত।"

তারপর গ্রন্থকার বলিতেছেন—"জ্ঞান-উপদেশ না হইলে ভক্তির উদ্রেক হইতে পারে না এবং ভক্তি না হইলে আত্মজ্ঞানে কোন ফল দর্শায় না।" তাঁহার এই উক্তির সমর্থন-কল্পে তিনি পরম ভাগবত শুকদেব গোস্বামীর নিম্নলিখিত বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"শ্রেয়ঃ স্থতিং ভক্তিমুদস্ত তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে !
তেষামসৌ ক্লেশন এব শিষ্যতে
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং ॥"

"অর্থাৎ হে বিভো! যে সাধকগণ সর্বপ্রকার কল্যাণকর ভক্তি বিসর্জন পূর্বক কেবলমাত্র শুষ্ক জ্ঞানপ্রাপ্তির আশায় ক্লেশ করে, তুষাবঘাতীয় ন্যায়ে (যাহারা তণ্ডুল-প্রাপ্তির অভিলাষে ধান্য ত্যাগ পূর্বক তুষ আঘাত করে) তাহাদিগের ফললাভ হয় না, কেবল পরিশ্রমই সার হয়।"

জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—"প্রারম্ভে দুই-ই একস্থান হইতে উৎপন্ন, কিন্তু পরে স্বতন্ত্র হইয়া যায়। যেমন গঙ্গা ও যমুনার স্রোত একত্র মিলিত হইয়া আসিয়া ত্রিবেণীতে পৃথক্ পৃথক্ দিকে গমন করে, সেইমত এই দুই প্রকরণও এক সূত্রে উৎপন্ন হইয়া কিঞ্চিৎ পরেই ভিন্ন ভিন্ন মার্গে চলিয়া যায়। কারণ, জ্ঞানযোগে নির্বিশেষ ব্রহ্মের ভাবনা। ভক্তিযোগে সাকার মূর্তির উপাসনা। জ্ঞানযোগের উদ্দেশ্য মুক্তি, কিন্তু ভক্তিযোগের উদ্দেশ্য ভগবানের নিত্য দাস হওয়া, যাহা কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় মধ্যলীলার* প্রথম অধ্যায়ে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

'ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতম্ ॥'

অর্থাৎ হে নাথ! কবে আমি ভবদীয় ঐকান্তিক নিত্য দাস হইয়া অখিল কামনা বিসর্জনপূর্বক আপনার আদেশানুবর্তী হইয়া আজীবন আত্মাকে আনন্দিত করিব।" পৃঃ ১০, ১১

জ্ঞান ও ভক্তিপন্থীরা যদি তাঁহাদের সাধনা-কালে কোনরূপে ভ্রষ্ট হন, তবে তাঁহাদের গতি কিরূপ হইবে, গ্রন্থকার তাহার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

* শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের।

"জ্ঞানযোগীরা ভ্রষ্ট হইলে তাঁহারা ধনাঢ্য ব্যক্তির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ইহা কথিত আছে যে, ইহারা যদ্যপি পুনর্জন্মে পুনর্যোগে নিযুক্ত হয়, তাহাদিগকে নূতন করিয়া প্রবর্ত হইতে হয়। ভক্তিযোগে এরূপ নহে। ভক্তিযোগে ভ্রষ্ট হইলে, পুনরায় নূতন প্রণালীতে আরম্ভ করিতে হয় না। যে স্থানে তাহারা ভ্রষ্ট হয়, পুনর্জন্মে সেই স্থান হইতে অগ্রসর হইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা ভরত রাজার উপাখ্যানে দৃষ্টি করি। হরিণ ভাবিয়া তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে হরিণ-জন্ম হইল বটে, কিন্তু হরিণ শ্রদ্ধা করিয়া হরিকথা শুনিত ও পরজন্মে মৌনব্রতী হইয়া সতত ভগবৎ-চিন্তাতে মগ্ন থাকিত। এমন কি এক দিবস তাহার ভ্রাতৃবধূগণ কুপিত হইয়া তাহাকে দগ্ধ অন্ন প্রদান করিলে পর জড়ভরতকে সেই অন্নই ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া দিতে হইল। ভগবান্ দগ্ধ অন্ন অমৃত করিয়া আপনি ভোজন করিলেন এবং অবশিষ্ট প্রসাদ ভরতের নিমিত্ত রাখিলেন।"
পৃঃ ৯

অতঃপর গ্রন্থকার জ্ঞান ও ভক্তি—এই উভয় যোগের সাধনার ফল এবং উহাদের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন—"জ্ঞানযোগের চরম অবস্থা নির্বিকল্প সমাধি, যাহাতে যে ধ্যান করিতেছে ও যাহাকে ধ্যান করিতেছে—এই দুইয়ের ভিন্ন জ্ঞান থাকে না, সুতরাং ধ্যায়ক ধ্যেয়ের সহিত আনন্দে সম্মিলিত হইয়া যায়। কিন্তু ভক্তগণ ভক্তিযোগে চিত্ততে ভগবানের মূর্তি অহরহ দর্শন করে এবং যদ্যপিও সেই পরিমাণে আনন্দে বিভোর হয়, তথাপি ধ্যায়ক ভৃত্য এবং ধ্যেয় প্রভু এ জ্ঞান সতত থাকে। যাহার যে ভাব, (অর্থাৎ শান্ত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর) সে সেইরূপে ভগবানকে দর্শন করে কিম্বা চাক্ষুষ ভোগ করে।"

"জ্ঞানযোগে শান্তভাব ব্যতীত আর অন্য কোন ভাবের ভাবনা হইতে পারে না। কিন্তু ভক্তিযোগে এই পাঁচ প্রকারে ভোগ হয়। এক্ষণে ইহা দেখা যায় যে, কেহ বা সুধার সহিত মিলিত হইয়া সুখের পরাকাষ্ঠা বোধ করে এবং কেহ বা সুধা পান করিয়া ঐকান্তিক সুখে নিমগ্ন হয়। ইহার মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অধিক সুখী, তাহা আমাদের বুদ্ধির গোচর হয় না।"

"অদ্বৈতবাদীরা ঈশ্বরকে অতি দূর হইতে দর্শন করেন, সুতরাং তাঁহার আকার বিশেষরূপে দেখিতে পান না, কেবল তাঁহাদের নয়নে ঈশ্বর কোন তেজোময় পদার্থের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। কিন্তু ভক্তিযোগে তিনি ভক্তদিগের অনেক নিকটে মূর্তিমান হইয়া দর্শন দেন ও প্রেমেতে গোপিকাদিগকে মূর্তিমান হইয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।"

"জ্ঞানযোগের সাধনে, মনের ও শরীরের উভয়েরই কষ্ট। মনের কষ্ট এই যে, ইন্দ্রিয়কে সংযত করা এবং শরীরের কষ্ট এই যে, প্রাণায়াম (পূরক, কুম্ভক ও রেচক), জিতাসন ও জিতশ্বাস হইয়া উপবিষ্ট হওয়া প্রভৃতি।"

"জ্ঞানযোগে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে মনের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। কেবল শারীরিক প্রকরণ, এ নিমিত্ত তাহাকে হঠযোগ কহে। কিন্তু ভক্তিযোগে প্রথমাবধি কেবল মনের নিষ্ঠা এবং আপনাকে তৃণ অপেক্ষা লঘু বোধ করিতে হয়। জ্ঞানেতে একক না থাকিলে যোগেতে নিষ্ঠা হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে উদ্ধব সংবাদে অবধৌত ব্রাহ্মণ কহিয়াছিলেন যে, তিনি ইহা এক কুমারী হইতে শিক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু ভক্তিযোগে এরূপ নহে। ভক্তমণ্ডলীর সমভিব্যাহারে থাকিলে ভক্তির উদ্দীপন হয় এবং কেবল মনের আনন্দ বৃদ্ধি হইতে থাকে।"

"জ্ঞানযোগে ইন্দ্রিয়কে অনেক কষ্ট করিয়া সংযত করিতে হয়। ভক্তিতেও কষ্ট বটে, কিন্তু ইন্দ্রিয় ক্রমে ক্রমে আপনি বশ হইয়া আইসে। যেমন অঙ্গার অগ্নি সংলগ্ন করাইলে যে পরিমাণে অগ্নির বৃদ্ধি, সেই পরিমাণে অঙ্গারের মলিনত্ব নাশ ; তেমনি ভক্তের হৃদয়ে যে পরিমাণে ভক্তির উদয় হইবেক, সেই পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের হ্রাস দেখা যাইবেক।" পৃঃ ১১-১৩

জ্ঞানযোগী ও ভক্তিযোগী—এই উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা হইতে দুইটি ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার ইহার একটা সুমীমাংসা করিয়াছেন—

"অর্জুন মহাশয় যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি অনন্যচিত্তে ও যথার্থ অনুরাগে তোমার উপাসনা করে, এবং যে ব্যক্তি অব্যক্ত পরম ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? তাহাতে তিনি (অর্থাৎ ভগবান্) স্পষ্টই কহিয়াছিলেন—

'ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥'

অর্থাৎ যিনি কেবল আমারই প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়া, আমাতেই অনুরক্ত থাকেন, এবং পরম শ্রদ্ধার সহিত আমাকে আরাধনা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয়ত ভগবান্ সকল যোগ অর্জুন মহাশয়কে উপদেশ করিয়া অবশেষে কহিলেন যে,—

'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥'

অর্থাৎ তুমি আমাতে চিত্ত অর্পণ কর, আমাকে ভজনা কর, আমার উদ্দেশে যজ্ঞাচরণ কর, আমাকে প্রণাম কর, তুমি আমার প্রিয় সেই হেতু আমি সত্যই কহিতেছি ঐরূপ করিলে তুমি আমাকে লাভ করিতে পারিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে চতুর্দশ অধ্যায়ে ভগবান্ উদ্ধব মহাশয়কে কহিয়াছিলেন—

'ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা॥'

অর্থাৎ হে উদ্ধব, মদ্বিষয়ক দৃঢ়া ভক্তি আমাকে যে প্রকার বশীভূত করে, কি যোগ, কি সাংখ্য, কি ধর্ম, কি বেদাধ্যয়ন, কি তপ, কি দান, কিছুতেই সেরূপ পারে না।"

গ্রন্থকার কানাইলাল বাবুর মতে—"ভক্ত তাঁহার (অর্থাৎ ভগবানের) কিঞ্চিৎ বিশেষ কৃপাপাত্র ও ভক্তিমিশ্রিত না হইলে যোগসাধন হইতে পারে না।" (পৃঃ ১৫) এই উক্তির সমর্থন-কল্পে তিনি বলিতেছেন—"যোগীরা নিয়মাবলী অনুসারে তাঁহাকে ভাবনা ও প্রাণায়ামের দ্বারা মূলাধার হইতে সহস্রারে লইবার চেষ্টা করিতে থাকেন; কিন্তু এই প্রকরণে অনেকের এমত ভ্রম উপস্থিত হয় যে, তাহারা আত্মার সহিত ভগবান্‌কে সমজ্ঞান করে সুতরাং বিস্মৃত হইয়া যায় যে, সেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ এক বৃহৎ অগ্নিরাশি ও আমাদিগের আত্মা এক কণা মাত্র। যদিও 'তত্ত্বমসি' জ্ঞান, বেদ, ও শাস্ত্রসম্মত বটে, তত্রাচ বৃহৎ অগ্নিতে ও কণাতে যে পরিমাণে ভেদাভেদ আছে, তাহা সতত ধারণা রাখিতে হইবেক।"

(পৃঃ ১৫) গ্রন্থকার ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের মধ্যে যে পার্থক্য দেখাইতেছেন, তাহা যে কতদূর যুক্তিসিদ্ধ ও সঙ্গত তাহা বলা কঠিন। ভক্তি-সাধনার শেষে যে আনন্দলাভ হয়, জ্ঞান-সাধনার সম্প্রাপ্তি-শেষে যে সে আনন্দ পাওয়া যায় না, তাহাই বা কিরূপে বলা যায়? সাধনার পথ দুইটি বিভিন্ন হইলেও, শেষে উভয় পথের পথিকই একই স্থানে সমুপস্থিত হন। তবে জ্ঞান-সাধনার পথ কঠিন এবং ভক্তি-সাধনার পথ সরল। পার্থক্য এইখানে।

ভক্ত কিরূপ অহঙ্কারশূন্য, দীন, সহ্যগুণশালী ও অক্রোধী হয়, তাঁহাদের ক্ষমাশীল ও মাৎসর্যবিহীন ভাব কিরূপে লোকসমাজকে মুগ্ধ করে, তাহা গ্রন্থকার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকটিত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"শ্রীরূপ ও সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের দুই প্রধান ভক্ত এবং মহা পণ্ডিত, কিন্তু তাঁহারা এত মাৎসর্যবিহীন হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন যে, যখন দ্রাবিড়ের একজন পণ্ডিত আসিয়া তাঁহাদের সহিত বিচার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা যদিও জ্ঞাত ছিলেন যে সেই পণ্ডিত কোন মতে তাঁহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন, তত্রাচ পরাভবপত্রে তাঁহারা স্বাক্ষর করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু যখন ঐ ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ঐ পত্র দেখাইলেন, তখন জীব তাঁহার সহিত বিচার করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এ ব্যাপার শ্রীরূপের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি কহিলেন যে ভক্তের এ ধর্ম নহে ও জীব এখনও শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিবার যোগ্য পাত্র হন নাই।" পৃঃ ১৯

গ্রন্থশেষে কানাইলাল বাবু ভক্ত ও যোগী উভয়ের তুলনা করিয়া লিখিতেছেন—"ভক্তের ও যোগীর মন যে সমভাব নহে, তাহার ভূরি ভূরি স্থানে প্রমাণ আছে। ফলত ভক্তের মন অতি দীন; যেমন সাধারণ জমি হইতে নিম্ন জমি খাদ বলিয়া বোধ হয়, তেমনি ভক্তের মন সাধারণ মন অপেক্ষা নিম্ন; এবং ঐ নিম্ন জমিতে কখন যদি জলপ্রবাহ আসে তবে ঐ খাদ জমি হইতে বন্যার জল যেমন সম্পূর্ণরূপে নির্গত হয় না, সেইরূপ ভগবৎকৃপা-বন্যা, সময়ে সময়ে উপস্থিত হইলে কেবল ভক্ত দীনদিগের মনে ঐ কৃপার অবশিষ্ট ভাগ অবস্থিত থাকে। এই কারণে

আমরা দেখিতে পাই যে, যদিও কর্মফলে জীব সুখ ও দুঃখ ভোগ করে বটে, তথাপি ভগবদ্-ভক্ত তাঁহার বিশেষ কৃপাপাত্র।" পৃঃ ২২, ২৩

"ভক্তিযোগে ভগবান্ এতাদৃশ বশ যে, বিধিপূর্বক কর্ম না হইলেও কর্ম সফল। যে সকল কর্মকাণ্ড কেবল ভক্তির উদ্দেশে করা হয়, তাহার কোন বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।......

কোন সময়ে এক মূঢ় ব্যক্তি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমস্তই অশুদ্ধ পাঠ করিতেছিল, কিন্তু পাঠ করিতে করিতে তাহার দুই নয়নের ধারাতে সে অস্থির হইতেছিল। শ্রীচৈতন্যদেব দৈবাৎ সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন, এবং এই ব্যাপার দর্শন করিয়া ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি পাঠ করিতে করিতে অশ্রুপাত করিতেছ কেন? সে ব্যক্তি কহিল যে, যদিও আমি উত্তমরূপে শিক্ষা পাই নাই, কিন্তু পাঠ করিবার সময় আমার বোধ হয় যেন অর্জুন মহাশয়ের রথ ও সারথী আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমি অহরহ দর্শন করিতেছি। এই ব্যাপারে আমার মনকে ভক্তির শক্তিতে বিহ্বল করিয়া অস্থির করে ও আমার জ্ঞান প্রায় শূন্য হইয়া যায়। আমার যে তখন কি অবস্থা হয়, তাহা আমি কহিতে পারি না। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে সাধুবাদ করিলেন, এবং কহিলেন যে তোমারই পাঠ সার্থক, তুমিই ধন্য ধন্য ধন্য।" পৃঃ ২২, ২৩

বর্তমানে শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্তিত নাম-সংকীর্তন দ্বারা ভগবানের উপাসনা করাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য—ইহা গ্রন্থকার গ্রন্থশেষে নানা প্রমাণ ও বচনাদি উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

পিতৃস্মৃতি

"পিতৃস্মৃতি অর্থাৎ পরমভাগত পিতা ৺কানাইলাল চন্দ্র মহাশয়ের প্রণীত ভক্তিগ্রন্থ।" তাঁহার পুত্র শ্রীপূর্ণচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীনদেরচাঁদ চন্দ্র ও শ্রীগোলকচাঁদ চন্দ্র কর্তৃক ১৯১২ খৃষ্টাব্দে (বাং ১৩১৮ সাল, কার্তিক মাস) প্রকাশিত হয়।

এ পুস্তকখানিতেও মূল্যের কোন উল্লেখ নাই। ইহাও সম্ভবতঃ বিতরণের জন্য প্রকাশিত হয়। ডিমাই ১৬ পেজী আকারে ২৬০ পৃষ্ঠায়

ইহা সমাপ্ত। সুন্দর কাপড়ের বাঁধাই। ৫৮ ও ১২ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটস্থ প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতা মেসার্স এস্ সি আঢ্য এণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থমধ্যে পুত্রত্রয় লিখিত একটি 'পূর্বাভাষ' ও কানাইলাল বাবুর লিখিত একটি ভূমিকা আছে। এখানে "পূর্বাভাষটি উদ্ধৃত হইল—

"আমাদের পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺কানাইলাল চন্দ্র মহোদয় বিগত সন ১৩১৫ সালের ২৩শে এপ্রিল, রবিবার তারিখে স্বধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার অভাবে তাঁহার পবিত্র স্মৃতিই এক্ষণে আমাদের একমাত্র আশ্বাসের সামগ্রী। আমরা তাঁহার অনুপযুক্ত পুত্র, তাঁহার আচরিত একটি ভক্তির অনুষ্ঠানও তাঁহার মত সম্পাদন করিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার সেই ভক্তিপূত মূর্তি ও অকপট ভক্তি-সাধনের কথা যখনই স্মরণ করি, তখনই অতি মাত্র আনন্দে অভিভূত হই।

"যাঁহারা ভগবানের একান্ত ভক্ত, তাঁহারা কখনও কামীর মত একা একা কোন সামগ্রী উপভোগ করিতে পারেন না। তাই আমাদের মহনীয় চরিত্র পিতৃদেব সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রব্যাখ্যাতা শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গোস্বামী মহাশয় প্রমুখ পণ্ডিতগণের মুখে যে সকল অমূল্য উপদেশ লাভ করিতেন, তাহাই সর্বসাধারণকে জানাইবার জন্য বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে যত্নবান্ হইতেন। তিনি ইহ সংসারে থাকিতে থাকিতেই এই যত্নের ফল দুইখানি গ্রন্থ বিতরণ করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থ দুইখানির একখানি 'নিত্যলীলাস্থাপন' এবং অপরখানি 'জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ'। গ্রন্থ দুইখানিই ভক্তজনের চিত্তবিনোদনে এবং অবিশ্বাসীর অন্তরে বিশ্বাস-বীজ বপনে সম্পূর্ণ সমর্থ। তাঁহার অবশিষ্ট রচনা যাহা তিনি স্বয়ং প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই এবং শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন আশানুরূপ সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন নাই, সেইগুলিই 'পিতৃস্মৃতি' নাম দিয়া আমরা প্রকাশ করিলাম। আশা আছে, তাঁহার পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থ দুইখানির মত এই গ্রন্থখানিও সাধারণের আনন্দবর্ধনে এবং হিতসাধনে সমর্থ হইবে।

"এই পবিত্র গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে বন্ধুবান্ধব যাঁহারা আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি, আর পাঠকবর্গের সমীপে সবিনয় প্রার্থনা, তাঁহারা যদি এই গ্রন্থপাঠে

কিঞ্চিন্মাত্রও উপকৃত হন, তবে তাহার বিনিময়ে এ অধমদিগকে এই আশীর্বাদ করিবেন, যেন সেই প্রাতঃস্মরণীয় পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে মতি-গতি রাখিতে পারি।”

‘পিতৃস্মৃতি’ গ্রন্থের আলোচনা

নিম্নলিখিত সাতটি অধ্যায়ে পিতৃস্মৃতি গ্রন্থখানি বিভক্ত—

১। মঙ্গলাচরণ (শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের অনুবাদ) ১—৬ পৃষ্ঠা
২। ব্রহ্মমোহন (এইখান হইতে ‘পিতৃস্মৃতি’ আরম্ভ) ১—৮ „
৩। ব্রহ্মার স্তব ... ... ৯—৭৩ „
৪। দশম স্কন্ধ ১ম অধ্যায় (শ্রীমদ্ভাগবত) ... ৭৪—১৭১ „
৫। দশম স্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায় ... ... ১৭২—২০৩ „
৬। একাদশ স্কন্ধ (উদ্ধব সংবাদ) ... ২০৪—২৩৭ „
৭। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার সংক্ষিপ্ত মর্ম
(১ম—১৮শ অধ্যায়) ... ... ২৩৮—২৬০ „

এই পুস্তকের প্রত্যেক অধ্যায়টি সুলিখিত, এবং সরল ভাষায় গ্রন্থকার তাঁহার বক্তব্য বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের যে সমস্ত মহামূল্য বিষয় মাত্র মূল শ্লোক, টীকা ও অনুবাদ মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, সেগুলি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ পূর্বক গ্রন্থকার ভিতরকার প্রকৃত রস পরিবেশনে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার এই বিশ্লেষণী-শক্তির পরিচয় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের অনুবাদেই প্রকটিত হইয়াছে। এখানে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল ; উহা পাঠে গ্রন্থকারের সে শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে—

“শ্রীশ্রীব্যাসদেব গ্রন্থারম্ভে ৺ভগবান্ পরমেশ্বরকে ধ্যান করিতেছেন,—‘ধীমহি’ অর্থাৎ ধ্যান করিতেছি। এখানে ‘ধীমহি’ শব্দ বহুবচন, কিরূপে ব্যাসদেবের একলার উক্তি হইতে পারে ? ইহার উত্তর এই যে, ব্যাসদেব সাক্ষাৎ নারায়ণ ; তিনি আপনি স্বয়ং আপনার ধ্যান করিতে পারেন না কিন্তু সকল জীবের নিমিত্ত তিনি ধ্যান করিতেছেন।

“তিনি কাহাকে ধ্যান করিতেছেন ?—‘পরং’ অর্থাৎ পরমেশ্বরকে। যিনি ব্রহ্মাণ্ডে লিপ্ত নহেন, কারণ ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল পদার্থ দেখা যায়, তাহা

সমস্তই নশ্বর অর্থাৎ তাহা লয় হইবেক। এখানে ইহা বোধ হইতে পারে যে, ব্রহ্মাণ্ড এক পদার্থ ও পরমেশ্বর অতীত; যেমন তাঁহার অবস্থিতির স্থান পৃথক্ ও পৃথিবী পৃথক্। ইহা কখন সম্ভবে না। তিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আছেন, কিন্তু মায়ার অতীত হইয়াই আছেন। অতএব যদ্যপি জীব মায়া ছাড়া হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে দেখিতে পাইবেক। এখানে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ব্যাসদেব অদ্বৈতবাদী নহেন, তাহা হইলে তিনি 'পরং ধীমহি' কহিতেন না। তিনি বলিতেন—'ব্রহ্ম ধীমহি'।

"এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, পরমেশ্বরের লক্ষণ কি? উত্তর—তাঁহাকে দুই লক্ষণেতে জানা যায়।

১। এক, তাঁহার 'স্বরূপ লক্ষণ'

২। দ্বিতীয়, 'তটস্থ লক্ষণ'

'স্বরূপ লক্ষণ' কাহাকে বলে? উত্তর—কোন এক পদার্থের সেই পদার্থটি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকে স্বরূপ লক্ষণ বলিতে পারা যায় না। যেমন গরুর স্বরূপ লক্ষণ গাভী, কেবল নাম বদল। এখানে পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ 'সত্য'। ব্যাসদেব মহাভারতে উদ্যোগপর্বে কহিয়াছেন যে, সত্যের উপর ভগবান্ স্থাপিত ও ভগবানের উপর সত্য স্থাপিত। অতএব সত্য আর ভগবান্ ভিন্ন পদার্থ নহে।

'সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্।
সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যো হি নামতঃ॥'

এই সত্য এক পদার্থ ভূমণ্ডলে থাকাতে, মিথ্যা পদার্থ সকলকে সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে, অর্থাৎ তিনিই কেবল সত্য, আর অন্য সকল পদার্থ মিথ্যা; কিন্তু মিথ্যা বস্তুও ভ্রমবশত সত্য বোধ হয়। তেজ, জল ও মৃত্তিকার পরস্পর ভ্রম বোধ হইয়া এক বস্তুতে আর এক বস্তু বোধ হয়। যেমন বালিতে ও তেজেতে—মরীচিকাতে জল বোধ হয়। শুক্তিতে রজত বোধ হয়। রজ্জুতে সর্প বোধ হয়। ইহাতে প্রমাণ হইল যে, জল এক পদার্থ আছে বলিয়াই বালিতে ও তেজেতে জল বোধ হয়, ও রজত এক পদার্থ আছে বলিয়া শুক্তিতে রজত বোধ হয়, এবং সর্প এক পদার্থ আছে বলিয়া রজ্জুতে সর্প বোধ হয়। অতএব পরমেশ্বর এক সত্য আছেন বলিয়া, এই

ব্রহ্মাণ্ড যদিও মিথ্যা, তথাপি সত্য বলিয়া বোধ হয়। এখানে এক কথা হইতেছে যে, জল আমরা দেখিয়াছি ; রূপা আমরা দেখিয়াছি ও সর্প আমরা দেখিয়াছি বলিয়া উল্লিখিত পদার্থে ভ্রম বোধ হয় ; কিন্তু পরমেশ্বরকে ত কখন আমরা দেখি নাই, কিরূপে ইহা হইতে পারে, যে ব্রহ্মাণ্ডকে আমরা সত্য বোধ করিতেছি, তাহা আমাদিগের ভ্রম ?

"উত্তর—৺ভগবান্ অজ অর্থাৎ তাঁহার আদি নাই এবং জীবও অনন্তকাল অবধি এই ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছেন ; কিন্তু অনন্তকাল অবধি জীব ভ্রমেতে পতিত। অতএব তাঁহার এই ব্রহ্মাণ্ডকে যে, ভ্রমেতে সত্য বোধ হয়, তাহা হইতে পারে, কিছুই আশ্চর্য নহে।

"এখানে আর এক সন্দেহ হইতে পারে যে, ব্যাসদেব সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে মিথ্যা বলিতেছেন। তবে কি তিনি অদ্বৈতবাদী ? কেননা ভগবান্ হইতে ব্রহ্মার (রজোগুণে) উৎপত্তি তাঁহাকে মিথ্যা কিরূপে বলি ? সত্য হইতে যাহার উৎপত্তি হয়, সে কখন মিথ্যা নহে। আবার ব্রহ্মা হইতে মনু প্রভৃতির উৎপত্তি ও সেই মনু হইতে সকল প্রজার সৃষ্টি।" পৃঃ ১-৩

আলোচনার শেষে তিনি বলিতেছেন—"(ভাগবতের) এই শ্লোকের সহিত বেদান্তসূত্রের দ্বিতীয় সূত্রের এবং গায়ত্রীর প্রথম অবধি শেষ পর্যন্ত একতা আছে। গায়ত্রীর প্রথমে প্রণব ; যাহার অর্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। এখানে 'জন্মাদ্যস্য' ঐ ভাব প্রকাশ করে। আর 'জন্মাদ্যস্যযতঃ' হইতেছে বেদান্ত সূত্রের ২য় সূত্র ; ইহারও মধ্যেতে যাহা আছে, গায়ত্রীও সেইভাব। আর গায়ত্রীর শেষেও 'ধীমহি', ইহারও শেষে 'ধীমহি'।" পৃঃ ৬

"মঙ্গলাচরণে"র পরের অধ্যায়ের নাম—"ব্রহ্মমোহন।" এই অধ্যায়ে গ্রন্থকার, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে বর্ণিত ব্রহ্মমোহন-লীলার সবিস্তার আলোচনা করিরাছেন।

গোলোকের ঠাকুর নরলোকে অবতীর্ণ হইয়া কি ভাবে তাঁহার সৃষ্ট মানবের সহিত লীলা করেন, তাহা দেখিবার আকাঙ্ক্ষা স্বর্গবাসী দেবতাগণের মনে জাগিয়া উঠে। এমন কি লোক-পিতামহ ব্রহ্মা পর্যন্ত এই আকাঙ্ক্ষার হাত হইতে অব্যাহতি পান না। কিন্তু লীলা দেখিতে আসিয়া

লীলার সম্যক্ তাৎপর্য তিনি উপলব্ধি করিতে অক্ষম হওয়ায়, বিভ্রান্ত ও জ্ঞানহত হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণরূপে ভগবান্ গোপবালকদিগের সহিত মাঠে গোচারণ করিতেন। এই উপলক্ষে তাহাদের সহিত তাঁহার নানাবিধ ক্রীড়া ও বনভোজনাদিরও আয়োজন হইত। এই ঘটনার আলোচনায় কানাইলাল বাবু বলিতেছেন, —"এই বনভোজন ইন্দ্র-আদি দেবতারা আকাশমার্গ হইতে দরশন করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন এবং ব্রজবালকদিগকে ধন্যবাদ দিলেন যে, যে ভগবান্‌কে মুনিঋষিরা ধ্যানেতে পান না, যে ভগবান্ বেদ ও শ্রুতির অগোচর, সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষ গোপবালকদিগের সহিত সামান্য বালকের ন্যায় বিহার করিতেছেন ও তাহাদিগের উচ্ছিষ্ট অন্ন পর্যন্ত উদরস্থ করিতেছেন। দেবতারা কহিয়াছিলেন,—অহো! ইহাদের কি ভাগ্য! প্রভু আমাদিগকে স্বর্গ, উর্বশী, ঐরাবত প্রভৃতি দিয়া প্রবঞ্চনা করিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছেন। যদ্যপি আমাদিগের ভাগ্যে ব্রজের রাখালত্ব ঘটিত তাহা হইলে আমরাও এইরূপ ভগবানের সহিত আনন্দ করিতাম।" পৃঃ ১, ২

দেবতাদের মুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই অপার্থিব লীলার কথা শ্রবণ করিয়া এবং ইহার লীলায়িত বিকাশ দেখিবার জন্য ব্রহ্মার মনে প্রবল আগ্রহ হইল। তারপর—"একদা আকাশ-পথ হইতে দেখিলেন যে, অঘাসুর শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজবালকদিগকে গ্রাস করিতে আসিয়া আপনি নিহত হইল ও অন্য প্রতিফল না পাইয়া কৃষ্ণপদে লীন হইল। দেখিয়া ব্রহ্মার আকাঙ্ক্ষা হইল যে, ভগবানের মহিমা আরও কিঞ্চিৎ অধিক দেখিতে হইবেক। অতএব বনভোজনে যখন বালকসকল আনন্দে আহার করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তখন তিনি গো-বৎস সকলকে হরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এবং ভগবান্ (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) যখন বৎসসকলের তল্লাসে ব্রজবালকদিগকে ছাড়িয়া যাইলেন, তখন তিনি ঐ বালকদিগকেও হরণ করিলেন।" পৃঃ ১

ইহা লইয়াই ব্রহ্মমোহন লীলার সূত্রপাত। দেবতারা মায় ব্রহ্মা পর্যন্ত সকল সম্পদের ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হইলেও, ভগবানের লীলা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের ছিল না। তাই ব্রহ্মার মনে হইল,

ষড়ৈশ্বর্যময় ভগবানের পক্ষে—এ কিরূপে সম্ভবে। তাই তিনি পরীক্ষার জন্য গোবৎসমূহ ও ব্রজবালকগণকে হরণ করিলেন। কিন্তু যিনি অন্তর্যামী, তাঁহার অগোচর কিছুই রহিল না। তিনি আবার নিজ মায়ায় গোবৎস ও ব্রজবালকগণকে সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মাকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিলেন।

এই বিষয় লইয়া গ্রন্থকার একটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্মা ভগবানের পুত্রস্বরূপ হইয়া তাঁহার পিতার উপর এ মায়া বিস্তার করিলেন কেন, তিনি ত জানিতেন যে, তাঁহার অল্প মায়া ভগবানের প্রকাণ্ড মায়াকে মুগ্ধ করিতে পারে না। তিনি যদ্যপি ভগবানের বিশেষ মহিমা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখিলেই ত তাঁহার কল্পনা সিদ্ধ হইত। নদ, নদী, সমুদ্র, পর্বত, বৃক্ষ ও পৃথিবী যাঁহার উদরস্থ, যিনি বিরাট্ ও বিশ্বরূপী, তাঁহার ইহাপেক্ষা আর কি মহিমা অধিক আছে? আর যদ্যপি তিনি বিরাট্ ও বিশ্বরূপী হইলেন, সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার শরীরের ভিতর ও সকল স্থাবর ও জঙ্গম তাঁহা হইতেই সৃষ্টি। যেমন মাকড়সা কীট তাহার আপনার মুখ হইতে সূত্র নির্গত করিয়া আপনার জাল নির্মাণ করে এবং অবশেষে সেই জাল উদরস্থ করিয়া ফেলে, সেইমত ভগবান্ আপনা হইতে সৃষ্টি করিয়া আপনাতেই সমন্বয় করেন। এ বিষয়ে ব্রহ্মার কেন ভ্রম হইল, তাহা বড়ই আশ্চর্য। তবে কি ব্রহ্মা—জড় পদার্থ পদ্ম হইতে তাঁহার জন্ম, তাহার কারণেই কি তিনি হতবুদ্ধি হইলেন?" পৃঃ ২

এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া গ্রন্থকার দুই দফায় তাহার উত্তর দিতেছেন। —"উত্তর—প্রথমত ব্রহ্মা যে এরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা ভগবানের আদেশ না হইলে তিনি কখন এ কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। তিনি ভগবানের পুত্র, সকলই অবগত আছেন; অতএব আমরা মূঢ় হইয়া যে কর্মেতে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হই না, তিনি বেদবক্তা হইয়া কিরূপে বিনা অনুমতিতে তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন? তিনি জানিতেন যে, তাঁহার মায়া ভগবানের মায়ার এক অংশ এবং অংশ হইয়া পূর্ণকে কখন আচ্ছাদন করিতে পারে না। যেমন কোয়াশা অর্থাৎ হিমকণা কিয়দংশ অন্ধকার বটে, কিন্তু ঘোর অন্ধকার রজনীতে কেবল রজনীর অন্ধকারের সহকারী

হয়, কিংবা যেরূপ দিবাভাগে জোনাকী কীটের তেজ একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়ে ; ব্রহ্মা জ্ঞাত ছিলেন যে তাঁহার মায়া ভগবানের মায়ার সম্মুখে সেইমত হইবেক।

"দ্বিতীয়ত—ব্রহ্মা যতক্ষণ আকাশমার্গে অঘাসুর-বধ দরশন করিয়াছিলেন, ততক্ষণ কৃষ্ণের উপর তাঁহার ঐশ্বর্যভাব ছিল, কিন্তু যে মুহূর্তকে তিনি বৃন্দাবনধামে প্রবেশ করিলেন, তৎক্ষণাৎ সে ঐশ্বর্যভাব তাঁহার দূরে চলিয়া গেল। কেবল যে ব্রহ্মার এ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা নয়। অক্রুর মহাশয় যখন মহারাজ কংসের আদেশে কৃষ্ণবলদেবকে মথুরা নগরে আনয়ন করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহার মনেতে কত রকম ভাবই উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, রামকৃষ্ণকে কি তাঁহার ভাগ্যে দরশন হইবে ? যাঁহারা মনোবাক্যের অগোচর, যাঁহাদিগকে ষড়দরশনে দরশন মেলে না, বেদ ও শ্রুতিতে নির্ণয় করিতে অশক্ত, তাঁহার যে সমীপে যাইব, এ অসম্ভব। কিন্তু যদি দরশন মেলে, তিনি কল্পনা করিলেন যে, অগ্রে গিয়া পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিয়া তবে কংসের নিমন্ত্রণ দিব। কিন্তু কি আশ্চর্য যে, বৃন্দাবনধামে পৌঁছিবামাত্র তাঁহার এ ভাব আর রহিল না। যখন নন্দালয়ে তিনি উত্তীর্ণ হইলেন, নন্দ-মহারাজের আজ্ঞানুসারে কৃষ্ণ অক্রুর মহাশয়ের পদধৌত করিয়া দিলেন। অক্রুর মহাশয়ও সেই সেবা গ্রহণ করিলেন।" পৃঃ ৩

"শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে, কৃষ্ণ মায়া-হেতু লীলা-শরীর ধারণ করিয়াছেন।" এখানে গ্রন্থকার কানাইবাবু এই 'মায়া'র অর্থ করিতেছেন, কৃপা। তিনি কৃপা করিয়া দেহধারী হইয়াছিলেন। ভগবান্ যুগে যুগে জীবের প্রতি কৃপা করিয়া,—করুণা করিয়া দেহধারণ করেন। গোস্বামীপাদ শ্রীরূপও শ্রীচৈতন্য-অবতারের কথা বলিতে গিয়া, বলেন—"করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ"। তিনি নিজে স্বেচ্ছাপূর্বক করুণা করিয়া দর্শন না দিলে, জীবের ভাগ্যে, তপস্যা, যোগ বা ব্রত সাহায্যে তাঁহার সাক্ষাৎকার পাওয়া যায় না। সুতরাং লীলার বিকাশের জন্য তিনি যাহা করিবেন, তাহা সর্বজীবের বুদ্ধি ও বেদবিধিরও অগোচর।

এই লীলা দ্বারা তিনি ব্রহ্মাকে দেখাইলেন, ব্রজমণ্ডলে নারায়ণ ব্যতীত

আর কিছুই নাই। এখানে তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী চতুর্ভুজ-মূর্তিধারী বিষ্ণু নহেন, এখানে তিনি দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর। ব্রজের যাহা কিছু সকলই তিনি, ব্রজের বৎস, ব্রজবালক, গোপ-গোপী সমস্তই তাঁহার ছায়া—ইহাদের সৃষ্টি তাঁহা হইতেই, এবং লয়ও হইবে তাঁহারই মধ্যে।

কানাইলাল বাবু বলিতেছেন—"বৃন্দাবনধামে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রেমেতে তাঁহার ঈশ্বরত্ব ভাব একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু কতক্ষণের নিমিত্ত? যাই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এ ব্রহ্মার কার্য তৎক্ষণাৎ তিনি নিজ মায়া বিস্তার করিয়া মাতৃবৎ গোপীদিগের ও গোসকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।" পৃঃ ৬

তারপর তিনি—"ব্রহ্মার কষ্ট ও মূর্ছাপ্রাপ্তি দেখিয়া মায়া-যবনিকা ব্রহ্মার সম্মুখ হইতে উত্তোলন করিলেন অর্থাৎ মায়া-অন্ধকার হইতে তাঁহাকে পরিত্রাণ করিলেন; কারণ তিনি মায়া-নদীর পর (অতীত), সুতরাং যতক্ষণ ব্রহ্মা মায়া-নদীতে ডুবিয়াছিলেন, অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই তাঁহার চক্ষুগোচর হয় নাই; কিন্তু মস্তক উত্তোলন করিয়াই তাঁহার ভগবান্ দরশন হইল। (পৃঃ ৭) এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়, দেহ ও মন ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল। ব্রহ্মা দেখিলেন, তিনি বৃন্দাবনে দাঁড়াইয়া আছেন, যে বৃন্দাবন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম এবং যে স্থান হইতে তিনি কখনও অন্তর্হিত হন না।"

ইহার পর গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়। এই অধ্যায়ের নাম—"ব্রহ্মার স্তব।" ইহা একটি বিশেষ প্রণিধানের বিষয়। গ্রন্থকার এই অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে ইহার আলোচনা ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

স্তবের প্রথমেই ব্রহ্মা বলিতেছেন—"হে ঈড্য! অর্থাৎ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত যত রূপ আছে, তাহাদিগের মধ্যে স্তবনীয়। তোমার দেহ জলবিশিষ্ট মেঘের ন্যায়। ইহাতে পূর্বপক্ষ এই যে, রূপ মেঘের ন্যায় হইতে পারে, কিন্তু দেহ কিরূপে মেঘের ন্যায় হইবে? ইহার উত্তর এই যে, প্রথমত, মেঘ কোন স্থূল পদার্থের ন্যায় নয়, কারণ উহার ভিতর দিয়া চলিয়া যাইলে মেঘের আকারের কোন পরিবর্তন হয় না। সেই মত ভগবানের চিন্ময় দেহের কোন প্রকারে বিকৃতি কিম্বা ভেদ করিতে

পারা যায় না। দ্বিতীয়ত, মেঘ যেমন অত্যন্ত উত্তাপ না হইলে বারি দান করে না, তেমনি জীব নিতান্ত উত্তপ্ত হইয়া একান্ত শরণাপন্ন না হইলে ভগবান্ কৃপা করেন না।" পৃঃ ৯

তারপর ব্রহ্মা বলিলেন—"হে প্রভু! তুমি পীতবস্ত্র পরিধান করিয়াছ, এ পীতবস্ত্র—'তড়িদম্বরায়' অর্থাৎ বিদ্যুতেতে নির্মিত হইয়াছে, সামান্য স্থূল পদার্থে নির্মিত হয় নাই। ভগবানের বস্ত্র দেখিতে বস্ত্রের ন্যায় বটে, কিন্তু অপ্রাকৃত।" পৃঃ ৯

ইহার অর্থাৎ এই 'অপ্রাকৃতের' আলোচনা-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার লিখিতেছেন —"যে সকল পদার্থ আমরা স্থূল চক্ষুতে দেখিতে পাই না, তাহাকে 'অপ্রাকৃত' কহি। প্রকৃতি শব্দে মায়া। এই মায়া-নদীর জলে আমরা ডুবিয়া আছি। জলের ভিতর মস্তক ডুবাইয়া রাখিলে যেমন তটের অর্থাৎ পারের কোন বস্তু দৃশ্য হয় না, সেইরূপ মায়াতীত যে সকল পদার্থ আছে, তাহা আমাদিগের নয়নগোচর হয় না। ভগবানের রূপ ও তাঁহার বস্ত্র প্রভৃতি আমাদিগের মায়াবিশিষ্ট চক্ষুতে দেখিতে পাই না। ভগবানের সম্পর্কীয় যত বেশভূষা আছে, সকলি অপ্রাকৃত।" পৃঃ ৯, ১০

পুনরায় তিনি প্রশ্নচ্ছলে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"এখানে ব্রহ্মা এই শ্লোকে কেবল ভগবানের রূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, তবে ইহাকে স্তব কি প্রকারে কহা যাইতে পারে?" ইহার উত্তরে তিনি বলিতেছেন— "এজন্য ব্রহ্মা পুনরায় কহিলেন যে, হে বিভো! তোমার এ সুলভ রূপেরও মহিমা আমি নিরূপিত করিতে পারিলাম না। কিন্তু যাহারা তোমাকে নির্গুণ ব্রহ্মভাবে ভজনা করে, কিরূপে তাহারা তোমাকে জানিতে সমর্থ হয়?—আমার বড় আশ্চর্য বোধ হইতেছে। যাহারা সাকার ভাব ছাড়িয়া ও ভক্তিপথ ত্যাগ করিয়া, কেবল শুষ্ক জ্ঞানপথ অবলম্বন করে, তাহাদিগের পরিশ্রম কখনই সফল হয় না।

* * * * *

হে অপরিচ্ছিন্ন! অর্থাৎ যাহার আকার কেহ বিভাগ করিতে পারে না, কিম্বা যাহাকে কেহ সহজে দেখিতে পায় না, কিম্বা যাহার সীমা হয় না, তোমার সেই মহিমা জ্ঞাত হওয়া দুষ্কর।" পৃঃ ১০, ১১

"ভগবানের মহিমা জ্ঞাত হওয়া দুষ্কর", একথা বলিয়া গ্রন্থকার পুনরায় লিখিতেছেন, শ্রবণ ও কীর্তন দ্বারা জীব ভগবানের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারে এবং ইহাদের সাহায্যে পরমা গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়। শ্রুতি ও পুরাণ বহুবার এ কথার উল্লেখ করিয়াছে, "শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্"। এ স্থলে তাঁহার মত এই যে, "যদ্যপি শ্রবণ ও কীর্তনই উপায়, তবে এ উপাসনা সাকারভাব ব্যতীত নিরাকারে পৌঁছে না। কেন না, শ্রবণ কিংবা কীর্তন, আকার না থাকিলে কিরূপে সম্ভবে।" পৃঃ ১১

ইহার পর তিনি ব্রহ্মার উক্তি উদ্ধৃত করিতেছেন,—"যে সকল ব্যক্তি নির্গুণ ব্রহ্মের ভাবনা করে, তাহারা তোমার মহিমা যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞাত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সগুণের মহিমা বড় দুর্জ্ঞেয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, নির্গুণ ব্রহ্মের ভাবনাতে কিরূপে তাঁহার মহিমা জানিতে পারিবেক? উত্তর,—প্রত্যাহারের দ্বারায় অর্থাৎ প্রত্যাহৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারায় যৎকিঞ্চিৎ সমাধা হইতে পারে। অষ্টাঙ্গযোগের 'প্রত্যাহার' একটি অঙ্গ। ইহার দ্বারা বাহ্য বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া মনকে আত্মাতে নিক্ষেপ করিতে হয়।" পৃঃ ১২

এই প্রসঙ্গে তিনি মন ও ইন্দ্রিয়কে কিভাবে সংযত ও প্রত্যাহৃত করিতে হয়, তাহার বিশদ আলোচনা করিয়াছেন—"মনের শক্তি অতি দুর্বল, যদ্যপি বিষয়ে আসক্ত থাকে ব্রহ্ম ভাবনা করিতে পারে না, এবং যদ্যপি বিষয় ভুলিতে পারে, ব্রহ্মাতে আপনা আপনি নিক্ষিপ্ত হয়। অতএব যাঁহারা মনকে যোগের দ্বারায় বাহ্য বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করেন, তাঁহারা ব্রহ্মানন্দে মুগ্ধ থাকেন। কিন্তু এখানে এক পূর্বপক্ষ হইতে পারে যে, মন বিষয়সকলে ধাবমান হয়, যে হেতু বিষয়সকল বিকারী পদার্থ, কিন্তু আত্মা ত বিকারী পদার্থ নহে; তবে কিরূপে মন আত্মাকে ধারণা করিবেক? ইহার উত্তর এই যে, মন স্বচ্ছ পদার্থ, যেমন আয়না, এবং জীবের মনেতে আত্মা অনাদি কাল অবধি অবস্থিত আছেন; কিন্তু বিষয়রূপ মলিনতাতে ঐ স্বচ্ছ পদার্থকে মলিন রাখে; সুতরাং উহার প্রতিবিম্ব কোনমতে বোধ হয় না। কিন্তু যদ্যপি ইন্দ্রিয়সকলকে যোগেতে প্রত্যাহৃত করা যাইতে পারা যায়, ও মন পরিষ্কার হয়, তখন ঐ ব্রহ্মের তেজোময় প্রতিমূর্তি ঐ

মনেতে আপনি উপস্থিত হয়। কিন্তু এ প্রত্যুত্তরেও যগুপি সন্দেহ নিবারণ না হয়, ও তথাপি পূর্বপক্ষবাদীরা কহেন যে, যদবধি মন আত্মাকে ভাবনা করে, মন এক পদার্থ, ও আত্মা এক স্বতন্ত্র পদার্থ-হেতু আত্মা বিকারী পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক। উত্তর,—এ তর্ক তাঁহাদিগের সমুদয়ই ভ্রম, এবং কোনমতে স্থাপনা হইতে পারে না। কেন না, মন যখন প্রত্যাহৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মাকে অনুভব করে, মন তখন সেই আনন্দের আকার প্রাপ্ত হয়, এবং সাক্ষাৎকার প্রভাবে আনন্দের সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়; যেহেতু আত্মা কেবল আনন্দের স্বরূপ। এ প্রমাণে মনের কেবল বৃত্তি অর্থাৎ কর্ম আছে, কিন্তু আত্মা নির্বিষয়ী হেতু মনের কর্মের ফল নাই, এবং যগুপি নির্বিষয়ী, অর্থাৎ স্থূল পদার্থ নহে, তখন আত্মা বিকারী বলিয়া কোনমতে সাব্যস্ত হইতে পারে না।" পৃঃ ১২, ১৩

অতঃপর গ্রন্থকার নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্মের আলোচনা করিয়াছেন এবং এই আলোচনা-শেষে তিনি ব্রহ্মার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন—"নির্গুণ ব্রহ্মের কিঞ্চিৎ মহিমা যোগেতে অনুমান মাত্র হইতে পারে, কিন্তু অপ্রাকৃত সগুণ ভগবানের মহিমা জানিবার কোনমতে উপায় দেখি না। যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত অর্থাৎ যাঁহাকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ধারণ করিবার স্থান হয় না ও যিনি বলীকে ছলিবার সময়ে কেবল তিন পদের দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্য, ও পাতাল ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন, কিরূপে মা যশোমতীর ক্রোড়ের এক পার্শ্বে তাঁহার বসিবার স্থান হইত, কিংবা শ্রীদাম কিরূপে স্কন্ধে করিয়া তাঁহাকে বেড়াইতে পারিতেন, কিংবা শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলে কিরূপে তাঁহার শয়ন করিবার স্থান হইত?......এই সকল মহিমা কেবল সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অধিকারীরাই বুঝিতে পারেন, অন্যে পারে না। ব্রহ্মা কহিলেন যে, তাঁহার পক্ষেও ইহা বোঝা অসাধ্য।" পৃঃ ১৩, ১৪

ব্রহ্মা তাঁহার স্তবে অনেক কথাই বলিয়াছেন, এবং ভক্তিমান্ গ্রন্থকারও বিস্তৃতভাবে সে সমস্তের ব্যাখ্যা ও আলোচনা করিয়াছেন। বাহুল্য-ভয়ে এখানে শুধু নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়া এ অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করা হইল—"ব্রহ্মা পুনরায় কহিলেন যে, হে বিভো! আমার আস্পর্ধা দেখুন যে, আপনার উপর আমার মায়া প্রচার করিয়াছিলাম।

যেমন অগ্নির কণারাশি অগ্নির নিকট কোন কার্য করিতে সক্ষম হয় না, সেইরূপ আমার ক্ষুদ্র মায়া আপনকার বৃহৎ মায়ার নিকট দৃশ্যমান্ হইতে পারে না।"

"ব্রহ্মার অভিলাষ যে, ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন। এ কারণে কহিলেন—'হে অচ্যুত'! অর্থাৎ তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা কখনও ভঙ্গ কর নাই। যদি বল প্রতিজ্ঞা কি? প্রতিজ্ঞা এই যে,—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বদা তস্মৈ দদাত্যেতদ্‌ব্রতং মম॥

অর্থাৎ জীবনের মধ্যে যে একান্ত চিত্তে একবার কহে, 'হে ভগবন্! আমি তোমার শরণাগত হইলাম।' তুমি তাহাকে চিরজীবনের জন্য অভয় দান কর, কারণ ইহাই তোমার প্রতিজ্ঞা। যদ্যপি তাহাই হয়, যদিও আমার গুরুতর দোষ, তত্রাচ আমাকে ক্ষমা করুন। রজোগুণে আমার উৎপত্তি, এ কারণে আমি আপনা হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। সত্বগুণের চিহ্ন—সদাচার ও ভগবন্নিষ্ঠা, রজোগুণের—ঐশ্বর্য ও অহঙ্কার এবং তমোগুণের আলস্য ও পাপাচরণ। যেমন কোন বস্তু পূর্বদিকে অবস্থিত থাকিলে তাহার অন্বেষণে পশ্চিমদিকে ধাবিত হইলে, বস্তুর সন্নিকটস্থ না হইয়া বরং অধিক দূর হইয়া পড়ে, তেমনি যদিও আমার মানস হয় যে, তোমার নিকটবর্তী হই, আমাকে ঐশ্বর্যমদে ও অহঙ্কারে অন্ধ করিয়াছে। আমি মনে মনে ধারণা করিয়াছিলাম যে, আমি 'অজ' অর্থাৎ প্রাকৃত মাতাপিতা হইতে জন্ম না হওয়া হেতু ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী। যদিও সে ধারণা আমার অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। কিন্তু সৃষ্টির ভার আমার উপর আছে এবং আপনিই আমাকে এই কর্তৃত্ব প্রদান করিয়াছেন। যেমন সূর্যকান্ত কাচ যদিও অগ্নি উৎপন্ন করিতে পারে বটে, তত্রাপি সে ক্ষমতা কেহ সূর্যের ব্যতীত ঐ কাচের কহিবেক না, সেইরূপ আমার এই স্বামিত্ব অবশেষে আপনাতে গিয়া পৌঁছিবে। আপনকারই তেজে আমি তেজীয়ান্, অতএব আপনি আমাকে দাস ভাবিয়া আপনকার অনুকম্পনীয় মনে করুন ও ক্ষমা করুন।" পৃঃ ১৭, ১৮

ভগবানের মাহাত্ম্য ও লীলা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা,

তাঁহার ব্রহ্মাত্বের পরিবর্তে ব্রজের তৃণ হইবার কামনা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা দেখিতে আসিয়া তাঁহার মনের মোহ ও নয়নের বিভ্রম অপসারিত হইল। তিনি দেখিলেন একমাত্র ভক্তি ও প্রেমে ব্রজের অধিবাসীরা দুর্লভকে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

"ব্রহ্মার স্তবের" পরে গ্রন্থকার "শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়" লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের মধ্যে এই দশমেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীব্যাসদেব কেন যে, নয়টি স্কন্ধের পরে দশমে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিলেন, সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"মনুষ্যের মন এত সংকীর্ণ যে, সেই বিরাট্‌রূপীর যশ হঠাৎ কীর্তন করিলে, তাহা কখনই মনেতে ধারণা হইতে পারিবেক না। এই নিমিত্ত ব্যসদেব সকল অংশ-অবতারের লীলা কীর্তন করিয়া মনকে প্রথমে ধারণাশক্তি প্রদান করিলেন এবং পরে পূর্ণলীলা বর্ণনা করিয়া, যেমন আহারীয় দ্রব্যসকল মধুর রসে সমাপন করে, সেইরূপ তিনি এই পরম মধুর শ্রীকৃষ্ণলীলা গান করিয়া ভাগবত সমাধা করিলেন।" পৃঃ ৭৪

কানাইলাল অতঃপর লিখিতেছেন,—"শ্রীধর স্বামী অধ্যায়ের প্রারম্ভে কহিলেন,—'শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম।' 'কৃষ্' শব্দের অর্থ 'অপরিমিত' অর্থাৎ পরম, ও মূর্ধ্বন্য (ণ) শব্দের অর্থ—'আনন্দ'। 'ধাম' শব্দের অর্থ 'আশ্রয়'। এই পরম আনন্দ আশ্রয় প্রাপ্ত হইবা মাত্র সকল দুঃখ নিবৃত্ত হইয়া যায়। যেমন আলোক প্রকাশ হইলে অন্ধকার আপনি নষ্ট হইয়া যায়, সেইমত এই পরম আনন্দ আশ্রয়ে সকল অশুভ বিনষ্ট হইয়া, জীব নিত্যসুখে অবস্থান করিতে থাকে। এই কারণে সকল পুরাণের যে দশটি লক্ষণ আছে, তাহার মধ্যে প্রধান লক্ষণ এই 'আশ্রয়' এবং এই আশ্রয়েতে সমস্তই পর্যবসান হয়।" পৃঃ ৭৪

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা,—ইঁহাদের উভয়ের স্বরূপ কি তাহা গ্রন্থকার এই অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। পরিশেষে তিনি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে ইঁহাদের উভয়ের পরিচয়মূলক নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার*।
স্বরূপ-শক্তি হ্লাদিনী, নাম যাহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ॥
গোবিন্দানন্দিনী রাধা, গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দসর্বস্ব সর্বকান্তাশিরোমণি॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর অন্তরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে॥
'সর্ব লক্ষী' শব্দ পূর্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান।
সর্বলক্ষীগণের তিঁহো হয় অধিষ্ঠান॥
রাধা পূর্ণ শক্তি কৃষ্ণ, পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ॥" পৃঃ ৭৬

ইহার পর গ্রন্থকার দশম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এ আলোচনাতেও তাঁহার জ্ঞান ও বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে ভক্তিমান্ ও ভগবদ্‌বিশ্বাসী তাহা তাঁহার রচনা পাঠ করিলে স্বতই প্রতীতি হয়। তাঁহার ভাষাও বেশ প্রাঞ্জল।

গ্রন্থের পরিশেষে তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার আঠারটি অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত মর্ম প্রদান করিয়াছেন। ২৩ পৃষ্ঠার মধ্যে এই অংশ সমাপ্ত হইয়াছে।

---

* "রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
মেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।"
শ্রীরূপ-গোস্বামীর কড়চা

বৈষ্ণবচরণ মল্লিক

"সুবর্ণবণিক্‌দিগের প্রতি নিবেদন" নামক পুস্তকখানি ১২৯৪ সালে (ইং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের রচয়িতা হুগলী বাবুগঞ্জ নিবাসী বৈষ্ণবচরণ মল্লিক মহাশয়। ইনি সুবর্ণবণিক্‌-কুলোদ্ভব নরোত্তম মল্লিক মহাশয়ের পুত্র। আলোচ্য গ্রন্থখানি ১১নং কলুটোলা ষ্ট্রীটস্থ মোহন যন্ত্রে শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত হয়। ডিমাই ১২ পেজী আকারে পাইকা অক্ষরে গ্রন্থখানি ছাপা হইয়াছে। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৮০, ইহা ছাড়া এক পৃষ্ঠা সূচীপত্র, ২ পৃষ্ঠা উৎসর্গ-পত্র এবং এক পৃষ্ঠা ভূমিকা আছে।

'সুবর্ণবণিক্‌গণের প্রতি নিবেদন গ্রন্থের' আলোচনা

জাতীয় উন্নতি ও স্বজাতীয় ব্যক্তিবর্গকে জাতীয় প্রেমে উদ্বোধিত করিবার জন্য এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে সাতটি পরিচ্ছেদ ও একটি পরিশিষ্ট আছে। সাতটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন—

১। বৈশ্যত্ব স্থাপন

২। সুবর্ণ ব্যবসায় এবং সুবর্ণবণিক্‌ আখ্যা

৩। কৃষিকর্ম্ম ও পশুপালন বৃত্তি ত্যাগ

৪। পাতিত্য সংঘটন

৫। পাতিত্য খণ্ডন

৬। বিরুদ্ধবাদীদিগের মত খণ্ডন

৭। বৈশ্যাচার অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা

সুবর্ণবণিকেরা যে বৈশ্য, বৈশ্যাচার তাঁহাদের অবলম্বন করা কর্তব্য এবং বৈশ্যবৃত্তিতে তাঁহাদের অবহিত থাকা বিশেষ প্রয়োজন—গ্রন্থকার বিস্তারিত-ভাবে ও প্রাঞ্জল ভাষায় ইহাই গ্রন্থমধ্যে আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন—

"জাতীয় উন্নতির নিমিত্ত জাতীয় ব্যক্তি মাত্রই দায়ী। সকলেরই আপন আপন সাধ্যানুসারে জাতীয় উন্নতি-সাধন চেষ্টা কর্তব্য। সেই কর্তব্য সাধনই এই পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য। সুবর্ণবণিক্ জাতি সম্বন্ধে যে কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, ঐ সকল গ্রন্থে কৃষিকর্ম ও পশুপালন বৃত্তি ত্যাগ বিষয়ে কিছুই উল্লেখ নাই। সেই অভাবের পূরণ করা ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি, তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন।

"যিনি সুবর্ণবণিক্‌দিগের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি হুগলি পিপুলপাতি নিবাসী মাননীয় শ্রীযুক্ত দীননাথ পাল মহাশয়ের বহু যত্ন ও পরিশ্রম কৃত বৈশ্যতত্ত্ব গ্রন্থখানি (যাহা শীঘ্র মুদ্রাঙ্কিত হইবে) পাঠ করিলে, জানিতে পারিবেন। পরিশেষে বক্তব্য, যদি মনের আবেগে কোন অরুচিকর ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকি, তজ্জন্য, পাঠকবর্গ অপরাধ মার্জনা করিবেন।"

উৎসর্গ-পত্র

পুস্তকখানি গ্রন্থকার তাঁহার পিতা ৺নরোত্তম মল্লিক মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। উৎসর্গ-পত্রটি এখানে উদ্ধৃত হইল—

"উৎসর্গ-পত্র

পরম পূজনীয় পরমারাধ্য পিতৃদেবতা
স্বর্গীয় ৺নরোত্তম মল্লিক মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু।

"পিতঃ! লোক রোগে, শোকে, দুঃখে এবং বিপদে পিতা মাতাকেই স্মরণ করিয়া থাকে। আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির মুখ হইতেও পিতা মাতা শব্দ উচ্চারিত হইয়া থাকে। অতএব, পিতা মাতাই পরম আরাম স্থান ও ভক্তির পাত্র।

"হে পিতা! তোমার পবিত্র ভাব স্মরণ করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জন ব্যতিরেকে স্থির থাকিতে পারি না! তোমারই প্রসাদে সপরিবারে সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতেছি। তোমারই সহবাসে চরিত্র গঠিত হইয়াছে।

"আমি এক্ষণে মায়াময় সংসারে আবদ্ধ। লৌকিক ব্যাপার সকল সহজেই আমার মনকে আকর্ষণ করে। বল্লালের অবিচারে স্বজাতীয়গণের

অকারণ সামাজিক হীনতা তোমার অবিদিত নাই। ঐ অকারণ হীনতা সম্বন্ধে 'সুবর্ণবণিক্‌দিগের প্রতি নিবেদন' নামক পুস্তক রচনা করিয়াছি। তুমি ধরাধামে রাজবিচারক ছিলে। এক্ষণে অনন্ত আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরের সন্নিধানে পরমানন্দে বাস করিতেছ। তোমার স্বর্গীয় চরণোপান্তে ভক্তি সহকারে আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি অর্পণ করিলাম। তোমার বিচারে আমরা সামাজিক প্রাপ্য স্থান পাইবার যোগ্য হইলে, তুমি ঈশ্বর সমীপে তাহা জ্ঞাপন কর। ইতি ১লা পৌষ, ১২৯৪ সাল।

ত্বদীয় বৎসল পুত্র
শ্রীবৈষ্ণবচরণ মল্লিক।"

এই পুস্তক প্রকাশের প্রায় আড়াই বৎসর পূর্বে, ১২৯১ সাল (ইং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ) চুঁচুড়া নিবাসী নিমাইচাঁদ শীল মহাশয় প্রণীত "সুবর্ণবণিক্" গ্রন্থ (সুবর্ণবণিকের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত এবং বৈশ্যত্ব সংস্থাপনবিষয়ক গ্রন্থ) প্রকাশিত হয়। ইহারও পূর্বে এই বিষয়ে আরও দুইজন "সুবর্ণ-বণিক্" লেখক কর্তৃক দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১২৬৫ সালে (ইং ১৮৫৮ খৃঃ) ভৈরবচন্দ্র দত্ত বিরচিত "সুবর্ণবণিক্ বিষয়ক পুস্তক" এবং ১২৭৬ সালে (ইং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ), স্বর্গীয় কবি অধরলাল সেনের ভ্রাতা বলাইচাঁদ সেন সঙ্কলিত "সুবর্ণবণিক্" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

স্বর্গীয় কুঞ্জলাল মল্লিক (ভূতি) মহাশয় ১৩০৯ সালে (ইং ১৯০২ খৃষ্টাব্দ) "সুবর্ণবণিক্" গ্রন্থের প্রথভাগ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয়-ভাগ পর বৎসরে অর্থাৎ ১৩১০ সালে (ইং ১৯০৩) প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের প্রথমভাগের ভূমিকায় (পৃঃ ১) মল্লিক মহাশয় বৈষ্ণববাবুর এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহার নাম দিয়াছেন—"সুবর্ণবণিক্"।

প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব বাবুর গ্রন্থের নাম—"সুবর্ণবণিক্‌দিগের প্রতি নিবেদন"। কুঞ্জ বাবুর গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগে ভৈরবচন্দ্র, বলাইচাঁদ সেন, নিমাইচাঁদ শীল প্রভৃতি মহোদয়গণের গ্রন্থসম্বন্ধে আলোচনা ও উদ্ধার আছে। কিন্তু বৈষ্ণবচরণের এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন আলোচনা বা গ্রন্থের কোন অংশ উদ্ধৃত হয় নাই। পুস্তকখানি (বৈষ্ণব বাবুর) বর্তমানে

দুষ্প্রাপ্য। গ্রন্থখানির মাত্র একটি পরিচ্ছেদ (কৃষিকর্ম ও পশুপালন বৃত্তি ত্যাগ) এখানে উদ্ধৃত করা হইল—

"কৃষিকর্ম ও পশুপালন বৃত্তি ত্যাগ

হে স্বজাতীয়গণ! কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও কুসীদগ্রহণ, আপনাদিগের এই চারিটি বৃত্তির মধ্যে কৃষিকার্যের দোষ গুণ জানিয়া আপনারা বহুকাল হইতে ঐ বৃত্তিটি এবং তৎসঙ্গে পশুপালন বৃত্তিটিও পরিত্যাগ করিয়াছেন। যথা—

প্রথম। বাণিজ্যে বসতির্লক্ষ্যাস্তদর্ধং কৃষিকর্মণি।
তদর্ধং রাজসেবায়াম্ ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস। বাণিজ্যে যে লাভ হয়, কৃষিকর্মে তাহার অর্ধেক হইয়া থাকে। রাজসেবায় কৃষির অর্ধেক এবং ভিক্ষাতে কিছুই লাভ হয় না। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কৃষি অপেক্ষা বাণিজ্য শ্রেষ্ঠ।

দ্বিতীয়। দশী কুলন্তু ভুঞ্জীত বিংশী পঞ্চ কুলানি চ।
গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষঃ সহস্রাধিপতিঃ পুরম্॥

মনুসংহিতা। ৭।১১৭

আটটি গো দ্বারা হল কর্ষণকে ধর্ম বলা যায়, জীবিকার জন্য ছয় গো দ্বারা হল কর্ষণ বৈধ, গৃহস্থ ব্যক্তি চারিটি গো দ্বারা হল কর্ষণ করিবেন। দুইটি গো সংবাহন ও কর্ষণে নিন্দিত। এইরূপ হলদ্বয়ে চারিটি গরুতে যত ভূমি কর্ষণ হইতে পারে ঐ ভূমিকে কুল বলে। দশগ্রামাধিপতি বৃত্তির জন্য কুল ভূমি প্রাপ্ত হইবেন।

উপরি উক্ত শ্লোকে লিখিত হইয়াছে যে, জীবিকার নিমিত্ত ছয় গো দ্বারা হল কর্ষণ বৈধ। অতএব, তদপেক্ষা ন্যূন সংখ্যা দ্বারা হল কর্ষণ অবৈধ। বঙ্গদেশে সর্বত্রই উর্বরা ভূমি। এখানে দুই গো দ্বারা হল কর্ষণে পর্যাপ্ত পরিমাণে কৃষিকার্য সাধিত হয়। এই জন্য দেখিতে পাইবেন যে, বর্তমান কৃষকেরা দুই গো দ্বারা হল কর্ষণ করিয়া থাকে। শাস্ত্রানুসারে ছয় গো দ্বারা হল কর্ষণ করিলে কৃষিকর্মে জীবিকা নির্বাহ হওয়া দুষ্কর।

তৃতীয়। উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথং স্যাদিতি চেদ্ভবেৎ।
কৃষিগোরক্ষমাস্থায় জীবেদ্বৈশ্যস্য জীবিকাম্॥

বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবংস্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽপি বা।
হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জয়েৎ ॥

মনুসংহিতা। ১০।৮২, ৮৩

স্বধর্ম ও ক্ষত্রিয় ধর্ম দ্বারা ব্রাহ্মণের জীবিকা না চলিলে কৃষি-গোরক্ষণাদি বৈশ্যের বৃত্তি অনুষ্ঠান করিবেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ইঁহাদের বৈশ্য বৃত্তি দ্বারা জীবিকা হইলে, হল কুদ্দালাদি দ্বারা ভূমিষ্ঠ জন্তুগণের বিনাশকর এবং বলীবর্দাদির অধীন কৃষিকার্য যত্ন সহকারে ত্যাগ করিবেন।

এই শ্লোকে লিখিত হইয়াছে, কৃষিকার্যে হলকুদ্দালাদি দ্বারা ভূমিষ্ঠ বহু জন্তুর হিংসা হয়।

আপনারা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত। আপনাদিগের পক্ষে জীবহিংসা নিষেধ। সুতরাং, কৃষিকর্ম আপনাদিগের পক্ষে অবিধেয়।

এই সকল কারণে আপনারা কৃষিবৃত্তির দোষ অবগত হইয়া বহুকাল হইতে ঐ বৃত্তিটি পরিত্যাগ করিয়াছেন। এ জন্য, প্রবাদ আছে যে, 'চাষের দোষ গুণ জেনে, চাষ চসে না সোণার বেণে।'

আপনারা কৃষি ত্যাগের সঙ্গে কৃষি-ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছেন, যেহেতু, কৃষি-ক্ষেত্র ত্যাগ কৃষি-বৃত্তি ত্যাগের আনুষঙ্গিক ফল। কৃষি-ক্ষেত্র না থাকিলে, গোপালনে সুবিধা হয় না। এ জন্য, দেখিতে পাইবেন, গোপালকেরা কৃষি-ক্ষেত্রে অথবা মাঠে গোচারণ করিয়া থাকে। আপনারা কৃষি-ক্ষেত্র ত্যাগ হেতু গোপালনে অসুবিধা দেখিয়া ঐ বৃত্তিটিও কৃষি-বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আপনাদিগের চারিটি বৃত্তির মধ্যে আপনারা বাণিজ্য ও কুসীদ গ্রহণ এই দুইটি বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন। কুসীদ গ্রহণ বাণিজ্যের অন্তর্গত। এ কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে আপনারা বৈশ্যের বৃত্তির মধ্যে কেবল একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বাণিজ্য দ্বারা বৈশ্যত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। অতএব, বাণিজ্যবৈশ্যই আপনাদিগের প্রকৃত সংজ্ঞা।"

রামকৃষ্ণ সেন

বংশ-পরিচয়

কবি রামকৃষ্ণ সেন সুবর্ণবণিক্ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। আহিরীটোলায় ২৭নং শঙ্কর হালদারের গলিতে ইঁহার বাড়ী।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের জন্ম। ইনি অধরলাল সেন মহাশয়ের পিতামহ রামগোপাল সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র।

রামকৃষ্ণবাবু একজন নিষ্ঠাবান্ ও ধার্মিক লোক ছিলেন। জীবনের শেষভাগে অধিকাংশ সময় তিনি পূজা প্রভৃতি লইয়া ব্রত থাকিতেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ৬৪ বৎসর বয়সে তিনি বৈদ্যনাথধামে দেহত্যাগ করেন।

পারিবারিক জীবন

রামকৃষ্ণবাবুর দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের তাঁহার তিন পুত্র—নারায়ণ-কৃষ্ণ, পরাণকৃষ্ণ ও হারাণচন্দ্র। জ্যেষ্ঠ নারায়ণকৃষ্ণ সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত (এম্ এ, বি এল্)। ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। নারায়ণবাবু হাওড়ার গভর্ণমেণ্ট উকীল রায় নরসিংহ দত্ত বাহাদুরের জামাতা। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের (২রা আষাঢ়) ইঁহার মৃত্যু হয়। রামকৃষ্ণ বাবুর মধ্যম পুত্র পরাণকৃষ্ণ সেন মহাশয় পোষ্ট্যাল বিভাগে কাজ করিতেন।

রামকৃষ্ণবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র রসময় সেন মহাশয় পুস্তক বিক্রেতা মেসার্স বাটারওয়ার্থ কোম্পানীতে কাজ করেন।

'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' কবিতা প্রকাশ

নিম্নে 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' হইতে কবি রামকৃষ্ণ সেনের লিখিত দুইটি কবিতা উদ্ধৃত হইল। ইহা পাঠে তাঁহার কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

(১)

"বর্ষা বন্দন

নিদাঘের অন্ত, লইয়া সামন্ত
বর্ষা উদয় হয়।
শোভা চমৎকার, অশেষ প্রকার,
হেরিতে কি সুখোদয়॥
প্রফুল্ল সকলে, সুখ যে উথলে,
আনন্দের সীমা নাই।
পাইয়া বর্ষা ধরণী সরসা
সুখেতে ভাসিল তাই॥
দিবাকর কর, ছিল যে প্রখর,
ক্রমেতে মলিন হয়।
গগনেতে ঘন, উঠি নবঘন,
ঘন ঘন বরিষয়॥
চাতকী চাতক, হইয়া পুলক
ঊর্ধ্বমুখে সদা ধায়।
করি কলরব, সারি দিয়া সব,
বারি আসে সদা যায়॥
গগন উপর নীল গিরিবর,
জলধর শোভা করে।
কিবা কলেবর, শ্যামল সুন্দর,
ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ হরে॥
মধ্যে মধ্যে তার, তড়িৎ সন্ধ্যায়,
আলো করে ধরাতল (?)।
সৌদামিনী তায়, চঞ্চলার প্রায়
আনন্দে সদা খেলায়॥
বারি একেবারে, মুষলের ধারে,
ধরণী উপর হয়।

মেঘের গর্জন, অশনি পতন,
শব্দে স্তব্ধ ধরাময়॥
পূর্ণ সরোবর, সরিৎ সাগর,
নদনদী একাকার।
নাহি হয় অন্য, সবে একবর্ণ,
শোভা তার চমৎকার॥
ভেক ভেকী সহ মত্ত অহরহ,
হর্ষে করে কলরব (?)।
নীরদের ডাকে, ময়ূর যে ডাকে,
নৃত্য করে নিরন্তর॥
জলচরগণ, বিহনে জীবন,
জীবনে ছিল যে মারা।
বরষাগমনে, পাইয়া জীবনে
জীবন পাইল তারা॥
হয়ে বিকশিত, পুষ্প·অপ্রমিত,
নানা বনে নানা জাতি।
করে চারিভিত, সৌরভে মোহিত,
কি কব তাহার ভাতি॥
কহ্লারাদিগণ, প্রফুল্লিত হন,
মধুলোভে ষট্‌পদ।
গুঞ্জ গুঞ্জ রবে, মত্ত হয়ে সবে
ঘোরে আসি কোকনদ॥
শস্য পূর্ণ অতি, হয়ে বসুমতী,
সুচারু সুন্দর হয়।
দৃশ্য কিবা তার অতি শোভাকর,
ফল ফুলে তরুচয়॥
হেরি স্থলে স্থল নবদূর্বাদল,
সবুজ বরণ ধরি।

সদা ফলভরে, লোটাইয়া পড়ে,
কান্দি, কি সুন্দর মরি ॥
পক্ষী আদি সব, করি নানা রব,
বসিয়া বিটপী-মূলে।
জলচরগণ সুখে সর্বক্ষণ
শান্ত রয় মাথা তুলে ॥
প্রেম রসে মত্ত, সর্বদা উন্মত্ত,
প্রেমিক প্রেমিকাগণ।
ছাড়ি অন্য ভাব, মনোভব ভাব,
সদা করে আলাপন ॥
অতনুর রসে, দিবানিশি রসে,
দুই তনু এক হয়ে।
সুখে সর্বক্ষণ করয় যাপন,
কামিনীগণেরে লয়ে ॥
বারি বিপর্যয়, অবিশ্রান্ত হয়,
তিলে নাই তাল ভঙ্গ।
মেঘের গর্জন, শুনি নারীগণ,
সভয়ে কাঁপিছে অঙ্গ ॥
ভয়ে চমকিয়া, পতি কাছে গিয়া,
জাপটিয়া গলা ধরে।
কি সুখ তাহায়, কব আর কায়,
বুঝুক রসিক বরে ॥
কিন্তু পতিহারা, বিয়োগিনী যারা,
তাদের কি কব দুঃখ।
অতনুর দাপে সদা তনু কাঁপে,
কিছু মাত্র নাহি সুখ ॥
বিরহে ব্যাকুল, হইয়া আকুল,
অদল (?) ভাবিয়া তায়।

নিজ নাম স্মরি চাঁদের কুকরি,
বয়ান ভাসিয়া যায় ॥
এমন সময়, প্রাণ বাহিরায়,
দারুণ বিচ্ছেদে ফেলে।
পেয়ে অবলায়, মনোভব তায়,
জ্বালায় অনল জ্বেলে ॥
কি কব সে কথা, অন্তরের ব্যথা,
অন্তরের মাঝে রয়।
প্রকাশ না করে, গুরুজন ডরে,
সতত যাতনা সয় ॥
চোরের রমণী, হয়ে সেই ধনী,
থাকেন তাদের মত।
বিরলেতে বসি, ভেবে ভেবে মশী,
সে মুখ, কহিব কত ॥
বোবার স্বপন, প্রকট যেমন,
করিতে বাহির মুখে।
কি কহিব আর, সেরূপ প্রকার,
পতিহীনা ভাবে দুখে ॥
করে হাহাকার, দেহ সবাকার,
দারুণ বিরহ ব্যাধি।
বাড়ে দিন দিন, ক্রমে করে ক্ষীণ,
না মানে মহা ঔষুধি ॥
জ্বলে মনাগুনে, অন্যেতে কি জানে,
এ জ্বালা যেজানে জানে।
ক'ব কি অধিক, যেন বজ্র ঠিক,
মস্তক উপরে হানে ॥
সদা খেদ মনে, দিন দিন গণে,
পাইব কেমনে তায়।

কি করে উপায় মুখে হায় হায়,
মরি বুঝি প্রাণ যায় ॥
ভাবি অবশেষ, ডাকি পরমেশ,
কোথা হে অখিল পতি।
করি যোড় কর, স্তবে নিরন্তর,
মিলাইয়া দেহ পতি।"*

(২)

"মনের প্রতি উপদেশ

কেনরে পামর মন, কি কারণ অকারণ
ভ্রমিছ রে কলুষ-কানন।
অহঙ্কারে হয়ে মত্ত, পাসরিয়া সব তত্ত্ব,
কার তত্ত্ব কর অন্বেষণ ॥
অলীক এ সুখ যত, তাহাতে হইয়া রত,
কত মত করিছ যতন।
একান্ত ভ্রমেতে ভুলে, বাসনা-তরুর মূলে,
বসিতেছে সদা সর্বক্ষণ ॥
দারুণ রিপুর বশে, বাসনা রসেতে রসে,
সেই রস করিতেছ পান।
বাড়িবেক আশা-তৃষা, কভু নাহি হবে কৃশা,
বল দেখি একি রে অজ্ঞান ॥
পরনিন্দা পরদ্বেষ, তাহাতে আছহ বেশ,
ওই গুণ সদা কর গান।
মায়ার মায়াতে ভুলি, প্রবৃত্তির ধ্বজা তুলি,
করিতেছ কুপথ সন্ধান ॥
মদ মদে মত্ত দেহ, অচৈতন্যময় গেহ,
তাহে কোপ অতি বিপরীত।

* 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়', ১২৬৫ সাল, পৌষ, পৃঃ ১৬৬৭—১৬৬৯।

কলহ-অনিল তায়, দিবানিশি সব গায়,
হয়ে তায় অতি প্রফুল্লিত॥
নিবৃত্তি নিবৃত্তি করি, অজ্ঞানের রূপ ধরি,
হারাইলে নিজ পরকাল।
গেলরে গেলরে কাল, নিকটে বিকট কাল,
কালপূর্ণে গ্রাসিবেক কাল॥
এ দেহ অনিত্যময়, কখন কিরূপ হয়,
চিরস্থায়ী না হয় কখন।
কমল পত্রে যেমন, নীর কভু স্থির নন,
টলমল করে অনুক্ষণ॥
তড়িৎ যেমন হয়, ক্ষণে আছে ক্ষণে লয়,
লুকাচুরি খেলিছে সদাই।
সেরূপ এ পাপ প্রাণ, ক্ষণে হয় অন্তর্ধান,
ক্ষণে আছে, ক্ষণে আর নাই॥
এ ভব মাঝেতে যবে, এই দেহ শব হবে,
তোমা ছাড়ি প্রাণ পলাইবে।
দারা পুত্র পরিবার, মুখে করি হাহাকার,
কোনক্রমে রাখিতে নারিবে॥
অতএব ওরে ভ্রান্ত, সাবধানে হয়ে শান্ত,
নিজ তত্ত্ব কর অন্বেষণ।
ত্যজরে অসার যত, কুপথে হয়োনা রত,
ভাব সেই নিত্য নিত্যধন॥
নির্বিকার নিরাকার, এক মনে ভাব তায়,
নির্বিশেষ ভকত-বৎসলে।
এ দেহ হবে না আর, ভাব সেই সারাৎসার,
মোক্ষ পাবি যার কৃপাবলে॥
যাইতে কলুষ বন, করো না করোনা মন,
বস' না রে আশা-বৃক্ষমূলে।

মন প্রাণ এক করি, জ্ঞানরূপ অসি ধরি,
দুষ্ট ভ্রম নাশহ সমূলে ॥
খেয়োনা বিষয়-রস, রিপুর হয়োনা বশ,
বোধ-কুঞ্জে কর সে গমন।
নিবৃত্তির তরু' পরে, বস' গিয়া প্রেম ভরে,
ভক্তিরস করয়ে ভক্ষণ ॥
ভক্তিরস প্রেম-সুধা, ভক্ষণে ঘুচাও ক্ষুধা,
আশা-তৃষা সকলি পলাবে।
নাহি রবে কোন ভয়, শমন হইবে জয়,
ভবের বন্ধন ঘুচে যাবে ॥
হর্ষরূপ বায়ুগণ, বহিবেক সর্বক্ষণ,
অনিবার তোমার হৃদয়ে।
রোগ শোক আদি সবে, পাপ তাপ না রহিবে,
অহঙ্কার পলাইবে ভয়ে ॥
তাহে আর ক্ষণ কালে, কালের করাল জালে (?)
তাতে নাহি হইবে পতন।
প্রফুল্ল নিখিল জ্যোতিঃ, প্রকাশ হইবে ভাতি,
অন্তরেতে সদা সর্বক্ষণ ॥
রবে না রবে না ত্রাস, ভাব সেই শ্রীনিবাস,
যিনি সৃষ্টি-সৃজন কারণ।
শ্রীচরণ হৃদে রাখি, মনের মানসে ডাকি,
পূর্ণকর (?) মানস রতন ॥"*

* 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ৭ই পৌষ, ১২৬৫ সাল, ২১শে ডিসেম্বর, ১৮৫৮।

অক্ষয়কুমার সেন

কবি অক্ষয়কুমার সেন একজন সুবর্ণবণিক্ লেখক। ৮৯নং আহিরী-টোলা ষ্ট্রীটে ইঁহার বাড়ী ছিল। চৈতন্য লাইব্রেরীর ভূতপূর্ব সম্পাদক স্বর্গীয় গৌরহরি সেন মহাশয় গত ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার "সুবর্ণবণিক্ সমাচারে" (পৃঃ ১) "কবি যুগল" প্রবন্ধে ইঁহার রচিত "নবান্ন" শীর্ষক একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বর্তমানে ইঁহার বংশধরেরা আহিরীটোলা হইতে কোথায় উঠিয়া গিয়াছেন, তাহার সন্ধান না পাওয়ায় ইঁহার কোন জীবনী দেওয়া সম্ভবপর হইল না। তবে তাঁহার অনেকগুলি রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

'সুবোধিনী' পত্রিকায় রচনা প্রকাশ

অক্ষয়বাবু "সুবোধিনী" পত্রিকার একজন লেখক ছিলেন। তিনি ইহাতে উপন্যাস, প্রবন্ধ ও বহু কবিতা লিখিয়াছেন। ১২৯৭ সালের বৈশাখ মাসে ৩২নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট হইতে "সুবোধিনী" মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া দুই বৎসরকাল চলে। কালিদাস মিত্র মহাশয় এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। স্বর্গীয় পরিহাসরসিক কবি রসময় লাহা মহাশয়ও "সুবোধিনীর" একজন লেখক ছিলেন।

প্রথম বর্ষের "সুবোধিনী" পাওয়া যায় নাই ; দ্বিতীয় বর্ষের পত্রিকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই বর্ষে অক্ষয়বাবুর উপন্যাস ব্যতীত নিম্নলিখিত ৭টি কবিতা ও একটি গান প্রকাশিত হয়—

১। নববিবাহিতের আক্ষেপ
২। বসন্ত-বিরহে
৩। দশহরা
৪। কহ্লার কুসুম
৫। কোহেলা
৬। কাদম্বিনী দর্শনে
৭। বর্ষরাজ করে সুবোধিনী সম্প্রদান ও শোকসঙ্গীত

সুবোধিনীতে "রসিক ও মূষিক" নামক তাঁহার একটি ব্যঙ্গরসাত্মক গদ্য প্রবন্ধ এবং তাঁহার "অন্তিম মিলন" উপন্যাসের ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ ও

৩০শ পরিচ্ছেদ বাহির হয়। এই "অন্তিম মিলন" উপন্যাসখানি "সুবোধিনী"র প্রথম বর্ষে আরম্ভ হয়। প্রথম বর্ষের পত্রিকায় ইহার চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছিল।

ব্রজভাষায় কবিতা রচনা

অক্ষয় বাবুর ব্রজভাষায় কবিতা রচনা করিবারও শক্তি ছিল। তাঁহার "বসন্ত-বিরহে" ও "কোহেলা" শীর্ষক কবিতা দুইটি ব্রজভাষায় রচিত। এখানে তাঁহার "বসন্ত বিরহে" কবিতাটি উদ্ধৃত হইল—

"নিদয় নিদাঘে প্রমথিত মাধব
ধায়ল কুঞ্জ গভীরে,
ভাগে মলয়ানিল, দ্বিরেফ দুখায়িত,
বিরমিল বঞ্জু-কুটিরে।
শিককুল রোবতি, বকুল-কদম্বে
কুহু কুহু কঠোর নিনাদ,
রসাল কি কোলে, মুকুলিত মাধবী,
ঝুরত হি বিনু অবসাদ।
চম্পা গোলেলা, ভ্রমসিত বন্ধন,
দারুণ বিরহ কি বায়ে,
যুথি, যাতি, বেলা সুরভিনী মালতী
বিলপতি আকুল কায়ে।
লোল হরিণী আঁখি, মুহু মুহু পেখত,
ধাবত মলিন-বয়ানে,
ঘন ঘন ছোড়ই ব্যলীক নিশাস
বিরমত বিটপী-বিতানে।
চাঁদ বিরস চিত, ধূলি ধূসর বপু
পুছতহি চতুর চকোরে,
কাঁহা মদন সখা, কাঁহা গিয়া ভাগই
ফেলই বিরহ বিঘোরে ?

চণ্ড দিবাকর নিথর নিকম্প
বাসর নিঠুর বিলাসে,
দিক দক্ষিণাক্ষণ শ্বাস বিমুঞ্চত
তাপ-দহন পরকাশে।
শুষ্ক জলাশয়, ঘন অবগাহন,
বিহগ নিনাদিত ফিরে।
শ্যাম বিটপিচয়, কিশলয় কোমল,
ভায় লুলিত নতশিরে।
গগন বিকম্পিত, জলদ নিঘোষে,
রাগ বিফল পরকাশ ;
গিরিবর আনন, তড়িত কড়ার
প্রকট বিকট কটু হাস।
ধূলি পটল কভু, জগত আঁধারি'
দূর গগন চলি যায়ে,
শ্যাম পলবচয়, মলিন বিকাশে,
দারুণ দহন কি দায়ে।
ভানু অরুণ আঁখি, কমল প্রকম্পিত,
হেরি কুমুদ মৃদু হাসে,
মৃগদল কানন; বিহগ বনান্তে
ধায়ল শরণকো আশে।
দুখভর মেদিনী, রসহীন মানস,
উরস বিদারিত ভায়ে,
শশিকর কোমল, রজনী সমাগম
বিরমত আকুল কায়ে।
ঘন ঘন বেপথু, পনস রসালে,
রম্য দিবস পরিণাম,
গাহে বিহগ দল, রভস বিলোকন
কোটর লভত বিরাম।

খণ্ড জলদ কভু, হেরি গগন তল
চাতক পূরত আশা,
নবীন বরখা জল, তুরিত মিটাইবে
চিরদিন ভূক পিয়াসা।" পৃঃ ৪৬

সঙ্গীত রচনায় অক্ষয়কুমার

অক্ষয়বাবু সঙ্গীত রচনাতেও সিদ্ধ ছিলেন। ২য় বর্ষের সুবোধিনীতে তাহার দুইখানি গান আছে। "অন্তিম মিলন" উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে (পৃঃ ১৩৬) প্রকাশিত গানখানির শব্দযোজনা ও ভাব—উভয়ই সুন্দর। নিম্নে উহা উদ্ধৃত করা গেল—

"সিন্ধু-ভৈরবী

সতীর মহিমা আমি কেমনে বর্ণিব বল ?
সংসার পঙ্কিল জলে সতীপ্রেম-শতদল।
কি মধুর সুধা-হাসি, সরস কৌমুদীরাশি
নিরখিলে মুখশশী, চিত হয় সুবিমল॥
রমণীর শিরোমণি, বিমল প্রেমের খনি,
সৃজিলেন পদ্মযোনি, স্বভাবসুন্দর ফল।
উজল নয়ন আগে, প্রবল শমন ভাগে
পতি-পদ হৃদে জাগে, পরশে অনল জল।"

অক্ষয়বাবুর কবিত্ব-শক্তির পরিচয়

অক্ষয়বাবুর রচিত "বর্ষরাজ করে সুবোধিনী সম্প্রদান" কবিতাটি "সুবোধিনী"র দ্বিতীয় বর্ষের শেষে বাহির হইয়াছে। "সুবোধিনী" আর বাহির হইবে না, এই আক্ষেপে অক্ষয়বাবু কবিতাটি রচনা করিয়াছেন। ইহা তিন পৃষ্ঠাব্যাপী। তিনি যে একজন সুকবি ছিলেন, ইহা পাঠে তাহা বুঝা যায়। তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় দিবার জন্য এখানে কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল—

"*　　　*　　　*　　　*

পড়ে কি স্মরণ-পথে সে সুখের দিন, পশি যবে কাব্যের কানন,
উঁচু ডাল নোয়াইয়ে, সুকোমল করে, করিতিস্ কুসুম চয়ন ?
নাচিয়ে নাচিয়ে তুই ফিরিতিস ঘরে ঘরে, ফুলভারে ভরিয়ে বসন ;
চাপিয়ে দশনকুন্দে অধরপল্লব, হাসিতিস্ ছড়ায়ে কিরণ।
তোর সেই আধ আধ অমিয় বচন, শ্রুতিমূলে কোকিল ঝঙ্কার,
কেমনে ভুলিব তোরে ?　ভুলিবার ধন, তুই কি গো জননি, আমার ?

*　　　*　　　*　　　*

এস মা প্রকৃতি আজি, এয়ো হয়ে তুমি সঙ্গেতে লইয়ে নিজগণ,
বহুক আনন্দ-নদী উল্লাসে অপার, হোক্ সবে আনন্দে মগন॥
সমীরণ ফুল-পাখা হেলাও যতনে সুবোধিনী শুভ পরিণয় ;
পিকবধূ !　হুলাহুলি দেহ অবিরাম, তরু, কর কুসুম সঞ্চয়।
চন্দ্রমা কৌমুদীরাশি কর বিতরণ, আলো কর বিবাহ-মণ্ডপ ;
উজ্জ্বল হীরককান্তি নক্ষত্রখচিত নীলনভঃ ধর চন্দ্রাতপ।
অলক্তক-রাগ-মাখা পদচিহ্ন তোর, পড়িয়ে রহিল গৃহতল ;
এই কি দেখিয়ে আমি বাঁধিব এ বুক, নিবারিব নয়নের জল ?
তোর এই খেলাঘর তোর এ রচনা, দেখে দেখে দহিবে অন্তর ;
আমার এ শূন্য ঘরে শূন্য হৃদি লয়ে কেমনে রহিব অতঃপর ?
আর কি হবে না দেখা জনমের মত, বল মাগো বল সুবোধিনি !
ভুলে গিয়ে জন্মশোধ জনক-আলয়, হবি কি গো পতিসোহাগিনী ?

*　　　*　　　*　　　*

নব দূর্বা-আস্তরণ বিছাও মেদিনি !　কিশলয় !　ধর ছত্র শিরে,
প্রশস্ত মুহূর্ত এই বিদায় কারণ, আয় বাছা আয় ধীরে ধীরে।
তিলেক বিচ্ছেদ তব বরষ সমান, কেমনে মা !　করিব যাপন ?
কেমনে ধরিবে প্রাণ আশা পথ চেয়ে, এ অক্ষয় অক্ষয় জীবন ?"

অক্ষয়কুমারের গদ্য রচনা

অক্ষয়বাবুর "রসিক ও মূষিক" প্রবন্ধটির মধ্যে রস আছে, ব্যঙ্গ আছে আর আছে সমালোচনা।　রসিক ও মূষিকের কথোপকথনে এগুলি

ফুটিয়াছে। কথোপকথনের শেষে সংস্কৃতভাষার উদ্বোধনকল্পে অক্ষয় বাবু মূষিকের মুখ দিয়া যাহা বলাইয়াছেন, তাঁহার গদ্য-রচনার নমুনাস্বরূপে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"মাতঃ সংস্কৃত ভাষা। বঙ্গের গণ্যমান্য সুসন্তানগণ কর্তৃক তোমার পুনরুত্থানের পথ প্রকাশিত হইতেছে। মাগো কুন্তলজাল ভাল করিয়া বাঁধ। মলিন মুখখানি অসিত বসন হইতে উন্মুক্ত কর।......জর্মণী তোমার ষোড়শোপচারে পূজা আরম্ভ করিয়াছে, তুমি মা! যে সিংহাসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তুমি মা সেই সিংহাসনেই আছ। কুটিল কাল তোমার অবনতির উপায় দেখিতেছিল, কিন্তু মা! তাহার চেষ্টা বিফল হইল। তোমার উচ্চ নাম সুমেরু চূড়ায় স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে। 'তুমি পার্থিব লীলা সম্বরণ করিয়াছ'—এই নিষ্ঠুর বচন কে আমাদিগকে শুনাইতে চায়? উঠ, উঠ, উজ্জয়িনীনাথ! উঠ, উঠ, অশোক। উঠ, কৃষ্ণচন্দ্র! উঠ, তোমাদিগের মাতার সিংহাসন মস্তকে করিয়া গাত্রোত্থান কর। সম্রাজ্ঞী ভারতেশ্বরী তোমাদের সহিত যোগ দিতেছেন, তোমরা উঠ। মা! তোমার ক্ষীণপ্রাণা কন্যাকে রাখিয়া দিব্যাঙ্গ কোথায় গোপন করিয়া রাখিয়াছ? দেখ মা! দেখ আসিয়া কুসন্তানগণ তাঁহার অবমাননা করিতেছে। তোমার সেই শশাঙ্কনিভানন তমোজাল ভেদ করিয়া একবার দেখাও। তৃষিত সন্তানগণ পরিতৃপ্ত হউক। সরস্বতি! দৃষদ্বতি তোমাদের অঙ্কস্থল এখন শূন্য পতিত রহিয়াছে। নবদ্বীপ, তুমি কিঞ্চিৎ মর্যাদা রক্ষা করিয়াছ বটে, কিন্তু ভাল করিয়া বদ্ধপরিকর হইয়া দণ্ডায়মান হও। দাক্ষিণাত্য! তোমার জয় হউক, তুমিই মাতার মলিন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করিবার চেষ্টায় আছ।"

"অন্তিম-মিলন" উপন্যাসের ভাষা সরল। ঘটনাটি বাংলার কথা লইয়া লিখিত, ইহাতে অতীত যুগের বাঙালী সমাজ ও বাংলার পল্লীর চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাণ্ডারহাটির স্থবর্ণবণিক্-কথা

হুগলী জেলার অন্তর্গত ভাণ্ডারহাটি গ্রামে বহু স্থবর্ণবণিকের বাস। প্রায় তিন শত বর্ষ পূর্বে, "সিংহ" পদবীধারী স্থবর্ণবণিক্ জাতীয় ঘনশ্যাম সিংহ মহাশয় বালিডাঙ্গা গ্রাম হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। এই বালিডাঙ্গা গ্রাম ভাণ্ডারহাটির তিন ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত।

ঘনশ্যাম সিংহের 'সাহা' উপাধি লাভ

নবাবী আমলে চৌধুরী, মল্লিক, সরকার, সাহা প্রভৃতি উপাধি দানের ব্যবস্থা বর্তমান ছিল। সম্মানিত ব্যক্তিদিগকে এই সমস্ত উপাধিতে ভূষিত করা হইত। বহুবিধ সৎকার্যের জন্য ঘনশ্যাম সিংহ মহাশয় নবাব সরকার হইতে "সাহা"[১] উপাধি পাইয়াছিলেন।

ভাণ্ডারহাটির বর্তমান জমিদার চৌধুরী মহাশয়দিগের পূর্বপুরুষদিগের আদিম নিবাস এইখানে ছিল। তাঁহাদের সহিত ঘনশ্যাম সিংহ মহাশয়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ইঁহারা কুলীন ব্রাহ্মণ। ইঁহাদেরই অনুরোধ ও আগ্রহে ঘনশ্যাম বাবু ভাণ্ডারহাটিতে আসিয়া বাস করেন।

চৌধুরী পরিবারের সহিত বন্ধুত্বের নিদর্শন

উভয় পরিবারের বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ এখনও একটি অনুষ্ঠান ভাণ্ডার-হাটিতে ঘনশ্যাম বাবুর সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। চৌধুরী মহাশয়দিগের গৃহদেবতা গোবিন্দরায় জিউ এবং সিংহ মহাশয়দিগের গৃহবিগ্রহ[২] বৃন্দাবন-

---

১ ঘনশ্যাম সিংহ হইতে অধস্তন চারি পুরুষ পর্যন্ত এই "সাহা" উপাধি ব্যবহার করিতে দেখা যায়। পুরাতন দলিল প্রভৃতিতে ইহার নিদর্শন আছে।

২ ভাণ্ডারহাটিতে আসিয়া ঘনশ্যাম সিংহ মহাশয় বৃন্দাবনচন্দ্র জিউকে প্রতিষ্ঠা করেন। বালিডাঙ্গায় তাঁহাদের গৃহদেবতা ছিল—বিনোদবিনোদিনী (রাধাকৃষ্ণ ও শিবদুর্গা)। এখন বৃন্দাবনচন্দ্র জিউর ঠাকুর-বাড়ীতেই ইঁহাদের স্থান। বৃন্দাবনচন্দ্র জিউর দোলমঞ্চটি খুব পুরাতন, একশত বৎসরেরও পুরাতন হইবে বলিয়া মনে হয়। এখনও ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন দোলের সময় এখানে উৎসব হইয়া থাকে।

চন্দ্র জিউ। ঘনশ্যাম বাবু নিজ গৃহদেবতা বৃন্দাবনচন্দ্রের দোলের সময় (পূর্ণিমার দিন) বিশেষ সমারোহে গোবিন্দরায় জিউকে আনয়নপূর্বক একাসনে দুই যুগল মূর্তিকে বসাইয়া দোলযাত্রার অনুষ্ঠান করিতেন। চৌধুরী মহাশয়েরাও শ্রীরাম নবমীর দিন সিংহ মহাশয়দিগের গৃহদেবতা বৃন্দাবনচন্দ্র জিউকেও আপনাদের গৃহে লইয়া গিয়া নিজ গৃহদেবতা গোবিন্দরায় জিউর সহিত সম্মিলন ঘটাইয়া দোলযাত্রা-পর্ব সমাধা করিতেন। পরস্পরের এইরূপ গৃহদেবতার বিনিময়-প্রথা একটি অভিনব ব্যাপার বলিয়া মনে হয়।

ঘনশ্যাম সিংহ মহাশয়ের বাড়ী এখন যেখানে বর্তমান, সে স্থান পূর্বে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। তিনিই জঙ্গল কাটাইয়া সে স্থানকে বসবাসের উপযোগী করিয়া তোলেন। ঠাকুরের নিত্য-সেবার জন্য বালিভাঙ্গা হইতে প্রত্যহ পুরোহিত আসিয়া ঠাকুরের পূজা করিয়া যাইতেন। তখন ভাণ্ডারহাটিতে সিংহ মহাশয়দিগের কোন পুরোহিতের বাস ছিল না। একদিন ঘটনাক্রমে পুরোহিত আসিলেন না,—ঠাকুরের সেবা হয় না। অথচ সময় প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। নারায়ণ অভুক্ত আছেন শুনিয়া স্থানীয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের এক জামাতা সূর্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুরের পূজা করেন। ইনি কুলীন ব্রাহ্মণ। ইহাতে ইনি নিজ সমাজে আর স্থান পান না। ঘনশ্যাম সিংহ মহাশয় ইঁহাকে জায়গীর ও বৃত্তি দিয়া স্বপল্লীতে প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার নবম অধস্তন পুরুষ শ্রীযুক্ত হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বর্তমান। তাঁহার বয়স পঁচাত্তর বৎসর। তিনি এবং আরও অন্যান্য ব্রাহ্মণ বৃন্দাবনচন্দ্র জিউর পূজা করিয়া থাকেন।

ঘনশ্যামবাবুর পারিবারিক বিবরণ

ঘনশ্যাম সিংহ মহাশয়ের সাত পুত্র—নন্দরাম, মণিরাম, ভৃগুরাম, শ্রীরাম, রামরাম, প্রভুরাম ও নিধিরাম। ঘনশ্যাম সিংহের সাত পুত্রের বংশধরদিগের মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ (দৌহিত্র-বংশ) ও সপ্তম পুত্রের বংশধরগণ এখনও ভাণ্ডারহাটিতে বাস করিতেছেন। প্রথম ও পঞ্চম পুত্রের বংশধরগণ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে এবং ষষ্ঠ পুত্রের বংশধরেরা কলিকাতায় বেণেপুকুরে আছেন।

শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রজি, ভাণ্ডারহাটি
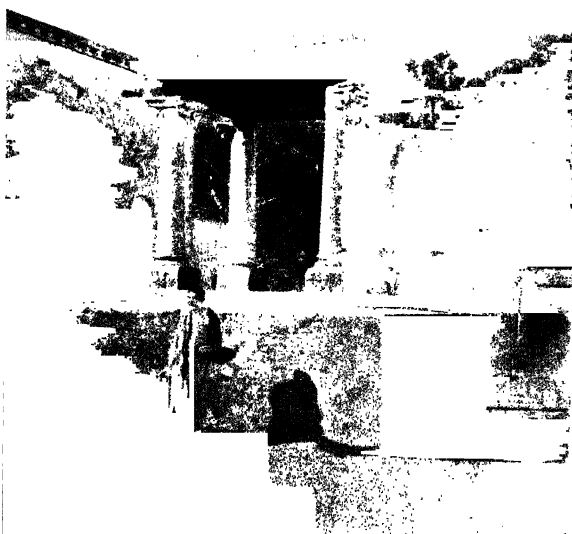
রূপচরণ সাহার গৌরনিতাই বিগ্রহ ও শিব স্থাপন

ঘনশ্যাম সিংহ মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র শ্রীরাম সাহার দ্বিতীয় পৌত্র রূপচরণ সাহা একজন কীর্তিমান পুরুষ। তিনি ভাণ্ডারহাটিতে গৌরনিতাই বিগ্রহ স্থাপন করিয়া একটি আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার সহিত তিনি রত্নেশ্বর (শিব) ঠাকুরের একটি মন্দির নির্মাণপূর্বক শিব স্থাপনা করেন। এই আখড়া ও মহাদেবের পূজা প্রভৃতির খরচা বাবদ ১২২৬ বঙ্গাব্দে (১৮১৯ খৃষ্টাব্দে) পঁচিশ বিঘা সতের কাঠা নিষ্কর জমি দিয়া যান। তাঁহার পরলোক গমনের পর তাঁহার পত্নী বিলাসিনী দাসীও এই কার্যের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ জমি দেবোত্তর করিয়া দেন।

ঘনশ্যাম সিংহের অপর এক বংশধরের স্থাপিত কেশবপুরের আখড়া উঠিয়া যাওয়ায় সেখানকার গিরিধারী বিগ্রহও ভাণ্ডারহাটির আখড়ায় স্থান পান। আখড়া প্রতিষ্ঠাকালে রূপচরণ সাহা এই ব্যবস্থা করেন যে, অনাহূত যত লোক আখড়ায় আসিবেন, সেবা পাইবেন। তাহার মধ্যে বিশেষ নিয়ম ছিল, দৈনিক পাঁচজন এইখানে আহার করিবেন। বর্তমানে এই আখড়া একজন উৎকল মহান্তের দ্বারা পরিচালিত হয়। রাধামদন-মোহন, গিরিধারী, নিতাইগৌর, বলরাম—এই বিগ্রহগুলি আখড়ায় আছে।

প্রসাদদাস সেন কর্তৃক আখড়ার সংস্কার সাধন

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে, এই আখড়ার জীর্ণাবস্থা দেখিয়া চুঁচুড়া দত্তের গলি নিবাসী সুবর্ণবণিক্‌বংশীয় প্রসাদদাস সেন মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে এই আখড়ার সংস্কার করেন। ইহার চিহ্নস্বরূপ আখড়ার দ্বারদেশে মর্মরফলকে নিম্নলিখিত অংশ উৎকীর্ণ আছে—

"শ্রীশ্রীহরি
স্মরণং
চুঁচুড়া নিবাসী
স্বর্গীয় শ্যামলাল সেন মহাশয়ের
স্মরণার্থ

তদীয় পুত্র শ্রীমান্ প্রসাদদাস সেন
কর্তৃক
শ্রীমন্দির পুনর্নির্মিত হইল
সন ১৩২৫ সাল, তারিখ ২৬ আষাঢ়”

সিদ্ধেশ্বর মণ্ডল

রূপচরণ সাহার দৌহিত্র মাধবচরণ মণ্ডল মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মণ্ডল মহাশয় রূপচরণ সাহার অংশে ভাণ্ডারহাটিতে বাস করিতেছেন। তিনি একজন শিল্পী। তাঁহার কৃতিত্বের বহু পরিচয় আছে। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে চুঁচুড়ায় বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্-সম্মিলনীর যে অষ্টাদশ অধিবেশন হয়, তাহাতে তিনি যন্ত্রাদি শিল্পের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া “সাক্ষীগোপাল বড়াল” রৌপ্যপদক পুরস্কার পান। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি “ভাণ্ডারহাটী জাতীয় শিক্ষায়তনের” প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ব্যতীত তিনি ১৩১২ সালে ভাণ্ডারহাটিতে “শিল্পোন্নতি বিধায়িনী সমিতি” স্থাপন পূর্বক নানাবিধ কুটীর-শিল্প ও বয়ন-কার্যের জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বি দে মহোদয়ের নিকট হইতে নিম্নলিখিত প্রশংসা-পত্র পান—

“I saw Babu Siddeswar Mandal's workshop to-day, and was very pleased to find that he is weaving various new kinds of fabric, such as twilled cloth, newars etc. He has a Hattersly loom and ordinary flyshuttle looms and also a new loom of the simpler automatic type in which he has made certain improvements. He has also invented a machine for sizing cloth.

I wish his venture every success.

(Sd.) B. Dey
Magistrate, Hooghly
2. 7. 08.”

‘বৃন্দাবন পাঠশালা’ স্থাপন

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভাণ্ডারহাটিতে বৃন্দাবনচন্দ্র জিউর ঠাকুরবাড়ীর দালানে সিদ্ধেশ্বর মণ্ডল মহাশয় “বৃন্দাবন পাঠশালা” স্থাপন করেন। এখানে

কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইত। হুগলী বিভাগের ডেপুটী ইনস্পেক্টর অফ্ স্কুলস্এর মন্তব্য হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল—

"I visited this Kindergarten School to-day and am very favourably impressed with all that is done here. The special teacher introduced in the school the Kindergarten system which has been successfully followed and has produced highly satisfactory results. The school was started in January 1919 and it owes its success entirely, so far as I can judge, to its energetic teacher Babu Siddeswar Mandal who is a man of many parts.

* * * * *

(Sd.) Bankim Ch. Chatterjee
Add. Deputy Inspector of Schools,
Hooghly
16th February, 1921."

ঘনশ্যাম সাহার সপ্তম পুত্র নিধিরাম সাহার সপ্তম অধস্তন পুরুষ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সিংহ মহোদয় একজন বিশিষ্ট সজ্জন ব্যক্তি। ইনি কলিকাতায় সোণাপটিতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যবসা করেন।

ঘনশ্যাম সাহা ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকাসমূহ গ্রামের জলকষ্ট নিবারণকল্পে সহায়তা করিতেছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বড় দীঘি "শ্যামসাগর" (ইহার বিস্তৃতি প্রায় দশ বিঘা) বিধুমণি ইন্‌ষ্টিটিউসনের নিকট অবস্থিত।

নৃসিংহচরণ আঢ্য

হুগলী জেলার ভাণ্ডারহাটী গ্রামে অন্যূন প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে সুবর্ণবণিক্‌বংশীয় ঘনশ্যাম সিংহ মহাশয়ের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আঢ্য, শীল, দত্ত, দে, লাহা, পাল, ধর, সেন, নন্দী, মণ্ডল পদবীধারী বহু সুবর্ণবণিক্ আসিয়া বসবাস করেন।

আঢ্যবংশে নৃসিংহচরণ আঢ্য মহাশয় এই পল্লীর হিতকামী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম গোপালচন্দ্র আঢ্য ও মাতার নাম বিধুমণি দাসী। নৃসিংহ বাবু ইঁহাদের পোষ্যপুত্র।

নৃসিংহবাবুর জনহিতকর কার্য

কলিকাতার ৪৪নং ময়রাহাটা ষ্ট্রীটে (বর্তমানে ১৯নং নলিনী শেঠ রোড্) নৃসিংহ বাবুর সোণা-রূপার দোকান ছিল। তাঁহার পিতা গোপাল বাবু মৃত্যুকালে বহু অর্থ রাখিয়া যান। নৃসিংহ বাবু পল্লীর উন্নতি সাধনে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর নামে তিনি এখানে দুইটি জনহিতকর কার্য করিয়া যান। অল্প বয়সে (৩৪।৩৫ বৎসর) তাঁহার মৃত্যু হয়; তিনি জীবিত থাকিলে আরও অনেক ভাল কাজ করিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার দুইটি কীর্তি—হরিপাল ষ্টেশন হইতে ভাণ্ডারহাটী গ্রাম পর্যন্ত সাত মাইল ব্যাপী রাস্তা, এবং ভাণ্ডারহাটী গ্রামে বিধুমণি ইন্‌ষ্টিটিউসন নামক উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়।

রাস্তা নির্মাণের জন্য পনের হাজার টাকা দান

তারকেশ্বর লাইনের হরিপাল ষ্টেশন হইতে ভাণ্ডারহাটী গ্রাম সাত মাইল। এই রাস্তাটি পূর্বে কাঁচা ছিল। এই সাত মাইল রাস্তার আশেপাশে বহু গ্রাম। বর্ষার সময় এই কাঁচা রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিতে গ্রামবাসিগণের বিশেষ কষ্ট হইত। তাহার উপর রাস্তার মধ্যে কাণা নামক নদী বিদ্যমান থাকায় ডোঙ্গার সাহায্যে পল্লীবাসিগণ নদী

পার হইতেন। একবার এই ডোঙ্গা পার লইয়া জেজুর গ্রামের জমিদার ঘোষ মহাশয়দিগের সহিত নৃসিংহ বাবুর বিবাদ হয়। বিবাদের ফলে নৃসিংহ বাবু অপমান বোধ করায়, তিনি উপযুক্তসংখ্যক লাঠিয়াল সংগ্রহ করিয়া ঘোষ মহাশয়দিগকে শিক্ষা দিবার আয়োজন করেন। কিন্তু নৃসিংহ বাবুর কয়েকজন হিতৈষী বন্ধু ও প্রবীণ কয়েকটি গ্রামবাসী নৃসিংহ বাবুকে বলেন—"যদি আপনি ঘোষেদের শিক্ষা দিতে চান তবে এভাবে না দিয়া অন্যভাবে দিন, যাহাতে তাঁহাদের শিক্ষা এবং গ্রামবাসিগণের উপকার দুই-ই একসঙ্গে সাধিত হয়।" নৃসিংহ বাবু জিজ্ঞাসা করেন,—"কি ভাবে এরূপ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে?" ইহাতে তাঁহারা উত্তর করেন—"যদি কাণা নদীর উপর একটি সুদৃঢ় সাঁকো করিয়া দিয়া সমস্ত রাস্তা পাকা করিয়া দেওয়া যায়, তবে ইহার দ্বারা ঘোষেদের উপর সাধু প্রতিশোধ লওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, গ্রামবাসিগণের প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে।" তাঁহাদের এই কথায় নৃসিংহ বাবু দাঙ্গাহাঙ্গামা হইতে বিরত হইয়া পাকা রাস্তা করিয়া দিবার জন্য পনের হাজার টাকা মায়ের নামে দিতে প্রতিশ্রুত হন।

বাংলার ছোটলাট সাহেবের নিকট প্রেরিত মেমোরিয়্যাল

নৃসিংহ বাবুর এই প্রতিশ্রুতির কথা শুনিয়া ভাণ্ডারহাটী ও নিকটবর্তী বহু গ্রামের অধিবাসিগণ বাংলার তৎকালীন লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর Sir Stewart Bayley বাহাদুরের নিকট ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৬এ নভেম্বর তারিখে একটি মুদ্রিত Memorial পাঠান। সেই memorial-এর চতুর্থ প্যারায় তাঁহারা গভর্ণর বাহাদুরকে জানান—

"4. That Your Honor's memorialists have been informed that Baboo Nreesingha Churn Auddy, a public-spirited gentleman of Bhandarhati, offered to the District Board of Hooghly a sum of Rs. 15000/- (Fifteen Thousand) for the purpose of making a pucca road extending from the Haripal Railway Station on the Tarkessur line to Bhandarhati

which is about six miles and forms a part of the proposed feeder road from Haripal to Dhoniakhally being two miles apart from the existing pucca road running from Hooghly to Dhoniakhally."

ইহার পরে হুগলী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সহিত নৃসিংহ বাবুর বহু লেখালেখি হয় এবং জেলার প্রধান এঞ্জিনিয়ার আসিয়া তদারক করিয়া যান। তাঁহারা রাস্তানির্মাণ কার্য মঞ্জুর করিলে, নৃসিংহ বাবু ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কাছে পনের হাজার টাকা (১৫০০০৲) নিজ মায়ের নামে জমা দেন। ইহার ফলে, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের Public Works Department হইতে বর্ধমান ডিভিসনের কমিশনারের কাছে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নিম্নলিখিত পত্র যায়। এ পত্রের লেখক—Public Works বিভাগের Under-Secretary মহাশয়। পত্রখানির একটি নকল নিম্নে প্রদান করা গেল—

"I am directed to acknowledge the receipt of your letter No. 51T—L. W., dated the 29th ultimo, reporting that Baboo Nreesingha Churn Auddy has contributed the sum of Rs. 15000/- towards the cost of a feeder road from the Haripal station of the Tarkessur Railway to Bhandarhati.

2. In reply, I am to request that you will be so good as to convey to Baboo Nreesingha Churn Auddy the thanks of the Lieutenant-Governor for his liberality in subscribing to this work, which will be of great benefit to all residents of the surrounding neighbourhood.

3. This letter will be published in the Supplement of the Calcutta Gazette for general information."

হরিপাল ভাণ্ডারহাটী রাস্তার ধারে স্থাপিত প্রস্তর-ফলক

এই সাত মাইল ব্যাপী রাস্তায় চারটি কাঠের তক্তা বসান পাকা সাঁকো, এবং কাণা নদীর উপর একটি পাকা (reinforced) সাঁকো আছে।

স্থবর্ণবণিক্ কথা ও কীর্তি

হরিপাল—ভাণ্ডারহাটি রাস্তার ধারে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড স্থাপিত প্রস্তরফলক

হুগলীর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হরিপাল Inspection Bungalowর সম্মুখে (হরিপাল ভাণ্ডারহাটী রাস্তার ধারে) একটি প্রস্তর-ফলকে এই কীর্তির কথা খোদিত করিয়াছেন। লেখাগুলি অস্পষ্ট হইয়া যাওয়ায় নিম্নে তাহার একটি নকল প্রদত্ত হইল—

"শ্রীশ্রী৺শ্রীধর জিউর কৃপায়
ভাণ্ডারহাটী নিবাসী
৺গোপাল চন্দ্র আঢ্য
মহাশয়ের বনিতা
শ্রীমতী বিধুমণি দাসীর
সাহায্যে
এই রাস্তা প্রস্তুত হয়
সন ১২৯৭ সাল।"

১২৯৭ সাল অর্থাৎ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে "হরিপাল-ভাণ্ডারহাটী রোড" সম্পূর্ণ হয়।

এইভাবে সামান্য একটি গ্রাম্য বিবাদের ফলে যে শুভ-অনুষ্ঠানের সূচনা হইল, তাহার দ্বারা স্থানীয় গ্রামবাসিগণ আজিও শ্রদ্ধার সহিত নৃসিংহ বাবুর এই কীর্তির কথা উল্লেখ করিয়া থাকে। এখন এই রাস্তার উপর দিয়া হরিপাল হইতে ভাণ্ডারহাটী পর্যন্ত প্রত্যহ কয়েকখানি বাস ও ট্যাক্সি যাতায়াত করে।

পল্লীর বহু সৎকার্যে অভাবগ্রস্তের অভাবমোচনে নৃসিংহ বাবু মুক্তহস্ত ছিলেন। নামের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল না। তিনি নীরবে কাজ করিয়াই যাইতেন। বহু সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও তিনি সাধারণের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতেন।

নৃসিংহ বাবু হুগলীর স্থানীয় ডাফরিন ফণ্ডে পাঁচশত টাকা দান করেন।

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের অভাব

ভাণ্ডারহাটী ও তৎসন্নিকটবর্তী পল্লীসমূহের অধিবাসিগণ বহুদিন হইতে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের অভাব অনুভব করিতেছিলেন। গ্রাম-

বাসিগণের মধ্যে যাঁহাদের স্বচ্ছলতা আছে, তাঁহারা কলিকাতায় বা অন্য কোন সহরে পুত্রদিগের লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু কষ্টে যাঁহাদিগকে সংসার চালাইতে হইত, তাঁহাদের পুত্রগণের উচ্চশিক্ষার কোন সুবিধাই ছিল না। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বহু আন্দোলন হয়, কিন্তু কোনটিই ফলপ্রসূ হইল না। তখন সকলে মিলিয়া নৃসিংহ বাবু ও তাঁহার জননীকে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের জন্য ধরিয়া বসিলেন। মাতা ও পুত্র উভয়েই গ্রামবাসিগণের সমবেত আবেদনে ভাণ্ডারহাটী গ্রামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইলেন।

বিধুমণি ইন্‌ষ্টিটিউসন

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে নৃসিংহ বাবু স্বীয় মাতার নামে 'বিধুমণি ইন্‌ষ্টিটিউসন' নামে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ভাণ্ডারহাটী B. M. Institutionএর যে মুদ্রিত বার্ষিক কার্য-বিবরণী প্রকাশিত হয়, তাহার প্রারম্ভে বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস-বর্ণনায় সম্পাদক মহাশয় লিখিতেছেন—

"Their* appeal reached the ear of the late Sreemati Bidhumani Dasi of revered memory. The generous and gifted lady looked upon the children of the locality as her own, felt their need and was anxious to remove it in the best possible way. The result was that in 1894, the Bidhumani Institution came into existence." (p. 1).

নৃসিংহ বাবুর মৃত্যু

প্রথমে স্থানীয় চাটুজ্যে পাড়ায় একটি বাড়ীতে স্কুল স্থাপিত হয়। কিন্তু স্কুল স্থাপিত হইবার এক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে নৃসিংহ বাবু পরলোক গমন করেন। তখন তাঁহার বৃদ্ধা জননী, বিধবা পত্নী এবং একটি চারি বৎসরের পুত্র ও একটি ৯ মাসের শিশু সংসারে বর্তমান।

* অর্থাৎ গ্রামবাসিগণের

বিধুমণি ইনষ্টিটিউসন, ভাণ্ডারহাটি, হুগলী

বিধুমণি ইনষ্টিটিউসনের বোর্ডিং, ভাণ্ডারহাটি, হুগলী

গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা নৃসিংহ বাবুর এই অকাল বিয়োগে মর্মাহত হইলেন। গ্রামের কল্যাণকর কাজ আরম্ভ করিবার পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্মাণ

পুত্রের মৃত্যুর পর বিধুমণি দ্বিগুণ উৎসাহে বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ঐ কাজ সমাপ্ত হইল, এবং ইহার দুই বৎসর পরে এই বিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত (affiliated) হয়।

বিদ্যালয়ের প্রথম সম্পাদিকা বিধুমণি দাসী

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম ষোল বৎসর নিম্নলিখিত তিনজন পর্যায়ক্রমে এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক হন—

প্রথম—বিধুমণি দাসী
দ্বিতীয়—গোকুলচন্দ্র সিংহ
তৃতীয়—ক্ষীরোদচন্দ্র আঢ্য

প্রথম সাত বৎসর বিধুমণি দাসী এই বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা ছিলেন। এই সময় তিনি নানাভাবে বিদ্যালয়টিকে সাহায্য করেন ("For the first seven years she nourished and nurtured the infant institute with all maternal care."—Annual Report—1934).

বিদ্যালয়ের কার্য-পরিচালনার জন্য বিধুমণি দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়া যান।

সম্পাদক অতুল চৌধুরী

১৯১০ খৃষ্টাব্দে বিধুমণি ইন্‌ষ্টিটিউসনের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে। তখন ঐ গ্রামনিবাসী সদাশয় অতুলচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টায় বিদ্যালয়টি পুনরার উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ পর্যন্ত অতুল বাবু এই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন।

বিদ্যালয়ের সংলগ্ন একটি হোষ্টেলের অভাব বহুদিন হইতে পরিলক্ষিত হইতেছিল।—২৫ জন ছাত্র থাকিবার উপযোগী আলো-বাতাসযুক্ত একটি সুন্দর ছাত্রাবাস তিনি নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া দেন। সম্পাদক হইবার পর পঁচিশ বৎসর তিনি দরিদ্র ছাত্রদিগের জন্য মাসিক একশত টাকা হিসাবে বৃত্তি প্রদান করেন। হেড মাষ্টারের থাকিবার একটি বাড়ীও তিনি নিজ ব্যয়ে তৈয়ারী করাইয়া দেন। তিনি ২৭ বৎসর কাল বিদ্যালয়টির সম্পাদক ছিলেন; এই সাতাশ বৎসরে তিনি প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা বিদ্যালয়ের জন্য দান করেন। বিধুমণি দাসী প্রতিষ্ঠিত গ্রামের একমাত্র শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটিকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করার জন্য তিনি গ্রামবাসিগণের ধন্যবাদার্হ।

বর্ত্তমান সম্পাদক অমরেন্দ্র চৌধুরী

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অমেরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং আজ পর্যন্ত তিনিই সম্পাদক আছেন।

বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অবস্থা

সদর সাব-ডিভিসন্যাল অফিসার মহাশয় এই বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি। বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মজুমদার বি এ, বি টি মহোদয় একজন উপযুক্ত ও সজ্জন ব্যক্তি। বিদ্যালয়ে সাতজন গ্রাজুয়েট শিক্ষক, ৩ জন আণ্ডার-গ্রাজুয়েট শিক্ষক ও দুইজন পণ্ডিত আছেন।

বর্ত্তমান ছাত্র-সংখ্যা ১৮৫-১৮৬ জন, তাহার মধ্যে ১৫।১৬ জন ছাত্র বোর্ডিংএ থাকে। ১৯৩৬—১৯৩৮ পর্যন্ত তিন বৎসরে এই বিদ্যালয় হইতে নিম্নলিখিতভাবে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ছাত্রগণ উত্তীর্ণ হইয়াছে—

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে—	৬ জন
১৯৩৭ „ —	৬ জন
১৯৩৮ —	১৩ জন

বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য গভর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক ১৫০৲ দেড় শত টাকা সাহায্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত—

স্বর্গীয়া বিধুমণি দাসীর ১০,০০০৲ হাজার টাকার সুদ হিসাবে বার্ষিক প্রায়—৩০০৲ আদায় হয়।

এতদ্ভিন্ন সম্পাদক মহাশয়ের মাসিক দান—১০০৲ পাওয়া যায়।

পানীয় জলের জন্য বিদ্যালয়ে একটি টিউবওয়েল আছে। এ ছাড়া বোর্ডিংএর সম্মুখে একটি সুন্দর পুষ্করিণীও বর্তমান।

বেশ ফাঁকা জায়গায় বিদ্যালয়টি অবস্থিত। উপস্থিত ছাত্রদিগের খেলা-ধূলার জন্য একটি বৃহৎ জায়গারও বন্দোবস্ত হইতেছে।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট হইতে দেখা যায়—ঐ বৎসরে স্কুলের বার্ষিক

আয়	৮৭৯৩৲
এবং বার্ষিক ব্যয়	৮৬৯৯৲

বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের জন্য একটি লাইব্রেরী আছে। স্কুলে ছাত্রদিগের একটি ডিবেটিং ক্লাব আছে। ছেলেদের নৈতিক ও শারীরিক উন্নতির জন্য একটি ব্রতচারী-সঙ্ঘও গঠন করা হইয়াছে। বিদ্যালয়ের সাধারণ তহবিল ব্যতীত নিম্নলিখিত ছয়টি স্বতন্ত্র তহবিল আছে—

১। স্থায়ী তহবিল
২। পাঠাগার তহবিল
৩। পুরস্কার তহবিল
৪। গৃহ-সংস্কার তহবিল
৫। আকস্মিক তহবিল
৬। ক্রীড়া-তহবিল

বিধুমণির মৃত্যু

মহীয়সী সুবর্ণবণিক্-মহিলা স্বর্গীয়া বিধুমণি দাসীর প্রতিষ্ঠিত এই বিধূমণি ইন্‌ষ্টিটিউশন ৪৭ বর্ষ কাল পল্লীর শিক্ষাবিধানে বহু সহায়তা করিয়াছে। সহরের বহুদূরে অবস্থিত থাকিলেও, ইহা একটি সুপরিচালিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে (১৩০৮ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন) বিধুমণি পরলোক গমন করেন।

গৃহ-দেবতার উৎসব

ভাণ্ডারহাটিতে তাঁহাদের গৃহ-দেবতা শ্রীধর জিউর বৃহৎ ঠাকুরবাটি বর্তমান। দোল ও রথের সময় বিশেষ ধূমধাম হয়। রথের ও উল্টারথের দিন ভাণ্ডারহাটিতে বৃহৎ মেলা বসে। রথে শ্রীধর জিউ ও সিংহদের শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র জিউ যাত্রা করেন। এ ছাড়া চড়ক ও দুর্গোৎসবেও ধূমধাম হয়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বিধুমণি বিশ্বনাথের একটি মন্দির স্থাপন করেন। দেবোত্তর সম্পত্তির আয় পূর্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গেলেও তাহারই আয় হইতে ঠাকুরদের নিত্যসেবা ও পূজা-পার্বণাদির ব্যয় নির্বাহ হইয়া থাকে।

নৃসিংহ বাবুর বংশধর

নৃসিংহ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বলাইচাঁদ ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে (১৩৩২ সাল) এবং কনিষ্ঠ পুত্র জহরলাল ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে (১৩২৫ সাল) মারা যান। বলাই-চাঁদের একটি পুত্র শ্রীমান্ তারকচাঁদ এবং নৃসিংহ বাবুর দুই বিধবা পুত্রবধূ বর্তমান।

সুবর্ণবণিক্ কথা ও কীর্তি

স্বর্গীয় রায় নরসিংহ দত্ত বাহাদুর

রায় নরসিংহ দত্ত বাহাদুর

সুবর্ণবণিক্‌কুলোদ্ভব রায় নরসিংহ দত্ত বাহাদুর একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি। হাওড়ার বহু সদনুষ্ঠান ও সাধারণ কার্যের সহিত তাঁহার স্মৃতি বিজড়িত। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী ছিলেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ মামলায় তাঁহার দক্ষতা সর্বজন-প্রসিদ্ধ। তিনি চরিত্র, অধ্যবসায় ও কর্মপ্রচেষ্টা দ্বারা প্রভূত যশ ও অর্থের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন।

বংশ-পরিচয়

তাঁহার পিতামহ গুরুচরণ দত্ত, ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত হইতে একাদশ পুরুষ। তাঁহার নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত আঁটপুর গ্রামে। গুরুচরণের পুত্র বৈকুণ্ঠনাথ আঁটপুর হইতে আসিয়া হাওড়ায় বাস করেন। সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক রসিকলাল দত্ত (Lt. Col. R. L. Dutt, I. M. S.) বৈকুণ্ঠনাথের সহোদর ছিলেন।

বৈকুণ্ঠনাথের চার পুত্র—নরসিংহ, পরেশচন্দ্র, বসন্তকুমার ও শরচ্চন্দ্র। নরসিংহ ও পরেশচন্দ্র উভয়ে উকিল, বসন্তকুমার কোলিয়ারীর ম্যানেজার এবং কনিষ্ঠ শরচ্চন্দ্র একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। বসন্তকুমার ও শরচ্চন্দ্র ব্যতীত অপর দুইজন পরলোকগত।

জন্ম ও বিদ্যাশিক্ষা

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে নরসিংহবাবু জন্মগ্রহণ করেন। হাওড়া জিলা স্কুল হইতে তিনি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্র্যান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরবর্তী বৎসরে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বি এল্ পাস করেন।

কর্মজীবনে নরসিংহ

বি এল্ পাশের পর তিনি ঐ বৎসরেই কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল হন এবং কিছুকাল তিনি হাইকোর্টেই ওকালতী করেন। তৎপরে তিনি হুগলীর জজকোর্টে এবং হাওড়া কোর্টে কাজ করিতে থাকেন। আইনে তাঁহার তীক্ষ্ণধী এবং বক্তৃতায় তাঁহার অনন্য-সাধারণ শক্তি শীঘ্রই তাঁহাকে এই ব্যবসায়ে উন্নীত করিল। তাঁহার এই কার্যের কৃতিত্ব সম্বন্ধে The Encyclopædia of Bengal, Bihar, and Orissa গ্রন্থে (পৃঃ ১৬৬) লিখিত হইয়াছে।

"He had an extensive practice as a criminal lawyer in Howrah, and his services were often requisitioned outside Howrah, in many districts of Bengal and Bihar. He was the retained pleader of all the respectable firms and mills in Howrah and of the various Railway Companies."

জনহিতকর কার্যে নরসিংহ

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি হাওড়ার Public Prosecutor হন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার কিছু পরে তিনি Notary Public হন। তাঁহার এই সম্মান-প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করিয়া পূর্বোক্ত গ্রন্থ বলিতেছেন (পৃঃ ১৬৭)—"A rare honour conferred on an Indian." ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তেইশ বর্ষকাল তিনি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের পদে কার্য করেন। তাঁহারই অদম্য চেষ্টার ফলে,—তাঁহারই ভাইস-চেয়ারম্যান থাকার সময় শ্রীরামপুরে গঙ্গার ধারে হাওড়ায় জলের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখান হইতে হাওড়া সহরে জল সরবরাহ হইত। এই জলের কলের এঞ্জিন-ঘরে একখানি মর্মর-ফলক আছে। উক্ত মর্মর-ফলকে উৎকীর্ণ অংশটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। ইহার মধ্যে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যানরূপে নরসিংহ বাবুর নাম আছে—

"Howrah Water Works
sanctioned by
Sir Charles A. Elliot K. C. S. I., I. C. S.
Lieutenant Governor of Bengal 1894
and
opened 8th February 1896
by
Sir Alexander Mackenzie K. C. S. I., I.C.S.
Lieutenant Governor of Bengal ;
G. A. Grierson C. I. E., I.C. S.,
Chairman to the Municipality ;
Rai Narasinha Dutt Bahadoor,
Vice-Chairman ;
W. Parry M. Inst. C. E.,
Resident Engineer."

এই কার্যের দ্বারা তিনি হাওড়ার অধিবাসিগণের বিশেষ প্রিয় হইয়া পড়েন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক তাঁহার কৃতিত্বের পুরস্কার স্বরূপ "রায় বাহাদুর" উপাধি দ্বারা ভূষিত হন।[১]

রায় বাহাদুর নরসিংহবাবুর অক্লান্ত চেষ্টায় হাওড়ায় নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপিত হয় [২] —

১। পরলোকগত রায় বাহাদুর চিন্তামণি দে [৩] মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে রামকৃষ্ণপুরে গঙ্গার উপর স্নানের ঘাট।

২। রায় মোহনলাল ক্ষেত্রী বাহাদুরের অর্থ-সাহায্যে সালিখার গঙ্গার উপর স্নানের ঘাট।

---

১ "The Government was greatly impressed with the great interest and initiative he took in Municipal matters, especially in connection with the Water Works, and as a mark of recognition of his meritorious services, conferred on him the title of Rai Bahadur in the year 1898."—The Encyclopædia of Bengal, Bihar, and Orissa, p. 166.

২ The Encyclopædia of Bengal, Bihar, and Orissa, p. 166.

৩ ইনিও সুবর্ণবণিক্-বংশোদ্ভব এবং একজন কীর্তিমান্ পুরুষ।

৩। পরলোকগত প্রসিদ্ধ ধনী আই আর বেলিলিয়স (I. R. Belilios)এর অর্থসাহায্যে ব্যাঁটরায় দাতব্য চিকিৎসালয়।

৪। পরলোকগত বেলিলিয়স সাহেবের স্থাপিত এবং তাঁহারই অর্থানুকূল্যে পরিচালিত I. R. Belilios Institution (বাঁটরায় স্থাপিত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়)। বহু বর্ষাবধি নরসিংহ বাবু এই বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন।

৫। স্বর্গীয় গোপাললাল শীলের প্রদত্ত বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত ইলিয়ট ব্রিজ (সালিমারে)।

৬। হাওড়া টাউন হল। ইহা নির্মাণের জন্য রায় বাহাদুর নরসিংহ-বাবুর আপ্রাণ চেষ্টা বিশেষ কার্যকরী হয়।

পারিবারিক বিবরণ ও মৃত্যু

হুগলী জেলার অন্তর্গত বালিগড় নিবাসী নটবর দত্তের কন্যাকে রায় বাহাদুর বিবাহ করেন। তাঁহার চারি পুত্র (কিশোরীলাল, সুরঞ্জন, যুগলকিশোর ও যতীন্দ্রমোহন) এবং পাঁচ কন্যা। রায় বাহাদুরের মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কিশোরীলাল ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। এই শোকের আঘাত তাঁহাকে মুহ্যমান করিয়া তোলে।

তাঁহার শরীর ক্রমশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী বেরিবেরি রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুতে শোকসভা

রায় বাহাদুর এরূপ জনপ্রিয় ছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে জনসাধারণ এবং তাঁহার গুণমুগ্ধ বন্ধুগণ তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশে হাওড়া টাউন হলে এক শোকসভার অনুষ্ঠান করেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২৬এ জানুয়ারী এই শোকসভার অধিবেশন হয়।

এই শোকসভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়—

"That in view of the great and varied services rendered to the cause of the public by the late Rai Bahadur,

this meeting resolves that a committee consisting of the following gentlemen, with power to add to their number, be appointed to collect subscriptions and to establish a suitable memorial for his public services."

"A committee consisting of 44 members was then formed."

এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে রায় বাহাদুরের স্মৃতি-রক্ষার জন্য কিঞ্চিদধিক দুই হাজার ছয়শত টাকা চাঁদা উঠে।

নরসিংহ দত্তের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা

স্মৃতি-সমিতির সংগৃহীত অর্থে রায় বাহাদুরের একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করান হয়। ঐ চিত্র হাওড়ার টাউন হলে স্থাপিত হইবার প্রস্তাব গৃহীত হইলে পর, স্মৃতিসমিতি ঐ চিত্র উন্মোচন করিবার জন্য বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট Sir William Duke K. C. I. E. বাহাদুরকে আহ্বান করা হয়। তাঁহাদের আহ্বানে মাননীয় ডিউক সাহেব হাওড়ার টাউন হলে অনুষ্ঠিত একটি সভায় উহার আবরণ উন্মোচন করিয়া প্রতিষ্ঠা-কার্য সম্পন্ন করেন। চিত্র-প্রতিষ্ঠা-সভায় তিনি যে বক্তৃতা করেন, তন্মধ্যে তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

"The late Rai Nara Sinha Dutt Bahadur enjoyed the confidence of both the Government and the people. He was thus a connecting link between the officials and the people of Howrah."

বৃত্তি স্থাপনের প্রস্তাব

স্মৃতি-সমিতির সংগৃহীত অর্থের উদ্বৃত্ত অংশ দ্বারা একটি বৃত্তি স্থাপনের জন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হয়—

"Resolved that the balance be invested in Port Trust Debentures and the interest be devoted to the purpose of founding a scholarship to be awarded to the best successful candidate in the Matriculation Examination from

schools in the Howrah District, who is not entitled to any other scholarship. The scholarship may be continued every second year on the report of good conduct and efficiency by the Principal of the Institution. If the scholarship be continued for the second year, the next award would be after the expiry of that year. The scholarship will be called *Nara Sinha Dutt Scholarship.*"

'নরসিংহ দত্ত' বৃত্তি প্রতিষ্ঠা

নরসিংহ দত্ত স্মৃতি-সমিতির উদ্বৃত্ত অর্থ উক্ত সমিতির সম্পাদক লালমোহন মুখোপাধ্যায় বি এল মহাশয় স্মৃতি-সমিতির নির্দেশ অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে সমর্পণ করেন। উক্ত অর্থের দ্বারা "Nara Sinha Dutt Scholarship"-এর সৃষ্টি হয়। এই বৃত্তি ও ইহার সর্তসমূহ সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে (১৯৩৭ খৃঃ, পৃঃ ৩২৬, ৩২৭) লিখিত আছে—

"In September 1915, Babu Lalmohon Mookerjee B. L. placed at the disposal of the University of Calcutta 4 per cent Port Trust Debentures of the nominal value of Rs. 2,500/- for the purpose of founding from the interest thereof a scholarship in memory of the late Rai Nara Sinha Dutt Bahadur on the following conditions: —

1. That a scholarship to be called the 'Nara Sinha Dutt Scholarship' of Rs. 8/- per month tenable for one year be awarded to such successful candidate at the Matriculation Examination for the year who being a student of any of the H. E. schools in the Howrah District obtains the highest number of marks among the fellow students, but does not obtain a Government or any other scholarship.

2. That the said scholarship be continued to the same student for a further period of one year, provided that he produces a report of satisfactory progress and good

conduct from the Principal of the Institution. In this latter case, no new award shall be made for the year, and the next award shall be made after the expiry of that year.

3. That if more than one boy obtain equal marks at the Matriculation Examination in the Howrah District, the poorest among the competitors, as recommended by the Divisional Inspector of schools, shall get the scholarship.

4. That the scholarship shall be tenable in any college affiliated to the University of Calcutta in which the student desires to prosecute his studies.

5. That the remaining Rs. 4/- or any balance left out of the total amount of the annual interest be made over to the authorities of the 'Students' Fund' in connection with the Calcutta University Institute, to be spent by them in furtherance of the objects of the said Fund.

6. That the names of the scholars be published in the University Calendar."

'নরসিংহ দত্ত' বৃত্তি-প্রাপ্ত ছাত্রের তালিকা

কোন্ কোন্ স্কুল ও কলেজের ছাত্র কোন্ কোন্ বর্ষে এই বৃত্তি পাইয়াছে তাহা নীচে দেওয়া যাইতেছে। এই তালিকায় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রের নাম সন্নিবেশিত হইল।

খৃঃ ১৯১৭	নীরদবরণ ভট্টাচার্য	আন্দুল এইচ্ সি ই স্কুল
" ১৯১৮	ঐ	সেণ্টপলস্ সি এম্ কলেজ
" ১৯১৯	ধীরেন্দ্রনাথ দে	বালুটি এইচ্ ই স্কুল
" ১৯২০	ঐ	সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ
" ১৯২১	নিতাইচন্দ্র মল্লিক	ব্যাঁটরা এম্ এস্ পি সি এইচ্ ই স্কুল
" ১৯২২	ঐ	সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ
" ১৯২৩	বিভূতিভূষণ দাস	আই আর বেলিলিয়স ইনষ্টিটিউসন, হাওড়া

খৃঃ	১৯২৪	বিভূতিভূষণ দাস	সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজ
,,	১৯২৫	তারাচরণ দাস	বালী রিভার্স টমসন স্কুল
,,	১৯২৬	ঐ	বঙ্গবাসী কলেজ
,,	১৯২৭	বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী	ব্যাঁটরা এম্ এস্ পি সি এইচ্ ই স্কুল
		সুধীরকৃষ্ণ ঘোষ	সালকিয়া এ এস্ স্কুল
,,	১৯২৮	ঐ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
,,	১৯২৯	নির্মলকুমার ভট্টাচার্য	সালকিয়া এ এস্ স্কুল
,,	১৯৩০	ঐ	স্কটিস্ চার্চেস্ কলেজ
,,	১৯৩১	সুধীরচন্দ্র পাল	ঝাপড়দা ডিউক ইন্‌ষ্টিটিউসন
,,	১৯৩২	ঐ	নরসিংহ দত্ত কলেজ
,,	১৯৩৩	মনোজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	বালী রিভার্স টম্‌সন্ স্কুল
,,	১৯৩৪	ঐ	সেণ্টপলস্ কলেজ
,,	১৯৩৫	অজিতকুমার মণ্ডল	পানিত্রাস এইচ্ ই স্কুল
,,	১৯৩৬	ঐ	বঙ্গবাসী কলেজ*

'নরসিংহ দত্ত করোনেশন' মেডাল

কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট স্বর্গীয় পরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে শতকরা তিন টাকা সুদের এক হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ প্রদান করেন। পরেশ বাবুর স্বর্গীয় ভ্রাতা রায় নরসিংহ দত্ত বাহাদুরের স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে প্রতি বৎসর এই টাকার সুদ হইতে "নরসিংহ দত্ত করোনেশন মেডাল" নামে একটি স্বর্ণগর্ভ বা সোণার বেড়-যুক্ত পদক প্রদত্ত হইবে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভা নিম্নলিখিত সর্তে ধন্যবাদের সহিত উক্ত টাকা গ্রহণ করেন।

"1. That the medal shall be called 'Nara Sinha Dutt Coronation Medal.'

* কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ক্যালেণ্ডার, ১৯৩৭ খৃঃ, পৃঃ ৩২৭

2. That the medal shall be awarded every year to the student who obtains the highest number of marks in compulsory Sanskrit at the Matriculation Examination appearing from one of the schools of the District of Howrah and who studies in the Nara Shinha Dutt College.

3. That if more than one student satisfy the aforesaid conditions, the poorest of them recommended by the Divisional Inspector of schools shall get the medal.

4. That every year the name of the student shall be forwarded to Mr. G. M. Dutt and shall be published in the University Calendar."[১]

এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতী

কলিকাতা হাইকোর্টে প্রথম ওকালতী করিবার পর, নরসিংহ বাবু কিছুকাল এলাহাবাদ হাইকোর্টে যোগ দেন। এই সময় তিনি উর্দু ভাষা শিক্ষা করেন। ইহার পর তিনি হাওড়া কোর্টে আসেন এবং স্থায়িভাবে হাওড়ায় প্র্যাক্‌টিস্ করিতে থাকেন।

'বেলিলিয়স' উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও 'রেবেকা' দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠায় সহায়তা

হাওড়ায় থাকা কালীন নরসিংহ বাবুর সহিত হাওড়ার প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী আই আর বেলিলিয়স্ (I. R. Belilios) সাহেবের পরিচয় ও পরে বিশেষ সৌহার্দ ঘটে। বেলিলিয়স্ সাহেব জাতিতে ইহুদী; ব্যবসায়ে ইনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেন। নরসিংহ বাবু, বেলিলিয়স্ সাহেবের ও তাঁহার জননীর উকীল ছিলেন। নরসিংহ বাবুর পরামর্শ ও উৎসাহে বেলিলিয়স সাহেব বাঁটরায় একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় (I. R. Belilios H. E. School) ও রেবেকা[২] দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত নরসিংহ বাবু এই দুই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন।

---

১ Calcutta University Calendar, 1937, p. 326.

২ রেবেকা বেলিলিয়স সাহেবের পত্নী

১৯১০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নরসিংহ বাবুর মৃত্যু হয়। একদিন তাঁহার মৃত্যু-শয্যায় তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া বেলিলিয়স্ সাহেব বলেন—"Within a year we shall meet." কথাটা শীঘ্রই সত্যে পরিণত হয়। নরসিংহ বাবুর মৃত্যুর ৭।৮ মাস পরেই বেলিলিয়স সাহেব পরলোক গমন করেন।

বেলিলিয়স সাহেবের ট্রাষ্ট ডিড্

বেলিলিয়স সাহেব অপুত্রক ছিলেন। তিনি নরসিংহ বাবুর মধ্যম পুত্র সুরঞ্জন দত্তকে (কালো বাবু) পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি সুরঞ্জন বাবুকে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির মালিক করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সুরঞ্জন বাবু তাঁহাকে বলেন—"আমার বাবার যা আছে, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আপনি আপনার এই বিপুল অর্থে সাধারণের জন্য কিছু ভাল কাজ করে যান। এমন একটা কাজ করে যান, যাতে করে আপনি সাধারণের কাছে স্মরণীয় হতে পারেন।" সুরঞ্জন বাবুর প্ররোচনায় বেলিলিয়স সাহেব সমস্ত সম্পত্তির ট্রাষ্ট ডিড্ করিয়া যান এবং সুরঞ্জন বাবুকেই তিনি তাঁহার ষ্টেটের ট্রাষ্টি করেন। বসতবাড়ী ও তৎসংলগ্ন জমি তিনি সাধারণ পার্কের জন্য দিয়া যান। তাঁহার কৃত দলিলে নির্দেশ থাকে—সুরঞ্জন বাবু যদি ইচ্ছা করেন, ঐ বাড়ী এবং জমি নিজের হাতে রাখিতে পারেন, অথবা উহা সাধারণের কাজে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি বা অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটার জেনারেলের হাতে তুলিয়া দিতে পারেন।

'বেলিলিয়স পার্ক' প্রতিষ্ঠা

বেলিলিয়সের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী রেবেকা সিঙ্গাপুরে স্বামীর যে পশ্বাদির ব্যবসা ছিল, সুরঞ্জন বাবুকে তাহার অংশীদার ও কর্মাধ্যক্ষ করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে রেবেকার মৃত্যু হইলে, ঐ বাড়ী ও তৎসংলগ্ন প্রায় ১২২ বিঘা জমি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির হাতে দেওয়া হয় এবং মিউনিসিপ্যালিটি উহাকে সাধারণ পার্কে পরিণত করেন; উহার নাম হয় বেলিলিয়স পার্ক।

'নরসিংহ দত্ত কলেজ' স্থাপন

১৯২২ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণের পক্ষ হইতে হাওড়ায় একটি কলেজ স্থাপনের চেষ্টা হয়। কোন কারণে সে চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। মৃত্যুর পূর্বে নরসিংহ বাবুও একবার হাওড়ায় একটি কলেজ স্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার এ চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। গৌরমোহন বাবুর (পরেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র) প্ররোচনায় নরসিংহ বাবুর মধ্যম পুত্র হাওড়ায় তাঁহার পরলোকগত পিতার নামে একটি কলেজ স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হন। কলেজ স্থাপনের আনুষঙ্গিক খরচা প্রায় দশ হাজার টাকার উপর সুরঞ্জন বাবু দান করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কলেজ স্থাপনের অনুমতি দেন। নরসিংহ দত্ত কলেজ স্থাপনের ইতিহাস সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে যাহা পাওয়া যায়, এখানে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"Narasinha Dutt College, Howrah
First Affiliation, 1923
History of its Foundation

The want of a college at Hawrah was for a long time keenly felt both by the people of the town and of the district. With the growing educational demands of the people, the difficuly which the students of the district had to experience in securing admission for prosecuting their studies in Calcutta colleges had been increasing from year to year. To remove their long-felt want, the late Rai Nara Sinha Dutt Bahadur resolved, so far back as 1908, to establish a Second Grade College at Howrah, but before any definite step could be taken in that direction, the Rai Bahadur fell ill and breathed his last.

Babu Suranjan Dutt, the son of the late Rai Bahadur, was the sole trustee for premises No. 129, Belilios Road, Howrah, which consisted of about 100 bighas of land and a palatial building, formerly the residence of the late Mr.

I. R. Belilios with several outhouses. With a view to a Park being laid out in the said premises he transferred the management of the same to the Municipal Commissioners of Howrah.

In 1922, Babu Suranjan Dutt, in order to give effect to the pious wishes of his father, the late Rai Nara Sinha Dutt Bahadur, and to perpetuate his memory, formed a provisional committee of which he agreed to act as Secretary and applied to and got sanction of the University in 1923 to locate a Second Grade College called the 'Nara Sinha Dutt College' in the aforesaid mansion for teaching English, Vernacular, Mathematics, History, Logic and Sanskrit, giving a guarantee to maintain the college out of his own money if there would be any deficit. He personally supplied the whole of the money for the purchase of furniture and books for the Library."

হাওড়ার জনসাধারণ বহুদিন হইতে দুইটি বিষয়ের অভাব অনুভব করিতেছিলেন; একটি জলের কল, অপর একটি কলেজ। রায় বাহাদুরের চেষ্টায় হাওড়ায় জলের কল স্থাপিত হয় এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সুরঞ্জন বাবুর চেষ্টায় ও অর্থ সাহায্যের ফলে হাওড়ায় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল।

'নরসিংহ দত্ত' কলেজের আয়

১২৯নং বেলিলিয়স রোডে (হাওড়া) বেলিলিয়স পার্কে নরসিংহ দত্ত কলেজ অবস্থিত। উদ্যানস্থিত যে সুরম্য ত্রিতল অট্টালিকায় পূর্বে বেলিলিয়স সাহেব বাস করিতেন, সেই বৃহৎ অট্টালিকাটি এখন কলেজরূপে ব্যবহৃত হয়। এই বাড়ীর ভাড়া বাবদ্ হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি কলেজের নিকট হইতে মাসিক পঞ্চাশ টাকা গ্রহণ করেন এবং এই কলেজের পরিচালনার সাহায্যকল্পে তাঁহারা মাসিক তিনশত টাকা সাহায্য করেন। কলেজ স্থাপনের সময় হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির কাছ হইতে এককালীন

৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা অর্থসাহায্য পাওয়া যায়। নরসিংহ দত্ত ট্রাষ্ট হইতে (১৯২৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত) মাসিক ২৫০৲ সাহায্য আসে।*

বেলিলিয়স সাহেবের ট্রাষ্টের আয় হইতে তাঁহার নামে স্থাপিত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও তাঁহার পত্নী রেবেকার নামে স্থাপিত দাতব্য ঔষধালয়ের জন্য প্রয়োজন মত টাকা ব্যয় করিয়া যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে তাহার মধ্য হইতে মাসিক ১৫০৲ টাকা নরসিংহ দত্ত কলেজের সাহায্যার্থ দেওয়া হয়।

নরসিংহ দত্ত কলেজের প্রথম পরিচালক-সমিতি

কলেজ স্থাপনের সময় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ পরিচালক-সমিতির সদস্য ছিলেন—

১। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট

২। চারুচন্দ্র সিংহ এম্ এ, বি এল্, গভর্ণমেণ্ট প্লিডার

৩। নৃত্যধন মুখোপাধ্যায় বি এল্,
হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান

৪। মন্মথনাথ রায় এম্ এ, বি এল্

৫। গৌরমোহন রায় বি এল্

৬। ডাক্তার শরৎচন্দ্র দত্ত এল্ এম্ এস্

৭। সুরঞ্জন দত্ত

৮। গৌরমোহন দত্ত এম্ এ, বি এল্

৯। যতীন্দ্রমোহন দত্ত

কলেজ-কমিটির প্রথম সম্পাদক হন স্বর্গীয় নরসিংহ বাবুর মধ্যম পুত্র সুরঞ্জন দত্ত। পরে গৌরমোহন দত্ত মহাশয় (৺নরসিংহ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং স্বর্গীয় পরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র) সম্পাদক হন। কলেজের বর্তমান সম্পাদক—শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর দত্ত (৺নরসিংহ বাবুর তৃতীয় পুত্র)।

কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং বর্তমান প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ।

* এক লক্ষ টাকার সম্পত্তি ট্রাষ্ট করা হয়।

বর্তমান পরিচালক-সমিতি

নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া কলেজের বর্তমান পরিচালক-সমিতি গঠিত—

স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধি	২ জন
ছাত্রদিগের অভিভাবকবর্গের প্রতিনিধি	৩ ,,
৺নরসিংহ দত্ত মহাশয়ের পরিবারবর্গের মধ্য হইতে প্রতিনিধি	৫ ,,
১। ডাক্তার শ্রীশরৎচন্দ্র দত্ত	
২। শ্রীযুক্ত শ্রীগৌরমোহন দত্ত	
৩। ,, যুগলকিশোর দত্ত	
৪। ,, যতীন্দ্রনাথ দত্ত	
৫। ,, সন্তোষকুমার দত্ত	
শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায়	১ ,,
কলেজের অধ্যক্ষ	১ ,,
অধ্যাপকদিগের মধ্য হইতে প্রতিনিধি	২ ,,
মোট	১৩ জন

নরসিংহ বাবুর নামে রাস্তা

পূর্বে হাওড়ার যে রাস্তাটি Bantra Road নামে আখ্যাত ছিল, তাহা পরে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক নরসিংহ বাবুর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ Nara Sinha Dutt Road নামে অভিহিত হয়।

'সুরঞ্জন দত্ত বৃত্তি' প্রতিষ্ঠা

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নরসিংহ বাবুর দ্বিতীয় পুত্র সুরঞ্জন (কালো বাবু) বাবু পরলোকগত হন। তাঁহার পরলোক গমনের পর, তাঁহার পত্নী শ্রীমতী কমলা দত্ত মহোদয়া স্বামীর স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশে "সুরঞ্জন দত্ত স্কলারসিপে"র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থ বার্ষিক ৯৬৲ আয় হয়, এইরূপ কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিবার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে প্রদান করেন।

নিম্নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডার হইতে এই দানের সর্ত্তাবলী উদ্ধৃত হইল—

"Sm. Kamala Dutt, widow of the late Mr. Suranjan Dutt, with a view to perpetuate the memory of her husband, offered to make over sufficient money for the purchase of Government Promissory Notes so as to produce an annual income of Rs. 96/- for founding a scholarship on the following terms and conditions:—

(1) That a scholarship to be called the 'Surajan Dutt Scholarship' of Rs. 8/- a month tenable for one year be awarded to the student who obtains the highest number of marks at the Matriculation Examination appearing from any one of the schools of the District of Howrah and who studies in the Nara Sinha Dutt College but who does not obtain a Government or any other scholarship.

(2) That the said scholarship be continued to the same student for a period of one year, provided that he produces a certificate of satisfactory progress and good conduct from the Principal of the Nara Sinha Dutt College. In the event of the continuation of the scholarship as aforesaid, no award shall be made for the year and the next award shall be made after the expiry of that period.

(3) That if more than one student satisfy the aforesaid conditions, the poorest of them, as recommended by the Divisional Inspector of schools, shall get the scholarship.

(4) That if there be any surplus the same shall be made over to the 'Student Fund' of the Calcutta University Institute to be spent by them in furtherance of the objects of the said fund.

(5) That Rules 1 and 2 should be given effect to in such a way that taking the Nara Sinha Dutt Scholarship and the present scholarship into account every year, a student

satisfying the aforesaid conditions will get either N. D. Scholarship or S. D. Scholarship tenable for 2 years."[১]

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২৯এ জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভা ধন্যবাদের সহিত উল্লিখিত সর্তসমূহের সহিত এই দান গ্রহণ করেন।

'সুরঞ্জন দত্ত বৃত্তি'-প্রাপ্ত ছাত্রের তালিকা

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নিম্নলিখিত স্কুল ও কলেজ হইতে নিম্নলিখিত ছাত্রগণ এই বৃত্তি লাভ করেন—

১৯৩২ প্রভাতচন্দ্র ঘোষ—উলুবেড়িয়া উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

১৯৩৩ " —নরসিংহ দত্ত কলেজ

১৯৩৪ প্রণবনাথ ভাদুড়ী—সাঁত্রাগাছি কেদারনাথ ইনষ্টিটিউসন

১৯৩৫ " —নরসিংহ দত্ত কলেজ

১৯৩৬ দেবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী—শিবপুর দীনবন্ধু ইনষ্টিটিউসন

'নারায়ণচন্দ্র সেন' স্বর্ণপদক

নারায়ণচন্দ্র সেন এম্ এ মহোদয় নরসিংহ বাবুর জ্যেষ্ঠ জামাতা। ইনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইঁহার পরলোকগমনের পর নরসিংহ বাবুর তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর দত্ত মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে এক হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করেন। এই টাকার আয় হইতে প্রতি বৎসর সেই ছাত্রকে একখানি স্বর্ণপদক দেওয়া হইবে যিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অঙ্কে সর্বোচ্চ সংখ্যক নম্বর পাইবেন। তবে তাঁহার হাওড়া জিলার স্কুলসমূহের ছাত্র হওয়া চাই।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশ বৎসর কাল পঁচিশ জন ছাত্র[২] এই পুরস্কার পাইয়াছেন।

১ Calcutta University Calendar, 1937, p. 345.

২ ১৯২০, ১৯২৩, ১৯২৪, ১৯২৫ ও ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ—এই পাচ বৎসরে দুইজন করিয়া ছাত্র এই পুরস্কার লাভ করিয়াছে।

স্নবর্ণবণিক্ কথা ও কীর্তি

৺অধরলাল সেন
(১৮৫৫—৮৫)

৺অধরলাল সেনের বাড়ী

অধরলাল সেন

বংশ-পরিচয়

সুকবি অধরলাল সেন মহাশয়ের অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ ঘনশ্যাম সেন মহাশয় হুগলী জেলার অন্তর্গত সিঙ্গুর (তারকেশ্বরের সন্নিকটে অবস্থিত) হইতে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা সুবর্ণবণিক্।

অধরবাবুর অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ ঘনশ্যাম সেন মহাশয়ের পুত্র কানুরাম, কানুরামের পুত্র রামহরি, রামহরির পুত্র মথুরামোহন। এই মথুরামোহনের পুত্র রামগোপাল সেন। ইনিই অধরবাবুর পিতা।

বড়বাজারে আরমানী ষ্ট্রীটে অধরবাবুর পিতার সূতার কারবার ছিল। এই কারবারে তিনি বহু অর্থ উপার্জন করেন। তাঁহার ছয় পুত্র ও দুই কন্যা। রামগোপাল বাবুর পুত্রকন্যাদিগের মধ্যে অধরবাবু পঞ্চম ছিলেন। তাঁহাদের ৯৭নং বেণেটোলা ষ্ট্রীটের বাড়ী রামগোপাল বাবুই প্রস্তুত করান।

জন্ম ও ভ্রাতৃবর্গ

১২৬১ সালের ১৯শে ফাল্গুন (১৮৫৫ খৃঃ, ২রা মার্চ) শুক্রবার দোল পূর্ণিমার পূর্ব দিন রাত্রে অধরলাল জন্মগ্রহণ করেন। রামগোপাল বাবুর পূর্ব বাটী ২৯নং শঙ্কর হালদার লেনে (আহিরীটোলা) অধরলালের জন্ম হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ৪ জন সহোদর—তাঁহাদের নাম যথাক্রমে বলাইচাঁদ, দয়ালচাঁদ, শ্যামলাল ও রামলাল। সর্বজ্যেষ্ঠ বলাইচাঁদ একজন সাহিত্যসেবী ছিলেন। তাঁহার বিষয় ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। অধরলালের তৃতীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীযুক্ত শ্যামলাল সেন মহাশয় প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মেসার্স স্রোডার স্মিথ কোম্পানীর ক্যাসিয়ার ছিলেন। অধরবাবুর কনিষ্ঠ একটি সহোদর ও দুইটি সহোদরা। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর হীরালাল ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ১৯১৮ সালের ১৭ই মে ইনি পরলোক গমন করেন।

বিবাহ

অল্প বয়সেই অধর বাবুর বিবাহ হয়। তখন অধর বাবুর বয়স বার এবং তাঁহার পত্নীর বয়স সাত বৎসর। অধরবাবুর পত্নী খিদিরপুরনিবাসী রামচাঁদ শীলের জ্যেষ্ঠা কন্যা।

বিদ্যাশিক্ষা

বিবাহের ২।৩ বৎসর পরেই অধরলাল মাইনর পাশ করেন। তারপর ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি এই পরীক্ষায় অষ্টম স্থান অধিকারপূর্বক বৃত্তি লাভ করেন। এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত কলেজ হইতে ফার্ষ্ট আর্টস্ পাশ করেন। এই পরীক্ষাতে তিনি চতুর্থ স্থান অধিকারপূর্বক ইংরেজীতে "ডাফ্ স্কলারসিপ" (বৃত্তি) পান।

পাঠ্যাবস্থায় কাব্য-প্রকাশ

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দেই তাঁহার দুইখানি কাব্য গ্রন্থ, 'ললিতাসুন্দরী' ও 'মেনকা' প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রথম গ্রন্থ ললিতাসুন্দরীর একটি সমালোচনা বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত হয় (শ্রাবণ, ১২৮১)। তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—"লেখক অতি তরুণ বয়স্ক * * * বয়োবৃদ্ধি হইলে ইঁহার রচনা বিশেষ প্রশংসনীয় হইতে পারিবে।" প্রকৃত পক্ষে ললিতাসুন্দরী প্রকাশের সময় অধরলালের বয়স ছিল ১৯ বৎসর।

অধরলাল ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

প্রেসিডেন্সী কলেজেই অধরলাল বি এ পড়িতে লাগিলেন। এই সময় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। অধরলাল সম্বন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"ইংরাজী ১৮৭৩।৭৪ খৃষ্টাব্দে অধরলাল সেন আমার সহিত প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িয়াছিল। * * * সাহিত্যে তাহার বেশ অনুরাগ ছিল। * * কলেজে অধর সকলেরই সহিত মিশিত। সে বেশ মেধাবী ছেলে।

* * মাঝে মাঝে সে ইংরেজী ও বাংলাতে বই লিখিত ও আমাকে পাঠাইয়া দিত। একখানি বইয়ের কথা আমার বেশ স্মরণ আছে। সেখানি ইংরেজীতে লেখা। বইখানির নাম 'The Shrines of Sita-kund'। অধরের স্মৃতি-স্বরূপ বইখানি এখনও আমার লাইব্রেরীতে আছে।" (সুবর্ণবণিক্-সমাচার, অগ্রহায়ণ ১৩৩১ সাল, পৃঃ ২৭)

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে অধরলাল বি এ পাশ করেন। এই বৎসরে তাঁহার "নলিনী" ও "কুসুম-কানন ১ম ভাগ" (দুইখানিই কাব্য গ্রন্থ) প্রকাশিত হয়।

'লিটোনিয়ানা' প্রকাশ

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পান। তখন তাঁহার বয়স মাত্র চব্বিশ বৎসর। এই বৎসর লিটোনিয়ানা (Lyttoniana) নামে তাঁহার একখানি কাব্য প্রকাশিত হয়। ইহা ভারতবর্ষের তদানীন্তন বড়লাট The Right Hon. Lord Lyttonএর কবিতার অনুবাদ।

চট্টগ্রাম যাত্রা

কর্ম পাইয়াই তিনি চট্টগ্রামে গমন করেন। সে সময় চট্টগ্রামে রেল হয় নাই। তখন জাহাজে করিয়া চট্টগ্রাম যাইতে হইত। সেখানে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে শিবচতুর্দশী উৎসবের সময় অধরলাল সীতাকুণ্ড গমন করেন এবং সীতাকুণ্ড, বাড়বকুণ্ড ও চন্দ্রনাথ দর্শন করিয়া ইংরেজীতে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধটি এসিয়াটিক সোসাইটির (বাংলার) একটি অধিবেশনে, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ, পঠিত হয়। পরে ইহা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই চট্টগ্রাম হইতে অধরলাল যশোহর বদলী হন। তারপর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রেল তিনি কলিকাতায় বদলী হইয়া ডেপুটি কলেক্টর নিযুক্ত হন।

অধরলালের বন্ধুবর্গ

পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, বঙ্কিমচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ও এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সভাপতি টনি সাহেব (Charles Tawney) অধরলালকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর অধরলালের পিতা রামগোপাল সেন মহাশয় পরলোক গমন করেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার নিউ বেঙ্গল প্রেস হইতে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন কর্তৃক তাঁহার "কুসুমকানন" নামক কাব্য-গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

অধর বাবুর কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। তাঁহার চারিটি কন্যা। ইঁহাদের মধ্যে তৃতীয় কন্যাটি এবং তাঁহার বিধবা পত্নী জীবিত আছেন। অধর বাবুর প্রথম জামাতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর চন্দ্র চক্রধরপুরে ডাক্তারি করেন।

এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য

অধরলাল কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। কলিকাতায় থাকিতে তিনি ইহার অধিবেশনাদিতে নিয়মিতভাবে যোগদান করিতেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে অধরলাল ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ফেলো নির্বাচিত হন (Vide: Minutes of the Syndicate of Calcutta University of 26th March 1884, pp. 108, 109)। এই নির্বাচনের পর তিনি Faculty of Artsএর অন্যতম সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন।

অধরলাল যে সময়ে কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ফেলো হন, তখন আমরা আর দুইজন সুবর্ণবণিক্ মহোদয়কে ইউনিভার্সিটির ফেলোরূপে দেখিতে পাই। ইঁহাদের একজন রায় কানাইলাল দে বাহাদুর এফ্ সি এস্ এবং অন্যজন বাবু দুর্গাচরণ লাহা (পরে মহারাজা)। ফেলো নির্বাচিত হইবার

পর অধরলাল সেনেটের ও Faculty of Arts এর অধিবেশনে* যোগদান করেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর কলিকাতা ইউনিভারসিটির যে উপাধি বিতরণ সভা (Convocation) হয়, তাহার সভাপতিরূপে ভাইস-চ্যান্সেলার Hon. C. P. Ilbert C. I. E. সাহেব তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতার মধ্যে অধরলালের নামোল্লেখ করেন।

অধরলালের ধর্ম-প্রবৃত্তি

কলিকাতায় থাকিতে থাকিতে ১৮৮৩ বা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে অধরলাল রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গলাভ করেন (রামকৃষ্ণ কথামৃত, প্রথমভাগ, পৃষ্ঠা ৬১)। তাঁহার ধর্মপিপাসা এই সময় প্রবল হয়। অধরলালের এই প্রবৃত্তির মূল তাঁহার পিতা রামগোপাল হইতে উদ্ভূত হয়। তিনি অতিশয় ধর্মপরায়ণ ছিলেন। ৯৭নং বেণেটোলা ষ্ট্রীটে নূতন বাড়ী করিয়া তিনি দুর্গাপূজার প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের উপযুক্ত বংশধরগণ এখনও পর্যন্ত সেই পূজা বজায় রাখিয়াছেন। এই দুর্গাপূজা ব্যতীত তাঁহাদের গৃহে বার মাসে অন্যান্য পূজা ও পার্বণাদির অনুষ্ঠান হইত। এই সমস্ত পারিপার্শ্বিক ঘটনার ভিতর দিয়া অধরলালের ধর্মজীবনের বিকাশ হইতেছিল। উপযুক্ত সময়ে পরমহংসদেবের সহিত পরিচয়ে ইহার অপূর্ব ফল ফলে।

অধরলালের মৃত্যু

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী মঙ্গলবার তিনি মাণিকতলার Distillery পরিদর্শন করিয়া আসিবার সময় শোভাবাজার ষ্ট্রীটে ঘোড়া হইতে পড়িয়া

* সেনেটের অধিবেশন—
১৫ই মার্চ, ১৮৮৪
১৯শে এপ্রেল, ১৮৮৪—এ সময়ে Hon. H. J. Reynolds ভাইস্‌চ্যান্সেলার।
৮ই নবেম্বর, ১৮৮৪—এই অধিবেশনে অধরলাল ও রায় বাহাদুর কানাইলাল উভয়েই সভার বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন।

Faculty of Arts এর অধিবেশন—
৩রা এপ্রেল, ১৮৮৪
৩রা জানুয়ারী, ১৮৮৫

উক্ত তারিখের Minutes দ্রষ্টব্য।

যান। এই পতনের ফলে তাঁহার বাম হাতের কব্জি ভাঙ্গিয়া যায়। পরে তিনি ধনুষ্টঙ্কার রোগে আক্রান্ত হন। ৮ দিন ভুগিয়া তিনি ১২৯১ সালের ২রা মাঘ বুধবার ত্রয়োদশীর দিন (১৮৮৫ খৃঃ, ১৪ই জানুয়ারী) প্রাতে আন্দাজ ৬টার সময় পরলোকগমন করেন।

অধরলালের বাড়ীতে রামকৃষ্ণ পরমহংস

তাঁহাদের বাড়ীতে পরমহংসদেব বহুবার ভক্তগণের সহিত শুভাগমন করিয়াছেন। এই বাড়ীর বৈঠকখানা ও ঠাকুর দালান বহুবার ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তগণের কীর্তনানন্দে মুখরিত হইয়াছে এবং তীর্থস্থানে* পরিণত হইয়াছে।

অধরলাল সুকবি ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন বিশিষ্ট ভক্ত। পরমহংসদেব অধরবাবুকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি ভাগ্যবান, তাঁহাকে "ঠাকুর বলেছিলেন, তুমি আমার আত্মীয়" (রামকৃষ্ণ-কথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ৪২)।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর, অধরবাবুদের বাড়ীতেই পরমহংসদেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় হয়। বঙ্কিমবাবু অধরবাবুর বন্ধু ছিলেন। এই দিনের ঘটনাপ্রসঙ্গে পরমহংসদেবের অন্যতম ভক্ত "শ্রীম" মহাশয় তাঁহার "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে"র পরিশিষ্ট খণ্ডের ১০১ হইতে ১৩২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এতই চিত্তাকর্ষক যে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

"আজ ঠাকুর অধরের বাড়ী আসিয়াছেন ; ২২শে অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণা চতুর্থী ; শনিবার, ইংরেজী ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে। ঠাকুর পুষ্যানক্ষত্রে আগমন করিয়াছেন।

অধর ভারি ভক্ত, তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। বয়ক্রম ২৯।৩০ বৎসর হইবে। ঠাকুর তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসেন। অধরেরও কি ভক্তি! সমস্ত দিনের আপিষের খাটুনির পর, মুখে ও হাতে একটু জল দিয়াই প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিতে যাইতেন।

---

* তাঁহাদের (অধরবাবুদের) বাটীর বৈঠকখানা ও ঠাকুর দালান তীর্থ হইয়া আছে।—রামকৃষ্ণ-কথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ৪৩।

তাঁহার বাড়ী শোভাবাজার বেণেটোলা। সেখান হইতে দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে ঠাকুরের কাছে গাড়ী করিয়া যাইতেন। এইরূপ প্রত্যহ প্রায় দুই টাকা গাড়ীভাড়া দিতেন। কেবল ঠাকুরকে দর্শন করিবেন, এই আনন্দ। তাঁহার শ্রীমুখের কথা শুনিবেন, এমন সুবিধা প্রায় হইত না। পৌঁছিয়াই ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন; কুশল প্রশ্নাদির পর তিনি মা কালীকে দর্শন করিতে যাইতেন। পরে মেজেতে মাদুর পাতা থাকিত, সেখানে বিশ্রাম করিতে বলিতেন। অধরের শরীর পরিশ্রমের জন্য এত অবসন্ন থাকিত যে, তিনি অল্পক্ষণ মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইতেন। রাত্রি ৯।১০টার সময় তাঁহাকে উঠাইয়া দেওয়া হইত। তিনিও উঠিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আবার গাড়ীতে উঠিতেন। তৎপরে বাড়ী ফিরিয়া যাইতেন।

অধর ঠাকুরকে প্রায়ই শোভাবাজারে বাড়ীতে লইয়া যাইতেন। ঠাকুর আসিলে তথায় উৎসব পড়িয়া যাইত। ঠাকুর ও ভক্তদের লইয়া অধর খুব আনন্দ করিতেন ও নানারূপে তাঁহাদিগকে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইতেন।

একদিন ঠাকুর তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছেন। অধর বলিলেন, আপনি অনেক দিন এ বাড়ীতে আসেন নাই, ঘর মলিন হইয়াছিল; যেন কি এক রকম গন্ধ হয়েছিল; আজ দেখুন, ঘরের কেমন শোভা হয়েছে। আর কেমন একটি সুগন্ধ হয়েছে। আমি আজ ঈশ্বরকে ভারি ডেকে-ছিলাম। এমন কি, চোখ দিয়া জল পড়েছিল। ঠাকুর বলিলেন, 'বল কি গো!' ও অধরের দিকে সস্নেহে তাকাইয়া হাসিতে লাগিলেন।

আজও উৎসব হইবে। ঠাকুরও আনন্দময় ও ভক্তেরাও আনন্দে পরিপূর্ণ। কেন না, যেখানে ঠাকুর উপস্থিত, সেখানে ঈশ্বরের কথা বৈ আর কোন কথা হইবে না। ভক্তেরা আসিয়াছেন ও ঠাকুরকে দেখিবার জন্য অনেকগুলি নূতন নূতন লোক আসিয়াছে। অধর নিজে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি তাঁহার কয়েকটি বন্ধু ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা নিজে ঠাকুরকে দেখিবেন ও বলিবেন, যথার্থ তিনি মহাপুরুষ কি না?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যবদনে ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। এমন সময় অধর কয়েকটি বন্ধু লইয়া ঠাকুরের কাছে আসিয়া বসিলেন।

অধর (বঙ্কিমকে দেখাইয়া, ঠাকুরের প্রতি)। মহাশয় ইনি ভারি পণ্ডিত, অনেক বই-টই লিখেছেন। আপনাকে দেখতে এসেছেন। ইঁহার নাম বঙ্কিমবাবু।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। বঙ্কিম তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!

বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে)। আর মহাশয়! জুতোর চোটে (সকলের হাস্য)। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।"

পরমহংসদেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয়ের এই সূত্রপাত। তারপর ধর্মবিষয়ে পরমহংসদেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বহু আলোচনা হইল। অধরবাবুও মধ্যে মধ্যে এ আলোচনায় যোগ দিতেছিলেন।

পরমহংসদেব ও অধরলাল

অধরবাবুর বয়স যখন আটাশ বৎসর সেই সময়ে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তখন তিনি চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতায় বদলী হইয়াছেন। এই পরিচয়ে তাঁহার জীবনের গতি ধর্মপথে পরিচালিত হয়।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল (২৬শে চৈত্র) শুক্লা প্রতিপদ তিথি রবিবার—এই দিন অধরলাল তাঁহার একটি বন্ধুকে লইয়া পরমহংসদেবকে দর্শনের জন্য দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে গমন করেন। পরমহংসদেবের নিকট অধরবাবুর যাওয়া, এই প্রথম।

যে বন্ধুটিকে লইয়া অধরলাল পরমহংসদেবের নিকট যান—তাঁহার নাম সারদাচরণ, তিনি স্কুলের ডেপুটি ইন্স্পেক্টর, সম্প্রতি পুত্রশোকে সন্তপ্ত। ইঁহারি শোক অপনোদনের জন্য পরমহংসদেবের নিকট অধরলালের গমন।

যথাসময়ে অধরলাল ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, পরমহংসদেব কয়েকটি ভক্তের সহিত আলাপ করিতেছেন। নানা প্রসঙ্গের পর তিনি অধরলালের পরিচয় লইয়া সারদাচরণ বাবুর শোকশান্তির জন্য অনেক তত্ত্বকথা

শুনাইলেন। কিছু পরে তিনি ঘরের উত্তরদিকের বারান্দায় অধরলালকে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বলিলেন—"তুমি ডিপুটি, এ পদও ঈশ্বরের অনুগ্রহে হয়েছে। তাঁকে ভুলো না। কিন্তু জেনো, সকলের এক পথে যেতে হবে। এখানে দু'দিনের জন্য।"[১]

এই কথোপকথনের একুশ মাস পরে—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের, ১৪ই জানুয়ারী অধরলাল পরলোকগমন করেন। পরমহংসদেবের "এখানে দু'দিনের জন্য" —এই ইঙ্গিত যেন অধরলালকে স্মরণ করাইয়া দিল, তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। পরমহংসদেব অধরলালকে বড় ভালবাসিতেন,—অধরলালের পরলোক গমনের কথা শুনিয়া তিনি "অনেকক্ষণ ধরিয়া মার কাছে কাঁদিয়াছিলেন।"[২]

প্রথম আলাপের কিছু পরে ঠাকুর অধরলালকে অনেক উপদেশ দিলেন। সবই তত্ত্বকথা—মতিকে ভগবদ্-অভিমুখী করিবার উপদেশ। এখানে কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল—

"সংসার কর্মভূমি। এখানে কর্ম কর্‌তে আসা; যেমন দেশে বাড়ী, ক'লকাতায় গিয়ে কর্ম করে।···* * *···

কিছু কর্ম করা দরকার—সাধন। তাড়াতাড়ি কর্মগুলি শেষ ক'রে নিতে হয়। ... * ... খুব রোক চাই। তবে সাধন হয়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

তাঁর নামবীজের খুব শক্তি। অবিদ্যা নাশ করে। বীজ এত কোমল, অঙ্কুর এত কোমল; তবু শক্ত মাটী ভেদ করে। মাটি ফেটে যায়।

কামিনীকাঞ্চনের ভিতর থাক্‌লে মন বড় টেনে লয়। সাবধান থাক্‌তে হয়। ত্যাগীদের অত ভয় নাই। ঠিক ঠিক ত্যাগী কামিনীকাঞ্চন থেকে তফাতে থাকে। তাই সাধন থাক্‌লে, ঈশ্বরে সর্বদা মন রাখতে পারে।

ঠিক ঠিক ত্যাগী—যারা সর্বদা ঈশ্বরে মন দিতে পারে। তারা মৌমাছির মত কেবল ফুলে বসে; মধুপান করে। সংসারে কামিনীকাঞ্চনের

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ২য় ভাগ, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪২

২ ঐ " " " পাদটীকা

ভিতর যে আছে, তার ঈশ্বরে মন হ'তে পারে; আবার কখন কখন কামিনীকাঞ্চনেও মন হয়। যেমন সাধারণ মাছি সন্দেশেও বসে, আর পচা ঘায়েও বসে।...* * * *...ঈশ্বরে সর্বদা মন রাখবে। প্রথমে একটু খেটে নিতে হয়। তারপর পেন্সন ভোগ করবে।"[১]

উপরি উক্ত সাক্ষাৎ ও আলাপের পর ২রা জুন শনিবার (১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ) ঠাকুর বেণেটোলায় অধরলালের বাড়ীতে যান। অধরলালের বাড়ীতে ঠাকুরের যাওয়া—এই প্রথম। ইহার পর বহুবার ঠাকুর অধরলালের বাড়ী গিয়াছেন।

যে সময়ে ঠাকুর অধরলালের বাড়ী উপস্থিত হইলেন, সে সময় সেখানে কলহান্তরিতা কীর্তন হইতেছিল। ঠাকুরও এই কীর্তনে যোগদান করেন। কীর্তনের পর তিনি ভক্তগণের সহিত অধরের বাড়ী প্রসাদ গ্রহণ করেন।[২]

প্রথম দর্শনের পর হইতে অধরলাল, অবসর পাইলেই পরমহংসদেবের নিকট যাইতেন। আর তাঁহার বাড়ীতেও কীর্তন, পূজা বা কোন ধর্মানুষ্ঠান হইলে ঠাকুর ভক্তদের লইয়া তথায় শুভাগমন করিতেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ—দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে ঠাকুর ভক্তগণের সহিত নানা আলাপ করিতেছেন। এমন সময় অধরলাল আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিগো, এতদিন আস নাই কেন?"[৩] ইহার পূর্বে কিছুকাল অধরলাল প্রত্যহ সন্ধ্যায় আপিষের পর ঠাকুরের কাছে আসিতেন। মধ্যে কিছুদিন আসা বন্ধ ছিল, তাই এই প্রশ্ন। প্রশ্নের উত্তরে অধরলাল বলিলেন—"আজ্ঞা, অনেক গুণো কাজে পড়ে গিছলাম। ইস্কুলের দরুণ সভা এবং আর আর মিটিংএ যেতে হয়েছিল।" পরমহংসদেব বলিলেন—"মিটিং স্কুল এই সব লয়ে একেবারে ভুলে গিছলে?" তারপর তিনি বলিলেন—"ছাখো, এ সব অনিত্য—মিটিং, ইস্কুল, আপিষ, এ সব অনিত্য। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। সব মন দিয়ে তাঁকেই আরাধনা করা উচিত। * * *

---

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ২য় ভাগ, পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ৪৩
২ ঐ " " পৃঃ ১৭৩, ১৭৪
৩ ঐ ৪র্থ ভাগ, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ ১০১, ১০২

এ সব অনিত্য। শরীর এই আছে, এই নাই। তাড়াতাড়ি তাঁকে ডেকে নিতে হয়।”

অধরলালের মৃত্যু সন্নিকট জানিয়াই যেন ঠাকুর এই ভাবে তাঁহাকে দ্বিতীয়বারও উপদেশ দিলেন। অধরলাল ২।৪ দিন না আসিলে ঠাকুর ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। আসিয়া তিনি দূরে বসিলে তাঁহাকে আরও কাছে বসিতে ইঙ্গিত করিতেন।”[১]

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর দক্ষিণেশ্বর হইতে ভক্তগণের সহিত ঠাকুর অধরলালের বাড়ী আসিয়াছেন। সেদিন অধরলালের গৃহে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে। কারণ প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া বৈষ্ণবচরণের কীর্তন-গান হইবে। “ঠাকুরের আদেশ-ক্রমে অধর প্রত্যহ আপিষ হইতে আসিয়াই বৈষ্ণবচরণের মুখ হইতে কীর্তন শুনেন।”[২] একদিন অধরলালের গৃহে সুপ্রসিদ্ধ সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ও উপস্থিত। কীর্তন শেষে পরমহংদেব গান করিলেন। গান সমাপ্ত হইলে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও অন্যান্য ভক্তেরা এদিন পরমহংসদেবের সহিত অধরলালের গৃহে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ইহার পর নানা তত্ত্বকথা চলিতে লাগিল। এই সময় “বঙ্গবাসী” পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর তখন সাকার ও নিরাকার লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলেন। আলোচনার মাঝে মাঝে গানও হইতেছিল, গায়ক স্বয়ং পরমহংসদেব। এদিনের বিস্তৃত বিবরণের জন্য কথামৃত দ্বিতীয় ভাগের (৫ম সংস্করণ) ১৭০-১৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর (১২৯১ সনের ২২শে ভাদ্র) আজ অধরলালের বাড়ী মহাসমারোহ। ঠাকুর, নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) ও অন্যান্য ভক্তদের সহিত শুভাগমন করিয়াছেন। আজ প্রথমে নরেন্দ্র গান করিলেন। তারপর বৈষ্ণবচরণ কীর্তন ধরিলেন। কীর্তন শুনিতে শুনিতে পরমহংসদেব সমাধিস্থ হইলেন। চতুর্থ ভাগ, রামকৃষ্ণ-কথামৃত হইতে এদিনের বর্ণনা কিছু কিছু উদ্ধৃত হইল—

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৩য় ভাগ, ৩য় সংস্করণ পৃঃ ১১০
২ ঐ ২য় ভাগ, পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ১৭১

"কীর্তনীয়া যখন আঁখর দিচ্চেন, 'হরিপ্রেমের বন্যে ভেসে যায়', ঠাকুর দণ্ডায়মান হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। ... ... সেই অপূর্ব নৃত্য দেখিয়া নরেন্দ্র প্রভৃতি ভক্তেরা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, সকলেই ঠাকুরের সঙ্গে নাচিতে লাগিলেন।

নাচিতে নাচিতে ঠাকুর একেবারে সমাধিস্থ হইতেছেন। তখন অন্তর্দশা। মুখে একটি কথা নাই। শরীর সমস্ত স্থির। ভক্তেরা তখন তাঁহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন।... ... ... আজ অধরের বৈঠকখানা ঘর শ্রীবাসের আঙ্গিনা হইয়াছে। হরিনামের রোল শুনিতে পাইয়া রাজপথে অসংখ্য লোক জমিয়া গিয়াছে।[১] বেলা ৩ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত কীর্তন ও ধর্মালোচনা—সকলেই আনন্দে পরিপূর্ণ।

কীর্তনাদির শেষে অধরলাল ঠাকুর ও ভক্তগণের সেবার জন্য তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন। তিনি আজ তাঁহাদের জন্য অনেক আয়োজন করিয়াছেন। মহেন্দ্র ও প্রিয়নাথ—মুখুজ্যে ভ্রাতৃদ্বয়কে, ঠাকুর বলিতেছেন, 'কিগো তোমরা খেতে যাবে না?'

তাঁহারা বিনীতভাবে বলিতেছেন—'আজ্ঞা, আমাদের থাক্।'

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। এঁরা সবই কচ্চেন, শুধু ঐটেতেই সঙ্কোচ।

একজনের শ্বশুর ভাসুরের নাম হরি, কৃষ্ণ এই সব। এখন হরিনাম ত করতে হবে?—কিন্তু 'হরেকৃষ্ণ' বলবার যো নাই। তাই সে জপ কচ্চে—

'ফরে ফৃষ্ট, ফরে ফৃষ্ট, ফৃষ্ট ফৃষ্ট ফরে ফরে।
ফরে রাম, ফরে রাম, রাম রাম ফরে ফরে॥'

অধর জাতিতে সুবর্ণবণিক্। তাই ব্রাহ্মণভক্তেরা কেহ কেহ প্রথম প্রথম তাঁহার বাড়ীতে আহার করিতে ইতস্তত করিতেন। কিছুদিন পরে যখন তাঁহারা দেখিলেন, স্বয়ং ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ওখানে খান, তখন তাঁহাদের খট্‌কা ভাঙ্গিল।"[২]

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য় ভাগ, পঞ্চম সংস্করণ, পৃঃ ১৪৬, ১৪৭
২ ঐ " " পৃঃ ১৫০

দেড় বৎসর মাত্র পরমহংসদেবের সাহচর্য লাভ করিয়া তিনি স্বীয় স্বভাব ও ঐকান্তিক নিষ্ঠাগুণে পরমহংসদেবের "আত্মীয়" মধ্যে গণ্য হইতে পারিয়াছিলেন।

অধরলালের পুস্তকাবলী

অধরলাল সুকবি ও সুলেখক ছিলেন। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই তিনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত খাতা হইতে তাঁহার গ্রন্থগুলির নাম ও তাহাদের প্রকাশের কাল উদ্ধৃত হইল—

		প্রকাশের সময়
১।	ললিতাসুন্দরী	১৪ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃঃ
২।	মেনকা	২৪শে নভেম্বর, ঐ
৩।	নলিনী	১৩ই জুন, ১৮৭৭ খৃঃ
৪।	কুসুমকানন ১ম ভাগ	৮ই অক্টোবর, ঐ
	(১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়।)	
৫।	লিটোনিয়ানা (Lyttoniana) ১ম ভাগ	৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৯ খৃঃ
৬।	কুসুমকানন ২য় ভাগ*	
৭।	The Shrines of Sitakund	১৮৮৪ খৃঃ

১৮৭৪ হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এগার বৎসরের মধ্যে অধরবাবুর উপরি-লিখিত ৭খানি বই প্রকাশিত হয়।

সংবাদ-পত্রে রচনার প্রশংসা

তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভার প্রশংসা অনেক পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। "কলিকাতা রিহ্বিউ" পত্রিকায় সে সময়ে তাঁহার সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে যাহা লেখা হয়, তাহা এখানে প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত হইল—

"Babu Adharlal Sen writes in a style that shows evident marks of thought and cultivation. A distinguished

* ইহার প্রকাশের তারিখ খাতায় দেওয়া নাই। মাত্র বইখানির উল্লেখ আছে।

graduate of the Calcutta University, he has well and wisely devoted his talents to the improvement of the literature of his own country: and in this field we confidently predict for him a highly successful career. The sentiments breathed in the poems before us are such as befit a gentleman and scholar—refined and tender ; the language is chaste and well-chosen, and the versification though not always perfect is generally smooth and agreeable. We shall look with interest for further contributions to the Bengalee literature from the Babu's accomplished pen."

কর্মস্থানে সুনাম

কর্মস্থানেও অধরলাল সুনাম অর্জন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বোর্ড অফ্ রেভিনিউ হইতে তাঁহার পরিবারবর্গকে যে পত্র লেখা হয়, তাহা দ্বারা জানা যায় যে, তিনি একজন সুদক্ষ ও বিজ্ঞ কর্মচারী ছিলেন—

"The Board regret the death of Babu Adharlal Sen who was a young officer of ability and prudence." (Letter No. 68B, dated 28th January 1885, para 2).

অধরলালের জনপ্রিয়তা

জনসাধারণের মধ্যেও তিনি প্রিয় ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শোক-সভার সভাপতিরূপে মিঃ এইচ্ জে এস্ কটন সাহেব যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি যে কিরূপ গুণবান্ ছিলেন, তাহাও বেশ বোঝা যায়—

"We miss in our midst the face of a friendly visitor who was present at our last meeting. Babu Adharlal Sen was a man full of energy, enthusiasm and hope. Young in years and vigorous in body, he was already with us in sympathy. His life was cut short by an accident a few days after our meeting. It is impossible not to labour under a sense of depression and sorrow when we see his place vacant and reflect how much fulfilment has been disappointed, how bright a promise has been blighted by his premature death."

Positivists' meetingএর সভাপতিরূপে কটন সাহেব এই বক্তৃতা দেন।

পুস্তকাবলীর আলোচনা

লিটোনিয়ানা—অধরলাল সেন প্রণীত "লিটোনিয়ানা" কাব্য ১ম ভাগ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থোক্ত আটাশটি কবিতা লর্ড লিটনের বিভিন্ন ইংরেজী কবিতার বঙ্গানুবাদ। সেই কারণেই এই গ্রন্থের নাম "Lyttoniana" হইয়াছে এবং গ্রন্থকার গ্রন্থখানি লর্ড লিটনের নামেই উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহা ডিমাই ১২ পেজী আকারে ৮৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ইহা ব্যতীত গ্রন্থারম্ভে "উদ্দীপনা" নামক নয় পৃষ্ঠাব্যাপী একটি কাব্য-সূচনা আছে। প্রত্যেক কবিতার পাদটীকায় কবি নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তিনি কোন্ ইংরেজী কবিতা অবলম্বনে উহা অনুবাদ করিয়াছেন। নিম্নে কবিতা কয়টির নাম ও উহা কোন্ কোন্ কবিতার অনুবাদ তাহা প্রদত্ত হইল।

'লিটোনিয়ানা'র বিষয়-বস্তু

১।	উদ্দীপনা	*Prologue, The Wanderer, 1876, p. 9.*
২।	ভবিতব্য	*Fatality, The Wanderer, 1876, p. 18.*
৩।	উপভোগ	*Possession, Fables in Song, Vol. I, 1874, p. 25.*
৪।	প্রণয়-সঙ্গীত	*The Canticle of Love, Clytemnestra and Poems Lyrical and Descriptive, p. 159; The Wanderer, 1876, p. 130.*
৫।	কোকিল	*The Swallow, Clytemnestra and Poems Lyrical and Descriptive, p. 151.*
৬।	সঙ্গীত	*Song, The Wanderer, 1876, p. 60.*

৭। পার্থিব	*Earth's Havings, Clytemnestra, etc., p. 156; The Wanderer, 1876, p. 126.*
৮। দুজনে আবার	*Meeting Again, Clytemnestra etc., p. 152; The Wanderer, 1876, p. 123.*
৯। গবাক্ষের পাশে	*At Her Casement, Clytemnestra etc., p. 114.*
১০। শেষ আবেদন	*The Last Remonstrance, Clytemnestra etc., p. 291.* The poem has been included in *The Wanderer,* but in a modified form *(vide p. 109).*
১১। সনেট	*Divided Lives, Clytemnestra etc., p. 164; The Wanderer, 1876, p. 94.*
১২। রহস্য	*Changes, Clytemnestra, p. 212; Imperfection, Poems Historical and Characteristic, p. 285.*
১৩। সসেমিরা	*Astarte, Clytemnestra etc., p. 226; Fata Morgana, The Wanderer, 1876, p. 183.*
১৪। বেলা	*Little Ella, Clytemnestra etc., p. 160; The Wanderer, 1876, p. 208.*
১৫। পদাঙ্ক	*A Footstep, The Wanderer, 1876, p. 93; Clytemnestra etc., p. 163.*
১৬। বাসনা	*Desire, The Wanderer, 1876, p. 16.*
১৭। মোহ	*Trance, The Wanderer, 1876, p. 20.*
১৮। অতীত তরঙ্গ	*The Comtesse de Nevers to Lord*

		Alfred Vargrave, Lucile, 1876, p. 96.
১৯।	অন্তিম	*The Utmost, The Wanderer, 1876, p. 50; Clytemnestra etc., p. 125.*
২০।	জন্মান্তরীণ	*Sorcery, The Wanderer, 1876, p. 118.*
২১।	ইতালী	*The Magic Land, The Wanderer, 1876, p. 15.*
২২।	সান্ত্বনা	*Consolation, The Wanderer, 1876, p. 186.*
২৩।	ঝটিকা	*The Storm, The Wanderer, 1876, p. 57.*
২৪।	রাক্ষসী	*The Vampire, The Wanderer, 1876, p. 105.* The translation of the third stanza is not given here, as some parts of it do not appear to be suited to Bengali ideas.
২৫।	মেঘ	*Fables in Song, Vol. I, 1874, p. 51.*
২৬।	বৃক্ষ	*Fables in Song, Vol. I, 1874, p. 188.*
২৭।	নিশীথে	*How these songs were made, The Wanderer, 1876, p. 137.*
২৮।	অন্তিম কুসুমাঞ্জলি	*Requiescat, The Wanderer, 1876, p. 192.*

পুস্তকখানি কলিকাতার ৩৮নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটস্থ নিউ বেঙ্গল প্রেসে জে এন্ বিদ্যারত্ন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'লিটোনিয়ানা'র আলোচনা

কবি অধরলাল সর্বত্র আক্ষরিক অনুবাদ করিবার চেষ্টা করেন নাই; সুন্দর সুন্দর ভাবসমূহকে যতদূর সম্ভব মূলানুযায়ী রাখিয়া অনেকস্থলে তিনি কবিতার ভাব অবলম্বনে অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাতে কোথাও

কোথাও তাঁহার কল্পনা ও কাব্যশক্তির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। মূল কবিতার সহিত তাঁহার অনুবাদের সামঞ্জস্য দেখাইবার জন্য নিম্নে মূল সহ কয়েকটি কবিতার অনুবাদ উদ্ধৃত হইল—

উদ্দীপনা

I

জনমে হরষ এক বিষাদ সাগরে — পৃঃ XI
পদার্থ শ্মশানে ফোটে শ্মশানকুসুম।
নহিলে আশার শবে কেন বা আবরে
ভালবাসা,—দিয়ে ফুল, বিষাদকুঙ্কুম ?
শীতল করেতে কেন দেয় অলঙ্কার ?
ছড়ায় গোলাপ কেন বিজন কবরে ?
অভিষিক্ত করি আনি সাগরের পার,
কেন বা সমাধি দেয় মৃত বীরবরে ?

There is a pleasure that is born of pain.
The grave of all things hath its violet.
Else why should Love with holy rites be fain
To deck the bier of Hope, and robe Regret?
Why put the posy in the cold clay hand?
Why plant the rose above the lonely grave?
Why bring the embalm'd corpse across the wave,
And deem the dead more near in native land?

The Wanderer, 1876, p. 9.

IV

কে তুলিতে পারে, বল, কণ্টক বিষাদ, — পৃঃ XIII
না তুলিয়া হৃদয়ের সাধের লতিকা ?
কে তুলিতে পারে, বল, পঙ্ক পরমাদ,
না তুলিয়া হৃদয়ের সাধের মুক্তিকা ?
পারিব না আমি কভু পরাণ থাকিতে !
আমার সদনে শিশু স্মৃতির লোচন

সকাতরে পরিহার যাচে সচকিতে—
"করোনা প্রহার, মোরা দীনহীন জন!"

Who can pluck out the bitter weed of pain,
Nor harm one tendril of remember'd joy?
Who, tho' resolved to rid the burthen'd brain
Of love's regrets, love's memories would destroy?
Not I, at least, whatever those memories be!
To whom, upsmiling from the past laid bare,
The innocent eyes of Childhood plead 'Forbear!
Nor injure us, who never injured thee'.

The Wanderer, 1876, p. 10.

VI

পৃঃ XIV

দুটি করে ধরি এই কাতর হৃদয়,
বিষাদে পূরিত হয় হৃদয় নয়ন,
অশ্রুপাত অন্তরালে তারকা উদয়,
আবার নিরখি মোর শৈশব কানন।
আবার মূরতি তার মধুর বদন,
মধুর মোহিনী হাসি মধুর অধরে,
সময়ে যা দিয়েছিল মধুর বরণ,
মধুর করিয়া দিল প্রত্যেক প্রহরে।

I hold my heart. It fills, o'erflows mine eyes,
And thro' the flashing fall of sudden tears,
Dim in the starlight of delicious skies,
Once more the garden of my youth appears,
Once more the form, the face, that made erewhile
Dull time divine, and all his glowing hours
Deep heavens wherein love dwelt!
The breath of flowers
Is on the air, and on my spirit her smile.

The Wanderer, 1876, p 11.

XI

এখন অনিলে শুনি হাহাকার ধ্বনি, পৃঃ XVI
বৃন্দাবনে নিশালোকে নিকুঞ্জ কাননে
কাঁদে যেন একাকিনী কাতরা কামিনী,
ভাঙিয়া গিয়াছে যার আশার ভবনে,
শুকায়েছে সুখ নদী তাপিত পরাণে
বিষাদ করেছে মনে অন্ধকারময়।
যা ছিল আমার তাহা গিয়াছে তুফানে,
হৃদয়েতে ভর দিলে ভাঙে গো হৃদয়।

And every wind is burthen'd with the moan
Of some man's loss. By night, on Shinar plain,
'Mid Babel's battlements by Heaven o'erthrown,
No baffled builder ever wailed in vain
Hope's fabric fallen, with a grief more bleak,
More bitter, more ünshelter'd, than my own,
For all I built and blest is broken down,
And if I lean upon my heart 'twill break.

The Wanderer, 1876, p. 12.

XII

দেখ দেখি এই সেই স্বর্ণ অট্টালিকা, পৃঃ XVII
গগন বিভেদী স্তম্ভে খচিত খিলান,
ঘুমাত যাহাতে সুখে সুখের ঘটিকা,
হয়েছে কেবল এবে ভগ্ন অবসান,
মাঝে মাঝে কতিপয় শ্যাম দূর্বাদল,
মাঝে মাঝে হিম ছায়া মরণ সমান।
দেখ দেখি এ মন্দির ছিল কি উজ্জ্বল ;—
কি ছিল, এখন নাই, চকিত প্রস্থান !

Behold these shatter'd shards—once aëry towers,
With pillar'd porches, built into the blue

Of blissful climes, the home of happy hours,—
Now ruins bare, round which the years renew
Only the casual weed, and creeping shade.
Pause, stranger, and be sad that such things were
And are not. Say, at least, the plan was fair,
The structure bravely, beautifully made.

The Wanderer, 1876, p. 13.

XIII

কতই যতনে গড়েছিনু এ মন্দির পৃঃ XVII
হৃদয় হইতে খোদি—উন্নত শিখর
পরশিত ব্যোমতল—অঙ্কিত প্রাচীরে
কতই পবিত্র নাম হীরক অক্ষর।
ইহার ভিতর কিরে বাজনা বাজিত,
কোমল করেতে কত বাঁশরী কোমল,
কতই অস্ফুট গীতি স্ফুটিত হইত,—
এখন একটি নাই প্রদীপ উজল !

How firmly hewn from out the inmost heart,
How lightly lifted to the upmost heaven,
The temple rose! and, ah, by what fond art
With hallow'd names its gracious walls were graven!
What spacious music bathed these silent shrines
Of pious harps by priestly fingers play'd!
What happy whisperers wander'd in the shade
Of these lone aisles where now no taper shines!

The Wanderer, 1876, p. 13.

XIV

এ হেন মন্দিরে কিন্তু থাকিল না সুখ ; পৃঃ XVIII
মানুষ-রচিত, হায়, সোণার মন্দিরে,
সুখ-পাখী থাকিবারে চির পরাঙ্মুখ,
যতনে না ধরিবারে পারিবে পাখীরে।

শূন্যমার্গে ঘুরি ঘুরি অযাচিত ভাবে,
কখন আসিয়া গায় শাখায় শাখায় ;
শুনিতেছ তার নাম ভূমানন্দ ভাবে,
তোমার হাসিতে সেই চকিতে পলায়।

But there Bliss settles not. She will not dwell
In any habitation made by hands.
Free as the bird of heaven, nor tameable
By careful craft, she over seas and lands
Hovers in hollow air. From spray to spray,
Set trembling by her touch, she springs, and sings;
And, while thou listenest, upon lightest wings,
Scared by a sigh, a breath, she flits away.

The Wanderer, 1876, p. 13.

XV

বৃথায় করোনা আর মন্দির নির্মাণ ; পৃঃ XVIII
যার তরে উঠি নিত্য প্রত্যূষ প্রভাতে,
গভীর নিশীথে হই বিশ্রান্ত শয়ান,
সে সুখ সতত ভ্রমে আপন ইচ্ছাতে।
ঘুমাও নিশ্চিন্ত হায়, নিষ্কর্ম, নির্ভাব,
স্বপন মস্তকে পাখী আসিবে আপনি,
ডেকোনা তাহায় ধরি জাগরিত ভাব,
চকিতে, চকিতে, হায়, পলাবে অমনি।

Build not! It comes and goes without our will,
The wisht Delight, for which we early rise,
And so late rest, and so long labour still.
Sleep! heedless, deedless, mindless, with shut eyes.
And o'er thy dreaming head, with wings aquiver,
'Twill perch unsummon'd, and ungreeted sit.

O breathe not, breathe not! Fear to welcome it.
Soon as thou call'st it thine, 'tis fled for ever.

The Wanderer, 1876, p. 13.

ভবিতব্য

I

কিবা হেরিনু নয়নে। পৃঃ ১

বসন্ত কবরী মাঝে, কমল লোচনে রাজে
গোলাপ কুসুম তার সহাস আননে,
কিবা হেরিনু নয়নে।
সাগর তরঙ্গ প্রায়, নাচিয়ে ধমনী বায়,
আমার হৃদয় ধায় তাহার বদনে,
কিবা হেরিনু নয়নে।

I have seen her,—the summer in her soft hair,
And the blusht rose husht in her face,
And violet hid in her eyes!
And my heart, in love with its own despair,
Speeded each pulse's passionate pace
To that goal where pain is the prize.

The Wanderer, 1876, p. 18.

II

কিবা হেরিনু নয়নে। পৃঃ ২

সুন্দর কবরী'পরে বসন্ত বিহার করে,
কুসুম সুবাস কত ছোটে ক্ষণে ক্ষণে,
কিবা হেরিনু নয়নে।
তাহার অধর মাঝে, কতই বাজনা বাজে,
কতই পল্লব রাজে, কতই কিরণে,
কিবা হেরিনু নয়নে।

Hair, a summer of glories fill'd
With odours! Lips that are ever spring:
The budding and birth of all joys that be,
All blossoms that brighten, all beams that gild,
All birds that gladden, all breaths that bring
Delight to the spirit in me.

The Wanderer, 1876, p. 18.

III

কিবা হেরিনু নয়নে। পৃঃ ২
ভুবনমোহন হাসে ত্রিদিবের বিভা ভাসে,
জগতে মাতায়ে দেয় প্রেমের কিরণে,
কিবা হেরিনু নয়নে।
আঁখিতে জনম লয়ে, অধরে মাধুরী বয়ে,
কেমনে ফুটিয়ে উঠে তাহার বদনে,
কিবা হেরিনু নয়নে।

And oh, that smile of divine surprise,
That slid out slowly, and lapp'd me round
With a rosy rapture of warmth and light!
It began in the dark of her deep blue eyes,
And, o'erflowing her face and her faint lips, drown'd
Past, present, and future, quite.

The Wanderer, 1876, p. 18.

V

কিবা হেরিনু নয়নে। পৃঃ ৩
এখন আমার ভব, হইবে কেমন ভব ?
হবে না তেমন জানি ছিল রে যেমনে,
কিবা হেরিনু নয়নে।

কি ছিল আগের সুখ, এখন কি হল সুখ,
না জানি কি রয়েছে রে ভাসিয়ে ভুবনে ;
কিবা হেরিনু নয়নে।

What sort of world will the world be now?
Oh, never again what the world hath been!
And how happen'd the marvellous change?
What my old life meant I begin to know,
But I know not what may this new life mean,
It is all sweet and strange!

The Wanderer, 1876, p. 19.

VI

কিবা হেরিনু নয়নে। পৃঃ ৪
অনুভবে অনুমানি, অনুভবে এই জানি,
নয়নে নয়নে দেখা হইল দুজনে,
কিবা হেরিনু নয়নে।
আছে সুখ এইখানে, যথা ও নভের পানে,
রূপের লাবণ্য-রাশি আছে গো ভুবনে,
কিবা হেরিনু নয়নে।

Enough to be sure of,—that, hand in hand,
We have seen, with each other's eyes,
The heavens grow happier o'er us,
And, here below, in the lovely land,
As, there above, in the blissful skies,
A world of beauty before us!

The Wanderer, 1876, p. 19.

উপভোগ

I

কোন কবি তারারে বাসিত ভালো। পৃঃ ৫
প্রতি নিশি কহিত তাহারে,

"কেন দূরে থাক, গগনেরি আলো,
দেখা দাও আসি,
আকাশ রূপসি,
হৃদয়-মাঝারে,
আমার প্রেয়সি,
কেন দূরে থাক, অয়ি গগনেরি আলো।"

A Poet loved a Star,
And to it whisper'd nightly,
"Being so fair, why art thou, love, so far?
Or why so coldly shine, who shinest so brightly?
O Beauty, woo'd and unpossesst,
O might I to this beating breast
But clasp thee once, and then die, blest!"

Fables in song, Vol. I, 1874, p. 25.

II

গগনের তারা মজি কবির প্রণয়ে পৃঃ ৬
নীল নভ পরিহরি,
রমণীর রূপ ধরি,
উদিল ভূতল মাঝে সমুজ্জ্বল হয়ে।
ধীরে ধীরে ধীরে
নারী জিজ্ঞাসে কবিরে,—
"তুমি ত দেখেছ, সখে, নারীরে, তারারে,
বল দেখি এবে, নাথ, ভালবাস কারে,
মধুর নারীরে কিম্বা উজ্জ্বল তারারে?"

That Star her Poet's love,
So wildly warm, made human.
And, leaving for his sake her heaven above,
His Star stoop'd earthward, and became a Woman.

"Thou who has woo'd and hast possesst,
My lover, answer, which was best,
The Star's beam, or the Woman's breast?"

Fables in song, Vol. I, 1874, p. 25.

III

উত্তরিল কবি—"এবে না পাই দেখিতে, পৃঃ ৬
গগনেরি আলো যাহা উজলিত প্রাণ,"
কহিল কামিনী—"এবে না পাই শুনিতে
কবির সঙ্গীত আর জগত জুড়ান।"

"I miss from heaven," the man replied,
"A light that drew my spirit to it."
And to the man the woman sigh'd,
"I miss from earth a poet."

Fables in song, Vol. I, 1874, p. 25.

সঙ্গীত

I

একই তারকা যথা নিশি অবসানে পৃঃ ১১
নিশির নক্ষত্রমালা হইতে সুন্দর ;
একই গোলাপ যথা শরদ বিগমে
বরষের ফুল চেয়ে হয় মনোহর ;
একই পল্লব যথা শীতের শাসনে
তরুর শরীরে করে শোভা বিতরণ
তোমার প্রণয়-আশা তেমনি মধুর,
জুড়াইয়ে রাখে মোর তাপিত জীবন।

As the one star that left by the morning
Is more noticed than all night's host,
As the late lone rose of October,
For its rareness regarded the most,

As the least of the leaves in December
That is loved as the last on the tree,
So sweetest of all to remember
Is thy love's latest promise to me.

The Wanderer, 1876, p. 60.

II

ভালবাসা ফুল দিয়ে হৃদয়ের মালা, পৃঃ ১২
গাঁথিব, পরিব দোঁহে যতনে যতনে ;
হৃদয়ে না থাকে যদি ভালবাসা-ফুল,
কি ফল আছে বা তবে হৃদয় ধারণে ?
হৃদয় প্রদান করা যেমন কঠিন,
তেমনি কঠিন হৃদয়ের বিনিময়,
তবে কেন মিছে করা হৃদয়-ধারণ,
হৃদয়ের বিনিময় যদি নাহি হয় ?

We must love, and unlove, and, it may be,
Live into, and out of anon,
Lovetimes no few in a lifetime,
Ere lifetime and lovetime be one.
For to love it is hard, and 'tis harder
Perchance to be loved again.
But if living be not loving,
Then living is all in vain.

The Wanderer, 1876, p. 60.

III

নয়নের জলে যার হয়েছে সাগর, পৃঃ ১৩
খসিলে নবীন বিন্দু কি ক্ষতি তাহার ?
আজীবন, আপরাণ যার ভালবাসা,
নবীন বিরহে, বল, কিসে ভয় তার ?

হিমের হিমানী যবে পড়িবে ভূতলে,
দিবার প্রতিভা আঁখি দেখিবে মলিন,
ভাসিব সাগর জলে অগাধ অকূলে,
মনে রেখ মোরে, আমি তব প্রেমাধীন।

To the tears I have shed, and regret not,
What matters a few more tears?

Why should love, that is present for ever,
Be afraid of the absence of years?

When the snow's at the door, and the ember
Is dim, and I far o'er the sea,
Remember, beloved, O remember
That my love's latest trust was in thee!

The Wanderer, 1876, p. 61.

বাসনা

I

অই আসিল যামিনী। পৃঃ ৪৭
চেয়ে থাকি সারাদিন, হৃদয় হয়েছে ক্ষীণ,
বিকসিত হ'ল এবে বাসনা-নলিনী ;
অই আসিল যামিনী।
নিরখি চাঁদের কর, গেল দিবসের জ্বর ;
শিকল হইতে খুলি বাসনা-দামিনী,
অই আসিল যামিনী।

The night is come,—ah not too soon!
I have waited her wearily all day long,
While the heart, now husht, of the feverish noon
In this burthen'd bosom was beating strong.
But the cool clear light of the quiet moon
Hath quench'd day's fever, and forth in song,

One by one, with a buoyant flight,
Arise day's wishes releast by night.

The Wanderer, 1876, p. 16.

II

অই আসিল যামিনী। পৃঃ ৪৮

নীলগিরি'পরে কাল, এলায়ে কুন্তলজাল,
নয়ন যুগলে ধরি প্রণয়-নলিনী ;
অই আসিল যামিনী।
খুলে দিয়ে ছায়াজাল, জ্বালিয়ে জোনাকী আল,
পাখীরে পাড়ায়ে ঘুম, জুড়ায়ে মেদিনী,
অই আসিল যামিনী।

The night is come ! On the hills above
Her dusky hair she hath shaken free,
And her tender eyes are dim with love,
And her balmy bosom lies bare to me.
She hath lessen'd the shade of the cedar grove,
And shaken it over the long dark lea.
She hath kindled the glow-worm, and cradled the dove,
In the silent cypress tree.

The Wanderer, 1876, p. 16.

III

অই আসিল যামিনী। পৃঃ ৪৮

তুমি না কি, সুখতারা, সুখের পসরা পারা,
কেন নাহি আন মোর প্রাণের কামিনী,
অই আসিল যামিনী।
এই তারে হেরি কাছে, এই যেন মোর কাছে,
সুখতারা, আন মোর প্রাণের কামিনী,
অই আসিল যামিনী।

O Hesperus, bringer of all sweet things,
Hear me in heaven, and favour my call!
Bring me, O bring me, what naught else brings,
The one sweet thing that is sweeter than all.
Bring me unto her, or bring her to me,
Whose unseen eyes I have felt from afar.
I feel I am near her, but where is she?
I know I shall find her, but when shall it be?
O hasten it, Hesperus star!

The Wanderer, 1876, pp. 16, 17.

IV

অই আসিল যামিনী। পৃঃ ৪৯

আমার হৃদয় মাঝে, প্রেমের বাজনা বাজে,
বাসনা হারিয়ে বয় তরল তটিনী ;
অই আসিল যামিনী।
পরিহরি খেলাধূলা, হে মদন এই বেলা,
যাও তুমি, আন মোর প্রাণের কামিনী ;
অই আসিল যামিনী।

My heart as a wind-thrill'd lyre,
Throbs audibly. Bright in the grove,
Like mine own thoughts taking fire,
The star-flies hover and rove.
Arise! go forth, keen-eyed, swift-wing'd Desire!
Thou art the bird of Jove,
And strong to bear the thunders that destroy,
Or fetch the ravisht flute-playing Phrygian boy.
Go forth athwart the world, and find my love!

The Wanderer, 1876, p. 17.

মোহ

I

ঘুমায়ে শরীর, কিন্তু আমার হৃদয় পৃঃ ৫০
জাগিছে সতত ;
নিদ্রার সাগরে মোর স্বপন তোমায়
খোঁজে অবিরত।
অন্তিম তরঙ্গ শেষে তোমার হৃদয়ে
নিক্ষেপে আমায় ;
শুনিয়া নির্ঝর-রবে শার্দূলের নাদ,
স্মরে হৃদয় তোমায়।

My body sleeps: my heart awakes.
In search of thee my dreams have roved
Dim slumber's deeps. The last wave breaks,
And brings me to thy breast beloved.
O stretch thy gracious hand to me,
Thro' sleep, thro' night! I hear the rills,
And hear the leopard in the hills,
And down the dark am drawn to thee.

The Wanderer, 1876, p. 20.

III

মুদিত চন্দ্রমা-ফুল, মুদিত তারকা, পৃঃ ৫১
নিদয় শিশিরে
ভিজিয়াছে কেশ পাশ ; আমার চরণ
ভাসিছে রুধিরে।
শুকায় অধর মোর চুম্বন পিয়াসে ;
আমার নয়ন
অপতিত অশ্রুজলে হয়েছে বেদিত ;
আমি মাতাল মতন।

The stars are hid, the moon is set,
Ah, wilt thou let me die forlorn?
Upon my hair the dews are wet.
Upon the rocks my feet are torn.
With kisses, never kisst, alas!
My lips are parcht: with tears unshed
Mine eyes are dim ; and faint I tread
With dizzy step the mountain pass.

The Wanderer, 1876, pp. 20, 21.

IV

হারায়েছে পথ মোর, ভাঙ্গিয়াছে লাঠি, পৃঃ ৫২
নিবিয়াছে দীপ ;
যামিনী যে যায়, প্রিয়ে, আইস ত্বরিত
আমার সমীপ,
অই দেখ আসে ঊষা হাসিতে হাসিতে
ধবল কিরণে ;
এ ভীম কান্তার হতে লয়ে যাও, প্রিয়ে,
মোরে তোমার সদনে।

My path is lost: my staff is gone:
My strength is spent: my lamp is out.
O love, the night is well-nigh done.
The camphor clusters all about
Gleam chilly-white, and I can see
The far-off dawn. O haste, O haste,
And draw me from the unshelter'd waste,
And draw me from the world to thee!

The Wanderer, 1876, p. 21.

জন্মান্তরীণ

হায়! সেই তুমি সলিল কুমারী, পৃঃ ৬১
সমীর কুমার আমি,
মায়াবশে দোঁহে হইয়াছি হেন,
মর্ত্যভূমে অধোগামী।
পুরাকালে এক করেছিনু পাপ
অবিদিত, অলিখিত;
তাহারি কারণ বিহরি কাননে,
পাখাতুটি অপহৃত।
সাগরের পাশে সোণার প্রাসাদে
দানবের মায়াবলে,
হয়ে আছ তুমি হরিত হরিণী পৃঃ ৬২
আমারে হেরিবে বলে'।
নও, তুমি নও, হরিত হরিণী,
নহি আমি মেষপাল;
শুনেছ কি তুমি আমার বাঁশরী
সুমধুর সুবিশাল?
এতদিন মেষ মহিষের পাশে
আছিলে নিবিড় বনে,
এতদিন আমি কাননে কাননে
ছিলাম দস্যুর সনে।
হস্তিনার হস্তী অতি বুদ্ধিমান
মানব সমাজে কয়,
সুমাত্রার সিংহ শত অক্ষি ধরে
পিছনে লাঙ্গুলময়।
তাহারা সকলে বুঝিতে নারিল,
ভাবেনি আমারে কেহ

পৃথিবী মাঝারে ভ্রমিছে কাঁদিয়া
ধরিয়া মানব দেহ।
শেষেতে তোমারে চাঁদের কিরণে পৃঃ ৬৩
হেরিয়া বুঝিনু সব,
মোহেতে মুদিত, জাগিলে চকিতে
শুনিয়ে আমার রব।
তোমার সে নাম ফুটিল অধরে,
মেলিলে মেদুর আঁখি,
ছদ্মবেশ মাঝে চিনিতে পারিলে
চরণের ধূলা মাখি।
বুঝিলাম কেন বিঘোর নিদ্রায়
ফেলেছিলে দীর্ঘশ্বাস,
আমারি কারণ,—পড়েছিল মনে
সেই প্রাসাদের রাস।
চল, যাই চল, নিবিড় কাননে,
চল ভ্রমি দুইজনে,
চল অন্বেষণ করি সেই ফল
এই শাপ বিমোচনে।
তুমি পুন পাবে কনক কিরীট,
আমি পাব পাখাদ্বয়;
মোরা পুন সেই সোনার প্রাসাদে পৃঃ ৬৪
প্রবেশিব হর্ষময়।
সেই ফল না কি অতীব কষায়,
মোহন কাননে থাকে;
যাত্রীরা না পায় খুঁজিয়া তাহারে
পাপ দৈব দুর্বিপাকে।
যেমন কষায় তেমনি কোমল,
যেন জাহ্নবীর জল,

সুপবিত্র করে অপবিত্র জনে
ক্ষালিয়া কলুষ-দল।
সে ফল ভক্ষণে, পাই যদি তাহা
পাব দোঁহে স্বীয় রূপ ;
তুমি, সেই তব সলিল-সুষমা,
আমি মারুতীয় রূপ।
আমাদের পথ নিবিড় বিজন,
আকাশে রজনী আছে ;
চল যাই তবু—কাননের পশু
আসিবে মোদের পাছে।

You're a Princess of the water:
I'm a Genius of the air.
We have both been metamorphosed,
But our spirits still are fair.
For a deed, untold, unwritten,
That was done an age ago,
I have lost my wings and wander
In the wilderness below.
For a wizard's wicked pleasure,
In a palace by the sea,
You are changed to a white panther,
Till the time for meeting me.
No white lamb are you, my panther,
And no shepherd swain am I!

* * * * * *

The black elephants of Delhi
Are the wisest of their kind,
And the libbards of Sumatra
Have hundred eyes behind:

The Wanderer, 1876, p. 118.

But they guess'd not, they divined not
They believed me of the earth.

*　　*　　*　　*　　*

Till I found you in the moonlight.
Then at once, I knew it all!
You are wild in sullen slumber,
But you started at my call.
To my lips your name came leaping
When you open'd your wild eyes.
At my feet you fawn'd, you know me
In despite of all disguise.
Sure I am why in your slumber
You were moaning! 'Twas for me.
And a dream of harpers harping
From a palace by the sea.
Thro' the wilderness together
We must wander everywhere,
Till we find the magic berry
That shall make us what we were.
Then your crown shall you recover,
And my wings shall I regain,
And we two shall then re-enter
Our inherited domain.
'Tis a fruit of bitter savour,
By few pilgrims sought or found:
And the palm whence we must pluck
Grows on far enchanted ground.
Bitter is it, yet benignant,
Since of power to cleanse and cure
Like the goodhood of the Ganges
Purifying things impure.
By its virtue, if you find it,
Shall our forms again be fair:

Yours, with beauty of the water,
Mine, with beauty of the air.
All the ways are wild before us,
And the night is in the sky.

* * *

The Wanderer, 1876, p. 120.

ইতালী

I

সাগরের ধারে কাননের পাশে পৃঃ ৬৫
মলয় সমীর মেদুর বায়,
তারকার পাশে চন্দ্রমা বিলাসে,
মধুর বাজনা ভাসিয়ে যায়।

By woodland belt, by ocean bar,
The full south breeze our foreheads fann'd,
And lightly roll'd round moon and star
Low music from the Magic Land.

The Wanderer, 1876, p. 15.

II

কাননের পাশে সাগরের ধারে পৃঃ ৬৫
নিশীথ সুবাসে ভূষিত হয়,
সাগরের ধারে সমীর প্রসারে
হরষ পরশে শরীরময়।

By ocean bar, by woodland belt,
More fragrant grew the glowing night,
While faint thro' dark blue air, we felt
The breath of some unnamed Delight ;

The Wanderer, 1876, p. 15.

III

প্রভাত উদয়ে সঙ্গীত বিলয় পৃঃ ৬৬

সাগরের ধারে গগনতলে,
মধুর বিভাষ নিমীলিত হয়
"মধুর ইতালী" মধুর বোলে।

Till morning rose, and smote from far
Her elfin harps. The sea, and sky,
And woodland belt, and ocean bar,
To one sweet note, sigh'd Italy!

The Wanderer, *1876, p. 15.*

সান্ত্বনা

যবে ভাবি কত দীন অকিঞ্চিৎকর পৃঃ ৬৭, ৬৮

আমার ভাবনা হ'তে ভাবের বিকাশ,
যদিও সাধনা করি' যতন প্রয়াস,
কবিতায় করিয়াছি নিবদ্ধ নিগড় ;
যবে ভাবি কার করে আমার অন্তর,
উজল হইল ; আর কোন্ রাগগণ
উদ্ভাসিত করেছিল আমার জীবন ;
তখন হৃদয় হয় কতই কাতর।
কে যেন তখন আসি হৃদয় ভিতরে
কহে, "বৎস, শান্ত হও, কোরো না বিষাদ ;
ভাবনার সার নহে ভাবের বিকাশ,
ভাবের বিকাশ নহে ভাবনা প্রসাদ ;
তবু সে ভাবনা তব, কে করে বিনাশ ?
অধিক যদ্যপি তাহা, থাক হর্ষভরে।"

When I perceive how slight and poor appears
(Though with sad care and strong compulsion brought
Down ranged rhymes with strenuous search of thought)
The express'd result of my most passionate years ;

Remembering, too, from what divinest spheres
Stoop'd many a starry visitant and taught
My spirit at her toils,—how round her wrought
Strong Ruptures, Sorrows, Splendours rich in tears,
My whole heart fails me. Then an inward voice
Replies, 'Possess thyself, and be content.
Life's best is bound not by utterance
Of any word, nor many in sound be spent,
To will back echoes out of hollow chance.
What thou hast felt in thine. If much, rejoice.'

The Wanderer, 1876, p. 186.

ঝটিকা

I

গিরি ও গহ্বর যেন শ্মশান নীরব, পৃঃ ৬৯
ক্ষণে ক্ষণে ভীম ভাব ধরিছে আকাশ,
চারিদিক্ যেন ভীত ঝটিকার ভয়ে,
কাতর ধরিত্রী ফেলে ব্যথিত নিশ্বাস।

Both hollow and hill were as dumb as death,
While the heavens were moodily changing form.
And the hush that is herald of creeping storm
Had made heavy the crouch'd land's breath.

The Wanderer, 1876, p. 57.

II

বিমুক্ত গবাক্ষ মাঝে দাঁড়ায়ে সুন্দরী, পৃঃ ৬৯
এলায়ে কুন্তল জাল পড়িছে উজল ;
আকাশের ঘন ঘোর অন্ধকার মাঝে
শোভা পায় কম্বুগ্রীবা তরল ধবল।

At the wide-flung casement she stood, full height,
With her glittering hair tumbled over her back.

And, against the black sky's supernatural black,
Shone her white neck, scornfully white.

The Wanderer, 1876, p. 57.

III

দেখিতে না পাইলাম সরোষ নয়ন,
(চেয়েছিল যবে সেই ঘনঘটা পানে) পৃঃ ৭০
হেন বোধ হ'ল মনে, ব্যোমের বিদ্যুৎ
টানিয়া লইতেছিল আপন পরাণে।

I could catch not a gleam of her anger'd eyes,
(She was sullenly watching the storm-cloud roll)
But I felt they were drawing down into her soul
The thunder that darken'd the skies.

The Wanderer, 1876, p. 57.

IV

'এমনি কি যাব তবে, জনম মতন ?
একবার বল, আমি ক্ষমিব সকল।' পৃঃ ৭০
উত্তর স্বরূপ তবু ফিরাল না মুখ,
কেবল হৃদয় 'পরে চাপিল অঞ্চল।

'And so do we part, then forever?' I said,
'O speak only one word, and I pardon the rest!'
For sole answer, her white scarf over her breast
She tighten'd, not turning her head.

The Wanderer, 1876, p. 57.

V

'বিষাদেতে ভালবাসা করে কিগো রঙ্গ,
অথবা তোমার আঁখি অন্ধ মরুভূমি, পৃঃ ৭০
যার বুকে কতদিন রেখেছিলে বুক,
ভাঙ্গিতেছে বুক তার দেখ না কি তুমি ?'

'Ah, must sweet love cruelly play with pain?
Or,' I groand, 'are those blue eyes such deserts of blindness
That, O woman, your heart hath no heed of unkindness
To the man on whose breast it hath lain?'

The Wanderer, 1876, p. 58.

VI

চমকিল সৌদামিনী,—ভীষণ জ্যোতিতে
ফিরাইল মুখ,—সেই ঝটিকা প্রবল পৃঃ ৭১
বেশভূষা, কেশদামে, চৌদিকে ছড়ায়ে
জ্যোতি দিয়া যেন তারে করিল উজ্জ্বল।

Then alive leapt the lightning. She turn'd in its gleere
And the tempest had clothed her with terror it clung
To the folds of her vaporous garments, and hung
In the leaps of her heavy wild hair.

The Wanderer, 1876, p. 58.

VII

একটি বচন শুধু ভাঙ্গিল নীরব,
একটি,—মস্তকে যেন পড়িল পর্বত। পৃঃ ৭১
তার পরক্ষণে শুনি অশনি নিনাদ,
নিনাদ বিরামে ধনী হ'ল বহির্গত।

One word broke the silence: and it fell
With the weight of mountain upon me. Next moment
All was blowing thunder, and she from my comment
Was gone ere it ceased. Who can tell.

The Wanderer, 1876, p. 58.

VIII

নহে ত স্বপন উহা দেখিনু প্রভাতে,
পদাঙ্ক পরশে তার মেদিনী মুদিত ; পৃঃ ৭৩
নহে ত স্বপন উহা—দেখিনু প্রভাতে
তাহার কমল ভূমে শিশিরে মুদিত।

'T was no vision! This morning, the earth, presst beneath
Her light foot keeps the print. 'T was no vision last night!
For the lily she dropp'd, as she went, is yet white
With the dew on its delicate sheath!

The Wanderer, 1876, p. 58.

মেঘ

I

সাগর লহরী যথা সাগরের নীলে পৃঃ ৭৬
হয় বিভূষিত,
আমরাও সেইরূপ আকাশের নীলে
হই বিজড়িত ;
তুমি সদা যেইখানে ভ্রম, ওহে মতিমান
মানব সন্তান ;
অলক্ষিত গতি মোরা সেইখানে করি
পশ্চাৎ প্রস্থান।
অনাগত সমাগত সময়-কুমার,
দূর অভিধান,
জানিও মোদের বাড়ী অতীত সাগরে,
নিশ্চিত সন্ধান।

As the waves that are clad in the azure of ocean,
So clad in the azure of heaven are we.
As thou movest, we move with an unseen motion;
And, where thou followest, there we flee.
For the children of Never and Ever we are,
And our home is Beyond, and our name is Afar.

Fables in Song, Vol. 1, 1874, p. 51.

II

আমাদের সন্নিধানে তোমার চরণ পৃঃ ৭৭
পাইবে না গতি ;
আমরাও কভু, হায়, না পাই যাইতে
তব সন্নিহতি।
তথাচ মধুর যদি তোমার স্বপনে
মোদের মুরতি,
যত উভে দূরতর হই, তত ভালবাস
হৃদয় সংহতি।
আমরা তোমার যথা, তুমিও তেমনি
হও আমাদের ;
নিকটে কি ফল যদি তাহা নাহি হয়
কারণ দূরের ?

Never to us shall thy steps attain,
Nor ever to thee may we draw nearer.
But, if fair in thy vision our forms remain,
Still love us, the farther we are, the dearer,
For what were the near, were it not for the far?

Fables in Song, Vol. 1, 1874, p. 51.

III

আঁখি মেলি চেয়ে দেখ উর্ধ্ব-অধোদেশে পৃঃ ৭৮
গগনে ভূতলে ;
নয়নের অগোচর হয় কোন্ রূপে
নিম্ন সম স্থলে ;
মহান্, উদার, দূর, ইহারাই হয়
সদা বর্তমান ;
যদিও সুদূর বটে, তবু সন্নিহিত
নয়ন প্রমাণ ;

আমরা যেমন ভ্রমি শিখরে আকাশে
তারকার মাঝে,
আমাদের রূপ, হায়, তোমার হৃদয়ে
তেমনি বিরাজে।

Look above, and below—to the heaven, the plain!
The low and the level, they disappear.
The aloof and the lofty alone remain.
And, for ever present tho' never near,
Whilst ours are the summit, the sky and the star,
Still thine is the beauty of all that we are.

Fables in Song, Vol. 1, 1874, p. 51.

বৃক্ষ

I

আমরা আকাশে ধাই, আমরা পাতালে ধাই, পৃঃ ৭৯
দুই লোকে উর্ধ্বতন আর অধস্তন,
শিখরে আকাশ ভেদি, শিকড়ে পাতাল ছেদি,
কত অপরূপ দেখি অপূর্ব দর্শন।

We tend to the high, and we tend to the deep,
'Twixt the two worlds o'er us and under,
With our boughs we peep at the heaven, and creep
With our roots thro' the earth, in wonder.

Fables in Song, Vol. 1, 1874, p. 188.

II

আকাশ আসে না নামি, পৃথিবী স্বপথগামী,
মোদের করেছে দোঁহে সীমা নিরূপিত।
সেই সীমা মধ্যভাগে, থাকিয়ে স্বীয় সোহাগে,
উভয়ের আশীর্বাদে হই বিবর্ধিত।

Heaven comes not down, and earth lets not go:
By them both in our bound to us given.

And so we live, endlessly wavering so,
'Twixt the bliss of the earth and heaven.

Fables in Song, Vol.1, 1874, p. 188.

নিশীথ

I

একদা গভীর নিশি, একাকী বিজনে বসি, পৃঃ ৮০
দশ দিশি নীরবিত রসাল নীরবে,
কিছু দূরে ধীরে ধীরে, বাহিয়ে ধবল নীরে,
ভেসে যায় স্রোতস্বতী রজত-গৌরবে।

I sat low down, at midnight, in a vale
Mysterious with the silence of blue pines:
White-cloven by snaky river-tail,
Uncoil'd from tangled wefts of silver twines.

The Wanderer, 1876, p. 137.

II

প্রাচীন প্রাসাদ পাশে, এক মৃদু ছায়া হাসে, পৃঃ ৮০
অবিরাম, অনিবার, শীতলি কানন ;
সেই ছায়া অন্তরালে, শ্যামল পর্বতমালে,
খেলা করে যেন একা চাঁদের কিরণ।

Out of a crumbling castle, on a spike
Of splinter'd rock, a mile of changeless shade
Gorged half the landscape. Down a dismal dyke
Of black hills the sluiced moonbeams stream'd and stayed.

The Wanderer, 1876, p. 137.

IV

সেই সুরভিত ফুলে, আমার হৃদয় খুলে, পৃঃ ৮১
সাজাব অতীতে আমি অন্তিম ভূষণে,

স্মৃতির আঁধার ঘরে, যেন চিরদিন তরে,
উজল বিজলী হয়ে রাজে সর্বক্ষণে।

Of fragrant sadness,—to embalm the Past—
The corpse-cold Past—that it should not decay;
But, in vaults of Memory, to the last,
Endure unchanged;...............

The Wanderer, 1876, p. 138.

অন্তিম কুসুমাঞ্জলি

একদা করিনু মনে সঁপিব প্রিয়ারে
অন্তিম কুসুমাঞ্জলি, আনিয়া যতনে
সুরভি সুন্দর ফুল জগত মাঝার,
যথা ছিল বিশ্বশোভা তাহার বদনে।
কোথায় পাইব তার রূপের তুলনা
পবিত্র আঁখির কিম্বা আনত গ্রীবার,
তাহার মনের আর গুণের, বল না,
অথবা আমার চিরপ্রিয় ভাবনার?
যথা কোন ভক্ত জন ভক্তি সহকারে,
আদরে বিগ্রহ গড়ে রজত কাঞ্চনে,
যদিও ভক্তিরে কভু না পায় আকারে,
তথাপিও বৃথা শ্রম করেনাক মনে;
বহু দেশ হতে আনে স্বর্ণ অলঙ্কার,
বহু দিক্ হতে আনে হীরক মুকুর,
দেবতায় সমাদরে দেয় উপহার;
আমিও সেরূপ দিই—সেই অপ্রচুর!
দেখ দেখি এই মালা গিয়াছে ছিঁড়িয়ে,
এই সব ফুলকুল গিয়াছে শুকায়ে;
এখনও যে ফুল আছে সজীব, লো প্রিয়ে,
ঘুমাও তাহায়, মোর জীবন জুড়ায়ে।

I sought to build a deathless monument
To my dead love. Therein I meant to place
All precious things, and rare: as Nature blent
All single sweetnesses in one sweet face.
I could not build it worthy her mute merit,
Nor worthy her white brows and holy eyes,
Nor worthy of her perfect and pure spirit,
Nor of my own immortal memories.
But, as some rapt artificer of old,
To enshrine the ashes of a virgin saint,
Might scheme to work with ivory and fine gold,
And carven gems, and legended and quaint
Seraphic heraldries ; searching far lands,
Orient and occident, for all things rare,
To consecrate the toil of reverent hands,
And make his labour, like her virtue, fair ;
Knowing no beauty beautiful as she,
And all his labour void, but to beguile
A sacred sorrow ; so I work'd. Ah, see
Here are the fragments of my shatter'd pile!
I keep them, and the flowers that sprang between
Their broken workmanship—the flowers and weeds!
Sleep soft among the violets, O my Queen—
Lie calm among my ruin'd thoughts and deeds.

The Wanderer, 1876, p. 192.

'ললিতা-সুন্দরী'

অধরলালের এই কাব্য গ্রন্থখানি ১৯৩১ সম্বৎ অর্থাৎ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে, ১২৮১ সাল ১লা বৈশাখ প্রকাশিত হয়। ডিমাই আটপেজী আকারে ৪৮ পৃষ্ঠায় ইহা সমাপ্ত। নিম্নে ইহার প্রচ্ছদ-পত্র উদ্ধৃত হইল—

"ললিতা-সুন্দরী

প্রথম সর্গ

—০—

'Had we never loved sae kindly,
Had we never loved sae blindly,
Never met or never parted,
We had ne'er been broken-hearted.'

বার্ন্স।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র
কলিকাতা,—মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৮।
সম্বৎ ১৯৩১।"

'নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে' এই গ্রন্থ সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং ইহার মূল্য ছয় আনা।

'ললিতা-সুন্দরী'র ভূমিকা

পুস্তকের একটি 'বিজ্ঞাপন' আছে। আলোচ্য কাব্য সম্বন্ধে এই বিজ্ঞাপনে লেখকের কিছু বক্তব্য জানা যায়। নিম্নে ইহা উদ্ধৃত হইল—

"বিজ্ঞাপন।

ললিতা-সুন্দরীর প্রথম সর্গের অধিকাংশই দুই বৎসর পূর্বে 'মাসিক প্রকাশিকা' নামক এক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে স্থানে স্থানে অনেক পরিবর্তিত ও সংযোজিত হইয়াছে।

ইহার সকল ভাব লেখকের মানস-প্রসূত নহে ;—মধ্যে মধ্যে অপরাপর ভাষার ভাবেরও অসদ্ভাব নাই। ঘটনাটি অনৈতিহাসিক, এবং রচনা চাতুরীর অভিমান করে না।

—'What is writ, is writ—
Would it were worthier.'

কলিকাতা,—বেণেটোলা।

১লা বৈশাখ,—১২৮১।"

কাব্যখানির প্রথম পৃষ্ঠায় কবি গ্রন্থশীর্ষে ভট্টনারায়ণের নিম্নলিখিত দুই পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ—

"স্থানাবনদ্ধ-ঘন-শোণিত-শোণ-পাণি-
রুত্তংসয়িষ্যতি কচাংস্তব দেবি ভীমঃ ॥"

'ললিতা-সুন্দরী'র আখ্যানবস্তু

ললিত ও ললিতা শৈশবকালে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়। শৈশবের সে অনুরাগ যেমন পবিত্র, তেমনি মনোহর। ললিত—

"তুলিয়ে গোলাপ ফুল বিকেল বেলায়,
পরাইত সযতনে তাহার খোপায় ;
চিবুক ধরিয়ে দেখি, কেমন হয়েছে—
আমরি, তোমার মুখ কেমন সেজেছে'।" পৃঃ ১৩

যৌবনের সূচনায় কাব্যের এই নায়ক-নায়িকা মিলিত হইবার কোন সুযোগ পাইলেন না। দৈববিড়ম্বনায় ললিতা স্থান পাইলেন, নবাব সিরাজউদ্দৌলার হারেমে—অবশ্য স্বেচ্ছায় নহে, স্বেচ্ছাচারী নবাবের স্বৈরাচারের ফলে। কিন্তু সেই শৈশবে উপ্ত অনুরাগের বীজ ললিতার হৃদয়ে কোন দিনই বিলীন হইয়া যায় নাই, বরং তাঁহার গোপন মানস-ক্ষেত্রে সতেজে বর্ধিতই হইয়াছিল এবং বিরহ-বেদনার অশ্রুবারিতে গোপনেই পরিপুষ্ট হইতেছিল। এদিকে নায়ক ললিতও যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, তাহার শৈশবের সে অনাবিল অনুরক্তি বিস্মৃতির অতলতলে বিলুপ্ত হয় নাই ; ললিতার চিন্তা, তাহার অবস্থা-বিপর্যয়ের জন্য দারুণ বিক্ষেপ, ললিতের হৃদয়কে নিয়তই উদ্বেল করিয়া রাখিত। একদিন ঘটনাক্রমে দু'জনের পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। ইহাই আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম সর্গে বর্ণিত বিষয়ের সারভাগ।

'ললিতা-সুন্দরী'র আলোচনা

কবি সুললিত ভাষায় তাঁহার কাব্যের সূচনা করিয়াছেন। একে প্রেমের কাহিনী, তাহাতে ভাষা ও ছন্দ বেশ স্পষ্ট এবং সুখপাঠ্য। এই

জন্য বর্ণিত সর্গটি উপভোগ্য হইয়াছে। স্থানে স্থানে উচ্চশ্রেণীর কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

এই কাব্যে কবির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পাঠকের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। তাঁহার স্বভাবের শোভা-বর্ণনায় স্বভাবকবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সহজ রচনা-প্রণালী স্মরণ করাইয়া দেয়। সহজ ভাষা ও উপমার আশ্রয়ে পাঠকের মনকে একটু উচ্চস্তরে লইয়া যাইবার প্রয়াস অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে শব্দ-চয়নেও কবি বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কোথাও একই কথা দ্বিরুক্তি করিয়া, কোথাও একই ভাবকে বারবার প্রকটিত করিয়া তিনি পাঠকের মনোহরণ করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁহার দ্বিরুক্তিতে মনে বিরক্তি জন্মে না। তিনি তাঁহার কাব্যগ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন নিম্নলিখিতভাবে—

"ঝিকিমিকি করে রবি, দিবা অবসান,
মৃদুল অনিল গায় বিরামের গান।
শোভাময় চারিদিক্, শোভাময় বন,
শোভাময় নীলনভ, শোভন ভুবন ;
নাহি আর তপনের আতপ প্রখর,
উজলে জাহ্নবী-জল কিরণনিকর।" পৃঃ ১

এই জাহ্নবী-তীরে মুঙ্গেরে নবাবের প্রমোদকাননে নায়িকা ললিতা প্রদোষে পাদচারণা করিতেছেন ; নাম তাঁহার এখন জেহানা। জাহ্নবী-তীরের বর্ণনায় কবি কৌশলে পৌরাণিক যুগের একটি আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছেন। সে আলেখ্যের দুই একটি রেখাপাত সুনিপুণ শিল্পীর শিল্পজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করে—

"সেই জাহ্নবীর কূলে জানকী সুন্দরী
ভেবেছেন পতিপদ রঘুকুলেশ্বরী ;—
কোথা সেই প্রাসাদের হেম-সিংহাসন,
বসিয়ে নদীর তীরে মুদিয়ে নয়ন !—
লহরী ক্ষালন করে চরণযুগল,
কিছু জ্ঞান নাই, সতী বিষাদে বিহ্বল ;

হরিণ হরিণী আসি, চকিত নয়নে
চেয়ে দেখে তাঁর সেই বিষাদ-বদনে ;
জপমালা কমণ্ডলু রয়েছে ভূতলে,
শোকময় কুলুরবে জাহ্নবী উথলে !
হৃদয়ে প্রাণেশ-ছবি, তনয় যুগল,
নয়নে প্রণয়-নীর হীরক-উজল !
যে নীর বিদার করে পাষাণ-হৃদয়,
চির অহৃদয় জনে করে সহৃদয়,
কোমল প্রণয়ময় করুণানিলয় ;
একেবারে করে দেয় স্ব-ভাবে অভাব,
অন্তরে থাকে না কোন বিপরীত ভাব।" পৃঃ ২

উদ্ভিন্ন-যৌবনা ষোড়শী ললিতার রূপবর্ণনায় কবি মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা যেমন উজ্জ্বল, তেমন মধুর—

"প্রথম প্রণয়-স্মৃতি মতন কোমল ;
শৈশবের দেব-চিন্তা স্বরূপ সরল ;
স্নিগ্ধ, যথা বান্ধবের প্রবোধ বচন ;
অমিয়-ধারার প্রায় জীবন-তোষণ !
সজ্জনের গুণগান মত মধুময় ;
সতত পবিত্র, যথা জননী-হৃদয় ;
কমনীয়, কামিনীর প্রণয় মতন,
নাহি কিন্তু চপলতা, চিরবিমোহন ;
মনোহর, যৌবনের ভাবনা স্বরূপ,—
যখন হৃদয় দেখি নিজ প্রতিরূপ,—
ছিল সে নবীনা বালা,—সেই বিনোদিনী
যৌবনের শোভাদলে ভুবনমোহিনী !" পৃঃ ৪

ভাষা ও ভাবের সংযমে এবং নিষ্ঠায়, এ বর্ণনা লেখকের মার্জিত মনের পরিচয় দেয়। সাবলীল ভাষার আলোকে, যৌবনের রূপ শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়া পাঠকের মনও পুলকিত। নায়িকা ভুবনমোহিনী,—কবি সে রূপের

মধ্যে দেখিয়াছেন, শৈশবের দেব-চিন্তার সরলতা, জননী-হৃদয়ের পবিত্রতা, বান্ধবের প্রবোধ-বচনের স্নিগ্ধতা ইত্যাদি।

যথার্থ প্রেম যে দৈহিক রূপ বা যৌবনের অপেক্ষা রাখে না, উহা যে কোন বিষয়-বস্তুর সহিত তুলনীয় নহে, উহা যে যথার্থই স্বর্গীয়, এই ভাবটি প্রকাশ করিতে গিয়া কবি লিখিতেছেন—

"নহ তুমি সুধাকর, জুড়াও পরাণ ;
নহ তুমি সঞ্জীবনী, কর প্রাণ দান ;
নহ তুমি শতদল, তাহাও শুকায় ;
নহ সৌদামিনী, তাহা চকিতে মিলায় ;
নহ তুমি রূপ, তাহা যৌবনের বশ ;
নহ রে যৌবন-সুখ, সময়ে নীরস ;
মানুষ হৃদয় নহ, তাহাও চপল ;
স্বর্গীয়, কেন রে তবে উজল ভূতল ?—
তবে কি তুমি রে হেন কোন দিনমণি,
যার চারি পাশে সুখ,—মঙ্গল ধরণী ?" 	পৃঃ ৩৪

প্রেমের মিলন-বর্ণনায় কবির শব্দ-চয়নের দক্ষতায় মুগ্ধ হইতে হয়। প্রেমের মিলন কত মনোহর কবি তাহা পাঠকের মনে কেমন সুন্দর অঙ্কিত করিয়া দিতেছেন,—

"মনোহর শরতের শশধর-কর,
মনোহর বসন্তের কোকিলের স্বর,
মনোহর নিদাঘের ফুলসমুদয়,
মনোহর চারুতনু ইন্দ্রধনুচয়,
মনোহর শারদীয় শ্যামল গগন,
মনোহর প্রভাতের নবীন তপন,
মনোহর সরসীর কুবলয়-শোভা,
মনোহর প্রদোষের প্রভা মনোলোভা,
মনোহর বাসবের নন্দন কানন,
মনোহর বসুধার রাজ-সিংহাসন,

মনোহর অমিত্রের উরস-শোণিত,
মনোহর মনোমত বান্ধবের হিত,
মনোহর কল্পনার বিনোদ-বদন,
এদের চেয়েও হায়, প্রেমের মিলন !" পৃঃ ১০, ১১

প্রেমের বর্ণনায় কবির ভাষা ও ভাব সংযত গণ্ডীর মধ্য দিয়া কি উচ্চ গ্রামে উঠিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়—

"ধরায় অতুল সুখ প্রেমের চুম্বন,
যদি সেই প্রেম হয় প্রেমের মতন—
তুমি মম, আমি তব, যদি তাই হয়,
তবে আর এ জগত আর কারো নয়।
যদি কভু এ ধরাতে থাকে কোন সুখ,
যদি কভু দেখা যায় তার হাসি মুখ ;
বিষাদ-সাগরে যদি থাকে কোন দ্বীপ,
আঁধার আগারে যদি জ্বলে কোন দীপ,
তবে বসুমতী-মাঝে আছে এক ধন,
প্রেমের চুম্বন তাহা প্রেমের চুম্বন !"

কবির উক্তি—

"তুমি মম, আমি তব, যদি তাই হয়,
তবে আর এ জগত আর কারো নয়।"

যেন প্রেমিক কবি বিহারীলালের অকুণ্ঠ উচ্ছ্বাসের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়—

"তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি
হোক্ গে এ বসুমতী যার খুসী তার।"

নায়ক ললিতের জীবন কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাও দেখিবার বিষয়—

"একদা শৈশবে শিশু কুসুম শয়নে
যখন খেলিতেছিল কুসুমের সনে ;—
* * *

চৌদিকে খেলিল বায়ু ত্রিদিব সুবাস,
হাসিল কুসুমরাশি, হাসিল আকাশ।
প্রথমেতে আসিলেন সারদা আপনি,
দিলেন মোহিনী বীণা, কৃপাণ, লেখনী ;
তার পর আসিলেন কমলা সুন্দরী,
দিলেন প্রচুর ধন কমল-ঈশ্বরী ;
পরে আসিলেন তথা মদনমোহিনী,
দিলেন অতুল রূপ রতি বিনোদিনী।" পৃঃ ২০, ২১

মানুষের আকাঙ্ক্ষা, কামনা ও বাসনার আর কি থাকিতে পারে? অমিশ্র সুখ ত সংসারে কোথাও নাই, তাই—

"রাক্ষসী অলক্ষ্মী এল শেষেতে সবার,
দিল এক বিষধর প্রেম উপহার।" পৃঃ ২১

পৌত্তলিকতা এবং পশুবলি সম্বন্ধে কবির মতামত কাব্যে একস্থানে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"যেমন অবোধ মন হিন্দুর কুমার
মাটির পুতুলে দেয় পশু উপহার ;—
হইবে দেবের তুষ্টি, যাইবে ত্রিদিবে,
পূজার পুণ্যের ফল তথায় পাইবে।" পৃঃ ১৮

বলা বাহুল্য, দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের সহিত সাক্ষাৎকার লাভের পূর্বে, অধরলাল আলোচ্য কাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন। হিন্দুর মূর্তি পূজার কল্পনা যে সামান্য 'মাটির পুতুল' পূজায় আবদ্ধ নয়, ইহা তিনি পরে বুঝিয়াছিলেন নিঃসন্দেহ ; আমরা তাঁহার পরবর্তী জীবনের ঘটনাবলী হইতে ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারি।

ত্রিদিব কোথায়, এই বিষয়ে আলোচ্য কাব্যের একস্থান হইতে নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তি বিচার্য—

"কে বলে ত্রিদিব রাজে আকাশ উপরে,
সুধার ভাণ্ডার আছে অমর নগরে?

কে বলে বিরাজে সুখ তাপস-হৃদয়ে,
নাচে বিদ্যাধরী সুধু বাসব-আলয়ে ?
কে বলে রতন মিলে গভীর সাগরে,
ফোটে রে কমলকলি খালি সরোবরে ?" পৃঃ ২৪

প্রেমের স্পর্শে এ ধরণী স্বর্গে পরিণত হয়, মানুষ অপার্থিব আনন্দের আস্বাদ পায়, তাপসসুলভ শান্তি এই প্রেমও যে দিতে পারে, সুকবি অধরলাল তাহা তাঁহার কাব্যে সুন্দরভাবে প্রকটিত করিয়াছেন। এই অপার্থিব প্রেম শুধু রক্তমাংসের সম্বন্ধে নিবদ্ধ নহে,—এই প্রেম যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারে—

"লিখিত নবীন ভাষা তরুর পাতায়,
তাহাই পড়িয়ে যেন জীবন জুড়ায়।"
"কহে যেন সমীরণ প্রেমের বচন।" পৃঃ ২৬

যে সময়ে মুঙ্গেরে সুবা বাংলার নবাবের প্রমোদকাননে নায়ক ললিত নায়িকা ললিতার সন্ধান এবং সাক্ষাৎ পাইলেন, তখন—

"পশিয়াছে পলাশীতে নির্ভীক্ ইংরাজ।" পৃঃ ৪১

বিদায়-বেলায় ললিত নায়িকাকে বলিতেছেন—

"এই দেখা শেষ দেখা—কেঁদোনা, প্রেয়সী,—
ক্ষতি নাই, দেখে লই তব মুখশশী—
মরে যাই, বেঁচে থাকি, কিছু দুখ নাই,
সমরে পামরে হেরি, এই ভিক্ষা চাই।" পৃঃ ৪১

সিরাজের পতনকামী হইলেও, ইংরেজের জয় অনিবার্য জানিয়া, নায়ক ললিত বলিতেছেন—

"আর তুমি বঙ্গভূমি ভীরু-প্রসবিনী,
বড় ভালবাসি আমি তোমারে, জননি!
ভালবাসি—বড় দুখ রহিল পরাণে,
নারিলাম উদ্ধারিতে ;—ধিক এ জীবনে।" পৃঃ ৪২

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের আলো বাংলার অনেক কবির কাব্যে ও কবিতায় প্রতিফলিত হইয়াছে, দেখা যায়।

অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ ললিত প্রেয়সী ললিতাকে বলিতেছেন—

"কাতর হয়েছি নহি জীবন-কাতর !—
মরিতে করে না ভয় সাহসী অন্তর !
যেই কর করে, প্রিয়ে, প্রেম-আলিঙ্গন,
সেই কর করে শত্রু-মস্তক-ছেদন—
চাহি না রাখিতে কভু কাপুরুষ-প্রাণ,
থাকিতে এ বাহু আর শাণিত কৃপাণ !" পৃঃ ৪২

তারপর বিদায়ের পালা। 'প্রেম-বিষাদিতা' নায়িকা প্রমোদ কানন হইতে প্রাসাদে ফিরিতেছেন—

"পাঞ্চালকুমারী কৃষ্ণা বিরাট-ভবনে,
ত্যজিয়া রজনী মাঝে পাচক-সদনে,
যেমন ফিরিয়াছিল, তেমনি ললিতা
ফিরিল কানন হ'তে প্রেম-বিষাদিতা।" পৃঃ ৪৩

আলোচ্য কাব্যে শব্দচয়নের বৈশিষ্ট্য, ভাবপ্রকাশের রীতি ও ভঙ্গী এবং সংস্কৃত কাব্য, নাটক ও পুরাণ-বর্ণিত চরিত্র বা বিষয়বস্তুর উল্লেখে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, কবি অধরলালের সংস্কৃত কাব্য প্রভৃতির সহিত বেশ পরিচয় ছিল। তাঁহার কাব্যের নায়ক ললিতও তাই সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত। নিজের বিরহ দশায়—

"ভাবিল সে কালিদাস স্বভাবের কবি
প্রভাতের আরক্তিম তপনের ছবি—
মহাশ্বেতা পুরূরবা শচী পারিজাত
হস্তিনার নরেশের সকুলে নিপাত।" পৃঃ ২৫

'মেনকা'

ইহাও অধরলালের একখানি কাব্য। ললিতা-সুন্দরীর পরেই ইহা প্রকাশিত হয়। ডিমাই ১২ পেজী আকারে ৫১ পৃষ্ঠায় কাব্যখানি সমাপ্ত। ১৯৩১ সম্বতে বা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইহা বাহির হয়।

'মেনকা'র প্রচ্ছদ-পত্র

নিম্নে এই কাব্যের প্রচ্ছদ-পত্র প্রদত্ত হইল—

"মেনকা

গীতিকাব্য

শ্রীঅধরলাল সেন বিরচিত

'O then at last relent: is there no place
Left for repentance, none for pardon left?'

মিলতন।

'—No sword
Of wrath her right arm whirl'd,
But one poor poet's scroll, and with *his* word
She shook the world.'

টেনিসন।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র

কলিকাতা,—রাজা কালীকৃষ্ণের লেন নং ৩০

সম্বৎ ১৯৩১"

'মেনকা'র উৎসর্গ-পত্র

কবি পুস্তকখানি তাঁহার পিতার নামে নিম্নলিখিতভাবে উৎসর্গ করিয়াছেন—

"শ্রীযুক্ত রামগোপাল সেন

পিতৃচরণকমলে

স্নেহভক্তি কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি

পুত্রের যাহা থাকা উচিত, তাহারই সামান্য নিদর্শনস্বরূপ

এই কাব্য

সমাদরে সমর্পিত হইল।"

'মেনকা' কাব্যখানির মূল্য চারি আনা মাত্র।

'মেনকা'র আখ্যানবস্তু

এই ক্ষুদ্র খণ্ড কাব্যখানির আখ্যানবস্তু মনোরম। স্বর্গের অপ্সরী মেনকা দুর্বাসার শাপে মর্ত্যে নির্বাসিতা হইলেন। দেবরাজের উদ্দেশে

স্তবস্তুতি করিয়া, শাপগ্রস্ত মেনকা আকাশে দৈববাণী শুনিলেন যে,—যতদিন না বসুধার সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন আহরণ করিয়া, তিনি স্বর্গের দ্বারীকে অর্পণ করিতে পারেন, ততদিন পর্যন্ত ত্রিদিবের দ্বার মেনকার নিকট মুক্ত হইবে না। নৈরাশ্যের অন্ধকারে আশার একটু ক্ষীণ রশ্মি যেন দেখা গেল। কিন্তু কি সে রত্ন ? কোথায় তাহার সন্ধান মিলিবে ?

হিমগিরি-শিরে কুবেরের অতুল রত্নাগারের কথা মেনকার মনে পড়িল, —কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে, স্মরণে আসিল—সমস্ত স্বর্গভূমিই যে অনুরূপ মণি-মাণিক্যে রচিত ! সুতরাং তুচ্ছ পার্থিব মণিমাণিক্যের বিনিময়ে স্বর্গভূমি লাভ করা একেবারে যে অসম্ভব। পার্থিব মণিমাণিক্যের মূল্য সেখানে কতটুকু ? শুভ্র গিরিশিরে সঞ্জীবনী নাম্নী মৃত্যু-বিজয়িনী লতা পাওয়া যায়,—মেনকা তাহার সন্ধানও জানিতেন। কিন্তু হায়, যে দেশে জরা নাই —মরণ নাই—সেই অমরের দেশ স্বর্গে সঞ্জীবনী লতার মূল্য কি ?

অতঃপর, কবি-কল্পনা হতাশ-হৃদয়া মেনকার সহিত শ্রেষ্ঠ রত্নের অন্বেষণে, স্থান ও কালের ব্যবধানকে তুচ্ছ করিয়া, দিকে দিকে, এমন কি, যুগে যুগে অবলীলাক্রমে ফিরিয়াছে। প্রথমেই, সর্ব-ঋতুসেবিতা স্বর্ণলঙ্কায় মেনকা উপনীতা। কিন্তু, লঙ্কাধাম তখন বিষাদমগ্ন,—সমরে ইন্দ্রজিতের পতনে সকলে শোকে মুহ্যমান। মেঘনাদের চিতাশয্যা রচিত হইয়াছে,—শোকাকুলা দানব-নন্দিনী রাক্ষসকুলবধূ প্রমীলা স্বামীর চিতায় আরোহণ করিলেন। লঙ্কার গগন-পবন সতীর অশ্রুসিক্ত অন্তিম নিশ্বাসে যেন ভরিয়া গেল,—বিষাদকাতরা মুগ্ধা মেনকা সতীর শেষ নয়নবিন্দুটুকু লইয়া স্বর্গদ্বারের সমীপস্থ হইলেন। দ্বার খুলিল না !! সকরুণ-কণ্ঠে দ্বারী জানাইল,—সহমৃতা সতীর এ অন্তিম অশ্রু স্বর্গেও আদরণীয় বটে, কিন্তু, উহা ত অতুলনীয় নহে !

মেনকা আবার মর্ত্যে ফিরিয়া আসিলেন—শ্রেষ্ঠ রত্নের সন্ধানে। এবারে হস্তিনায়। কুরুরাজ শান্তনুর তৃপ্তির জন্য দেবব্রতের স্বার্থত্যাগ, অতি অপূর্ব চিরস্মরণীয় পণ, সমস্তই মেনকা স্বচক্ষে দেখিলেন, সকলই স্বকর্ণে শুনিলেন। ভীষ্মের অপরূপ আত্মদানের বাণী লইয়া চলিলেন তিনি ; স্বর্গের দ্বার তবু খুলিল না। কোমল-কণ্ঠে দ্বারী জানাইল,—দেবব্রত দেব-অংশে জাত,

তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব। তথাপি, এ আত্মদান ত অনুপম নহে। দৈত্য বলিরাজ যে ত্রিভুবন দান করিয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন! মেনকা ফিরিলেন।

আরও কতদিন, কত বর্ষ কাটিয়া গেল। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে কুরু-পাণ্ডবের সমর বাধিয়াছে,—ভীষ্মপর্বের পালা সাঙ্গ হইয়াছে। আচার্য দ্রোণের নেতৃত্বে কৃপ, কর্ণ প্রভৃতি সপ্তমহারথী কেশরি-শিশু অভিমন্যুকে ঘিরিয়া মহারণে প্রবৃত্ত। সিংহবিক্রম অভিমন্যুর অভূতপূর্ব রণকৌশলে গগনচারী দেবতাবৃন্দ স্তম্ভিত! অন্যায় সমরে অচিরে অভিমন্যু ধরাশায়ী হইলেন। শোকাকুলা মেনকা চিরনিদ্রিত বীরের একবিন্দু বক্ষ-শোণিত লইয়া আসিলেন আবার সেই ত্রিদিবের দ্বারে। দ্বার তবুও খুলিল না! সম্মুখ সমরে নিহত বীরের স্বর্গতি হয় বটে, কিন্তু, সম্মুখ সমরে বীরের পতন ধরণীতে দুর্লভ নয়।

মেনকা আবার ফিরিলেন। সতীত্বের সুষমা, সত্যপালনে দৃঢ়পণ ও আত্মাহুতি, শৌর্যের গরিমা কিছুতেই স্বর্গের দ্বার খুলিল না! এবার, কবি-কল্পনা কালের ব্যবধানকে অবহেলা করিয়া, অবলম্বন করিয়াছে রামায়ণী যুগের অতি প্রাচীন কাহিনী। কবির দৃষ্টি ইতিহাসের নিক্তির দিকে চাহিয়া থাকে না,—তাঁহার দৃষ্টি দেশ-কালের বাধায় প্রতিহত হয় না। কিরাত-শরে নিপতিত ক্রৌঞ্চ-মিথুনের এককের কাতর বিলাপে, তমসা-তীরে তপোমগ্ন বাল্মীকির ধ্যান ভঙ্গ হইল। অনুশোচনায় যে মহান্ জীবনের উদ্বোধন,—অনুকম্পায় সে মহান্ হৃদয় হইতে সহসা বিনির্গত হইল —করুণা ও মৈত্রীর ছন্দোময়ী বাণী,—"মা নিষাদ—।" করুণা ও মৈত্রীর আকর্ষণে ছন্দের হইল জন্ম,—করুণা ও মৈত্রীর আকর্ষণে স্বর্গে বাজিল দুন্দুভি—খুলিয়া গেল স্বর্গের দ্বার—নামিয়া আসিলেন ভূতলে অমর ও অমরীবৃন্দ,—স্বর্গ নামিল ধরণীতে। মেনকা সহচরীদের সহিত মিলিত হইয়া অবাধে স্বর্গে ফিরিয়া গেলেন; তাঁহার শাপমুক্তি হইল।

'মেনকা'র কাব্য-সৌন্দর্য

সুকবি অধরলালের 'মেনকা' কাব্যের কয়েকটি অংশ কাব্য-সৌন্দর্য প্রদর্শনের জন্য উদ্ধৃত হইল—

অপ্সরা মেনকা ত্রিদিবের পথে চলিয়াছেন—

"সাধু সজ্জনের পুণ্য রাশি প্রায়
সোনার প্রতিমা যেন চলে যায়,—" পৃঃ ২

তাঁহার পাদপাতে—

"বহে পরিমল পবন চপল
সুবাসে পূরিল আকাশ ভূতল,
* * *
* * *
বহিল পবন তাহারি সৌরভ
ভরিল ভুবন তাহারি গৌরব,
ভাসিল হরষে মানব-নিকর,
সুখেতে পূরিত ধরণী-ধাম।" পৃঃ ৩

পরবর্ত্তীকালে, রবীন্দ্রনাথ উর্বশীকে সম্বোধন করিয়া যে অনুপম কবিতা-সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার এই পংক্তিটি মনে পড়ে,

"তোমার মদির গন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারিভিতে।" চিত্রা

আবার রবীন্দ্রনাথের উর্বশী যখন সুরসভাতলে নৃত্য করেন তখন—

"ছন্দে ছন্দে নাচি' উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল।" চিত্রা

কিন্তু মেনকার দুর্ভাগ্য, তাঁহারই অঙ্গ-সুবাস পরিসেবিত চপল পবন অনর্থের সৃষ্টি করিল।—

"বহে পরিমল পবন চপল
তাপস দুর্বাসা বসি যেই স্থল
করিতেছিলেন বিভুর ধ্যান,
যোড় করদ্বয় বুকেতে রাখি,
নিবেশ-নিশ্চল, নিমীল-আঁখি,
নিরোধ করিয়ে ইন্দ্রিয় সকল,
দেখেন পরম কিরণ উজল।

বহে পরিমল পবন চপল,
ভাঙ্গিল মুনির বিভুর ধ্যান।" পৃঃ ৪

চিরক্রোধপরায়ণ ঋষি মেনকাকে ধরাবাসের অভিসম্পাত দিলেন। কিন্তু—

"নদ, নদী, আর ভূধর, সাগর
হ্রদ, উপত্যকা, পর্বত-গহ্বর,
এ সকল, হায়, করি দরশন
ঘোচে না পরীর মনের দুখ।" পৃঃ ৫

নির্বাসিতা অপ্সরার মন হইতে অমরপুরীর স্মৃতি কিছুতেই ঘোচে না।—

"দেখিয়াছি আমি যমুনার জল,
জাহ্নবী-সলিল বিমল উজল,
মানসের সম কেহই নহে।
দেখিয়াছি আমি মানবলীলা,
বিষাদ আবাসে বিজলী খেলা,—
এক চোখে কাঁদে, এক চোখে হাসে,
এক চোখে বাসে, এক চোখে নাশে,—
হায়রে কেবল অমরের তরে
জগতের যত আনন্দ রহে।" পৃঃ ৬

এই নিরানন্দময় ধরাবাসের কল্পনায় অধীরা অপ্সরা দেবরাজের স্তুতি করিয়া দৈববাণী শুনিতে পাইলেন—

"এই বসুমতী বসুধা মাঝে
সর্বসার যেই রতন রাজে,
যাও ত্বরা করি, হে সুরসুন্দরি!
সে চারু রতনে আনয়ন করি,
প্রদান করিলে স্বরগদ্বারীরে,
আসিতে পাইবে স্বরগ 'পরে।" পৃঃ ৮

তারপর, সুদীর্ঘ অন্বেষণের পালা। রামানুজের সহিত সমরে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু ঘটিলে, মেঘনাদজায়া প্রমীলা স্বামীর চিতায় সহমৃতা হইলেন।—

"যখন পবন বহিল সুবাস,
ধরিয়ে অন্তিম প্রমীলা-নিশ্বাস,
ভেটিল মেনকা স্বরগ-দ্বার।
সতী রমণীর নয়ন-জল
এর চেয়ে কিবা অতুল, বল ;
খুলিবে, খুলিবে ত্রিদিবের দ্বার,
চির প্রিয়ধনে দেখিব আবার,
এইরূপ মনে ভাবিয়ে সুন্দরী,
ভেটিল মেনকা স্বরগ-দ্বার।" পৃঃ ১৯

কিন্তু প্রমীলার অশ্রু ধরার শ্রেষ্ঠ রত্ন বলিয়া গণ্য হইল না। মেনকার নিকট স্বর্গের দ্বার বন্ধ রহিল।

অতঃপর হস্তিনার দেবব্রত বলিতেছেন—

"করিয়াছি পণ, জনম মতন
হ'ব ব্রহ্মচারী ; বাঁচিতে কখন
হইব না কোন নারীর দাস ;
বসিব না তব আসনে কভু,
ভাইদের তাহা, জানিবে, প্রভু।
* * *
* * *
শেষ বাণী গুলি ধারণ করে'
চলিল মেনকা স্বরগ 'পরে।
কনকঘটিত হীরক ভূষণ
খুলিল না সেই ত্রিদিবতোরণ ;
'এ নহে অতুল রতন, রূপসি,'
কহে দ্বারপাল করুণ স্বরে, পৃঃ ২৭
* * *
* * *
'ত্রিভুবন দান করিয়ে বলি
গিয়াছিল দৈত্য পাতালে চলি,—

কি দানের বাণী করি আনয়ন,
প্রবেশিতে চাও অমরভবন ?
যাও বিধুমুখি, মরতে আবার।'—
ফিরিল অপ্সরা বিষাদ ভরে।" পৃঃ ২৮

বহুদিন কাটিয়া গেল, কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গণে আসিয়া মেনকা স্বচক্ষে অভিমন্যুর পতন-দৃশ্য দেখিলেন। মৃত বীরের বক্ষ-শোণিত লইয়া মেনকা আবার স্বর্গের দ্বারে উপনীত হইলেন, কিন্তু—

"প্রতিহারী পুন সদয়ে কহে ;
এ শোণিত কিন্তু অতুল নহে।" পৃঃ ৩৬

অতঃপর বাল্মীকির তপোবনে। একদিন ধ্যানমগ্ন মুনি—

"দেখেন নয়ন মীলন করি
কিরাত অদূরে ধনুক ধরি,
ক্রৌঞ্চ পাখী এক ভূতলে পতিত ;
রোষে দুখে আঁখি হইল লোহিত,
'রক্ষ, রক্ষ, দেব' বলিতে বলিতে,
'মা নিষাদ' এই ঈরিত হইল ! পৃঃ ৪৮

* * *

* * *

বিদ্যাধরী-বীণা আপনি বাজিল,
হাসিয়ে সারদা মরতে নামিল,
দস্যু-তাপসেরে হরষে বরিল,
ধরায় অসুখ নাহিক আর ;

* * *

* * *

'মা নিষাদ' এই ঈরিত হইল,
স্বরগের দ্বার আপনি খুলিল,
নামিল ভূতলে শতেক পরী,
ভেটিবারে চিরদয়িতা জনে,
সম্মিলিয়ে চিত্ররথের সনে ;

আসিল ভূতলে উর্বশী সুন্দরী,
চিত্রলেখা আর কত বিদ্যাধরী,
পারিজাত-মালে খেলিতে খেলিতে ;
মোহিত জগতে মোহিত করি !”

পৃঃ ৪৯

‘নলিনী’

ইহাও কবি অধরলালের একখানি কাব্য। ডিমাই ১২ পেজী আকারে ৩২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এবং ১৯৩৪ সংবতে প্রকাশিত। ইহার মূল্য ছয় আনা মাত্র।

‘নলিনী’র প্রচ্ছদ-পত্র

নিম্নে এই কাব্যের প্রচ্ছদ-পত্র উদ্ধৃত হইল—

“নলিনী।
শ্রীঅধরলাল সেন বিরচিত।
‘নলিনীদলগতজলমতিতরলম্’
শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
কর্তৃক
কলিকাতা,—শোভাবাজার গ্রে ষ্ট্রীট ১০২ নং ভবনস্থ
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্বৎ ১৯৩৪।”

‘নলিনীর’ উৎসর্গ-পত্র

এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি অধরলাল কবি সুইনবার্ণের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন। উৎসর্গ-পত্র ইংরেজীতে লিখিত। নিম্নে ইহার অবিকল প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল—

“To
Algernon Charles Swinburne,
The Begetter of this song
‘I can give not what men call love ;
But wilt thou accept not

The worship the heart lifts above
And the heavens reject not ;
The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow'?"

উপরি উদ্ধৃত ইংরেজী কবিতার পংক্তি কয়টি মহাকবি শেলীর রচনা।

'নলিনী'র আলোচনা

আলোচ্য কাব্যখানি তিনটি পল্লবে বিভক্ত। জ্ঞানগুরু শঙ্করের মোহ-মুদ্গর হইতে প্রসিদ্ধ পদটি গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্রে কবি উদ্ধৃত করিয়াছেন "নলিনীদলগতজলমতিতরলম্।" কাব্যের নায়িকার নামও 'নলিনী'। তাঁহার হৃদ্গত প্রেমও নলিনীদলগত জলরাশির মতই তরল,—এই আছে, এই নাই। তাঁহার প্রথম প্রত্যাখ্যানের ব্যথায় বিধুর প্রেমিকের মোহ ভাঙ্গিয়াছে। প্রথম প্রণয়-স্বপ্ন-ভঙ্গের বেদনায়, তথা মোহ-মুক্তিজনিত স্বস্তির সুরে, কাব্যের প্রথম পল্লবটি ভরপূর। ভাব ও ছন্দের ঐন্দ্রজালিক কবি সুইনবার্ণের সুর প্রথম পল্লবটিতে অনেক স্থানে সুন্দরভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। অনুতপ্তা নায়িকাকে নায়ক বলিতেছেন—

"ভালবাসি আমি' যবে বলেছি তোমারে,
হেসেছ তখন তুমি ভাবিয়ে তামাসা ;
'ভালবাসি আমি' এবে বলিছ আমারে,
হাসিব কি আমি শুনি তব ভালবাসা ?
জানিয়াছি সার
ভালবাসা, সুখ-আশা, তামাসার নয় ;
সুখ নয়, দুখ নয়, সুধা নয়, বিষ নয়,
তবু জ্বলে, স্নিগ্ধ হয় হৃদয়-আগার,
ওরে নলিনী আমার।" পৃঃ ৩

নায়কের বর্তমান মনোভাব নিম্নোক্ত পংক্তিগুলিতে কেমন সুন্দর ফুটিয়াছে—

"কে আনিতে পারে আর কে এনেছে কবে
যে প্রেম ডুবিয়া গেছে বিরাগের জলে ;
কে বা দিতে পারে আর কে দিয়েছে কবে
প্রেমসুখে বিসর্জন বিস্মৃতির জলে ;
শেষেতে কেবল
মূলের বান্ধব দোঁহে জিনিব দুজনে ;
সদা ভার ভার মনে, আধ আধ আলাপনে,
চাওয়া-চাওয়ি হাসাহাসি অন্তিম সম্বল,
প্রেমে হেন বিষফল !" পৃঃ ৯

সংসারতাপদগ্ধ নায়কের সংশয়োক্তি—

"আছে জগদীশ, তাহা প্রকৃতি লুকায়,
নাই জগদীশ, তাহা মানুষ প্রকাশে ;
কল্পনা কল্পিত করে, কাহারে দেখায়,
নিশির স্বপনে হৃদে কার রূপ আসে ;
কে জেনেছে কবে
কোথা আছে জগদীশ কি রূপ তাহার ;
উদ্দেশেতে ভক্তি সার, উদ্দেশেতে নমস্কার,
উদ্দেশেতে জগদীশে পূজা করি সবে ;
শেষে কে জানে কি হবে।" পৃঃ ১১

'নলিনী'র দ্বিতীয় পল্লবে নায়ক অতীত দিনের স্মৃতির আলেখ্য অতি সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—

"সময়ের করে
গেছে কত প্রিয়জন কত প্রিয় আশা,
গেছে কত ভালবাসা, যা'বে কত ভালবাসা ;
তোমারও সে ভালবাসা সময়ের করে
গেছে জনমের তরে।" পৃঃ ১৭

এখন— "কি সুখ বিজনে বসি' মুদিত নয়নে
নীরবে, নিস্তব্ধে শোনা প্রকৃতি-রোদন।

কি সুখ বিজনে বসি সজল নয়নে
একাকী নীরবে সহা হৃদয়-বেদন।" পৃঃ ২০

কাব্যের তৃতীয় পল্লবটি আরও মধুর। সংসার-বিরাগী উদাসী প্রেমিকের উক্তি—

"যেখানে মোহনমূর্তি বিজন কান্তার,
সেই স্থান হয় মোর বিচিত্র ভবন ;
যেখানে বিটপী করে শাখার বিস্তার
সেই স্থান হয় মোর সুখদ-শয়ন।" পৃঃ ২৪

ঘাত-প্রতিঘাতে ফেনিলহৃদয় প্রেমিকের মানব-জীবন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উক্তিটুকু উপভোগ্য—

"ভাবনার সমাহার মানব-জীবন,
ভাবনার সুখে সুখী মানব-হৃদয় ;
ভাবনায় প্রেমিকের মনের মিলন,
ভকতের দেবদেবী, ত্রিদিব-নিলয়।" পৃঃ ২৬

'কুসুম-কানন'

অধরলালের 'কুসুম-কানন' নামক কাব্যগ্রন্থ প্রথমে দুই ভাগে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের প্রথম ভাগ পাওয়া যায় নাই। প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় ভাগ সংগৃহীত হইয়াছে ; উহা ১৯৩৫ সম্বতে বা ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণে দুই ভাগ একত্র করিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল।

'কুসুম-কানন' দ্বিতীয় ভাগের প্রচ্ছদ-পত্র

কুসুম-কানন দ্বিতীয় ভাগের প্রচ্ছদ-পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"কুসুম কানন।
দ্বিতীয় ভাগ।
শ্রীঅধরলাল সেন বিরচিত।

'The poet in a golden clime was born,
With golden stars above;
Dowered with the hate of hate, the scorn of scorn,
The love of love.'——Tennyson.

শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
কর্তৃক
কলিকাতা,—শোভাবাজার গ্রে ষ্ট্রীট ১০২নং ভবনস্থ
নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত
সম্বৎ ১৯৩৫"

মহাকবি টেনিসনের উপরি উদ্ধৃত ছত্র কয়টি গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্রে কবি উদ্ধৃত করিয়াছেন। দেশ যখন শান্তিময়, অলস-দৈন্য যখন চারিদিকে হাহাকার করে না, এমনই শুভ সময়ে দেশে কবিদের প্রাদুর্ভাব হয়। তাঁহারা কখনও প্রীতির জয়মাল্য লাভে দেশবরেণ্য হইয়া উঠেন, আবার কখনও ঘৃণা ও অবজ্ঞা তাঁহাদের অদৃষ্টে লাভ হইয়া থাকে। এমন কি, কবি যতই কেন শুভ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে আবির্ভূত হউন না, একই কবির প্রতি ক্ষেত্র বিশেষে প্রীতি, ঘৃণা ও অবজ্ঞা বর্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং কবির ভাগ্য-বিধাতা বোধ হয়, তাঁহার জন্মকালে অনুরূপ ভাগ্যলিপিই ললাটে অঙ্কিত করিয়া দেন।

'কুসুম-কানন' দ্বিতীয় ভাগের কবিতাবলী

এইভাগে নিম্নলিখিত নয়টি কবিতা স্থান পাইয়াছে—

'কুসুম-কাননে'র উৎসর্গ-পত্র

পুস্তকখানি গ্রন্থকার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার লুইস জ্যাকসনের নামে নিম্নলিখিতভাবে উৎসর্গ করিয়াছেন—

"Inscribed
with all devotion and reverence
To
The Hon.
Sir Louis Jackson, Kt.,
C. I. E."

ডিমাই ১২ পেজী আকারে ৫১ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

'কুসুম-কাননে'র দ্বিতীয় সংস্করণ

দ্বিতীয় সংস্করণের 'কুসুম-কানন' ১৯৩৯ সম্বতে বা ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয় ভাগ কুসুম-কানন প্রকাশের পাঁচ বৎসর পরে। এই সংস্করণে দ্বিতীয় ভাগের নয়টি কবিতা এবং প্রথম ভাগের চৌদ্দটি কবিতা স্থান পাইয়াছে। প্রথম ভাগের নিম্নলিখিত চৌদ্দটি কবিতার পর দ্বিতীয় ভাগের নয়টি কবিতা গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—

দ্বিতীয় সংস্করণের গ্রন্থখানি ডিমাই ১২ পেজী আকারে ৯৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

'কুসুম-কাননে'র আলোচনা

আলোচ্য গ্রন্থখানির খণ্ড কবিতাগুলি কবির প্রথম যৌবনের রচনা বলিয়া অনুমিত হয়, কারণ ভাবের গাম্ভীর্য অপেক্ষা ভাষার শব্দজাল রচনার প্রয়াস প্রায় সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। তখনকার প্রকাশ-ভঙ্গিমার দিকে লক্ষ্য রাখিলে, যুবক কবির এ প্রয়াস যে ব্যর্থ হয় নাই, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। আলোচ্য গ্রন্থের মহাবীর (পৃঃ ১১) ও "বিজয়ী" (পৃঃ ২০) নামক কবিতা দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"মহাবীর" কবিতায়, আমি অজেয়, অভেদ্য, অপ্রতিহতগতি। যথা—

"উন্নত শিখরে,
গভীর সাগরে,
বিজন প্রান্তরে,
অভেদ্য নগরে,
বিশাল ভুবন এই মম অধিকার ;
চাঁদের কিরণে,
জলদ-গর্জনে,
সৌরভ কাননে
চিন্তার ভবনে,
মহাবীর আমি, হয় রাজত্ব আমার।" পৃঃ ১২

আমি,—পরমজ্যোতিঃ। যথা—

"বিজন কাননে
তাপসের মনে
পবিত্র আসনে
পবিত্র ভূষণে
আমিই পরমজ্যোতি করুণানিলয়।" পৃঃ ১৩

আমি দুঃখীর মোহন স্বপ্ন, বীরের সমর-জয়-বাসনা, গৃহীর সন্তোষ,

বিদ্বানের জ্ঞানালোক, আমি করুণা, আমি কবি-কল্পনা, আমি অতনু, আমি সুন্দর,—

"আমার শাসনে
বিশাল ভুবনে
জীবজন্তুগণে
সুখী সর্বক্ষণে,—
মহাবীর আমি, মনে জানিলে এখন।" পৃঃ ১৯

আবার "বিজয়ী" কবিতায়—

"তুষার-মণ্ডিত
বিজন শিখর,
শৈবালভূষিত
স্বচ্ছ সরোবর
পদার্পণ মানবের হয় নি যেখানে ;
ভগ্ন দেবালয়ে,
* * * *
ভীষণ শ্মশানে,
একাকী বিজয়ী আমি ভ্রমি সেইখানে।" পৃঃ ২০

আমি বিরহ, আমি নির্বেদ, আমি বিষাদ, আমি কলহকোলাহল, আমি নৈরাশ্য, আমি সর্বজয়ী কাল—

"শারদ শিশির
নিদাঘ, মাধব,
ধীরে ধীরে চির
ভ্রমিতেছে ভব
মোর মহোদয়ী ইচ্ছা করিয়ে প্রচার।
আমি শান্তিসুখ,
বিরাগ বিশ্বের ;
আমাতে প্রমুখ
সুবোধ জনের
চিন্তার শ্মশানে সদা সুখের বিহার।" পৃঃ ২৬

'দি স্রাইন্‌স্‌ অফ্‌ সীতাকুণ্ড'

কর্মোপলক্ষে চট্টগ্রামে অবস্থিতিকালে সমুদ্রতীরবর্তী শৈলভূষিত চট্টগ্রামের অনুপম প্রাকৃতিক দৃশ্যে অধরলাল বিমোহিত হইয়া যান। কিছুকাল কাজ করিবার পর ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে শিবচতুর্দশী উৎসবের সময় তিনি সীতাকুণ্ড গমন করেন। সেখানে চন্দ্রনাথ, সীতাকুণ্ড ও বাড়বাকুণ্ড দর্শন করিয়া তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন। উহা এসিয়াটিক সোসাইটির একটি অধিবেশনে, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ তারিখে পঠিত হয়। অধরলাল সে সময়ে উক্ত সোসাইটির একজন সদস্য ছিলেন। এই প্রবন্ধ-পাঠের তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন, তাঁহার "The Shrines of Sitakund" পুস্তক বাহির হয়।

'দি স্রাইন্‌স্‌ অফ্‌ সীতাকুণ্ড' গ্রন্থের প্রচ্ছদপত্র

পুস্তকখানি ইংরেজীতে লিখিত। ডিমাই আটপেজী আকারে ৫৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। নিম্নে গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল—

"The
Shrines of Sitakund
in the District of
Chittagong in Bengal
by
Adhar Lal Sen, B. A.
Deputy Collector of Calcutta, formerly of Chittagong :
Late Scholar, Presidency College ; Member of the
Asiatic Society of Bengal ; Author of 'Lalita
Sundari,' 'Menaka', 'Nalini', 'Kusum
Kanan', and 'Lyttoniana'; Fellow
of the University of Calcutta.
Calcutta
Thacker, Spink & Co.,
Publishers to the University.
1884"

'দি স্রাইন্‌স্ অফ্ সীতাকুণ্ড' গ্রন্থের ভূমিকা

পুস্তকখানি ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস হইতে J. W. Thomas কর্তৃক মুদ্রিত। অধরলাল এই গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখিয়াছেন। সেই ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন—

"I visited Sitakund in 1880 during the *Siva-Chaturdasi* festival. From the notes then recorded by me, I wrote a paper on the Shrines of the place, which was read before the Asiatic Society of Bengal on the 2nd March, 1881. This paper, with some additions and alterations, is now presented before the public.

"It was owing to the kindness of the late Pandit Bhairava Chandra Nyayaratna of Chittagong, that I was able to obtain copies of some of the sacred writings to which reference is made in the following pages. To my old and revered tutor, Pandit Haris Chandra Kaviratna, of the Presidency College, my thanks are also due for his kindly going through the proof-sheets, and helping me with his suggestions."

'দি স্রাইন্‌স্ অফ্ সীতাকুণ্ড' গ্রন্থের আলোচনা

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচনা করিতে গিয়া গ্রন্থকার তাঁহার ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার বিশিষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

গ্রন্থকার প্রথমে সীতাকুণ্ডের ভৌগোলিক বিবরণ প্রদান করিয়া বলিতেছেন,—আইন-ই আক্‌বরীতে এই স্থানের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে যখন চট্টগ্রাম সর্বপ্রথম ইংরেজদিগের অধিকার আসে, সে সময় ইহা যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ৩রা জানুয়ারী চট্টগ্রামের প্রথম প্রধান শাসক মিঃ হ্যারি ভেরেল্‌ষ্ট (ইনি মিঃ ভান্সিটার্টের পরে বাংলা দেশের শাসন-কর্তা হন) এই স্থান হইতে আপনার আগমন-বার্তা বিজ্ঞাপিত করেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড টেইনমাউথ

ও ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়াম জোন্স এই স্থান পরিদর্শন করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন পোগসন এবং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সার জোসেফ্ হুকার এই স্থান দর্শন করিয়া উহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থকারের মতে, সীতাকুণ্ড তখনও চট্টগ্রাম জেলার মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

তিনি বলিতেছেন—"There is not certainly a more beautiful place on earth. Nature has adorned it with all that is sublime and beautiful in creation. It is a meet residence for gods. The grand mountains, the beautiful waterfalls, the volcanic springs, the clear streams, the thick forests, and their conflagrations at night, the numberless odorous flowers, the fragrant breeze, and the sweet song of birds,—these no one can forget, who has once been there." (p. 2.) এই স্থানের পূর্বদিকে সীতাকুণ্ড পর্বতশ্রেণী এবং পশ্চিমদিকে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত থাকিয়া ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আরও মনোরম করিয়া তুলিয়াছে।

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত এই সীতাকুণ্ড তীর্থ যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও, গ্রন্থকারের মতে—"There seems to be no end of places called Sitakund." (p. 54, foot-note). তিনি বলিতেছেন, এই সীতাকুণ্ড ব্যতীত, মুঙ্গের, খেলাট ও সিংহলে আরও তিনটি সীতাকুণ্ড আছে।* কানিংহাম সাহেবের আর্কিওলজিকাল রিপোর্টের ষোড়শ ভাগে (২২ ও ৩৫ পৃষ্ঠায়) আরও একটি সীতাকুণ্ডের উল্লেখ রহিয়াছে। এই সীতাকুণ্ড ত্রিহুতে গণ্ডকনদীর তীরে অবস্থিত।

---

* In p. 209, Part 1, Vol. XVII of the Journal of the Asiatic Society of Bengal, General Cunningham mentions a spring called Sitakund in Kelat, which is nine miles from Dwara, and five from Monali. In Mr. Duncan's account of the Travels in Ceylon, of a Fakeer named Praun Poory (p. 39, Vol. V of the Asiatic Researches), it is stated that "our traveller states that leaving this tank, he proceeded on to a station called *Seetakund*, where Rama placed his wife Seeta on the occasion of his war with * * Ravan."

অধরলাল তাঁহার "The Shrines of Sitakund" গ্রন্থ রচনা করিতে গিয়া বহু পুঁথি, গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকাদির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এসিয়াটিক সোসাইটির অধিবেশনে (২রা মার্চ, ১৮৮১) সুধীবৃন্দের সমক্ষে আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তিনি একটি বক্তৃতা করেন। প্রাচীন ঐতিহ্য ও কৃষ্টির দিকে অধরলালের কিরূপ আন্তরিক অনুরাগ ছিল এবং তদানীন্তন যুগের এই তরুণ রাজকর্মচারীর প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে কিরূপ আগ্রহ, উদ্যম ও অনুসন্ধিৎসা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা ঐ বক্তৃতা তথা এই আলোচ্য গ্রন্থখানিতে পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তখনকার দিনে বিভিন্ন পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি পুঁথি সংগ্রহ করা কঠিন ছিল, মুদ্রিত পুস্তকও সব সময়ে সুলভ ছিল না। এমন অবস্থায়, রাজকার্যের স্বল্প অবসরে অধরলাল এই রচনাব্যপদেশে নিজের যুক্তির সমর্থনকল্পে অথবা ভিন্ন মত খণ্ডনের জন্য কিঞ্চিন্ন্যূন চল্লিশখানি গ্রন্থ, পুঁথি ও বিবরণের সহায়তা লইয়াছেন। নিম্নে তাহার একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রদত্ত হইল—

পৌরাণিক গ্রন্থ

১। আদি পুরাণ (উমাচরণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত)
২। লিঙ্গপুরাণ (ঐ)
৩। দেবীপুরাণ
৪। আদি ব্রহ্মপুরাণ
৫। বায়ুপুরাণ
৬। ভবিষ্যপুরাণ
৭। মহাভারত, আদি, সভা ও অরণ্য পর্ব
৮। রামায়ণ (সংস্কৃত)
৯। Griffith's Ramayana

তন্ত্র

১০। বারাহী তন্ত্র
১১। ছিন্নমস্তা তন্ত্র
১২। চূড়ামণি তন্ত্র

১৩। যোগিনী তন্ত্র

১৪। তন্ত্রসার

১৫। মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্র

১৬। প্রাণতোষিণী তন্ত্র

অভিধান

১৭। শব্দকল্পদ্রুম, Vol. I., III., VII

১৮। অমরকোষ (Colebrooke's edition)

প্রাচীন বাংলা গ্রন্থ

১৯। অন্নদামঙ্গল (ভারতচন্দ্র রায় কৃত)

আধুনিক বাংলা গ্রন্থ

২০। চন্দ্রনাথ উপন্যাস (২য় সংস্করণ, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী প্রণীত)

ইংরেজী গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকাদি

২১। Census Report of 1881

২২। Cotton's Memorandum on the Revenue History of Chittagong

২৩। Lord Teignmouth's Memoirs of Sir William Jones, Vol. II

২৪। Pogson's Narrative during a Tour to Chateegaon

২৫। Dr. Oldham's Thermal Springs of India

২৬। Hooker's Himalayan Journals, Vol. II

২৭। Hunter's Statistical Account of Chittagong

২৮। Hunter's Statistical Account of Hill Tipperah

২৯। Monier Williams' Indian Wisdom

৩০। Kailas Chandra Sinha's Chronicles of Tipperah

৩১। A List of the Objects of Antiquarian Interest in the Lower Provinces of Bengal compiled at the Bengal Secretariat under the orders of the Government of India 1879

৩২। J. A. S. B., Part I, Vol. XVII

৩৩। Duncan's Travels in Ceylon (Vol. V of the Asiatic Researches)

৩৪। Shakespeare's King Henry V

৩৫। Sherring's Sacred City of the Hindus

৩৬। Cunningham's Archæological Report, Vol. XVI

গ্রন্থোল্লিখিত মন্দিরসমূহের কালনির্ণয়কল্পে প্রথমেই গ্রন্থকার মণিয়ার উইলিয়্যামসের মতোদ্ধার করিয়া বলিতেছেন যে, উপরিলিখিত পুরাণ ও তন্ত্রগুলিতে চন্দ্রনাথের তীর্থসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ পুরাণ ও তন্ত্রগুলির রচনাকাল কোনমতেই খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে নির্ধারণ করা যায় না। রামায়ণ বা মহাভারতে চট্টগ্রাম বা সীতাকুণ্ডের তীর্থসমূহের উল্লেখ নাই; তবে হাণ্টার সাহেব প্রবল পরাক্রান্ত ত্রিপুরারাজ ত্রিলোচন সম্বন্ধে উল্লেখপূর্বক বলিয়াছেন যে, তিনি মহারাজা যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক ছিলেন। মহাভারতে সহদেব ও কর্ণ কর্তৃক ত্রিপুরা-জয়ের উল্লেখ আছে। এই ত্রিপুরা-রাজগণ পরম শৈব ছিলেন এবং সম্ভবত এই শৈব রাজবংশ কর্তৃক কোন সময়ে এই তীর্থগুলি রক্ষিত হইয়া থাকিবে; আধুনিক কালেও ত্রিপুরা-রাজবংশ আংশিকভাবে এগুলির ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন। যাহাই হউক, প্রসিদ্ধ ভারত-পর্যটক য়ুয়ান-চুয়াং এই প্রসিদ্ধ তীর্থ দর্শন করেন নাই এবং মধ্যযুগে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব কর্তৃকও এ তীর্থগুলি পরিদৃষ্ট হয় নাই। হাণ্টার সাহেব বলেন, ১৫১২ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা সেনাপতি কর্তৃক চট্টগ্রাম বিজিত হয়। সম্ভবত তৎপরে মন্দিরগুলি নির্মিত হইয়া থাকিবে—কিন্তু সঠিকভাবে কোন তারিখ নির্দেশ করা সম্ভব নহে। কাপ্তেন পগ্‌সনের মতে, শম্ভুনাথের মন্দির প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্বে এবং বাড়বকুণ্ডের মন্দির প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্বে নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কাপ্তেন সাহেব ঐরূপ সময় নির্দেশ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে গ্রন্থকার (অধরলাল) সন্দিহান। চান্দুর বা চন্দ্রকুণ্ডের উৎপত্তি সম্বন্ধে কাপ্তেন পগ্‌সন (১৮৩১ খৃষ্টাব্দে) বলিতেছেন যে, মাত্র চারি বৎসর পূর্বে এই কুণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে।

জনকনন্দিনী সীতার নামে উৎসৃষ্ট বলিয়া অপর কুণ্ডটির নাম সীতাকুণ্ড রাখা হইয়াছে। এই সীতাকুণ্ড সম্বন্ধে গ্রন্থকার অধরলাল একটি কৌতুকাবহ ইতিহাস দিয়াছেন। কুণ্ডের অধিকার লইয়া একবার বৈষ্ণব ও শৈবগণের

মধ্যে বিবাদ বাধে। স্থানীয় জমিদার ও চট্টগ্রাম কালেক্‌টরীর তৎকালীন দেওয়ান কালীচরণ রায় মহাশয়ের নিকট এ বিবাদ সালিশী নিষ্পত্তির জন্য দেওয়া হয়। বিবাদ শীঘ্র মিটাইবার জন্য রায় মহাশয় খুব সহজ পন্থার আশ্রয় লইলেন, অর্থাৎ তিনি কুণ্ডের Spring বা উৎস-মুখটি ভরাট করাইয়া দিলেন। (এই রায় মহাশয় সম্বন্ধে Cotton's Memorandum on the Revenue History of Chittagong দ্রষ্টব্য)। কেহ কেহ বলেন যে, সীতাকুণ্ডের তৎকালীন মহান্ত মহাশয়ই ঐ উৎসমুখ বন্ধ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, গ্রন্থকার অধরলালের সময়ে যিনি মহান্ত ছিলেন, তিনিই শাস্ত্র-নির্দেশ অনুসারে ঐ প্রাচীন স্থানের চতুর্দিকে গভীরভাবে খনন করাইয়া বদ্ধ ও লুপ্ত উৎস-মুখটি পুনরাবিষ্কার করিবার জন্য ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি অধরলালকে বলেন, শাস্ত্রসমূহে বর্ণিত আছে বটে, কিন্তু ঐস্থলে কোনদিনই কোন স্বাভাবিক উৎসমুখ বর্তমান ছিল না। মহান্তজী তাঁহার এই বিশ্বাসের কারণ স্বরূপে নির্দেশ করেন যে, পার্শ্ববর্তী উষ্ণ-প্রস্রবণগুলির সংস্রবে তিনি সর্বত্র bitumenএর অস্তিত্ব পাইয়াছেন, কিন্তু সীতাকুণ্ডের তথাকথিত লুপ্ত উৎসমুখের সন্নিধানে তিনি bitumenএর অস্তিত্ব একেবারেই পান নাই।

এসিয়াটিক সোসাইটিতে যেদিন এ প্রবন্ধ পঠিক হয়, সেদিন আলোচনা-প্রসঙ্গে মিঃ ভি বল্ নামক জনৈক সদস্য বলেন যে, আলোচ্য স্থানটিতে হয়ত কোন দিন কোন উষ্ণ প্রস্রবণ ছিল না ; কিন্তু একমাত্র bitumenএর অভাবের দ্বারাই উৎসের অভাব প্রমাণিত হয় না।* যাহাই হউক, দেখা যাইতেছি যে, গ্রন্থকারের সময়ের কিছু পূর্ব হইতে সীতাকুণ্ডের স্বাভাবিক প্রস্রবণ বা উৎস-মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং সমসাময়িক লোকেরা তাহার কোন সন্ধান জানিতেন না।

কাপ্তেন পগ্‌সন (১৮৩১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) তাঁহার গ্রন্থে সীতাকুণ্ডের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই উষ্ণ কূপ বা জলাধারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (a remarkable hot well) এবং অগ্নি-সংযোগে উহার জলের উপরিভাগ জ্বলিয়া উঠে। অধরলাল দেবী পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া

* Proceedings of A. S. B. for March 1888, p. 51.

দেখাইয়াছেন যে, সীতাকুণ্ডের ঐরূপ উষ্ণতা ও দহনশীলতার উল্লেখ উক্ত পুরাণেও আছে এবং তদনুসারে দেবীপুরাণ ও পগ্‌সনের উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বর্তমান। কিন্তু পগ্‌সনের উক্তি গেজেটিয়ারের প্রতিধ্বনি। তবে গ্রন্থকার অধরলালের মতে, সীতাকুণ্ড বলিতে যে প্রস্রবণ বিশেষকে বুঝায় (the specific Spring Sitakund), তাহা পগ্‌সন যে সময়ে বিবরণ লেখেন, সে সময়ে বিদ্যমান ছিল কি না সন্দেহ। কারণ তৎকালের (এবং বর্তমানেও) সীতাকুণ্ড বলিতে একটি স্থান বিশেষকে বুঝায়, যেখানে কয়েকটি উষ্ণ প্রস্রবণ ও তীর্থ আছে (the name of the outpost containing all the groups of springs and shrines at the locality —p. 9)। স্থানবিশেষের নাম হিসাবে সীতাকুণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন, কোন কুণ্ড বা প্রস্রবণ হিসাবে তাঁহার গ্রন্থে সীতাকুণ্ডের উল্লেখ করেন নাই। যদি ধরিয়া লওয়া যায়, কাপ্তেন পগ্‌সনের সময়ে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে সীতাকুণ্ড নামক উষ্ণ প্রস্রবণটি বিদ্যমান ছিল, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, নিতান্ত আধুনিক কালেই উক্ত প্রস্রবণ অন্তর্হিত বা লুপ্ত হইয়াছে। শৈব বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব এবং রায় মহাশয় ও মহান্তজী সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তী ছাড়া এ বিষয়ে আর কোন কিছুর উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। হিন্দুর এরূপ একটি প্রাচীন ও পবিত্র তীর্থের আধুনিক কালে এরূপভাবে বিলোপ নিতান্তই দুঃখের বিষয়।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এবং ভারতের বাহিরে কয়েকটি স্থানে, জনকনন্দিনী সীতার নামে কয়েকটি কুণ্ডের পরিচয় দেওয়া হয়। গ্রন্থকার বলেন যে, প্রাচীন আর্য ভক্ত, তপস্বী ও ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধে একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তাঁহারা রমণীয় প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যে দেবায়তন নির্মাণ করিতেন এবং যেখানেই রহস্যময়ী প্রকৃতির অপূর্ব কোন খেয়ালের পরিচয় পাইতেন, সেখানেই ভগবদ্‌ভক্তিতে মাথা নত করিয়া পুরুষানুক্রমে ভক্তিধারা সেচনে আপন আপন রুচি অনুসারে পৌরাণিক দেবতা-সম্পর্কে তীর্থস্থান গড়িয়া তুলিতেন। প্রায়ই দেখা যায়, পুরাণবর্ণিত কোন দেবতা বা ঘটনার সহিত কোন না কোন তীর্থের একটা সম্পর্ক দাঁড় করাইয়া ভক্তগণ আনন্দ বা তৃপ্তিলাভ করিতেন। ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক

সম্ভাব্যতা বা অসম্ভাব্যতা লইয়া ভক্তের কোন দিন কিছু আসিয়া যায় না। তাই ভারতের নানা স্থানে এবং ভারতের বাহিরে একই জনকনন্দিনী সীতার নাম অবলম্বনে কয়েকটি সীতাকুণ্ডের উদ্ভব হইয়াছে। গ্রন্থকার এ তীর্থের আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব এবং মাহাত্ম্য ও ইহার নৈসর্গিক শোভা-সৌন্দর্য সম্বন্ধে শতমুখ হইলেও, গ্রন্থ-প্রারম্ভেই রামায়ণ-বর্ণিত কয়েকটি ঘটনা-পরম্পরার উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, রামচন্দ্র তথা জনকনন্দিনী সীতা দক্ষিণাপথ গমনের পথে ভারতের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত চট্টলভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ পাওয়া যায় না।

পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনার অন্তে, অধরলাল সীতাকুণ্ড ও চন্দ্রনাথ তীর্থের পরিক্রমার পরিচয়ও তাঁহার গ্রন্থে দিয়াছেন। অধরলাল সুকবি এবং ভক্ত, সুতরাং তাঁহার প্রদত্ত বর্ণনা একদিকে যেমন সৌন্দর্যে ও শ্রদ্ধায় পূর্ণ, অন্য দিকে তেমনই, তিনি অনিসন্ধিৎসু ঐতিহাসিক বলিয়া তাঁহার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে নানা মতবাদের উল্লেখ করিয়া সর্বত্র নিজের বিচার-শক্তির পরিচয় দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

অধরলালের রচনাবলীর প্রশংসা

কবির কাব্য-প্রতিভা সম্বন্ধে স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় তৎসম্পাদিত "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রে 'ললিতা-সুন্দরী' ও 'মেনকা' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল—

"Our poet has a mind rolling in fine frenzy. He has a brilliant imagination, and a good descriptive faculty. The beauty of the poem should not be judged from the effect it produces as a whole, but from detached pieces. Take parts of the poem, and you will find in it many a thought that breathes, and many a word that burns. In attempting to describe the passion of love he shews that he has got the philosophy of it, and that he knows to explain that philosophy. There is indeed something very interesting, very touching, and truly poetical in the composition. Our poet has wooed Nature in her best mood and his courtship

has not been paid in vain. Some of his happy traits are developed in his second work Menaka."

'কুসুম-কানন' প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইবার পর, উহা সাধারণ্যে যে ভাবে আদৃত হয় তাহার নমুনা-স্বরূপ নিম্নে তিনটি অভিমত উদ্ধৃত হইল—

Government Translator :"Kusum Kanana or the flowery grove. Sixteen poems on miscellaneous subjects;—the passion of love is feelingly and philosophically described."

Indian Mirror : "Some time ago, we noticed with much pleasure three poems from the pen of this author in our columns, *Menaka*, *Lalita Sundari*, and *Nalini*. The present little volume does in no way lower him in our estimation of him as a poet. Here also we mark the same felicity of thought and expression, the same happy choice of words that we noticed in his former productions. His muse, however, speaks more in strains of love, though there are other strains to be met with here and there."

Hindoo Patriot : "Poetry like painting is an imitative art, but poetry excels painting in this that while the former can penetrate into the deep recesses of the heart, the latter seeks to portray the feelings of man upon his face. The painter gives us a glimpse of the heart through the mirror of the face, but the poet carries us into the secret and unknown chambers of the heart. The poet before us has successfully painted the passions—particularly, the passion of love. His 'Kusum Kanana' or the 'flower garden' is a charming ground decorated with flowers plucked from the region of Love. Intense feeling and richness are the chief characteristics of the poem ; the lines flow swiftly but smoothly ; but they are sometimes rugged, uneven and unequal. The reader will, however, derive real pleasure from the skill with which the poet has unfolded the mechanism of the heart."

নিমাইচাঁদ শীল

সাহিত্যসেবী স্বর্গীয় নিমাইচাঁদ শীল মহাশয় চুঁচুড়ার শীলবংশে ১৮৩৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার কবিতা ও প্রবন্ধ রচনায় অনুরাগ দেখা যাইত ; তিনি সাহিত্য-সম্রাট্‌ স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহপাঠী।* হুগলী কলেজে পাঠাভ্যাসকালে সাহিত্যসেবায় তাঁহার অনুরাগ আরও বর্ধিত হয়। ইহার ফলে তিনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রচনা করেন—

১। যামিনীযাপন কামিনীগোপন

২। চন্দ্রাবতী

৩। ধ্রুবচরিত্র

৪। তীর্থমহিমা

৫। এঁরাই আবার বড়লোক ?

৬। স্মুবর্ণবণিক্‌

"স্মুবর্ণবণিক্‌" তাঁহার শেষ রচনা।

'তীর্থ-মহিমা'

তীর্থমহিমা একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক। ডিমাই ৮ পেজী আকারের ৮৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহা ১২৮০ সালে প্রকাশিত হয়।

এই পুস্তকের প্রচ্ছদ-পত্র নিম্নরূপ—

"তীর্থমহিমা

(নাটক।)

শ্রীনিমাইচাঁদ শীল প্রণীত।

কলিকাতা

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক

মুদ্রিত।

সন ১২৮০ সাল। (ইং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ)

[মূল্য এক টাকা মাত্র।]"

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক, পৃঃ ৩৫৩

'তীর্থ-মহিমা'র উৎসর্গ পত্র

গ্রন্থখানি খড়দহ নিবাসী নিতাইকিশোর গোস্বামী মহাশয়কে উৎসর্গ করা হইয়াছে। উৎসর্গ-পত্রে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"আপনি বঙ্গদেশের সর্বোচ্চতম্ এবং সদ্ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব, আপনি আবার এতাদৃশ মহান্ বংশের কুলতিলক, আপনকার নিবাসগ্রাম সম্প্রদায় বিশেষের প্রধান তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং আপনি খড়দহ বিরাজিত দেবমূর্তির গুরুভারাক্রান্ত মোহন্তের (মহান্ত) পদে অভিষিক্ত। দেবকার্যে আপনকার যেরূপ যত্ন ও অনুরাগ, মেলাদি উপলক্ষে আপনকার কৃত সদ্ব্যবস্থাদির যেরূপ সুশৃঙ্খলা, এবং সমাগত যাত্রিবর্গের প্রতি আপনকার যেরূপ সস্নেহ দৃষ্টিপাত, তাহাতে আপনি যে এ দেশের তীর্থ ও দেবালয়সমূহের মোহন্তের (মহান্ত) আদর্শ-স্বরূপ, আমার এ কথা কদাপি অত্যুক্তি নহে। এই কারণে এবং আপনকার প্রতি আমার যে অসীম ভক্তি তাহার যৎসামান্য পরিচয় স্বরূপ আমি আমার এই তীর্থমহিমা নাটকখানি আপনকার শ্রীচরণে অর্পণ করিলাম। * *

চুঁচুড়া ২০ অগ্রহায়ণ, ১২৮০ সাল	আপনার কৃপাকাঙ্ক্ষী শ্রীনিমাইচাঁদ শীল"

'তীর্থ মহিমা'র আলোচনা

আলোচ্য নাটকখানি উদ্দেশ্যমূলক। তীর্থস্থানের মহান্তেরা স্বীয় কর্তব্য-জ্ঞান বিস্মৃত হইয়া কালক্রমে কিরূপ অনাচারী হইয়া পড়ে এবং তাহাদের কবলে পড়িয়া কত লোক যে কতভাবে বিপন্ন হয়, আলোচ্য গ্রন্থে তাহাই কতকগুলি কাল্পনিক চরিত্রের সাহায্যে চিত্রিত করা হইরাছে।

প্রস্তাবনায় গ্রন্থকার লিখিতেছেন—

"মরি ! কব এ দুঃখ কায়।
পুণ্যভূমি যে ভারত, দেখি তা পাপে পূরিত
প্রবাহিত পাপ-স্রোতঃ দেশ সমুদয়।
পবিত্র তীর্থ সকল, হল অনর্থেরি স্থল
ঘৃণিত নরক পাপ ঘটে সদা তায়।

দুঃরীতি মোহন্ত (মহান্ত) দল দেবস্ব হরে কেবল
আকুল অবলাকুল ধর্ম রাখা দায়।"

বর্তমান পুস্তকের আখ্যানবস্তু তারকেশ্বরের মহান্ত মাধবগিরি ও এলোকেশীর ঘটনার অনুরূপ।* পুস্তকের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল ; নাটকখানি বিয়োগান্ত এবং শেষ দৃশ্যে নায়িকার মৃত্যু করুণ ভাবের সঞ্চার করে।

গ্রন্থকার যে কয়টি চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তন্মধ্যে নায়িকা পূর্ণকেশীর পিতা কমলকৃষ্ণ অর্থলোভী এবং সদসৎবিচাররহিত। অর্থের জন্য কোন অপকর্ম করিতে তিনি পশ্চাৎপদ নহেন। তাঁহার কন্যা মায়াবতীও স্বীয় স্বার্থ সাধনের জন্য পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। বেচারাম মহান্তের দূত—ছলে বলে কৌশলে মহান্তের কার্য সিদ্ধি করা তাহার কাজ। অর্থের জন্য এমন কোন হীন কাজ নাই যাহা করিতে সে অক্ষম। আবার মন্দের মধ্যেও ভাল দেখিতে পাওয়া যায়—গ্রন্থকারের দামিনী চরিত্র তাহার প্রমাণ।

চন্দ্রাবতী

চন্দ্রাবতী গ্রন্থকারের অন্য একখানি নাটক। গ্রন্থকার ইহাকে ইতিবৃত্ত-মূলক নাটক আখ্যা দিয়াছেন। ইহার প্রচ্ছদপত্র নিম্নরূপ—

"চন্দ্রাবতী নাটক।
(ইতিবৃত্তমূলক)
শ্রীনিমাইচাঁদ শীল প্রণীত।
কলিকাতা,
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ নং ভবনে
ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত
সন ১২৭৫ সাল। (ইং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ)
[মূল্য এক টাকা মাত্র]"

আলেখ্য নাটকখানি আড়পুলি নাট্যসমাজের সভ্যগণকে উৎসর্গ করা হইয়াছে।

* বঙ্গভাষার লেখক, পৃঃ ৭১৬

'চন্দ্রাবতী' প্রণয়নের উদ্দেশ্য

ভূমিকায় গ্রন্থকার নাটক-প্রণয়নের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন, তাহা নিম্নরূপ—

"অভিনয় প্রদর্শিত হওয়াই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। তদ্বিষয়ে আমি একপ্রকার নিশ্চিন্ত আছি। গুণিগণের দ্বারা পঠিত হওয়াও সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। কিন্তু ইদানীন্তন নাটকের পক্ষে যেরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহাতে সুধীগণ নাটক পাঠ করা দূরে থাকুক, নাম শুনিলেই প্রায় ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, এমত অবস্থায় চন্দ্রাবতীকে সাধারণ সমীপে সমর্পণ করাই অসমসাহসের কর্ম। তবে এই ভাবিয়া করিতেছি যে, যদি দুঃখিনী চন্দ্রাবতী গুণগ্রাহী পাঠকগণের করুণাপূর্ণ নয়নে পতিত হইয়াও তাঁহাদের সেই ঘৃণাই বলবতী করেন, তবে তাঁহাদের সাবেক নামের সংস্কার না হয় দূরীভূত হইবে এবং চন্দ্রাবতী হইতেই না হয় তাদৃশ নাটক পাঠেচ্ছা এবং ফলত জঘন্য নাটকলেখা সম্পূর্ণরূপে অন্তরিত হইবে। এও একটা সামান্য উপকার নহে। আর যদি চন্দ্রাবতীর অদৃষ্টগুণে বিপরীত ফল ঘটে, তবে আমার চন্দ্রাবতী হইতেই গুণিগণের সরস নাটক পাঠের সদভিলাষ (পুনরুদ্দীপিত) হইতে পারিবে এবং তাহাই আমার একান্ত প্রার্থনীয়।"

'চন্দ্রাবতী' নাটকের গল্পাংশ

'চন্দ্রাবতী' চন্দ্রশেখরের মহান্ত নারায়ণদেবের পালিত-কন্যা। চন্দ্রশেখরের আদেশে নারায়ণদেব জানিতে পারেন যে চন্দ্রাবতীকে বিবাহ করিবে, সেই মানভূমির রাজা হইবে। মহান্ত তারাপুরের রাজা বীরেন্দ্র-কেশরীর সহিত চন্দ্রাবতীর বিবাহের উদ্যোগ করিতেছিলেন; হঠাৎ মন্মথ নামক একটি ভিন্ন দেশীয় যুবক নারায়ণদেবের আশ্রমে উপস্থিত হন, তাঁহাকে দেখিয়া চন্দ্রাবতী মন্মথকে স্বীয় পতি বলিয়া মনে মনে স্থির করেন। ইতিমধ্যে মানভূমির রাজা কিরীটচন্দ্র চন্দ্রশেখরের আদেশ পরিজ্ঞাত হইয়া স্বীয় রাজ্য-শাসন সুদৃঢ় করিবার জন্য চন্দ্রাবতীকে হরণ করিয়া আনেন এবং

পাতালপুরীতে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। চন্দ্রাবতীর সন্ধানে ও উদ্ধার করিবার মানসে মন্মথ এবং চন্দ্রাবতীর সখী ইন্দুমালা মানভূমিতে আগমন করেন। রাজা কৌশলে মন্মথকে বন্দী করিয়া বন কাটিবার জন্য দূরদেশে প্রেরণ করেন। সেখানে বনভূমির অধিপতিরূপে মন্মথ তাঁহার পিতার সহিত মিলিত হন। পরে পিতার সহায়তায় মন্মথ মানভূমি আক্রমণ ও অধিকার করেন এবং চন্দ্রাবতীর সহিত মন্মথের মিলন ঘটে।

'চন্দ্রাবতী'র আলোচনা

নাটকখানি ১৩২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত পাঠককে আকৃষ্ট করে। ভাষার সরলতাও গ্রন্থখানির একটি বিশিষ্ট গুণ। কর্জনার জনহীন অবস্থা শ্রবণে মন্মথের বিলাপ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"কর্জনা নিশ্চয় জনশূন্য হয়েছে, আমার অনুরোধে কেহই সেখানে নাই। সে ঐশ্বর্যশালিনী নগরী প্রজা-পরিত্যক্ত হয়ে অত্যল্পকালের মধ্যেই ভগ্নাবস্থায় পতিত হইবে। লোকালয় গহন কানন হয়ে উঠবে। বাণিজ্য-বর্ধিনী খড়্গেশ্বরী অপ্রশস্তহৃদয় হয়ে বেগ সম্বরণ করবেন!" পৃঃ ৩৯

বিভিন্ন জেলার ভাষায় যে গ্রন্থকারের ব্যুৎপত্তি ছিল, নাটকের বহু স্থানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে একটি স্থান উদ্ধৃত হইল—

"স্ত্রী—বাবা ঠাকুর মুই তুপুর বেলা ভাত চড়িয়ে দোরে মড়ে ছেলেটিকে কোলে করে ছিনু আর বড় ধুপ ফুট্যাছিল বল্যা ভাবছিনু যে মোদের মরদ মাঠ হত্যে এ ধুপে কেমনে এস্যা ভাত খেয়ে যাবে। এক মিনসে যমদূত এমন সময়ে দৌড়্যা এস্যা মোকে বললে—তোর ভাতার নদীর ধারে কোটালের ঘোড়া চাপা পড়েছে—বাবা ঠাকুর, শুনে কি আর মুই থাকতে পারি। অমনি কোলের ছেলে পীড়ায় ফেলে দৌড়্যা দৌড়্যা তার সঙ্গে চলে আলেম। ছেলে মোর ফুকারে কাঁদতে লাগলো।" পৃঃ ৭২

নাটকখানি সঙ্গীতবহুল। নিম্নে তুইখানি গান উদ্ধৃত হইল, উহা হইতে সঙ্গীত-রচনায় গ্রন্থকারের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। প্রথমখানি রজনীর বর্ণনা; দ্বিতীয়খানি শিবের স্তোত্র।

গ্রন্থকার কর্তৃক
উপহার
প্রদত্ত হইল।"

'সুবর্ণবণিকে'র ভূমিকা

ভূমিকায় গ্রন্থকার পুস্তকপ্রণয়নের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"আপনাদের মধ্যে অনেকে অবগত নহেন যে, তাঁহারা কোন্ বর্ণ; অনেকে হয়ত এই মাত্র জানেন যে, তাঁহারা বৈশ্য, কিন্তু কি কারণে শূদ্রভাবাপন্ন, যজ্ঞোপবীতবিহীন এবং মাসাশৌচ ব্যবহারবদ্ধ, তাহা হয়ত প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞাত নহেন; আবার অনেকেরই এই সংস্কার আছে যে, তাঁহারা বাস্তবিকই শূদ্রজাতি, অথবা নিকৃষ্ট শূদ্রজাতি; এই সকল বিষয়ের প্রকৃত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

"২। অন্যান্য জাতি আপনাদের প্রতি নিকৃষ্ট জাতিযোগ্য ব্যবহার করিয়া থাকেন; হয়ত তাঁহারা আপনাদের সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত নহেন, লোক-পরম্পরায় যাহা শুনিয়া আসিতেছেন তাহাতেই বদ্ধমূল বিশ্বাস, অনুসন্ধান কিম্বা রহস্যভেদে যত্ন-পরাঙ্মুখ। তাঁহাদের কুসংস্কার বিমোচন করাই এই পুস্তকের অন্যতম উদ্দেশ্য।

"৩। জন সাধারণ, অপেক্ষাকৃত উচ্চ ব্যক্তিগণের মতাবলম্বী; ইদানীন্তন সময়ে বিদ্যার বিমলজ্যোতিঃ কুসংস্কারান্ধ হৃদয়কে আলোকিত করিয়াছে, সত্যের প্রতি বিদ্বেষসূচক অবিশ্বাসের কাল তিরোহিত হইয়াছে। প্রবাদ বিশেষের প্রকৃত অবস্থা বিজ্ঞাপন করিয়া উন্নতমনা ব্যক্তির মত-পরিবর্তন আর অসম্ভব নহে; অতএব এই সমুদয়ে যদি একজন হিংসাদ্বেষ-বিবর্জিত নিরপেক্ষ বিদ্বানের হৃদ্বোধ হয় যে আপনারা বৈশ্য—বর্ণসঙ্কর কিম্বা পতিত নহেন—তাহা হইলে তাঁহার মতাবলম্বী এক সহস্র ব্যক্তির কুসংস্কার দূরীভুত হইবে! ইহাও এই পুস্তকের অন্য একটি উদ্দেশ্য।

"৪। হিন্দু-শাস্ত্রবিশারদ ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতের যাহাকিছু সকলই অবগত হইতে একান্ত ব্যস্তচিত্ত; তাঁহারাই ভারতের আর্যাভিমানকে

অমূল্য রত্ন বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন ; আর্য নামে তাঁহাদের চিত্ত আর্দ্র হয় ; তাঁহাদেরই সমক্ষে আধুনিক ও প্রক্ষিপ্ত পাঠভূয়িষ্ঠ কয়েকখানি পুরাণ, শব্দকল্পদ্রুম ও বাচস্পত্যভিধান, হণ্টার সাহেবের ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ও গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের রিপোর্ট এবং বঙ্গদেশের আদমসুমারির জাতিমালা সমর্পিত হইয়াছে ; তাঁহারা সেই সকল গ্রন্থে আপনাদের নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া পরিচয় পাইবেন ; তাহাই নিবারণ করণোদ্দেশে এই পুস্তকের সৃজন।

"৫। বর্তমান রাজসমীপে সম্মানে ও পদলাভে আপনারা অন্যান্য বর্ণ ও জাতির সহিত সমকক্ষ তাহার সন্দেহ নাই ; কিন্তু জাতি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যে কোন তালিকা উদ্ঘাটন করুন দেখিতে পাইবেন যে, রাজা অভ্রান্তরূপে সুবর্ণবণিক্‌কে নবশাকের নিম্নে অন্যান্য জাতির সহিত একত্রিত করিয়াছেন এবং কখনই আপনাদিগকে যথাযোগ্য স্থান প্রদান করেন নাই ; রাজার এই ভ্রম সংশোধন করাই এই পুস্তকের অন্য একটি উদ্দেশ্য।

"৬। ইং ১৮৮১ অব্দের আদমসুমারির রিপোর্টের অভিপ্রায়ানুসারে গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি বঙ্গদেশের জাতিসমূহের যথাযথ বৃত্তান্ত এবং সামাজিক সম্ভ্রমাদি সম্বলিত বিস্তারিত জাতিমালা প্রস্তুত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন ; এই শুভ সময়ে আপনাদের প্রকৃত পরিচয় রাজসমীপে সমর্পণ করা আবশ্যক হইয়াছে ; এই জন্যই এই পুস্তকের অবতারণা।

"৭। আপনাদের এক সম্প্রদায়ের মধ্যে রাঢ়ীয় ও সপ্তগ্রামী শ্রেণী-বিভাগ নিতান্ত অকারণজনিত ; সম্প্রতি এ শ্রেণীবিভাগ ভিন্ন শ্রেণীস্থ বিজ্ঞতম ব্যক্তিগণের লজ্জাকর ও অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে ; একেই আপনাদের লোকসংখ্যা স্বল্পমাত্র, আবার সেই স্বল্পসংখ্যক লোক মধ্যে শ্রেণী বিভাগ, এবং আদান-প্রদানরহিত ; এ দিকে আদান-প্রদান রহিত থাকা অনিষ্টকর বলিয়া অনেকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, দূর-রক্ত-সম্বন্ধে বিবাহোৎপন্ন বলিষ্ঠ সন্তান-সন্ততির গৌরব অনেকের হৃদ্বোধ হইয়াছে, অতএব আপনাদের দুই শ্রেণীর মধ্যে স্থগিত আদান-প্রদান পুনঃ প্রচলিত হয়, ইহাও এই পুস্তকের আর একটি উদ্দেশ্য।

* * * * *

"১২। আপনাদের জাতীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে

পাওয়া যায় যে, ইহারই অনতি-পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত আপনারা একাদিক্রমে বাণিজ্য-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন, এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নাবস্থাপন্ন স্বজাতীয়গণ ধনাঢ্যগণের কার্যালয়ে নিযুক্ত থাকিয়া প্রতিপালিত হইয়াছেন। ইদানীন্তনকালে আপনাদের জাতীয় বৃত্তি অন্য জাতীয়গণ অপহরণ করিয়াছেন, বাণিজ্য-লক্ষ্মী সামাজিক-নিয়ম-বিশৃঙ্খলতায় আর কেবলমাত্র আপনাদের গৃহে কারাবদ্ধ নহে। আপনারা অনেকেই * * স্ববৃত্যাদির মধ্যে কেবলমাত্র কুসীদ গ্রহণে সংসার নির্বাহ করিতেছেন। আপনাদের বহুল লোকবিশিষ্ট কার্যালয়সমূহ রুদ্ধ হইয়াছে। ফলত অপেক্ষাকৃত ধনাঢ্যগণের স্বজাতীয় প্রতিপালনের ক্ষমতা এক প্রকার অন্তরিত হইয়াছে; এমতে আপনাদের মধ্যবর্তী অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ নানা কার্যসূত্রে নানা দেশে নানা জাতীয় লোক মধ্যে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বঙ্গদেশের অনেক স্থানে সেই সকল ব্যক্তি কুসংস্কারাপন্ন জাতীয়গণের নিরতিশয় ঘৃণাজনিত অসুবিধার ভোগ সহ্য করিতেছেন। এ কথা জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা সপ্রমাণার্থ এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আপনাদের মধ্যে যাঁহারা রাজকীয় উচ্চ পদাভিষিক্ত, তাঁহারাও এখনো পর্যন্ত স্থানবিশেষে সামান্য সূপকার ব্রাহ্মণ, দাসদাসী পাইতে অনেক কষ্ট পাইয়া থাকেন। সেই সকল দেশে তদপেক্ষা নিম্নপদস্থ স্বজাতীয়গণের যে কি দুরবস্থা এবং তাঁহাদিগের যে কি অপরিমিত অসুবিধা সহ্য করিতে হয়, তাহা তুলনায় অবশ্যই উপলব্ধি হইবে। * * * এ কাল পর্যন্ত এই অন্যায় লোকাত্যাচার আপনাদের কোন অসুবিধা উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় নাই; উপরোক্ত অবস্থান্তরের সঙ্গে উহা এতাদৃশ অনিষ্টকর বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, আশু নিবারণ একান্ত আবশ্যক। নিরপেক্ষ রাজা তুলদণ্ড হস্তে ধর্মবিচার বিতরণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আলস্য পরিত্যাগ করিয়া এ বিষয় রাজ-বিচারে সমর্পণ করুন;—দেখিবেন প্রমাণের ভার এ পুস্তক বহন করিয়া আনিয়াছে।”

‘সুবর্ণবণিক্’ গ্রন্থের আলোচনা

“সুবর্ণবণিক্” পুস্তকখানি বিংশতি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে —গ্রন্থকার “আদিমকালে হিন্দুদিগের বর্ণবিভাগ ছিল না”—এই বিষয়

লইয়া ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়াছেন। তিনি প্রথমত হিন্দুদিগের আদিম বাসস্থান লইয়া পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন— "ভারতবর্ষ হিন্দুদিগের আদিম বাসস্থান নহে, তাঁহারা অন্য কোন দেশ হইতে আসিয়া ভারতে বাস করিয়াছেন—এই জনপ্রবাদ ধারাবাহিকরূপে সর্বত্র প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এসিয়া খণ্ডের মধ্যস্থলই মনুষ্যজাতির আদিম বাসস্থান। ইয়োরোপ খণ্ডের সংস্কৃতজ্ঞ তত্ত্বানুসন্ধানী বিখ্যাতনামা পণ্ডিতসকল, ইদানীন্তন সমস্ত সভ্যদেশের শাস্ত্রমন্থন করিয়া যে মনোহর মীমাংসা লাভ করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম গ্রহণ করিলে ইহা প্রায়ই অবিবাদে স্বীকার করিতে হইবে যে, মনুষ্য জাতি সর্বপ্রথমে আসিয়া খণ্ডের মধ্যস্থলে বেলুর্তাগ ও মুসতাগ পর্বতের পশ্চিমাংশে আমুরনদীর উৎপত্তিস্থান-সন্নিহিত কোন হিমাবৃত উচ্চতম ভূমিখণ্ডে বসতি করিতেন। সেই আদিম মনুষ্যকুলই বেদোক্ত আর্যজাতি। * * * যে আর্যগণ, তাঁহাদের আদিম বসতিস্থান পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে আগমনপূর্বক ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হন, তাঁহারাই পরবর্তীকালে হিন্দু নামে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তাঁহারাই হিন্দু জাতি।"*

হিন্দুর আদিম বাসস্থান নির্ণয় করিয়া গ্রন্থকার রোমান, গ্রীক্, জার্মাণ, ইংরেজ প্রভৃতি জাতিও যে হিন্দুর মত অখণ্ড আর্যজাতির বিভিন্ন শাখামাত্র এবং পুরাকালে সকলে একান্নবর্তী পরিবারের ন্যায় বাস করিতেন, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রমাণস্বরূপ বিভিন্ন জাতির উপাস্য দেবতার নামের ও অর্চনার সাদৃশ্য, ভিন্ন ভিন্ন জাতির উপকথার সাদৃশ্য ও ভাষাগত এবং উচ্চারণগত সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

তৎপরে তিনি হিন্দু শব্দের উৎপত্তি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, হিন্দুশব্দ "সিন্ধু" শব্দের অপভ্রংশমাত্র, উহা সপ্তসিন্ধুর অপভ্রংশ পারসিক হপ্তহেন্দু হইতে উৎপন্ন। আর্যগণ পাঞ্জাবে অবস্থিতিকালে পারসিকগণ কর্তৃক হপ্তহেন্দু নামে অভিহিত হইতেন। কালক্রমে উহা হিন্দুশব্দে পর্যবসিত হইয়াছে।

---

* সুবর্ণবণিক্—পৃঃ ১, ২

আর্যশব্দের উৎপত্তি ও আর্যদের বৃত্তি

আর্যশব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন,—"বেদানুসারে আর্য শব্দের অর্থ বৈশ্য; এবং তদপেক্ষা অপ্রাচীন হিন্দুগ্রন্থের মতানুসারে আর্য শব্দের অর্থ সৎকুলোদ্ভব মান্য ব্যক্তি। বোধ হয় অর্য শব্দ হইতেই আর্য শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আদিমকালে কৃষিকার্যই আর্যদিগের সর্বপ্রধান বৃত্তি ছিল; পশুপালন সেই বৃত্তির অনুকূল বলিয়া আর্যেরা তাহাও অবলম্বন করিয়াছিলেন। পশু সাহায্যে হলাদির দ্বারা ভূমিকর্ষণ করিয়া শস্যোৎপাদন-পূর্বক জীবিকা-নির্বাহ করা ভিন্ন অন্য উপায় অবলম্বন মনুষ্যের প্রথমাবস্থায় কদাপি সম্ভবপর নহে। পণ্ডিতবর মোক্ষমুলর ভট্ট স্থির করিয়াছেন যে, লাটিন, গ্রীক, ইংরেজী প্রভৃতি ইয়োরোপীয় ভাষায় হল ও কৃষিবাচক কতকগুলি শব্দ আছে, তাহা অর্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। অর্ ধাতুর অর্থই ভূমিকর্ষণ। ইহাতে বোধ যে, আর্যেরা একত্র সংশ্লিষ্ট থাকিবার সময়ে আদিম অবস্থায় কৃষিকার্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। এমতে দেখা যাইতেছে যে, পরবর্তীকালে ভারতের আর্যগণের বর্ণবিভাগে যে কৃষিকার্য ও পশু পালন কেবলমাত্র বৈশ্যদিগের বর্ণগত বৃত্তি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল, তাহা আর্যদের আদিম অবস্থায় তাঁহাদের সাধারণ বৃত্তি ছিল। এই জন্যই সমস্ত আর্যকুলকে বৈশ্য বলা যাইত।"*

আর্যদিগের বর্ণবিভাগ

আদিমকালে আর্যদিগের মধ্যে বর্ণবিভাগ ছিল না—ইহার প্রমাণার্থ গ্রন্থকার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ও বেদবিভাগের কাল লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, খুব কম করিয়া ধরিলেও বেদবিভাগ অন্ততঃপক্ষে ৪৭৫০ বৎসর পূর্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বেদের মধ্যে ঋগ্বেদের রচনা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। কিন্তু তাহাতে বর্ণবিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিনি লিখিতেছেন—"সেই মন্ত্রময় বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ অতীব প্রাচীন

বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে আদিমকালে আর্যদিগের মধ্যে বর্ণ-বিভাগ ছিল, এরূপ কোন স্পষ্ট প্রমাণ দেখা যায় না। দুই এক স্থানে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই সব স্থলের পূর্বাপর অংশ মনোনিবেশ পূর্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সে শব্দ জাতিবেশেষ-প্রতিপাদক নহে, বৃত্তি বা কর্মবিশেষের বিজ্ঞাপকমাত্র; সে ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ বৈদিক মন্ত্রবক্তা ও সে ক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ দেশরক্ষক ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।"[১]

এমন কি মহাভারতে এবং শ্রীমদ্ভাগবতেও যে আদি কালে বর্ণবিভাগ ছিল না বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—"ভারতাগমনের অনতিপরবর্তীকালেও তাঁহাদের মধ্যে বর্ণ-বিভাগ হয় নাই। মহাভারতীয় মোক্ষধর্মে লিখিত আছে—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কর্মণা বর্ণতাং গতম্॥

বর্ণভেদ নাই, সমস্ত জগতে এক ব্রাহ্মণমাত্র ব্রহ্মা কর্তৃক পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছিলেন, তৎপরে কর্মের বিভিন্নতা বশত বর্ণের বিভিন্নতা হইয়াছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ॥ ৯।১৪।৩৭

পূর্বকালে সকল বাক্যের মূলস্বরূপ প্রণবই একমাত্র বেদ ছিল, নারায়ণ একমাত্র উপাস্য দেবতা ছিলেন, এবং বর্ণ একমাত্র ছিল।

এমতে অতিপূর্বকালে বেদের সংস্থাপন সম্বন্ধে আর্যদিগের মধ্যে বর্ণ-বিভাগ হয় নাই।"[২]

হিন্দুদিগের কর্মগত বর্ণবিভাগ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হিন্দুদিগের কর্মগত বর্ণবিভাগ আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার লিখিতেছেন—"মহাভারতের মোক্ষধর্মে ভরদ্বাজ ঋষির প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে ভৃগু কহিয়াছেন—

---

১ সুবর্ণবণিক্—পৃঃ ৫
২ ঐ —পৃঃ ৬

কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্মা রক্তাশ্চ দ্বিজাস্তে ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় বার্তাকৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্মং নাধিতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্বকর্মোপজীবিনঃ।
ক্লিষ্টাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

যে সকল ব্রাহ্মণ স্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক ইচ্ছানুসারে ভোগে রত, উগ্র স্বভাববিশিষ্ট, ক্রোধী ও সাহসী হইলেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, যাঁহারা গো-পালন, কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন তাঁহারাই বৈশ্যনাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা হিংস্রক, মিথ্যাবাদী, লোভী, অপবিত্রাচারী, এবং জীবিকা নির্বাহার্থে সকল প্রকার কর্মে রত ছিলেন, তাঁহারাই শূদ্রনামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।"*

অতঃপর গ্রন্থকার সৃষ্টিকর্তা দ্বারা স্বয়ং বর্ণ চতুষ্টয়ের সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"মতান্তরে বর্ণবিভাগ সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা এককালে এই বর্ণ চতুষ্টয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মনুষ্যের দ্বারা এই শ্রেণীবিভাগ-কর্ম সম্পাদিত হয় নাই। এই মত সংস্থাপনে শ্রীমদ্ভাগবত এবং মনুসংহিতার এই দুই শ্লোক প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষাশ্চাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥ ১১।৫।২ শ্রীমদ্ভাগবত
লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ॥ ১।১৩ মনুসংহিতা

সামান্যত এই উভয় শ্লোকের অর্থ এই মাত্র যে, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং ব্রহ্মা আপন মুখ, বাহু, ঊরু ও চরণ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি বর্ণ উৎপাদন করিয়াছিলেন, কিন্তু নিগূঢ় তাৎপর্য গ্রহণ করিলে এই দুই শ্লোকের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, পূর্বকালে যে সকল মনুষ্য ব্রহ্মার

* সুবর্ণবণিক্—পৃঃ ৭, ৮

মুখের কার্য অর্থাৎ বেদপাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ; যাঁহারা বাহুর কার্য অর্থাৎ যুদ্ধাদি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়; যাঁহারা উরুর কার্য অর্থাৎ হলধারণপূর্বক ভূমি কর্ষণ করিয়া শস্যোৎপাদন ও ধন সঞ্চয়ের ও রাজ্যের বলস্তম্ভ নির্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহারাই বৈশ্য; এবং যাঁহারা চরণের কার্য অর্থাৎ পদসেবা ও দেশ-দেশান্তরে গমনাগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই শূদ্রবর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিলেন। * * বেদবক্তা ব্রাহ্মণের চারিপুত্রের মধ্যে নিজ-নিজ কর্মানুসারে একজন ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয়, একজন বৈশ্য এবং একজন শূদ্র বলিয়া সমাজে পরিচিত হইতে পারিতেন। * * পুরাকালে একবর্ণ হইতে অন্য বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, এমন কি একবর্ণ হইতে সমুদয় চতুর্বর্ণের উৎপত্তির প্রসঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

এতে হ্যঙ্গিরসঃ পুত্রা জাতা বংশেঽথ ভার্গবে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ॥ 		হরিবংশ

ভার্গব বংশোদ্ভব অঙ্গিরসের পুত্রসকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণেই বিভক্ত হয়েন। * * * পাঞ্জাবের সীমাভ্যন্তরে বসতিকালে ব্রাহ্মণময় আর্যগণ কেবল কার্যগত বর্ণবিভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। কুলগত বর্ণবিভাগ তখনও প্রবর্তিত হয় নাই।”*

কুলগত বর্ণবিভাগ

তৃতীয় পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার বর্ণবিভাগ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই অধ্যায়ে মনুসংহিতার রচনাকাল ও বর্তমান আকার সম্বন্ধে বহুবিধ তথ্য বিবিধ পুস্তক হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। মনুসংহিতার সমসাময়িককালে হিন্দুদিগের মধ্যে প্রথম কুলগত বর্ণবিভাগের সৃষ্টি হয়। তিনি বলিতেছেন —“সমাজের প্রয়োজনানুসারে এই সময়ে হিন্দুগণ প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়াছিলেন; এবং এই বর্ণবিভাগ কুলপরম্পরাগত হইয়াছিল। তদানীন্তন কাল হইতে বর্ণচতুষ্টয়ের

---

* সুবর্ণবণিক্—পৃঃ ৮, ৯

বংশাবলী ক্রমান্বয়ে বর্ণগত নির্দিষ্ট বৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন, মনুর এইরূপ কঠিন নিয়মের অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন।"[১]

মনুর বর্ণবিভাগের বৈশিষ্ট্য

কুলগত বর্ণ বিভাগ করিলেও, মনুর বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি কর্মগত বর্ণবিভাগকে ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তখনও একবর্ণ হইতে অন্য বর্ণে উত্থান বা পতন অসম্ভব ছিল না। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের কার্যাবলী বর্ণনা করিয়া তিনি বলিতেছেন—"আর্যগণ এইরূপে মনু কর্তৃক কুলগত কার্যাদি সম্পাদনে বর্ণ চতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু নিয়ম সংস্থাপনের প্রথম অবস্থায় প্রতিপালন-শৈথিল্যের উদাহরণ নিতান্ত বিরল নহে; কারণ তখনও একজাতীয় ব্যক্তিবিশেষ তপস্যা ও গুণের প্রভাবে অন্যবর্ণের উচ্চপদে অধিরোহণ করিতে পারিতেন। বিশ্বামিত্র, আর্ষ্টিষেণ, সিন্দুদ্বীপ ও দেবাপি ক্ষত্রিয় হইয়াও নিজ নিজ গুণ বলে ব্রাহ্মণপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"[২]

বিবাহ-শৈথিল্য ও বর্ণসঙ্কর

চতুর্থ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার বিবাহ-শৈথিল্য ও বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সমাজে লোকসংখ্যার অল্পতাই বিবাহ-শৈথিল্যের ও বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির কারণ। তৎপরে তিনি বিবিধ বর্ণসঙ্করজাতির মনুলিখিত বিবরণের আলোচনা করিয়া বলিতেছেন—"বর্ণ-সঙ্কর জাতি মাত্র, বর্ণ নহে।" উদাহরণ স্বরূপ তিনি মনুর নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥" ১০।৪

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি অর্থাৎ দ্বিজ শব্দে বাচ্য,

---

১ সুবর্ণবণিক্—পৃঃ ১২
২ ঐ —পৃঃ ১৩

যেহেতু উহাদের উপনয়ন-সংস্কার আছে। চতুর্থ বর্ণ শূদ্র, দ্বিজ নহে, ইহার উপনয়ন নাই, অম্বষ্ঠাদি সঙ্করসকল জাতিপদবাচ্য, বর্ণ নহে।

তৎপরে তিনি বিভিন্ন অভিধান হইতে অম্বষ্ঠজাতির উৎপত্তি ও বৃত্তি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন; এই আলোচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—"অম্বষ্ঠজাতির উৎপত্তি ও বৃত্তির উল্লেখ এই পুস্তকের প্রয়োজনীয় বলিয়া লেখা গেল মাত্র।"*

বৈশ্যের বৃত্তি

পঞ্চম পরিচ্ছেদে বৈশ্যের বৃত্তি লইয়া গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন এবং বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে উদাহরণ সঙ্কলন করিয়াছেন। নিম্নে উহা বিবৃত হইল—

"পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥" ১।৯০ মনুসংহিতা

বৈশ্যগণ পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, কৃষিকর্ম ও কুসীদ গ্রহণ করিবেন।

"মণিমুক্তা-প্রবালানাং লোহানাং তান্তবস্য চ।
গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ বিদ্যাদর্ঘবলাবলম্॥" ৯।৩২৯ মনুসংহিতা

বৈশ্য মণিমুক্তা, প্রবাল, সুবর্ণাদি বস্তু, কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য, লবণাদি রস—এই সকল বস্তুর গুণভেদে মূল্য স্থির করিবেন।

"লৌহকর্ম তথা রত্নং গবাঞ্চ প্রতিপালনম্।
বাণিজ্যং কৃষিকর্মাণি বৈশ্যবৃত্তিরুদাহৃতা॥১।৬০ পরাশরসংহিতা

লৌহকর্ম, রত্ন-ব্যবসায়, গোজাতির প্রতিপালন, বাণিজ্য, কৃষিকর্ম—এই সকল কার্য বৈশ্যের।

"গোরক্ষাং কৃষিবাণিজ্যং কুর্যাদ্বৈশ্যো যথাবিধি।" হারীতসংহিতা

বৈশ্যগণ যথাবিধি পশুপালন, কৃষিকার্য ও বাণিজ্য করিবেন।

"কৃষির্গোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

---

* সুবর্ণবণিক্—পৃঃ ১৮, ১৯

বৈশ্যগণ কৃষিকর্ম, পশুপালন ও বাণিজ্য করিবেন।

"দানমধ্যয়নং যজ্ঞো ধর্মঃ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যয়োরিতি।" গরুড়পুরাণ

দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, এই তিন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সাধারণ ধর্ম।

"পালয়েচ্চ পশূন বৈশ্যঃ পিতৃবদ্ধনমর্জয়ন্ ইতি।" পদ্মপুরাণ

বৈশ্য ধর্ম উপার্জন নিমিত্ত পিতার ন্যায় পশু পালন করিবে।

"কৃষিবাণিজ্য-গোরক্ষাকুসীদং তূর্যমুচ্যতে।" শ্রীমদ্ভাগবত

কৃষি বাণিজ্য, গোপালন ও কুসীদ গ্রহণ এই চারিটি বৈশ্যের বৃত্তি।*

বৈশ্যের বৃত্তি নির্ণয় করিয়া গ্রন্থকার বৈশ্যের দশকর্মবিধি বর্ণনা করিয়াছেন এবং বলিতেছেন যে শাস্ত্রকারেরা বৈশ্যকে দ্বিজ বলিয়াছেন এবং বেদাধ্যয়নে অধিকার দিয়াছেন।

বৈশ্যের সংজ্ঞা

বৈশ্যের সংজ্ঞা নির্ণয় প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"বৈশ্যের আর কোন নাম আছে কি না? বৈশ্য আর কোন নামে অভিহিত হইতে পারেন কি না? যেমন স্বর্ণকে কাঞ্চন বলা হয়, তদ্রূপ বৈশ্যকে আর কিছু বলা হয় কি না? * * * সেইরূপ এমন কোন শব্দ আছে কি না, যাহা উচ্চারণ করিবামাত্রই শ্রোতার হৃদয়ে নিঃসন্দিগ্ধরূপে বোধ হইবে যে, সে শব্দ বৈশ্যের দ্বিতীয় সংজ্ঞামাত্র, অন্য কিছুই নহে।" এই তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ গ্রন্থকার প্রথমে রাজনির্ঘণ্ট ও অমরকোষের বচন উদ্ধৃত করিয়া বৈশ্য ও বণিক্ যে একার্থবাচক তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তৎপরে বলিতেছেন—"* * কোন শব্দের প্রশস্ত অর্থ বিখ্যাতনামা গ্রন্থকর্তাদের ব্যবহার দ্বারা সপ্রমাণ না হইলে রাজনির্ঘণ্ট ও অমরকোষ সদৃশ প্রসিদ্ধ অভিধানের শব্দার্থও বিজ্ঞজনের গ্রাহ্য না হইতে পারে। অতএব বৈশ্যের অপর সংজ্ঞা অন্বেষণ করণার্থ প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি দৃষ্টি করা আবশ্যক হইতেছে।" এই নিমিত্ত তিনি প্রথমে মহামুনি বাল্মীকির রামায়ণ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

* সুবর্ণবণিক্—পৃঃ ২০, ২১

"পঠন্ দ্বিজো বাগৃষভত্বমীয়াৎ
ক্ষত্রান্বয়ো ভূমিপতিত্বমীয়াৎ।
বণিগ্জনঃ পণ্যফলত্বমীয়াৎ
শৃন্বন্ হি শূদ্রোঽপি মহত্বমীয়াৎ ॥"

এই রামায়ণ গ্রন্থ পাঠ করিলে ব্রাহ্মণ বাগ্মিতা প্রাপ্ত হয়েন, ক্ষত্রিয়েরা রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন, বণিকে পণ্যফল লাভ করেন এবং শূদ্রে শ্রবণ করিলে মহত্ব প্রাপ্ত হয়।

তৎপরে তিনি মনুসংহিতার ৮ম অধ্যায়ের ১৬৯ সংখ্যক শ্লোক ও ১০ম অধ্যায়ের ৭৯ সংখ্যক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মনুও বৈশ্য-শব্দের পরিবর্তে 'বণিক্' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। লক্ষ্মীব্রত গ্রন্থেও বৈশ্য শব্দের পরিবর্তে বণিক্ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে বৈশ্য ও বণিক্ যে একার্থবোধক তাহার সম্বন্ধে গ্রন্থকার নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন —"এ মতে প্রমাণিত হইল যে, ভগবান্ মনু, মহর্ষি বাল্মীকি এবং লক্ষ্মীব্রত গ্রন্থকর্তা বৈশ্যকে বণিক্ বলিয়াছেন অর্থাৎ বৈশ্যের স্থলে বণিক্ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, অতএব হিন্দুদিগের মধ্যে বৈশ্য বলিলে যাহাদিগকে বুঝায়, বণিক্ বলিলেও তাহাদিগকে বুঝায় ;—অর্থাৎ বৈশ্য ও বণিক্ একই বর্ণের দুই সংজ্ঞা।"*

রামায়ণ ও মহাভারতে বৈশ্যের উল্লেখ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার রামায়ণ ও মহাভারতের রচনাকাল লইয়া আলোচনার ফলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রামায়ণ বৌদ্ধ মত প্রচারের পূর্বে রচিত ; তবে যে বৌদ্ধ মতের উল্লেখ কোথাও পরিদৃষ্ট হয়, তাহা প্রক্ষিপ্ত। তাঁহার মতে মহাভারত এবং মনুসংহিতাও রামায়ণের পরবর্তী রচনা। মহাভারতের যুগে "বণিক্গণ বাণিজ্যার্থ সমুদ্র পথে বালিদ্বীপ ও যবদ্বীপ পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন।"

তিনি আরও বলিতেছেন,—"রত্নপ্রসবিনী ভারত ভূমির যে প্রদেশ রত্নরাজিনিহিত খনিবিশিষ্ট, যে প্রদেশ মূল্যবান্ ধাতুর আকর, সেই প্রদেশেই

* সুবর্ণবণিক্—পৃঃ ২৪

বণিক্‌গণ নিরতিশয় যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে গমন করিয়াছেন এবং সময়ে তাহা স্বজনের অধিকারভুক্ত করিয়াছেন। এইরূপে বৈশ্য বৃত্তি পরিচালনা সূত্রে ভারতের এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্যন্ত সমস্ত ভূমি এবং পূর্ব পশ্চিমতট সন্নিহিত মুক্তাপ্রসবিনী শুক্তিবিশিষ্ট ও নিকটবর্তী উপদ্বীপ সকল হিন্দুদিগের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।"[১]

ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব

অতঃপর গ্রন্থকার ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব লইয়া আলোচনা করিয়া ষষ্ঠ অধ্যায় পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"বর্ণবিচার রহিত হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণের নাম পর্যন্ত লোপ হইয়া গিয়াছিল; আর্যধর্মের ও আর্যতীর্থের চিহ্নমাত্র ছিল না। হিন্দুদের বৈদিক ধর্ম উৎসন্ন দিতে ভারতে এরূপ মহা পরাক্রান্ত শত্রু আর কখনই উপস্থিত হয় নাই; প্রকৃত ধর্মবিপ্লব সেই একবারই ভারতে ঘটিয়াছিল।"[২]

তিনি আরও বলিতেছেন যে, কিন্তু ভারতবর্ষ কোনকালে একেবারে ধর্মহীন হয় নাই। সেই ভীষণ দুর্দিনেও প্রচ্ছন্নভাবে ব্রাহ্মণগণ কোথাও কোথাও বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ সঞ্জীবিত রাখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কান্যকুব্জের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই স্থানের ব্রাহ্মণগণ বৈদিক ধর্মে অটলভাবে অবস্থিত ছিলেন; সদাচারভ্রষ্ট এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপরহিত হন নাই।

সনক আঢ্য ও সুবর্ণবণিক্ সংজ্ঞা-লাভ

সপ্তম পরিচ্ছেদে বঙ্গে বণিক্‌গণের আগমন-বিবরণ লইয়া গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন। আনুমানিক খৃষ্টীয় দশম শতকে অযোধ্যার সন্নিকটবর্তী রামগড় নামক স্থান হইতে সনক আঢ্য নামক জনৈক ধনী বৈশ্য বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হইতে আত্মরক্ষার্থ বরাটিকা নাম্নী পত্নী, জ্ঞানচন্দ্র মিশ্র নামক কুলপুরোহিত, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, বন্ধুবর্গ ও কতিপয় অস্ত্রধারী সৈন্য সমভিব্যাহারে তীর্থভ্রমণচ্ছলে বঙ্গে আগমন করেন। বঙ্গদেশ তৎকালে

---

১ সুবর্ণবণিক্—পৃঃ ২৮

২ ঐ —পৃঃ ৩০, ৩১

অম্বষ্ঠ জাতীয় রাজা আদিশূর কর্তৃক শাসিত হইতেছিল ; তিনি হিন্দুধর্ম-পরায়ণ ছিলেন বলিয়া সনক আঢ্য তাঁহার আশ্রয়ে ব্রহ্মপুত্রনদ-তীরে বসতি স্থাপন করিয়া বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে যে ১৬ ঘর প্রধান বৈশ্য বঙ্গে আগমন করেন তাঁহাদের নাম—দে, দত্ত, চন্দ্র, আঢ্য, শীল, সিংহ, ধর, বড়াল, পাল, নাথ, মল্লিক, নন্দী, বর্ধন, দাস, লাহা ও সেন। এই ১৬ ঘর প্রধান বৈশ্যের সঙ্গে আরও ৩০ ঘর অপ্রধান বৈশ্য বাংলাদেশে আসিয়াছিলেন। এই ৪৬ ঘর বৈশ্যই বঙ্গদেশের আদি বণিক্।

কালক্রমে সনক আঢ্যের সহিত বঙ্গাধিপ আদিশূরের বিশেষ সৌহার্দ স্থাপিত হয় এবং অপুত্রক রাজা পুত্র-কামনায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদনে ইচ্ছুক হইলে সনক আঢ্য কান্যকুব্জ হইতে বৈদিক ক্রিয়া-পরায়ণ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া রাজার যজ্ঞে সহায়তা করায় তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্ররূপে পরিণত হন। তিনি স্বর্ণের ব্যবসা দ্বারা প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সেই হেতু রাজা আদিশূর তাঁহার সম্মান বৃদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাকে "সুবর্ণবণিক্" এই উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন এবং তাঁহার বসতি স্থানের নামকরণ করিলেন —"সুবর্ণগ্রাম"। এইরূপে বাংলার নবাগত বৈশ্যগণ "সুবর্ণবণিক্" সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন। এই ঘটনা খৃষ্টীয় ৯৪৫ অব্দে ঘটে বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন।

রাজা বল্লাল সেন ও সুবর্ণবণিক্

অষ্টম অধ্যায়ে গ্রন্থকার রাজা বল্লাল সেনের প্রবর্তিত কৌলীন্য-প্রথা লইয়া আলোচনা প্রসঙ্গে রাজার চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছেন। নবম অধ্যায়ে সুবর্ণবণিকের প্রতি রাজা বল্লাল সেনের অত্যাচার-কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তৎকালে সনক আঢ্যের বংশধর বল্লভানন্দ আঢ্য বাংলা দেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনবান্ ছিলেন। তাঁহার সহিত রাজা বল্লালের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপিত হইয়াছিল এবং রাজা সময়ে সময়ে তাঁহার নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করিতেন। তিনি রাজাকে বহুবার ঋণ স্বরূপ অর্থ প্রদান করিয়াছেন ; কিন্তু রাজা বল্লাল তাহা পরিশোধ করিতে সমর্থ হন নাই। মণিপুর-যুদ্ধে ব্যয়বাহুল্যবশত তিনি পুনরায় বল্লভানন্দের নিকট ঋণ গ্রহণ

করেন, এবং প্রতিশ্রুত হন যে, যুদ্ধের অবসানে ঋণ পরিশোধ করিবেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধজয়ে অসাফল্য হেতু এই ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইয়াও পুনরায় ঋণ প্রার্থনা করায় বল্লভানন্দ 'মিনতি সহকারে জ্ঞাপন করিলেন যে, প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন না করায় তাঁহার অধর্ম হইয়াছে; অম্বষ্ঠ জাতির রাজ্যলাভ কেবল অদৃষ্ট প্রসাদাৎ; যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম; এবং উপস্থিত যুদ্ধ অধর্মার্জিত; অতএব যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হওয়াই কর্তব্য।' ইহাতে রাজা বল্লাল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন।

সুবর্ণবণিকের প্রতি তাঁহার ক্রোধের আরও চারিটি কারণ বিদ্যমান, উহা নিম্নরূপ—

(১) বল্লালের কৌলীন্য-মর্যাদা সংস্থাপন ও জাতিবিভাগ সুবর্ণবণিকেরা অনুমোদন করেন নাই।

(২) সুবর্ণবণিকেরা অনেক ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দান করেন এবং তাঁহাদিগকে পৌরোহিত্য-পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

(৩) বল্লালের ডোমকন্যা-বিবাহের কলঙ্ক দেশময় প্রচার হইলে কতিপয় চপলমতি অল্পবয়স্ক সুবর্ণবণিক্ রাজাকে উপহাস করিবার উদ্দেশ্যে রঙ্গভূমিতে রাজার ঐ কার্যের অভিনয় করিয়াছিলেন।

(৪) রাজা ডোমকন্যা-বিবাহজনিত কলঙ্ক অপনোদনার্থ কল্পিত প্রায়শ্চিত্ত করেন; তৎপরে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া বর্ণ চতুষ্টয়কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; সুবর্ণবণিক্‌গণ রাজার পাতিত্য অপনোদনীয় নহে বলিয়া রাজনিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেন এবং যজ্ঞ-সভায় অনুপস্থিত ছিলেন। এই পঞ্চ কারণে রাজার ক্রোধাগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

বল্লাল-চরিতে আছে যে রাজা সুবর্ণবণিক্‌গণের পাতিত্য সাধনের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি কোনও সুবর্ণবণিক্‌কে ছলনা-জালে আবদ্ধ করিয়া গোহত্যা ও স্বর্ণাপহরণরূপ মিথ্যা অপবাদে সমগ্র সুবর্ণবণিক্ জাতিকে বৈশ্যাচার রহিত করত পাতিত্য দোষে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বলপূর্বক উপবীতচ্যুত করিয়াছিলেন এবং নির্বিশেষ অত্যাচার সহকারে তাঁহাদের জাতীয় বৈশ্যাচার হইতে বিরত করিয়াছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার ১১০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুবর্ণবণিকের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, এই সময় মুসলমান অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা সময়ে সুবর্ণবণিক্‌গণের জাতিকুল ধর্ম রক্ষা করিয়া জীবনযাপন করা ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদে তিনি কর্জনার বণিক্‌সমাজ ও শ্রেণীবিভাগ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই সময় কর্জনায় ৭৯২ ঘর সুবর্ণবণিক্ বাস করিতেন। তৎপরে কালক্রমে এই কর্জনা-সমাজের বহু সুবর্ণবণিক্ দেশ-দেশান্তরে গমন করেন।

রাঢ়ী ও সপ্তগ্রামীয় শ্রেণীর উৎপত্তি

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, তৎকালে কর্জনার সমাজভুক্ত অনেক সুবর্ণবণিক্ রাঢ় অঞ্চলে অবস্থিতি করিতেছিলেন; আবার অনেকে সপ্তগ্রামেও উঠিয়া গিয়াছিলেন; একই পরিবারের দুই সহোদরের মধ্যে একজন সপ্তগ্রামে ও দ্বিতীয়জন কর্জনায় বাস করিতেন—এরূপ দৃষ্টান্তও তৎকালে বিরল ছিল না।

১৫১৪ খৃষ্টাব্দে কর্জনাসমাজ ভঙ্গ হয়। এই সম্বন্ধে কুলজীতে লিখিত হইয়াছে—

"চৌদ্দ শত ছত্রিশ শকে ভাঙ্গিল কর্জনা,
রাজ পীড়ায় পীড়িত হইল সর্বজনা॥
বিশেষ বণিক্ সব ছিল সুখবাসী।
পরিবার সহিত হইল নানা দেশী॥
নিকটে রহিল কেহ, কেহ গেল দূরে।
নিবাস নিয়ম নাই, কেবা তত্ত্ব করে॥"

১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে কর্জনা-সমাজের অজ্বরচন্দ্র খাঁ পরলোক গমন করিলে তাঁহার ভাগিনেয় পতিরাজ দে ও নীলাম্বর দত্ত দূর-দূরান্তরের সুবর্ণবণিক্-গণকেও অজ্বর খাঁর শ্রাদ্ধে ভাটের দ্বারা নিমন্ত্রণ করেন। দেশের তাৎ-কালিক অবস্থা দূর দেশে গমনাগমনের উপযোগী ছিল না। পূর্বে উল্লিখিত ৭৯২ ঘর সুবর্ণবণিকের মধ্যে ৫০২ ঘর এই শ্রাদ্ধবাসরে কর্জনায় উপস্থিত

ছিলেন। সেই দিন হইতে তাঁহারা রাঢ়ী নামে অভিহিত হন এবং অবশিষ্ট ২৯০ ঘর সুবর্ণবণিক্ সপ্তগ্রামীয় বলিয়া পরিচিত হন। গ্রন্থকার বলিতেছেন —"রাঢ়ী ও সপ্তগ্রামী সুবর্ণবণিক্‌দের পৃথক হইবার এই সামান্য কারণ।"*

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সুবর্ণবণিক্

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও সুবর্ণবণিকের সহিত শ্রীনিত্যানন্দদেবের সাহচর্যের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সপ্তগ্রাম-নিবাসী বণিক্-শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্ত শ্রীনিত্যানন্দদেবের একজন পার্ষদ ছিলেন। নিত্যানন্দ স্বয়ং সপ্তগ্রামে আসিয়া উদ্ধারণ দত্তের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, এবং শ্রীবৃন্দাবন ও মথুরাধামে লুপ্ত লীলাস্থানাদি পুনঃ প্রকটকার্যে উদ্ধারণকে সমভিব্যাহারে লইয়াছিলেন। অতএব উদ্ধারণের জন্মে সুবর্ণবণিকের কুলোজ্জ্বল হইয়াছে।

গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, পাঠান রাজত্বের শেষভাগে সুবর্ণবণিক্‌গণ বল্লাল কৃত অন্যায় রাজাজ্ঞা উল্লঙ্ঘনপূর্বক যজ্ঞোপবীত ধারণ ও পঞ্চদশ দিবস অশৌচ ব্যবহার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম তাঁহাদের সে কার্যে বাধা দান করে; কারণ শ্রীনিত্যানন্দদেবের অনুগ্রহে সুবর্ণবণিকেরা তৎকালে অভিমানশূন্য, হিংসা-দ্বেষ-বিবর্জিত হওয়ায় পরম তৃপ্তিকর পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্মে জাত্যভিমান না থাকায় তাঁহারা তৎকালে যজ্ঞোপবীত ধারণের ও অন্যান্য বৈশ্যাচার প্রবর্তনের আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই।

অপেক্ষাকৃত আধুনিকযুগে সুবর্ণবণিক্

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার হুগলী, চুঁচুড়া ও কলিকাতায় সুবর্ণবণিকের উপনিবেশ স্থাপন লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। বাণিজ্য-ব্যপদেশে ইংরেজের ভারতাধিকার লাভ হইয়াছিল ও সেই বাণিজ্য-সূত্রেই সুবর্ণবণিকের সহিত ইংরেজের প্রথম সৌহার্দ স্থাপিত হয়। সপ্তগ্রামের বাণিজ্য-লুপ্তির ফলে স্বাভাবিক বাণিজ্যপ্রবণতা হেতু সুবর্ণবণিক্‌গণ তৎকালীন ইংরেজের

---

* সুবর্ণবণিক্—পৃঃ ৬৫

বাণিজ্যপ্রধান স্থানসমূহে বসতি স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ধীরে ধীরে হুগলী, চুঁচুড়া ও কলিকাতায় সুবর্ণবণিক্ উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ফলে কলিকাতা মহানগরীর উন্নতির মূলে সুবর্ণবণিকের বাণিজ্য-কুশলতা বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"* * কলিকাতার প্রথমাবস্থায় ইংরেজের বাণিজ্য প্রধানত সুবর্ণবণিকের হস্তেই ন্যস্ত ছিল; ধর্মভীত সচ্চরিত্র সুবর্ণবণিকেরা অতীব বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন, এবং ইংরেজের বহুল পরিমিত বাণিজ্যে ও তাঁহাদের প্রদত্ত সুদে সুবর্ণবণিক্‌গণের ধনাগমের সীমা ছিল না।"*

সুতরাং দেখা যাইতেছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও সুবর্ণবণিক্‌গণ বৈশ্যোচিত বৃত্তি দ্বারা পূর্বকালের ন্যায় ধনশালী হইয়াছিলেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার সুবর্ণবণিক্‌গণের মধ্যে অকারণ শ্রেণী-বিভাগ ও উহা রহিতকরণের আবশ্যকতা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, একটি সুবর্ণবণিক্ জাতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন স্থানে বসতি করায় এবং তৎকালে স্থানান্তরে গমনাগমন বিপদ্‌সঙ্কুল ও দুঃসাধ্য হওয়ায় পরস্পরের মধ্যে আচার, ব্যবহার ও বৈবাহিক আদান-প্রদান রহিত হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমান সময়ে তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারাদি দেখিলে ভিন্ন জাতি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা দূর করিয়া পরস্পরের সহিত মেলামেশা ও বৈবাহিক আদান-প্রদান হওয়া দরকার। তবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সুবর্ণবণিকেরা যে একই জাতি তাহা নির্ণয়ার্থ সম্প্রদায় সকলের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া আবশ্যক। সম্প্রদায় বিশেষের আদি পুরুষের নাম নির্ণীত হইলে যদি উহা পূর্বতন বঙ্গাগত সুবর্ণবণিক্-গণের আদি পুরুষগণের নামের মধ্যে পড়ে, তবে যে তিনি সুবর্ণবণিক্ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। বর্তমানে যানবাহন ও চলাচলের সুবিধা বৃদ্ধি হওয়ায় গ্রন্থকার ভিন্ন শ্রেণীতে বৈবাহিক আদান-প্রদানের বিশেষ সমর্থন করিয়াছেন; কারণ দূররক্তে বিবাহ নিষ্পন্ন হইলে সন্তান-সন্ততি বলবান্ হয়; ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন—"যখন পুত্র-কন্যার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধিমান্ পিতামাত্রেই বিবাহের তাদৃশ

---

* সুবর্ণবণিক্—পৃঃ ৭৪

ফল প্রত্যাশায় লালায়িত, আর যখন কন্যার বিবাহে সর্বস্বান্ত হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে, তখন একই জাতির এই অকারণ বিভিন্ন শ্রেণী-বিভাগ বিমোচন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। স্বজাতি সদাচারভ্রষ্ট না হইলে তিনি যতই দূরদেশে বসতি করুন, তাঁহার সহিত বিবাহাদি সম্পাদনে পূর্ববৎ মিলিত হইবার পক্ষে কোন আপত্তিই যুক্তিযুক্ত নহে।"[১]

পঞ্চদশ অধ্যায়ে গ্রন্থকার "শাস্ত্রীয় প্রমাণে বিচার' লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—"উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলবাসী কি ক্ষত্রিয়, কি মহারাষ্ট্রীয়, কি রাজপুত্র, কি বৈশ্য, কি শূদ্র সকলেই একবাক্যে বঙ্গীয় সুবর্ণবণিক্‌কে বৈশ্য বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট সুবর্ণবণিকের জাতিগত সম্ভ্রমের সীমা নাই। * * * উড়িষ্যা হইতে দক্ষিণে কুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত দেশের লোকেরা সুবর্ণবণিক্‌কে বৈশ্য বলিয়া সবিশেষে চিরদিনই স্বীকার করিয়া থাকেন। * * * কেবল বঙ্গদেশের কতিপয় স্থানে, যেখানে বল্লাল-প্রতিষ্ঠিত জাতি ব্যবস্থা অদ্যাপি প্রচলিত আছে, সুবর্ণবণিক্‌কে লোকে ইচ্ছামত শূদ্র, বর্ণসঙ্কর, পতিত কিম্বা নীচ জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। * * দেখা আবশ্যক হইতেছে যে, এই সকল অপবাদ শাস্ত্রমূলক কোন কারণসম্ভূত কিম্বা অলীকমাত্র। এ বিচার সম্পন্ন করিতে হইলে সুবর্ণবণিক্‌কে শাস্ত্রানুসারে বৈশ্য, দ্বিজ, উচ্চবর্ণ প্রতিপন্ন করা আবশ্যক হয় এবং বিরুদ্ধবাদীদিগের বৈপরীত্য প্রতিপাদনের প্রমাণসমুদয়কে খণ্ডন করিতে হয়।"[২]

সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্বের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও তাহার খণ্ডন

(১) সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্বের বিরুদ্ধে পরাশরপদ্ধতির নিম্নলিখিত শ্লোক সাধারণত প্রযুক্ত হইয়া থাকে—

"কাংস্যকারাচ্চ মাণিক্যাং সুবর্ণজীবিকোঽভবৎ" অর্থাৎ কাংস্যকার পিতা ও মণিকার মাতা হইতে সুবর্ণব্যবসায়ী জাতির উৎপত্তি।

---

১ সুবর্ণবণিক্—পৃঃ ৭৭, ৭৮

২ ঐ —পৃঃ ৭৮, ৭৯

(২) দ্বিতীয়ত বৃহদ্ধর্মপুরাণের ৭৩ খণ্ডে লিখিত হইয়াছে—

"স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক্ তস্যামম্বষ্ঠসম্ভবঃ" অর্থাৎ বৈশ্যাগর্ভে অম্বষ্ঠ ঔরসে স্বর্ণকার ও স্বর্ণবণিক্ এই দুই জাতির উৎপত্তি।

(৩) ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে দশম অধ্যায়ে কার্যদোষজনিত সুবর্ণবণিকের পাতিত্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"কশ্চিদ্ বণিগ্বিশেষশ্চ সংসর্গাৎ স্বর্ণকারিণঃ।
স্বর্ণচৌর্যাদিদোষেণ পতিতো ব্রহ্মশাপত॥"

স্বর্ণকারের সংসর্গে কোন বণিক্ জাতি (সুবর্ণবণিক্) সুবর্ণচৌর্যাপরাধে ব্রাহ্মণগণের কোপে পতিত হইয়া শাপগ্রস্ত হইয়াছে। সুতরাং তদবধি তাহারা পতিত।

(৪) সুবর্ণবণিক্‌কে অন্ত্যজ জাতি প্রতিপন্ন করিতে ব্যাসসংহিতার নিম্নলিখিত বচন প্রযুক্ত হইয়া থাকে—

বর্ধকী নাপিতো গোপঃ আশাপ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্-কিরাত-কায়স্থ-মালাকার-কুটুম্বিনঃ॥
বরাট-মেদ-চণ্ডাল-দাস-শ্বপচ-কোলকাঃ।
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতাঃ— ॥

বর্ধকী, নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক্, কিরাত, কায়স্থ, মালাকার, কুটুম্বী, বরাট, মেদ, চণ্ডাল, শ্বপচ, কোলক ইহাদিগকে অন্ত্যজ জাতি বলা হয়।[১]

উপরি লিখিত প্রমাণসমূহের খণ্ডনার্থ গ্রন্থকার বলিতেছেন—"বাদানুবাদ দ্বারা কোন বিষয় বিচারে সংস্থাপিত করিতে হইলে, সে বিচার শাস্ত্রীয় প্রমাণের দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করা আবশ্যক। * * * হিন্দুগণের জাতি সম্বন্ধীয় কোন বিচারে শাস্ত্রীয় প্রমাণের আবশ্যক হইলে ধর্মশাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করাই প্রশস্ত।"[২]

তৎপরে গ্রন্থকার ধর্মশাস্ত্র কাহাকে বলে—তাহার সংজ্ঞা নির্দেশপূর্বক যে সমস্ত মহাত্মা ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাদের নামীয় শ্লোক যাজ্ঞবাল্ক্য সংহিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন—

১ সুবর্ণবণিক্—পৃঃ ৮০, ৮৩

২ সুবর্ণবণিক্—পৃঃ ৮৩

"মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসংবর্তাঃ কাত্যায়ন-বৃহস্পতী ॥
পরাশরব্যাস-শঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ ॥

উপরিউক্ত শ্লোকে ভগবান্ মনুর নাম সর্বপ্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব মনুপ্রণীত ধর্মশাস্ত্রই সর্বাগ্রে সমালোচ্য। মনুসংহিতায় * * অনুলোম, বিলোম, সঙ্কর, নীচ ও অন্ত্যজ সমস্ত জাতির উল্লেখ আছে এবং তৎসমুদয়ের জীবিকা-নির্বাহের উপায় নির্ধারিত হইয়াছে। বৈশ্য মনু সংহিতায় বর্ণ চতুষ্টয়ের অন্তর্গত এবং তৃতীয় বর্ণ। মনুতে বৈশ্য—সঙ্কর, পতিত, নীচ কিম্বা অন্ত্যজ জাতি বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। মনুর জাতিমালায় 'সুবর্ণবণিক্' নামে কোন জাতির উল্লেখ নাই অতএব যখন মনুর কোন স্থলেই সুবর্ণবণিকের উল্লেখ নাই, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, মনুসংহিতার সময়ে সুবর্ণবণিক্ বলিয়া কোন নির্দিষ্ট জাতি ছিল না। থাকিলে সর্বজ্ঞ মনু জানিতেন না সেই জন্য উল্লেখ করেন নাই, একথা বলিতে পারা যায় না। অথচ মনুতে উল্লিখিত হয় নাই, এমন কোন জাতি হিন্দু সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব 'সুবর্ণবণিক্' যে কোন লোক-সম্প্রদায়েরই হউক, এ সংজ্ঞা মনুসংহিতার সময়ের নহে, সেই জন্য তাহাতে নাই। * * * বৈশ্যবর্গগত কোন বণিক্ বিশেষকে হেম-ব্যবসা-জনিত পাতিত্য-দোষাশ্রিত বলিয়া মনু উল্লেখ করেন নাই। * * অধিকন্তু সুবর্ণচৌর্যাপরাধজনিত বৈশ্যের কিম্বা অন্য কোন জাতির কার্য-দোষদুষ্ট পাতিত্যাদি মনুসংহিতায় উল্লিখিত হয় নাই। অতএব মনু-সংহিতানুসারে সুবর্ণবণিক্ জাতি বর্ণসঙ্কর, পতিত, নীচ কিম্বা অন্ত্যজ নহে, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। অর্থাৎ সুবর্ণবণিকের জাতিগত এই সকল দোষ সপ্রমাণ করিবার জন্য মনুসংহিতা হইতে কোন প্রমাণ দিতে পারা যায় না। কারণ মনুতে এতৎ সম্বন্ধীয় স্পষ্ট বা দূরক্ষেপণীয় কোন কথাই নাই।"*

---

* সুবর্ণবণিক্—পৃঃ ৮৪, ৮৫

মনুর ধর্মশাস্ত্র আলোচনার অবসানে গ্রন্থকার কোন্ যুগে কোন্ ধর্ম মানবের কর্তব্য তাহা লইয়া বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম মানবের অনুষ্ঠেয় এবং সেই সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের প্রণেতাও বিভিন্ন। অতঃপর কলিযুগের ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—

"কৃতে তু মানবা ধর্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ॥

পরাশরসংহিতা

অর্থাৎ পরাশর নিরূপিত ধর্ম কলিযুগের ধর্ম। * * * অতএব পরাশরসংহিতার কথিত বচনানুসারে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কলি-যুগের লোকেরা পরাশরনিরূপিত ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিবেন; এবং অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের যে যে অংশ পরাশরসংহিতার বিরোধী নহে, তাহাও কলিযুগের লোকের মান্য। অতএব যখন * * পরাশরসংহিতাই কলিযুগের ধর্মশাস্ত্র, তখন এই ধর্মশাস্ত্রেই অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক, সুবর্ণবণিক্ জাতি সম্বন্ধে কোন কথা লিখিত আছে কি না এবং সুবর্ণবণিকের কিংবা বৈশ্যের কিংবা অন্য জাতির সুবর্ণ-ব্যবসাজনিত পাতিত্যদোষ সংঘটনের উল্লেখ হইয়াছে কি না। কিন্তু সমস্ত সংহিতাখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখা গেল যে, সে সকল কথার কোন উল্লেখ নাই। এমন কি সুবর্ণবণিক্ শব্দ কিম্বা এমন কোন শব্দ যাহাতে ঐ জাতিকে বুঝাইতে পারে, তাহার উল্লেখমাত্রও নাই। * * * স্বর্ণচৌর্যাপরাধে সুবর্ণবণিকের বা কোন বণিক্-বিশেষের জাতিগত পাতিত্যের উল্লেখ নাই। স্বর্ণ-ব্যবসা-জনিত কোন পাপের এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ নাই। * * বরং পরাশর-সংহিতায় বৈশ্যের স্বর্ণ ব্যবসায়ের বিধি আছে—

'লোহকর্ম তথা রত্নং গবাঞ্চ প্রতিপালনম্।
বাণিজ্যং কৃষিকর্মাণি বৈশ্যবৃত্তিরুদাহৃতা॥' ১।৬০

পরাশরসংহিতা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। * * স্বর্ণ ব্যবসায়ী বৈশ্যের সুবর্ণবণিক্ আখ্যা তদপেক্ষা অপ্রাচীন; সেই জন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ থাকা সম্ভব নহে। পরাশরভাষ্যেও বৈশ্যের সুবর্ণ-ব্যবসায়ের বিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে—'যানি লাভকর্মাদীনি বণিজাং তানি সর্বাণি বৈশ্য-

বৃত্তিঃ। লাভকর্ম কুসীদং * * * কুসীদাদীনাং বৈশ্যধর্মত্বমাহ সুবর্ণ-রজতাদেরর্ঘপরিজ্ঞান ক্রয়াদিকং তৎকর্মেতি ব্যাখ্যেয়ম্।'

কেবল পরাশর-পদ্ধতির মত অন্যপ্রকার।"[১]

পরাশরপদ্ধতির মতবিচারে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে, পরাশরপদ্ধতির রচয়িতা ভার্গবরাম; এবং তিনি পরাশরসংহিতাকে ভিত্তি করিয়াই পরাশর-পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন। অতএব যাহা পরাশরসংহিতায় নাই, তাহা পরাশরপদ্ধতিতে থাকা সমীচীন নহে এবং থাকিলে তাহা নূতন আমদানি বা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, যে সুবর্ণবণিকের নাম পর্যন্ত পরাশরসংহিতায় নাই, পরাশরপদ্ধতি তাহার সবিশেষ তথ্যে পূর্ণ। সুতরাং প্রতিপাদিত হইতেছে যে, পদ্ধতির জাতিমালা সংহিতার অতিরিক্ত এবং প্রামাণিক নহে। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার কমলাকর ভট্টাচার্য ও স্মার্ত রঘুনন্দনের কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহারা মাধবাচার্যের অনেক ব্যবস্থা শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদর্শন করিয়া 'নির্ণয়-সিন্ধু' ও 'তিথিতত্ত্বে' খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে মূল সংহিতাকে অগ্রাহ্য করিয়া আশ্রিত গ্রন্থকে পূজা করা বিজ্ঞজনোচিত কার্য নহে। "সুতরাং পরাশর সংহিতায় যখন সুবর্ণবণিকের কোন কথা দৃষ্ট হয় না, তখন তদাশ্রয়াবলম্বিত ভার্গবরামের জাতিমালার * * বাক্য সুবর্ণবণিকের বর্ণসঙ্করত্ব * * * কদাচ শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তবে যদি 'পরাশর-পদ্ধতৌ ভার্গবরামকৃত-বর্ণসঙ্করজাতিমালা' * * * কোন স্বাধীন গ্রন্থ বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তবে তাহার বিশেষ আন্দোলন নিষ্প্রয়োজন হইতেছে। কারণ সে গ্রন্থ নিবন্ধন-গ্রন্থকর্তারা স্বীকার করেন নাই। অতএব তাহার বিধি ব্যবস্থা হিন্দু সমাজে গ্রাহ্য হইতে পারে না।"[২]

সুবর্ণচৌর্যাপরাধে সুবর্ণবণিকের জাতিগত পাতিত্যদোষ-সংস্থাপনার্থ ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের উদ্ধৃত শ্লোকের মতবাদ খণ্ডন করিতে অগ্রসর হইয়া গ্রন্থকার প্রথমে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথমে তিনি পুরাণের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তৎপরে পদ্মপুরাণ

১ সুবর্ণবণিক্—পৃঃ ৮৬, ৮৭ ২ সুবর্ণবণিক্—পৃঃ ৮৯

হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, লোকনিস্তার হেতু স্বয়ং নারায়ণ ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে পুরাণ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বেদব্যাস কে তাহা লইয়া আলোচনা করত গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, 'তৎকালে যে কোন পুরাণ উপপুরাণ রচিত হইয়া প্রচারিত হইত, তাহাতেই বেদব্যাস বলিয়া রচয়িতার পরিচয় দেওয়া হইত। অথবা কাহারো মতে পুরাণ রচয়িতার পদবীই বেদব্যাস।' নারদীয় পুরাণানুসারে ব্যাস প্রণীত অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম নিম্নরূপ—(১) ব্রহ্ম, (২) পদ্ম, (৩) বিষ্ণু, (৪) বায়ু, (৫) ভাগবত, (৬) নারদীয়, (৭) মার্কণ্ডেয়, (৮) অগ্নি, (৯) ভবিষ্য, (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত, (১১) লিঙ্গ, (১২) বরাহ, (১৩) স্কন্ধ, (১৪) বামন, (১৫) কূর্ম, (১৬) মৎস্য, (১৭) গরুড়, (১৮) ব্রহ্মাণ্ড।

কিন্তু গরুড় পুরাণানুসারে আদি, নরসিংহ, স্কন্ধ, শিবধর্ম, দুর্বাসস, নারদীয়, কাপিল, বামন, ঐশনস, ব্রহ্মাণ্ড, বারুণ, কালিকা, মাহেশ্বর, শাম্ব, সৌর, পারাশর, মারীচ।

গ্রন্থকার অতঃপর পঞ্চলক্ষণান্বিত পুরাণের বর্তমান আকার লইয়া আলোচনার পর বলিতেছেন—"এই সমস্ত পুরাণ উপপুরাণ কেবলই পঞ্চলক্ষণ বিশিষ্ট নহে, ইহা অনেক নূতন লক্ষণাক্রান্ত এবং ইহাতে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।"*

মৎস্যপুরাণে বর্ণিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের পরিচয় প্রদানে অগ্রসর হইয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, সাবর্ণি যে পুরাণ নারদ সমীপে কীর্তন করেন এবং যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য, রথন্তরকল্পের বৃত্তান্ত ও বারংবার ব্রহ্মবরাহের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, সেই অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক বিশিষ্ট পুরাণকে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বলে। বর্তমানে যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ জনসমাজে প্রচলিত, তাহার সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"বর্তমান সময়ে যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণখানি বিদ্যমান আছে, তাহাতে রথন্তরকল্পনা, ব্রহ্ম-বরাহের বৃত্তান্ত দৃষ্ট হয় না, এবং তাহা সাবর্ণি ঋষির দ্বারা নারদ সমীপে কথিত নহে। পণ্ডিতেরা অনুমিত করিয়াছেন যে, ভারতে মুসলমান অধিকার প্রবল হইলে পর ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বিরচিত হইয়াছিল। * * * পণ্ডিতেরা এই

* সুবর্ণবণিক্—পৃঃ ৯২

পুরাণখানির জন্মকাল যেরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার বহু পূর্বে বঙ্গাগত সুবর্ণব্যবসায়ী বৈশ্যকুল আদিশূর দত্ত সুবর্ণবণিক্ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং বল্লাল-রোষানলে অদ্ভুত পাতিত্যদোষে মিথ্যা কলঙ্কিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ উহার পরবর্তী গ্রন্থ ; অতএব তাহাতে কথিত ঘটনাবলম্বনে বণিক্ বিশেষের স্বর্ণকারের সংসর্গে স্বর্ণচৌর্যাপরাধজনিত ব্রহ্মশাপে পাতিত্যের উল্লেখ থাকা তাদৃশ বিচিত্র নহে।"[১]

দ্বিতীয়ত স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন তাঁহার 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে' ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণকে স্বীকার করিলেও, তাঁহার সময়ে "কশ্চিৎবণিক্ বিশেষশ্চ" ইত্যাদি পাঠ উক্ত পুরাণে সন্নিবেশিত হয় নাই। সেই হেতু তিথিতত্ত্বে উহার উল্লেখ দেখা যায় না। তৃতীয়ত, বর্তমানে মুদ্রাঙ্কিত উক্ত পুরাণের ব্রহ্ম-খণ্ডের দশম অধ্যায়ের যে স্থানে ঐ শ্লোকটি দৃষ্ট হয়, তাহার অব্যবহিত পূর্বে ও পরে যাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে শ্লোকটিকে অসংলগ্ন এবং অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া অনুমিত হয়। তৎপরে গ্রন্থকার উক্ত শ্লোকের ব্যাবকরণগত ক্রটি-বিচ্যুতি প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন—"ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ যতই আধুনিক হোক, উহা পণ্ডিতাগ্রগণ্য কোন মহাত্মা-প্রণীত তাহার সন্দেহ নাই; অতএব তাদৃশ মহানুভব ব্যক্তির লেখনী-নিঃসৃত গ্রন্থে এতাদৃশ অসংলগ্ন ভ্রমপূর্ণ উক্তি কদাপি স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব কথিত রচনাটি সম্যক্ প্রকারে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে।"[২]

অতঃপর গ্রন্থকার বৃহদ্ধর্ম পুরাণের লিখিত সুবর্ণবণিকের উৎপত্তি-বিবরণ লইয়া আলোচনা করত দেখাইয়াছেন যে, উক্ত পুরাণ ভগবান্ বেদব্যাস বিরচিত কিংবা কোন ঋষি-প্রণীত নহে। উহাতে পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ বা মহাপুরাণের দশ লক্ষণও নাই। এই পুরাণ নারদীয় পুরাণোক্ত অষ্টাদশ পুরাণ বা গরুড় পুরাণোক্ত অষ্টাদশ উপপুরাণের মধ্যেও স্থান লাভ করে নাই। রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্বেও উহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং—"এতাদৃশ পুরাণনামবিশিষ্ট কোন নিতান্ত আধুনিক পুস্তক শাস্ত্র বলিয়া মাননীয় কি না এবং তল্লিখিত কোন কথা শাস্ত্রীয় প্রমাণ

---

১ সুবর্ণবণিক্—পৃঃ ৯৩ ৯৫

২ সুবর্ণবণিক্—পৃঃ ৯৮, ৯৯

স্বরূপ গণ্য হইয়া নিঃসংশয়রূপে কোন জাতির মূল সংস্থাপনে প্রামাণ্য কি না, তাহার বিচার বিজ্ঞতম পাঠকেরাই করিবেন।"[১]

ইহার পর গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে; পুরাণ অভিধেয় যে কয়েকখানি গ্রন্থে সুবর্ণবণিকের উৎপত্তি-বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকলগুলিই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এমতে একই জাতির উৎপত্তি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে হইয়াছে, একথা স্বীকার না করিলে পৌরাণিক মতের সত্যতা সংরক্ষিত হয় না। আবার বেদ, স্মৃতি এবং ধর্মশাস্ত্র-বহির্ভূত কোন কথা পুরাণে লিপিবদ্ধ থাকিলে, প্রামাণিক গ্রন্থের বিরোধী বলিয়া উহা তাদৃশ গ্রাহ্য হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥" ধর্মসংহিতা

বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দৃষ্ট হইলে বেদই প্রমাণ; আর স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধে স্মৃতিকে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়।

বৃহস্পতিও বলিয়াছেন—

"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।"

মনুসংহিতায় বেদার্থ সঙ্কলিত হইয়াছে; সেই হেতু মনুর প্রাধান্য; মনু-বচনের বিপরীত স্মৃতি প্রশস্ত নহে।

"অতএব সুবর্ণবণিক্ বিরুদ্ধে শ্রুতি ও স্মৃতির বিপরীত পৌরাণিক প্রমাণ সম্বন্ধে আর কোন কথা লিখিবার প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না।"[২]

এই স্থলে মনুসংহিতার অনুবাদক স্বর্গীয় ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়—

"ধান্যেঽষ্টমং বিশাং শুল্কং বিংশং কার্ষাপণাবরম্।
কর্ষোপকরণাঃ শূদ্রা কারবঃ শিল্পিনস্তথা।" ১০।১২০

শ্লোকের অনুবাদকালে সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্ব সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইল—

১ সুবর্ণবণিক্—পৃঃ ৯৯
২ ঐ —পৃঃ ১০০

"এতদ্দারা উপলব্ধি হইতেছে যে, সুবর্ণাদি কার্ষাপণ পর্যন্তের ব্যবসায় বৈশ্যবর্ণের জাতীয় ব্যবসায় এবং সুবর্ণবণিক্ প্রভৃতি জাতিরা বৈশ্যজাতি, বিশেষত বৈশ্যের উপাধি আঢ্য সুবর্ণবণিক্ মধ্যেই দৃষ্ট হয়, অন্য জাতির আঢ্য উপাধি নাই ; কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণে সুবর্ণ ও গন্ধবণিক্‌কে শূদ্র জাতির মধ্যে পরিগণিত দেখা যায়, ইহাতে অতিশয় সংশয় উপস্থিত হয়, কিন্তু উভয় পুরাণান্তর্গত ঐ সকল বচনের পরস্পর বিভিন্নতা ও অনৈক্য তথা অনুলোমবিলোম জাতির সম্বন্ধে অবিচার দৃষ্ট হয়, একের মধ্যে কায়স্থ নিন্দিত, অপরে অম্বষ্ঠ শূদ্র মধ্যে গণিত, পরন্তু উক্ত বচনসমূহের রচনাও আধুনিক বোধ হয়, ইহাতে তাহা মহর্ষি ব্যাসদেবের প্রণীত বলিয়া কদাপি বিশ্বাসযোগ্য নহে। অতএব অনুভূত হইতেছে যে, এ প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার বা বিদ্বেষমূলক বচন কৃত্রিম, তাহার সাক্ষী মুদ্রাঙ্কিত ব্যাস-সংহিতায় বণিক্, কিরাত, কায়স্থ, মালাকার, কুটুম্বিনঃ প্রভৃতি শ্লোক। এই সকল কল্পিত বচনপ্রতিকূলে এবং মন্বর্থ অনুকূলে অমরসিংহের অভিধান ও অন্যান্য সমূলক শাস্ত্র তথা প্রাচীন ব্যবহারাদি দৃষ্ট হইতেছে! এমন কি বৈশ্য-প্রকাশক নানা শব্দ মধ্যে বণিক্ এই শব্দ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যাইতেছে। এতদ্দেশে সুবর্ণ গন্ধ বণিক্ জাতির যে দুইটি উপাধি তাহা কেবল তত্তৎ দ্রব্য ব্যবসায় সম্বন্ধে উপলব্ধ হইয়াছে। বঙ্গে আরোপিত জাতিমালায় যে পঞ্চ বণিক্ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে কারুকাদি শিল্পিক জাতির মধ্যে বণিক্ নিবেশিত দেখা যায়, ইহাতে বণিক্‌কে শূদ্র ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু ঋষি প্রণীত কোন গ্রন্থে শিল্পিক জাতিকে বণিক্ কহেন নাই এবং বৈশ্যেতর অন্য কোন জাতি বণিক্ বলিয়া উক্ত হয় নাই।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার যুক্তিমতে বিচার করিয়া সুবর্ণবণিকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন যে, অনেকে সুবর্ণবণিকের বিরুদ্ধে নিন্দিত, মূর্খ, অধম প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাদের উক্তির অনুকূলে শ্রীমদ্‌ভাগবত ও চৈতন্য-ভাগবতের যে সমস্ত বচন প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সেই সমুদয় আদৌ বিচারসহ নহে। এই প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলিতেছেন—"সুবর্ণবণিক্ মূর্খ, কিন্তু সুবর্ণবণিকের জাতীয় বৃত্তি বাণিজ্য। বাণিজ্য-বৃত্তি পরিচালনে যে পরিমিত বুদ্ধিমত্তার

প্রয়োজন হয়, যুদ্ধাদি কার্য ব্যতীত অন্য কোন্ কার্যে তৎপরিমিত বুদ্ধি নিয়োগের আবশ্যকতা হইয়া থাকে? আর বুদ্ধির উৎপত্তি বিদ্যাজনিত কি মূর্খতাজনিত? * * * যতদিন সুবর্ণবণিকের স্বজাতীয় বাণিজ্যবৃত্তি ও কুসীদ গ্রহণ কার্য সুচারুরূপে চলিয়াছিল, এবং তাঁহাদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, ততদিন তাঁহাদের হাকিমি ইত্যাদি কার্যযোগ্য বিদ্যানুশীলনের আবশ্যকতা হয় নাই। সরকারী চাকুরি করিয়া বর্তমান সময়ে যখন ১০।২০ জন সুবর্ণবণিক্ গভর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগ করিতেছেন, তখন অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় যে, এ জাতীয় কত লোক এবং তাঁহারা কত কাল হইতে সরকারী কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আবার বর্তমান সময়ের প্রধান রাজকীয় পদের তালিকা দৃষ্টি করিলে অবশ্য জানিতে পারা যাইবে যে, এই অল্পসংখ্যকলোকবিশিষ্ট সুবর্ণবণিক্ জাতির কতগুলি লোক উচ্চ পদাভিষিক্ত; এবং বহুলোকবিশিষ্ট অন্যান্য জাতিসমূহের তাদৃশ পদাভিষিক্ত-গণের তুলনায় অবশ্য প্রতিপন্ন হইবে যে, হারাহারিতে সুবর্ণবণিকের সংখ্যা অনেক বেশী। ইহা কি জাতিগত বিদ্যার পরিচয়-প্রমাণ নহে?" পৃঃ ১০৮, ১০৯

আচার-ব্যবহারে দ্বিজত্ব

সপ্তদশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার সুবর্ণবণিকের আচার-ব্যবহারে দ্বিজত্বের পরিচয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মনুসংহিতার নিম্নলিখিত শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন—"সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জয়েৎ।" সেবা শ্ববৃত্তি, তাহা কখন করিবে না। ইংরেজ-রাজ্যের প্রারম্ভে, রাজ্য বন্দোবস্তের সময়ে, যখন রাজকীয় উচ্চ পদসমূহ বিতরিত হইয়াছিল, তখনও সুবর্ণকণিক্‌গণ চাকুরীকে ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিয়াছেন * * * নিরতিশয় ঘৃণা সহকারে একাদিক্রমে পরের দাসত্ব পরিত্যাগ করায় সুবর্ণবণিকের দ্বিজত্ব প্রমাণিত হইতেছে। * * * সুবর্ণবণিকের * * * বিদ্যার পারদর্শিতা দর্শাইবার ক্ষমতা ইত্যাদি * * তাঁহাদের চির অভ্যস্ত বর্ণগত অধ্যয়নের পরিচয়। এই পরিচয়ই তাঁহাদের দ্বিজত্বের অন্য একটি প্রমাণ। * * পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে, পরিচ্ছন্নতার

সহিতই ধার্মিকতার স্থান। সুবর্ণবণিক্ * * * পরিষ্কার এবং গৃহাদি, আহার, পরিচ্ছদ ইত্যাদি সম্বন্ধে অধিকতর পরিচ্ছন্ন। অতএব পরিচ্ছন্ন সুবর্ণবণিক্ ধার্মিক। এ পরিচয়ও তাঁহাদের দ্বিজত্বের একটি প্রমাণ, কারণ বেদে দ্বিজগণকেই পরিচ্ছন্ন ও ধার্মিক বলিয়া উল্লিখিত আছে। * * * শূদ্রের স্বগোত্রে বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ নহে। রঘুনন্দন উদ্বাহতত্ত্বে দ্বিজাতিরই স্বগোত্রে বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন। সুবর্ণবণিকের স্বগোত্রে বিবাহ হয় না। * * বিবাহের এতৎ রীতি দ্বারা সুবর্ণবণিক্‌কে দ্বিজ প্রমাণ করিতেছে। * * অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যে সুবর্ণবণিক্‌কে উচ্চজাতীয় ও দ্বিজ বলিয়া সপ্রমাণ করিতেছে।" পৃঃ ১১৩-১১৫

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্ব সম্বন্ধে টেলবয় হুইলার ও স্বর্গীয় ভরতচন্দ্র শিরোমণির অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে সেন্সাস রিপোর্টে সুবর্ণবণিক্‌কে গভর্ণমেণ্ট তৃতীয় শ্রেণীতে সংস্থাপিত করিয়া সুবর্ণবণিকের প্রতি যে অবিচার করিয়াছেন, তাহা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং বলিতেছেন—"একাল পর্যন্ত জাতীয় তালিকাদিতে সুবর্ণবণিক্‌কে বৈশ্যযোগ্য স্থান প্রদান না করিয়া গভর্ণমেণ্ট যে অবিচার করিয়া আসিতেছেন, তাহা সংশোধন করিবার উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে। নিরপেক্ষ কর্মচারীর দ্বারা আবশ্যকীয় প্রমাণাদি গ্রহণ পূর্বক সদ্বিচার বিতরণ করিলে রাজার যোগ্য কার্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।" পৃঃ ১২৭

বিংশ পরিচ্ছেদে তিনি বর্তমান হিন্দু সমাজের অবস্থা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং সুপ্রাচীনকালের হিন্দু অপেক্ষা বর্তমান হিন্দু যে দিন দিন বলবীর্যে এবং ধর্মকর্মে পূর্বপুরুষগণ অপেক্ষা হীন হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন।

পরিশিষ্টে 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় সুবর্ণবণিক্ জাতিকে 'অশ্রদ্ধেয়' বলিয়া প্রতিপন্ন করত যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে; এবং গ্রন্থকার সমাচার চন্দ্রিকা ও এডুকেশন গেজেটে এই প্রবন্ধের যে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহাও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এডুকেশন গেজেট ও নিমাইচাঁদ শীল

১২৭৬ সালের এডুকেশন গেজেটে "সুবর্ণবণিক্" নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। নিমাইচাঁদ শীল মহাশয় এই প্রবন্ধের প্রতিবাদে এডুকেশন গেজেট সম্পাদকের নামে যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহা ১২৭৬ সালের ১২ই ভাদ্রের সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল—"মহাশয় আপনি অদ্যকার এডুকেশন গেজেটে 'সুবর্ণবণিক্' শিরোনামাঙ্কিত যে প্রস্তাবটি লিখিয়াছেন, তাহা দেশকালপাত্র বিবেচনায় সমাজের বর্তমান অবস্থায় সাধারণ সংবাদপত্রের একটি সুযোগ্য সমালোচনার বিষয় বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কিন্তু যখন আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া জনগণের নয়ন-পথে অর্পিত হইয়াছে, তখন সে বিতণ্ডা বৃথায়, প্রস্তাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য অবশ্যই প্রতিপাদিত হইবে অর্থাৎ আপনকার পাঠকমণ্ডলী বঙ্গ দেশীয় সুবর্ণবণিক্দের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অবস্থাদি যথা পরিমাণে অবগত হইবেন। কিন্তু আপনকার বর্ণিত বিষয়গুলি কতদূর পর্যন্ত যুক্তিসিদ্ধ এবং কতদূর পর্যন্ত সভ্যতার আলোকে উজ্জ্বলিত হইয়াছে, তাহা বিচার করা কিম্বা তদ্বিষয়ে কটাক্ষপাত করা আমার অভিপ্রায় নহে; কারণ সকল বিষয়েই সকলকার স্বাভিপ্রায় প্রকাশের সমান স্বত্ব আছে। কিন্তু সম্প্রতি দেশীয় জনগণের সমাজ পরিবর্তনের যে প্রবলতর স্রোত প্রবহমান দেখা যাইতেছে, তাহাতে এ বিষয়ে বর্ণবিশেষের আদিসূত্র জাতি নির্ণয় বিষয়ে কেহই যত্নবান্ হইয়া জ্ঞাত হইতে স্বীকার করিবেন না; ফলত সুবর্ণ-বণিকেরা যে কি এবং কোন্ জাতি, তাহা আপনি যেরূপ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, তাহাই তাহাদের ধ্রুবজ্ঞান হইয়া থাকিবে। এমত অবস্থায় সুবর্ণবণিকেরা যে নির্দিষ্ট কতিপয় পক্ষপাতী, পরশ্রীকাতর হিংস্রক জাতিদের পূর্বকালীন উন্নত অবস্থার প্রভাবে এতদ্দেশীয় যৎসামান্যসংখ্যক জনগণের নিকট নীচজাতি বলিয়া অযথা প্রতিপন্ন হইয়া আছেন, এডুকেশন গেজেটের দ্বারা আবার সেই কুসংস্কার দৃঢ়মূল করিয়া দেওয়া হইতেছে, কিন্তু এডুকেশন গেজেটের দ্বারা কোন অমূলক কথা বদ্ধমূল হইলে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হয়; বিশেষত, সে আয়াস প্রকাশ করাই সংবাদপত্রের গৌরব নষ্টের বিষয়, তা কে না বলিবে। অতএব আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আপনি

উক্ত প্রস্তাবে লিখিয়াছেন—'সুবর্ণবণিক্ একটি বর্ণসঙ্কর জাতি, ইঁহারা বৈদ্যের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইঁহারা কার্যদোষে পতিত ইত্যাদি'—এ সকল কি আপনকার স্বকপোলকল্পিত রচনা মাত্র ? কি এতদ্দেশীয় কতিপয় লোকপরম্পরা শ্রুত এই কথাই ইহার মূলস্বরূপ ? কি ইহার প্রতিপন্ন যোগ্য কোন বিশেষ নির্দিষ্ট প্রমাণ আছে ? যদি আপনকার স্বকপোলকল্পিত হয়, স্বীয় যুক্তি ও অনুমান মাত্রই যদি ইহার অস্থিস্বরূপ হয়, কিম্বা লোকপরম্পরা শ্রুত কথাই যদি ইহার প্রমাণের স্থান হয়, তবে আপনকার প্রস্তাবের কোন প্রতিবাদ করা অযুক্ত ও অনাবশ্যক, কারণ আপনকার হস্ত মুখ বন্ধ করা ত কাহারো সাধ্য নহে, যাহা ইচ্ছা লিখিবার ও বলিবার স্বত্ব আপনকারও আছে; আর যদি কোন বিশেষ প্রমাণ, মূলবচন ও যোগ্য প্রবাদ ইত্যাদির প্রভাবে আপনি ইহা নির্ণয় করিয়া ব্যক্ত করিয়া থাকেন, তবে আগামীবারের পত্রিকায় আমার এই পত্রখানি সহ আপনকার সেই সকল প্রমাণ ইত্যাদি প্রকটন দ্বারা প্রস্তাবিত বিষয়ের বাক্য কয়েকটি সপ্রমাণ করিলে আমি প্রকৃতরূপে তৎপ্রতিবাদের দ্বারা সুবর্ণবণিকেরা যে বর্ণসঙ্কর জাতি, পতিত ইত্যাদি নহেন, তাঁহারা যে বিশুদ্ধ বৈশ্যজাতি তাহা ভূরিভূরি অকাট্য সন্তোষজনক প্রমাণ ইত্যাদির দ্বারা সপ্রমাণ করিয়া দিব।"

উপরিলিখিত পত্রের শেষে নিম্নলিখিত সম্পাদকীয় মন্তব্য সন্নিবেশিত হইয়াছিল—"এই পত্রখানি 'এঁরাই আবার বড়লোক' প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা সুবর্ণবণিক্-কুলতিলক শ্রীযুক্ত বাবু নিমাইচাঁদ শীল আমাদিগকে লিখিয়াছেন। বাবুজির পত্রটি অবিকল মুদ্রিত করিলাম। আমরা সুবর্ণ-বণিক্ জাতির বিষয়ে যথাজ্ঞান লিখিয়াছিলাম, বাবুজির তাহাতে যে বিরক্ত হইবার কোন কারণ ছিল, জানিতাম না। এক্ষণে ত আর উপায়ান্তর নাই —বাবুজি যে ভূরি-ভূরি অকাট্য প্রভৃতি প্রমাণ দিবেন, তাহাই মুদ্রিত করিয়া কথঞ্চিৎ আত্মদোষ ক্ষালনার্থ প্রস্তুত থাকিলেই আমাদিগের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

এই পত্র প্রকাশিত হইবার পর তিনি এডুকেশন গেজেট সম্পাদককে যে দ্বিতীয় পত্র লেখেন, তাহা মুদ্রিত না করিয়া সম্পাদক মহাশয় ১২৭৬

সালের ২৬শে ভাদ্রের পত্রিকায় "নিমাই বাবুর পত্র মুদ্রিত করা আবশ্যক বোধ হইল না" বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি 'সমাচার চন্দ্রিকায়' 'এডুকেশন গেজেট ও সুবর্ণবণিক্' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া সুবর্ণ-বণিকের বৈশ্যত্বের প্রমাণ উপস্থাপিত করেন। ২রা আশ্বিনের এডুকেশন গেজেটে সমাচার চন্দ্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিবাদে "সুবর্ণবণিক্—পুনরালোচনা" নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১২ই আশ্বিনের "সমাচার চন্দ্রিকায়" পুনরায় "এডুকেশন গেজেট ও আমরা" শীর্ষক প্রবন্ধে নিমাই বাবু এডুকেশন গেজেটের আপত্তি খণ্ডন করেন এবং ১২ই আশ্বিনের "সোম-প্রকাশ" পত্রিকাতেও "সুবর্ণবণিক্, এডুকেশন গেজেট ও হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্র" প্রবন্ধে তিনি সুবর্ণবণিকের বৈশ্যত্বের প্রমাণাবলী লইয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। ইহাতে ৫ই অগ্রহায়ণের এডুকেশন গেজেটে তাঁহার উপস্থাপিত প্রমাণাবলী সহ তাঁহার পত্র মুদ্রিত হইয়াছিল।

'এরাই আবার বড়লোক'

গ্রন্থখানি তিন অঙ্কে সমাপ্ত প্রহসন। ১ ৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। প্রচ্ছদ-পত্র নিম্নরূপ—

"এঁরাই আবার বড়লোক !
(প্রহসন)
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু পোঃ বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক
ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।
সন ১২৭৪ সাল, কার্তিক।"

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের উল্লেখ করিরা গ্রন্থকার 'নান্দী' উপলক্ষে বলিতেছেন—

"সুধী সজ্জনগণ, মনোরঞ্জন কারণ, গাইব করি যতন
নূতন নাটক গান।
সবার প্রতি মিনতি, ধরে মরালের রীতি, এ মম সঙ্গীত-প্রতি
করিবেন শ্রুতিদান।

সমাজ দোষ বর্ণনে, করি নাই হেন মনে, কটাক্ষ বিশেষ জনে
করিব সন্ধান।
একত্র স্বভাব সব, করি, রচি ছবি নব, দেখিলে তাহে স্বভাব
সে দোষ জেনো আপন।" পৃঃ ১

আলোচ্য গ্রন্থখানি তাৎকালিক সামাজিক দুর্নীতির চিত্র। ইহাতে গ্রামাঞ্চলে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার ও পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী বড়লোকের সামাজিক শৃঙ্খলা-বিরোধী অনাচার প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামস্থ মধ্যবিত্ত লোকের সবল মনোবৃত্তির চিত্রও অঙ্কিত করিয়াছেন।

'ধ্রুব-চরিত্র'

ধ্রুবচরিত্র নাটকখানি প্রাচীন আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত। উহা ৮৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। প্রচ্ছদপত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"ধ্রুবচরিত্র
(পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক নাটক)
শ্রীনিমাইচাঁদ শীল প্রণীত
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈঃ
ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ।' উদ্ভট
কলিকাতা
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ৩৮ নম্বর ভবনে কলম্বিয়ান প্রেসে
শ্রীযদুলাল দে দ্বারা মুদ্রিত।
সন ১২৭৮ সাল।"

প্রস্তাবনায় গ্রন্থকার নটের মুখে বলিতেছেন—

"সভাজন আজ মম সৌভাগ্য উদয়।
সমাগত সভাস্থলে গুণিসমুদয়॥
কিন্তু আমি মূঢ় নট অতি অকিঞ্চন।
জ্ঞানহীন ক্ষীণমতি ভয়ে ভীত মন॥

কাঁপি থর থর করি হ'তে অগ্রসর।
সঙ্গীতে মোহিতে হেন সভার অন্তর॥
সম্বল সাহস এই জাগিতেছে মনে।
ক্ষমাগুণে বিভূষিত বিশুদ্ধ সুজনে॥
তাই করি করযোড়ে চরণে প্রণতি।
আকিঞ্চন কৃপাদৃষ্টি হোক মম প্রতি॥
পবিত্র পীযূষপোরা মধুর পুরাণ।
করুণা-সিঞ্চিত চারু ধ্রুব উপাখ্যান॥
নাটকেতে গাঁথা সেই মধুমাখা কথা।
গাইব এ রঙ্গভূমে সাধ্য মম যথা॥
মরাল যেমন ক্ষীর নীর ছাড়ি লয়।
তেমনি গুণীর মন পবিত্র আলয়॥
বেছে লবে গুণ কথা ত্যজি দোষরাশি।
এই মাগে অভিনয়ে রঙ্গভূমে আসি।" পৃঃ ১, ২

এই নাটকে গ্রন্থকার সুরুচির চরিত্র অভিনবভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। সাধারণত পুরাণকারের তুলিকায় সুরুচিকে সপত্নীদ্বেষকারিণী স্বার্থসর্বস্ব নারীরূপে চিত্রিত দেখা যায়। কিন্তু গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন সুরুচি আদৌ সপত্নী সুনীতিকে দ্বেষ করেন না; বরং সুনীতির সুখেই সুখী। এই জন্য গ্রন্থকার হেমন্তী নাম্নী একটি পরিচারিকার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন—এই পরিচারিকাই যত নষ্টের মূল—সে সুনীতিকে রাজার কোপে নিপতিত করিবার জন্য বড় রাণীর পোষাক চুরি করিয়া পরিয়া রাত্রিতে রাজপরিষদ রসময়ের সঙ্গে উদ্যানে উপবেশন করিয়াছিল এবং রাজা উত্তানপাদ উহা দেখিয়া বড় রাণী সুনীতিকে দুশ্চরিত্রা মনে করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দান করেন। ইহাতে দুঃখিতা ও মর্মাহতা সুরুচি রাজাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করত প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে বনবাসের ব্যবস্থা মঞ্জুর করাইয়া লন। তৎপরে হেমন্তীর এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া সুরুচি বলিতেছেন—"কি সর্বনাশ! তুই বড় রাণী হয়ে বাগানে রসময়ের পাশে বসেছিলি! হেমন্তী, এই তোর ষড়যন্ত্র! কি ভয়ানক!"

অন্যান্য বিষয়ে গ্রন্থকার পুরাণের অনুসরণ করিয়াছেন।

একটি সঙ্গীতে গ্রন্থকার ঊষার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা বেশ উপভোগ্য—

"কত নিদ্রা যাবে আর অন্তঃপুরবাসিগণ।
পূর্বাশার দ্বারে ঊষা কর দরশন॥
আসিছেন দিনমণি, চলিয়া যান যামিনী,
শ্বেত-অঞ্চলেতে বাঁধি তারকাভূষণ।
পবিত্র শিশির জলে করি স্নান কুতূহলে,
সেজেছে বিবিধ ফুলে বসুধা কেমন।
সুন্দর মৃণালে বসি হাসে নলিনী রূপসী,
আরসি সরসী জলে দেখিয়া বদন।
হেলিতেছে শাখা পাতা জাগিতেছে তরুলতা,
সুরভি নিশ্বাস ছলে ত্যজিয়া জৃম্ভন।
প্রভাত নিকট দেখি আনন্দে ডাকিছে পাখী
সঙ্গীত-তরঙ্গময় নিকুঞ্জ ভবন।
তেজস্বী তপস্বিগণ বরণ তপ্ত কাঞ্চন
স্নানহেতু যমুনায় করিছে গমন।
বিভুপদে সদামতি সুখের নাহি অবধি
করিছে ঈশ্বর গুণ যতনে কীর্তন।" পৃঃ ৩০, ৩১

ধ্রুবের স্তবটিও বেশ সময়োপযোগী ; উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"দুঃখভঞ্জন সুখ-কারণ
দীন দয়াল কোথায় হে।
গিরি সরঃ বন ব্যাপ্ত সর্বস্থান
ভকত-হৃদি তব আসন হে।
মূঢ় জ্ঞানবান সকলে সমান
সাধু হৃদয়ে সদা রমণ হে।
গর্ব খর্বকারী সর্ব ভয়হারী
শরণাগতজন রক্ষণ হে।

শেষ নাগদল শোভে তব পদতল
নাম পদ্মপলাশলোচন হে।” পৃঃ ৫৪

চন্দ্রাবতী, ধ্রুবচরিত্র ও এঁরাই কি বড়লোক—এই তিনখানি পুস্তক বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

জনহিতকর কার্যে নিমাইচাঁদ

তিনি বহু বৎসর চুঁচুড়ার “শিশুশিক্ষালয়ের” সম্পাদক এবং হুগলী চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন। দীর্ঘকাল তিনি চুঁচুড়ায় অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদেও কাজ করিয়াছেন। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে হুগলী কলেজের অধ্যাপক থাকা কালে প্রায়ই নিমাইচাঁদের সহিত দেখা করিবার জন্য সস্ত্রীক তাঁহার বাড়ীতে যাইতেন। নিমাইচাঁদ লালবিহারীর এক দূর-সম্পর্কীয়া ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে উভয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ ছিল। কামারপাড়া বাজারে নিমাই বাবুর বৈঠকখানা ঘরে লালবিহারী দে সম্পাদিত বেঙ্গল ম্যাগাজিনের অফিস ছিল।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে নিমাইচাঁদ তিন পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন।

মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর

লক্ষ্মীকান্ত ধর

ইংরেজগণ কলিকাতায় বাণিজ্য-কুঠী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সুবর্ণবণিক্ ব্যবসায়ী বাণিজ্যার্থ হুগলী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহারা স্বীয় দূরদর্শিতার ফলে বুঝিয়াছিলেন যে, একদিন কলিকাতা বিশাল বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইবে এবং প্রথমাবধি এই স্থানে বসবাস করিলে ভবিষ্যতে প্রভূত ধন উপার্জনের সুযোগ মিলিবে। এই সমস্ত সুবর্ণবণিক্ ব্যবসায়ীর মধ্যে লক্ষ্মীকান্ত ধরের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি সাধারণের নিকট "নকুড় ধর" নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার আদি নিবাস ছিল সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামে ব্যবসাবাণিজ্যের অসুবিধা বিধায় তিনি হুগলী আগমন করিয়াছিলেন। মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর এই লক্ষ্মীকান্ত ধরের দৌহিত্র।

কলিকাতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্প্যানীর সহিত লক্ষ্মীকান্তের বিশেষ প্রীতি ছিল এবং তিনি বরাবরই কোম্পানীকে অর্থ-সাহায্য করিতেন। পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে লক্ষ্মীকান্ত ক্লাইবকে যুদ্ধের ব্যয় বহনার্থ প্রভূত অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। অতঃপর প্রথম মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহার্থে তিনি ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে নয় লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন।[১] শুধু অর্থ সাহায্য নয়, অন্যান্য ব্যাপারেও ক্লাইব এবং ওয়ারেণ হেষ্টিংস লক্ষ্মীকান্তের নিকট পরামর্শ চাহিতেন। একবার একজন বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন হওয়ায় ক্লাইব তাঁহাকে একটি লোক যোগাড় করিয়া দিতে বলেন; তিনিই বর্তমান শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নবকৃষ্ণকে লর্ড ক্লাইবের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন এবং তাঁহাকেই মুন্সী নিযুক্ত করিতে বলেন।[২] ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহার অর্থ সাহায্য ও অন্যান্য উপকারের জন্য তাঁহাকে মহারাজা

---

১ *Maharaja Sukhmoy Roy Bahadur and His Family*, pp. 3, 4

২ ঐ—পৃঃ ৪

উপাধি প্রদানে অগ্রসর হইলে, তিনি ঐ উপাধি গ্রহণে অস্বীকৃত হন। লক্ষ্মীকান্তের মৃত্যুতে সর্ব শ্রেণীর লোক শোক প্রকাশ করিয়াছিল।

মহারাজ-মাতা পার্বতী দাসী

লক্ষ্মীকান্তের কোন পুত্র সন্তান ছিল না; তাঁহার একমাত্র কন্যার নাম পার্বতী দাসী। তিনি বিবিধ সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহার স্বামীর নাম রঘুনাথ পাল। তাঁহারই পুত্র মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর। সুখময় মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হওয়ায় পার্বতী দাসীও মহারাজ-মাতা নামে অভিহিত হইতেন। মৃত্যুকালে পার্বতী দাসী তাঁহার উইলে কাশীপুর গান ফাউণ্ড্রি ঘাট তৈয়ারী ও দমদমা হইতে ঐ ঘাটে আসিবার রাস্তা নির্মাণের জন্য ৪০,০০০৲ টাকা দান করিয়া যান। তাঁহার পৌত্র রাজা বৈদ্যনাথ রায় ও রাজা নরসিংহচন্দ্র রায়—এই দুইজন এই ঘাট ও রাস্তা নির্মাণ কার্য সম্পাদন করেন। এতদ্ভিন্ন দেশীয় হাসপাতালের সাহায্যার্থ তিনি আরও ৩০,০০০৲ টাকা উক্ত উইলে দান করিয়া যান।

সুখময়ের মহারাজা উপাধি লাভ

লক্ষ্মীকান্ত ধরের মৃত্যুর পর সুখময় তাঁহার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তদানীন্তন দিল্লীর সম্রাট্ Khuram Bakht Muazzam Shah Bahadur সুখময়ের বদান্যতা ও রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে মহারাজ বাহাদুর উপাধি ও 'চার হাজারি' পদ প্রদান করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি ঝালর দেওয়া পাল্কী ব্যবহারেরও অনুমতি প্রাপ্ত হন—তৎকালে ইহা অত্যন্ত উচ্চ সম্মান বলিয়া পরিগণিত হইত। এই সনদের ইংরেজী অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"In accordance with an august order passed on Sunday the twenty-seventh of Jamadiussanee in the fourth year of His Majesty's reign by His Highness the Protector of people....It is again submitted for His Majesty's perusal and is written by Hafiz Abdul Ghani, the writer of events and list of the houses, born slave in His Majesty's Court that an order has been

issued to the effect that Rai Sukhamoy be promoted to the title of Maharaja Bahadur and the post Char Hazaree (command over four thousand men) and be permitted to use a Palkie with fringes around it...

"Grant him a Sanad dated with the month mentioned above in the fourth year of His Majesty's reign, 1135 Hizree, corresponding with the year 1757 A.D."*

দিল্লী সম্রাটের প্রদত্ত "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি লাভের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও তাঁহাকে উক্ত উপাধি প্রদান করেন এবং পারশ্যের সাহ বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের মারফৎ অনুরূপ উপাধি দিয়াছিলেন।

জনহিতকর কার্য

মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর দীনদুঃখীর দুঃখমোচনে মুক্তহস্ত ছিলেন এবং জনহিতকর কার্যে সাহায্য করিতেন। কলিকাতা হইতে পুরী পর্যন্ত বিস্তৃত যে সুদীর্ঘ রাস্তা "কটক রোড" নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তিনিই অর্থ ব্যয়ে এই রাস্তা নির্মাণ করিয়া তীর্থযাত্রিগণের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ তারিখের হিন্দু পেট্রিয়টে এই প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—"মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর প্রভূত অর্থব্যয়ে 'কটক রোড' তৈয়ারী করেন এবং উহার মেরামতী কার্যের জন্য গভর্ণমেণ্টের হাতে ১,৫০,০০০ টাকা জমা দিয়াছিলেন।"

কটক রোডের বিবরণ

কটক রোড মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরের অবিনশ্বর কীর্তি। ইহা উলুবেড়িয়া হইতে পুরী জগন্নাথ-মন্দিরের সিংহ-দরজা পর্যন্ত গিয়াছে এবং ইহার দৈর্ঘ্য ২৮০ মাইল। তিনি রাস্তা তৈয়ারী করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই; নিম্নলিখিত স্থানে যাত্রিগণের বাসের জন্য পাকা ধর্মশালা বা বিশ্রামাবাস প্রস্তুত করিয়াছিলেন—

---

* *Maharaja Sukhmoy Roy Bahadur and His Family*, pp. 25, 26

পুরী জেলায়—

(১) কাটজুরী নদীর তীরে বরং ধর্মশালা ;
(২) কঁচি নদীর তীরে আঠারনালা ধর্মশালা ;

কটক জেলায়—

(৩) মহানদীর তীরে টঙ্গী ধর্মশালা ;
(৪) বৈতরণী নদীতীরে আখুয়াপাড়া ধর্মশালা ;

বালেশ্বর জেলায়—

(৫) সালুণ্ডী নদীতীরে ভদ্রক ধর্মশালা ;
(৬) কাঁশবন নদীর তীরে সোরো ধর্মশালা ;
(৭) বড়বল্লং নদীর তীরে বালেশ্বর ধর্মশালা ;
(৮) জলকা নদীর তীরে খুন্তাবস্তা ধর্মশালা ;
(৯) সুবর্ণরেখা নদীর তীরে বাজঘাট ধর্মশালা ;

মেদিনীপুর জেলায়—

(১০) কাঁসাই নদীর তীরে দাঁতন ধর্মশালা ;
(১১) কাঁসাই নদীর তীরে শ্রীরামপুর ধর্মশালা ;
(১২) কাঁসাই নদীর তীরে দেব্রা ধর্মশালা ;
(১৩) রূপনারায়ণ নদীর তীরে কোলা ধর্মশালা ;

হাওড়া জেলায়—

(১৪) দামোদর নদীর তীরে চণ্ডীতলা ধর্মশালা ;

প্রত্যেক ধর্মশালার পানীয় জলের সুবিধার্থ কূপ খনন করা হইয়াছিল এবং প্রায় ৫০০ যাত্রীর স্থান হইত। রেলপথ নির্মিত হওয়ার পূর্বে এই সমস্ত চটি বা ধর্মশালাই তৎকালীন যাত্রীর একমাত্র আশ্রয় ছিল। এতদ্ভিন্ন পথের ধারে বৃক্ষ রোপণ ও ৩।৪ মাইল অন্তর কূপ খনন করিয়া যাত্রিগণের তীর্থযাত্রা সুগম করিবার জন্যও তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

পুরীধামে তীর্থযাত্রা

কটক রোড তৈয়ারীর পর তিনি ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে পুরীধামে জগন্নাথ দর্শনার্থ গমন করেন। এই সময় বড় লাট লর্ড ওয়েলেস্‌লি তাঁহাকে যে পাসপোর্ট প্রদান করেন, নিম্নে তাহার মর্ম প্রদত্ত হইল—

"কার্যনিরত কলেকটার, প্রহরী, চৌকীদার ও সাধারণ রাস্তার রক্ষকগণকে অবগত করান হইতেছে যে, মাননীয় মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর জগন্নাথের মন্দিরে তীর্থযাত্রা করিতেছেন ; তাঁহার সহিত নিম্নলিখিত দ্রব্য ও পরিচারক আছে। তোমাদের কেহ রাস্তা বা অন্য কোন প্রকার শুল্ক আদায়ের জন্য তাঁহার তীর্থযাত্রায় কোনরূপ বাধা প্রদান করিবে না। বরং তাঁহাকে নিরাপদে তোমাদের প্রত্যেকের এলাকার মধ্য দিয়া যাইতে দিবে। এই আদেশ জরুরী বলিয়া জানিবে।

দ্রব্য ও ভৃত্যবর্গের তালিকা

রূপার বাসন—এক দফা
কাপড়চোপড় ও পিতলের বাসন প্রভৃতি—৪০ বাক্স
তাঁবু—এক দফা
খড়খড়ীযুক্ত ঝালর দেওয়া পাল্কী—১৫ খানা
উট—১টি
ঘোড়া—(সংখ্যা অস্পষ্ট)
অলঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্য—৪ বাক্স
খাট—২ খানা
মসলা প্রভৃতির বাক্স—২টি
বরকন্দাজ—১৫ জন
বর্শাধারী—৪ জন
ভৃত্য—৭ জন
মশালধারী—৭ জন
মুন্সী—১ জন
কেরাণী—২ জন

নাপিত—৪ জন

হরকরা—৪ জন

ঝাড়ুদার—১ জন

সিপাহী—২ জন

জমাদার—(সংখ্যা অস্পষ্ট)

২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮০৫ (স্বাক্ষর) ওয়েলেস্‌লি”[১]

পুরীধাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন

১৮০৫ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ তারিখে মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর পুরীধামের তীর্থকৃত্য সম্পন্ন করিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার প্রত্যাগমনকালে উড়িষ্যা প্রদেশের কমিশনার তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারিগণের উপর এক পরোয়ানা জারী করিয়া মহারাজার সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। নিম্নে এই পরোয়ানার মর্ম প্রদত্ত হইল—

“উড়িষ্যা প্রদেশের রাস্তা ও ঘাট প্রভৃতিতে নিযুক্ত চৌকীদার, প্রহরী ও শুল্ক-সংগ্রহকারিগণের প্রতি—

সকলে পরিজ্ঞাত হইবে যে, মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর পুরীধামের তীর্থকৃত্য সমাপ্ত করিয়া কটক হইতে তাঁহার নিজ দেশ কলিকাতা যাইতেছেন। তোমাদিগকে আদেশ করা হইতেছে, যে যে স্থানে তিনি বিশ্রাম করিবেন, সেই সেই স্থানে তোমরা উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধান করিবে এবং তাঁহার জিনিষপত্র পাহারা দিবে। তোমাদের প্রত্যেকের এলাকার ভিতর দিয়া যাহাতে তিনি নিরাপদে যাইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিবে এবং তোমাদের প্রতেকে তাঁহাকে রাস্তা দেখাইয়া লইয়া যাইবার জন্য পথ-প্রদর্শক সরবরাহ করিবে। উহা অত্যন্ত জরুরী বলিয়া বিবেচনা করিয়া সেই মত কার্য করিবে।

২০শে মার্চ, ১৮০৫ (স্বাক্ষর) জে মেনভিল

কমিশনার”

Maharaja Sukhmoy Roy Bahadur and His Family, pp. 39, 40

পুরুষানুক্রমিক সুবিধাদানের জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ

প্রথমবার তীর্থযাত্রা করিয়া ফিরিয়া আসিবার পর তিনি জগন্নাথ দর্শন ও কটক রোড সম্বন্ধে কতকগুলি বংশানুক্রমিক সুবিধা প্রার্থনা করিয়া গভর্ণর জেনারেলের নিকট এক পত্র লেখেন। গভর্ণমেণ্টও তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিয়া উহা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। নিম্নে উভয় পত্রের মর্ম প্রদত্ত হইল—

"১। যখন আমি, আমার পুত্র অথবা অন্য কোন বংশধর জগন্নাথ দর্শনে যাইব বা যাইবে, তখন আমাদিগকে বা আমাদের অনুচরবর্গকে কোনরূপ শুল্ক প্রদান করিতে হইবে না।

২। যখন আমার গোমস্তা ও অনুচরেরা জগন্নাথের ভোগের দ্রব্য লইয়া যাইবে, তাহারাও কোনরূপ শুল্ক প্রদান না করিয়া যাইতে পারিবে।

৩। যখন আমি মন্দিরে যাইব, তখন আমাকে স্বহস্তে 'পরিচাযষ্টি' বহন করিবার অনুমতি দেওয়া হউক এবং আমার অনুপস্থিতিতে আমার নায়েব উক্ত যষ্টি বহন করিবে।

৪। আমার নাম সংস্কৃত, বাংলা ও পার্শি ভাষায় প্রত্যেক সেতুর গাত্রে লিখিত থাকিবে।

৫। উপরি লিখিত ভোগের দ্রব্যাদি ও 'পরিচা-যষ্টি' সম্বন্ধে খুরদার রাজা যেন কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করেন, কিম্বা উহাতে তাঁহার যেন কোনরূপ আধিপত্য না থাকে।

৬। কটক রোডের বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষবীথি রোপিত হইবে।

৭। 'বেগোনিয়া'য় একটি পুষ্করিণী খনন করিতে হইবে এবং অন্য যে স্থানে অত্যন্ত জলাভাব, সেই স্থানেও অন্য একটি পুষ্করিণী খনন করিতে হইবে।

৮। যদি আমার উপরি লিখিত বিষয়গুলি অনুমোদিত হয়, তবে আমাকে যেন একটি সনদ দেওয়া হয় এবং পুরীতেও এই আদেশ প্রচারিত হয়।"

গভর্ণর জেনারেলের উত্তর

১৮১০ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টোর সহি-মোহরযুক্ত একটি সনদ মহারাজার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। উহার মর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"১। সপারিষদ গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর এবং তাঁহার বংশধরগণকে ও তাঁহাদের ব্যক্তিগত অনুচরগণকে জগন্নাথ-তীর্থযাত্রীর উপর নির্ধারিত কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দানের জন্য যথোপযুক্ত আদেশ প্রদান করিবেন।

২। ভোগের দ্রব্যাদি বহনকালে মহারাজার গোমস্তা বা লোকজনের উপর কোনরূপ কর ধার্য হইবে না।

৩। জগন্নাথের মন্দিরের নিয়মানুযায়ী মহারাজার তৃতীয় অনুরোধ যথাসাধ্য রক্ষিত হইবে।

৪। মহারাজার নাম অনুরোধানুযায়ী সেতু-গাত্রে ক্ষোদিত হইবে এবং সপারিষদ গভর্ণর জেনারেল বাহাদুর আরও ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, যাহাতে এই মহোপকারী কার্যের কর্তারূপে তাঁহার নাম ভবিষ্যতেও লোকেরা জানিতে পারে।

৫। তৃতীয় দফার মত এই অনুরোধও মন্দিরের নিয়মানুযায়ী যথাসাধ্য রক্ষিত হইবে।

৬। এই অনুরোধ কার্যে পরিণত করা হইবে।

৭। এই অনুরোধও শীঘ্রই কার্যে পরিণত করা যাইবে।

৮। মহারাজা গভর্ণর জেনারেলের সহিমোহরযুক্ত এই পত্রকে সনদ বলিয়া মনে করিবেন। পুরীতেও যথোপযুক্ত আদেশ প্রচারিত হইবে।"[১]

বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর

ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর এই ব্যাঙ্কের একজন ডিরেক্টর মনোনীত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তৎকালে তিনিই একমাত্র বাঙালী ডিরেক্টর ছিলেন।[২]

---

১ *Maharaja Sukhmoy Roy Bahadur and His Family*, pp. 35, 36, 37

২ *Statesman*, 3rd January 1909, p. 6

উইলে ধর্মকার্যে দান

মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে উইল করেন, তাহাতে তিনি বৃন্দাবন ধামের কুঞ্জে অতিথি-সেবার জন্য ১৫,০০০৲ টাকা দান করিয়া যান। এতদ্ভিন্ন সত্যবাদী গ্রামে গোপালজী ঠাকুরের সেবার জন্য ১৫,০০০৲ টাকা নির্ধারিত করেন।

মৃত্যু

তিনি ১৮১১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে পাঁচ পুত্র ছিল। তাঁহাদের নাম—মহারাজা রামচন্দ্র রায় বাহাদুর, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর, রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর, রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর, রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর।

পুত্রগণের বিবরণ

মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র রায়ও মহারাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং ঝালরদার পাল্কী ব্যবহারের অনুমতি পাইয়াছিলেন। তিনি ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে পরলোক গমন করেন যোড়াসাঁকো রাজবাড়ীর কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁহার বর্তমান বংশধর।

তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় অপুত্রক অবস্থায় ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দেহত্যাগ করেন। তৃতীয় পুত্র রাজা বৈদ্যনাথ রায় দানশীল ছিলেন, এবং পশু-বিজ্ঞানে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি লণ্ডন জুলজিক্যাল সোসাইটির নিকট হইতে ডিপ্লোমা লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব কাউন্সিলার কুমার বিশ্বনাথ রায় তাঁহার অন্যতম বংশধর।

চতুর্থ পুত্র রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে পোষ্য পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। কনিষ্ঠ পুত্র রাজা নরসিংহচন্দ্র রায় বাহাদুর পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগের সময় পোস্তায় পিতার প্রাসাদোপম বাড়ী প্রাপ্ত হন। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা রাজা শিবচন্দ্র রায় উভয়ে এক সঙ্গে কর্মনাশা নদীর উপর সেতু নির্মাণের জন্য ১৬৭০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। কুমার বিষ্ণুপ্রসাদ রায় তাহার অন্যতম বংশধর।

হলধর সেন

জন্ম ও বাল্যজীবন

দানশীল হলধর সেন মহাশয় আহিরীটোলার সুবর্ণবণিক্ কূলে সুপ্রসিদ্ধ সেন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম একশত বৎসরেরও কিছু পূর্বে। তাঁহার পিতা ধনী ছিলেন এবং তিনি শৈশবকাল হইতে ধনৈশ্বর্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি তৎকাল প্রচলিত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন কিন্তু বিলাসব্যসনে আসক্ত হন নাই। বাল্যকাল হইতে তাঁহার চিত্ত পরের দুঃখ মোচনে আনন্দ অনুভব করিত।

পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলধর

পিতার মৃত্যুর পর হলধর বাবু পিতার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন; কিন্তু নিজের ভোগবিলাসে তিনি ইহা ব্যয় করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁহার অন্তরলোকে যে করুণার বীজ বাল্যাবধি সুপ্ত ছিল, এইবার তাহা বিরাট্ বটবৃক্ষের মত ফুল ফল-পল্লবে বিকশিত হইয়া উঠিল। পল্লীর দরিদ্র, বিপন্ন, অনাথ প্রভৃতির সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন এবং পরের দুঃখ মোচন করিয়াই তিনি ধনের সদ্ব্যবহার করেন। 'বিনাশ নিশ্চয় জানিয়া সৎকার্যে দান করিবে'—এই নীতিবাক্য তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়াছেন। পল্লীস্থ বৃদ্ধলোকগণের মুখে শোনা যায় যে, প্রত্যহ তিনি আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য দুঃস্থ পরিবারের অভাব-অভিযোগের খবর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লইতেন ও তাহার প্রতীকার না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না,—ইহাই ছিল তাঁহার প্রাত্যহিক উপাসনা বা সাধনা। এই বিষয়ে তিনি কোনরূপ অভিমান পোষণ করিতেন না।

পারিবারিক বিবরণ

তিনি বিবাহিত জীবনে আদর্শ গৃহী ছিলেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, গৃহস্থকে আয়ের এক ষষ্ঠাংশ দান করিতে হয়। তিনি শাস্ত্রের এই

অনুশাসন যথাসাধ্য প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মাত্র দুইটি কন্যা ছিল; কোন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে নাই। এই জন্য তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবেরা বংশরক্ষার্থ পোষ্যপুত্র গ্রহণে প্ররোচিত করিয়াছিল, কিন্তু তিনি ঐরূপে বংশরক্ষায় মনোযোগী না হইয়া ভিন্নভাবে বংশরক্ষার ব্যবস্থা করেন।

উইলে সুবর্ণবণিক্ দাতব্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ

এই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া নীরব কর্মী পরদুঃকাতর হলধর বাবু ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর এক উইল সম্পাদন করেন। এই উইলে তিনি তাঁহার সম্পত্তিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগ স্ত্রী ও দুই কন্যাকে দান করেন; এবং অপরার্ধ ৫০,০০০ টাকা দ্বারা দরিদ্রনারায়ণের দুঃখমোচনের জন্য হলধর সেন সুবর্ণবণিক্ দাতব্য ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা করেন। উইলে নির্দেশ থাকে যে, এই ৫০,০০০ টাকা দ্বারা একটি ট্রাষ্ট ফণ্ড গঠন করিতে হইবে এবং এই ট্রাষ্ট ফণ্ডের টাকা হইতে যে সুদ পাওয়া যাইবে, তাহা জাতিবর্ণনির্বিশেষে দরিদ্রনারায়ণগণের মধ্যে প্রতি মাসে বিতরণ করিতে হইবে। উইলে তিনি এই ট্রাষ্ট ফণ্ডের ট্রাষ্টিগণের নামও উল্লেখ করিয়া যান।

ট্রাষ্ট ফণ্ডের প্রথম ট্রাষ্টিগণ

তিনি উইলে তাঁহার স্ত্রী হরমণি দাসী ও অন্য তিনজন সুবর্ণবণিক্ ভদ্র মহোদয়কে এই ট্রাষ্ট ফণ্ডের ট্রাষ্টি নির্বাচিত করেন। তদনুসারে ট্রাষ্ট ফণ্ডের ট্রাষ্টিগণের নাম নিম্নরূপ—

(১) হরমণি দাসী
(২) মহেশচন্দ্র চন্দ্র
(৩) গোবিন্দচন্দ্র ধর
(৪) গঙ্গানারায়ণ লাহা

ইঁহারা সকলেই বর্তমানে পরলোকগত।

হলধর সেন সুবর্ণবণিক্ দাতব্য ভাণ্ডারের কার্য

১৮৪৭ হইতে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৯৩ বৎসর কাল এই দাতব্য ভাণ্ডারের কার্য ট্রাষ্টিগণের নিঃস্বার্থ কর্মকুশলতায় সুচারুভাবে পরিচালিত হইয়াছে। ট্রাষ্টের মাসিক আয় ন্যূনাধিক ১৭৫৲ টাকা। এই টাকা হইতে দরিদ্র ছাত্রগণ যাহাতে বিনা বেতনে বা অর্দ্ধ বেতনে পড়িতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে উক্ত পল্লীস্থ আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ে মাসিক ১৫৲ টাকা গত ৪২ বৎসর ধরিয়া দেওয়া হইতেছে। এতদ্ভিন্ন জাতিধর্মনির্বিশেষে দরিদ্রগণকে এককালীন ও মাসিক হিসাবে সাহায্য করা হইয়া থাকে। সাহায্যের পরিমাণ মাসিক ১৲ টাকা হইতে ৪৲ টাকা পর্যন্ত। ১৩১৲ টাকা মাসিক বৃত্তিও ১০৲ টাকা এককালীন দান নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। গত ৯৩ বৎসরে এই ট্রাষ্ট ফণ্ড হইতে প্রায় ১,৬৫,০০০৲ টাকা দান করা হইয়াছে। ইহা কম গৌরবের কথা নহে। প্রতি বাংলা মাসের শেষ রবিবারে মাসিক সাহায্য বিতরিত হইয়া থাকে।

ট্রাষ্টফণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থা

পূর্বাপর ট্রাষ্টিগণের কার্যকুশলতায় ও নিঃস্বার্থ পরিচালনায় ট্রাষ্ট ফণ্ড দাতার দান অপেক্ষাও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান ট্রাষ্ট ফণ্ডের মূলধন ৫০,০০০৲ টাকা হইতে বর্ধিত হইয়া ৫৮,৫০০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। তন্মধ্যে—

৩½ সুদী কোম্পানীর কাগজ (গভর্ণমেণ্টের নিকট গচ্ছিত)	৫৭,০০০৲
পোষ্ট অফিস সেভিং ব্যাঙ্কে মজুত	১,৫০০৲
মোট	৫৮,৫০০৲ টাকা

১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হলধর সেন স্মৃতি-সভার সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস সি আই ই মহাশয় ট্রাষ্ট ফণ্ড সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছিলেন—"এই ট্রাষ্ট ফণ্ডটি আজ ৯৩ বৎসরকাল দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে অর্থ সাহায্য করিয়া শুধু যে বাঁচিয়া

আছে তাহা নহে, অধিকন্তু ফণ্ডের টাকা ৫০,০০০৲ হইতে ৫৮,৫০০৲ টাকায় পরিপুষ্ট হইয়াছে। ইহাই পূর্বাপর সকল ট্রাষ্টিগণের সাধুতা ও কৃতিত্বের পরিচায়ক।"

ট্রাষ্টিগণের নিঃস্বার্থভাব

এই ট্রাষ্ট ফণ্ডের ট্রাষ্টিগণ কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন না। ট্রাষ্টের নিজস্ব বাড়ী না থাকায় ভূতপূর্ব ট্রাষ্টি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চন্দ্র মহাশয় বহুকাল ৬৭নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীটে নিজ বাড়ীতে বিনা ভাড়ায় ট্রাষ্টের অফিসের জন্য একখানি ঘর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ট্রাষ্টের মাসিক ব্যয় মাত্র দুই টাকা। গিরিশ বাবু বহু বৎসর ধরিয়া ট্রাষ্ট ফণ্ডের কার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন।

সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ

মাসিক সাহায্য কলিকাতা ও উপকণ্ঠস্থিত ব্যক্তিবর্গকে মাত্র দেওয়া হয়। এককালীন দান কলিকাতার বাহিরেও দেওয়া হইয়া থাকে। নিয়মিত মাসিক সাহায্য প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অধিকাংশ মহিলা। পুরুষ-দিগের মধ্যে অতিবৃদ্ধ, অকর্মণ্য ও অন্ধ ব্যক্তিগণ সাহায্য পাইবার অধিকারী। বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত অঞ্চলের সাহায্যার্থ এককালীন বার্ষিক ২৫৲ সাহায্য করা হইয়া থাকে। উহা হলধর বাবু ও তাঁহার পিতার আত্মার তৃপ্তিসাধনার্থ উইলের নির্দেশ মত ব্যয়িত হয়। বর্তমানে ৬২ জন নিয়মিত মাসিক সাহায্য পাইয়া থাকেন।

বর্তমান ট্রাষ্টিগণ

বর্তমানে ট্রাষ্ট ফণ্ডের ট্রাষ্টি দুই জন; তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চন্দ্র

(২) শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র চন্দ্র এম্ বি

বর্তমানে মাণিকবাবুর বাড়ী ৭৩নং নিমুগোস্বামীর লেনে ট্রাষ্ট ফণ্ডের অফিস অবস্থিত।

বর্তমান ট্রাষ্টিগণের উদ্যোগে মাঝে মাঝে হলধর বাবুর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ স্মৃতি-সভার আয়োজন হইয়া থাকে। ১৯৩৫, ১৯৩৭, ১৯৩৮ ও ১৯৪০ এই কয় বৎসর স্মৃতি-সভার অধিবেশন হইয়াছে।

হরমণি দাসীর দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

হলধর বাবুর পত্নী হরমণি দাসী হলধর বাবুর বসত বাটীতে শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ জীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার অংশের সমস্ত সম্পত্তি ঠাকুরের সেবার জন্য দেবোত্তর করিয়া যান। হলধর বাবুর বসতবাটী বর্তমানে নিমুগোস্বামীর লেনে শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ জিউর ঠাকুর বাড়ী নামে পরিচিত।

হলধর বাবু অপুত্রক ছিলেন বটে, কিন্তু দাতব্যভাণ্ডার বংশধরের কার্য করিয়া তাঁহার নাম পৃথিবীর বুকে অমর করিয়া রাখিবে।

অনুক্রম